প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

সাহিত্য প্রচার
॥ কলিকাতা ॥

প্রথম প্রকাশ ঃ
আশ্বিন—১৩৬৩

প্রকাশ করেছেন ঃ
শ্রীদীপক কালিদাস ভট্টাচার্য
সাহিত্য প্রচার,
২নং বারাণসী ঘোষ সেকেন্ড লেন,
কলিকাতা।

ছেপেছেন ঃ
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিঃ,
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড,
কলিকাতা-১৩।

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন ঃ
অরুণ দাস

ব্লক করেছেন ঃ
টাওয়ার হাফটোন কোং।

বই বেঁধেছেন ঃ
ভ্যারাইটি বাইন্ডিং ওয়ার্কস।

দাম ছয় টাকা
রেক্সিন—সাত টাকা

—প্রাপ্তিস্থান—

কলিকাতা পুস্তকালয় (প্রাইভেট)
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভূমিকা

—শচী-দুলাল নিমাই, প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বড় গর্বের, বড় গৌরবের পরম আদরের ধন। জগতে বহু অবতার অথবা অবতার-কল্প মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে; কিন্তু আমাদের অতুল সৌভাগ্য যে, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয়েছিল আমাদের নিজেরই ঘরে।

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের পুণ্যময় অপূর্ব জীবন-লীলা অনন্তরসের ভাণ্ডার,—অমৃতের গোমুখী-নির্ঝর। আবির্ভাব থেকে তিরোভাব পর্যন্ত তাঁর সমগ্র জীবন বহুতর বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ। একাধারে প্রেম-ভক্তি, স্নেহ-কারুণ্য, প্রীতি-বাৎসল্য, ত্যাগ-বৈরাগ্য ইত্যাদির এরূপ হৃদয়গ্রাহী সমাবেশ—বুঝিবা কোন উপন্যাসে-ও কোনদিন কল্পিত হয়নি। অথচ যে সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর শুভ্র-সুন্দর মহান চরিত্রটি অপার মহিমায় ফুটে উঠেছে,—তার কোনটিই অপ্রাকৃত বা অবাস্তব নয়। প্রত্যেকটিই সর্বমানবের হৃদয়-মন-গ্রাহ্য চিত্ত-নির্মল-কর এক উপাদেয় স্বর্গীয় বস্তু।

ভাষার তুলিকায় ভাবের ব্যঞ্জনায় এবং গল্পের আঙ্গিকে এই লোকোত্তর মহাজীবনের আলেখ্য রচনা করে তাকে রসোত্তীর্ণ করে তোলা—আমার সাধ্য কি-না অথবা তার যোগ্য অধিকার আমার আছে কি-না,—এ-বিষয়ে চিন্তা করবারও সুযোগ আমার হয়নি। ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি আমার অন্তরের বহুদিন-সঞ্চিত গভীর শ্রদ্ধানুরাগ—কি-এক দুর্বার আকর্ষণে—আমাকে আত্মহারা করে নিয়োগ করেছে এই দুশ্চর সাধনায়। আমার সম্মুখে সুদীর্ঘ সুদুর্গম পথ,—এই পথ-পরিক্রমায় আমার সহায়ও নেই,—সম্বল-ও নেই; আছে শুধু প্রগাঢ় অধ্যবসায়, প্রাণপণ নিষ্ঠা,—এবং ভরসা শুধু শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের করুণা।—আর সান্ত্বনা এই যে,—আমার প্রচেষ্টা সৎ ও মহৎ; সৎ প্রচেষ্টা নাকি সেই সচ্চিদানন্দের কৃপায় জগতে প্রায়ই ব্যর্থ হয় না,—এবং এর অকৃতকার্যতাতেও অগৌরব নেই।

—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ-বিমুখ মোহপ্রাপ্ত ধনঞ্জয়কে উপদেশ-দান-কালে বলেছিলেন,—"যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়,—তখনই আমি ধর্ম-স্থাপনের জন্য দেহ পরিগ্রহ করি।'—শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবকালেও বাঙ্গালার ধর্মজীবন ছিল ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন। সমগ্র দেশ ভরে উঠেছিল ধর্মের গ্লানিতে,—কুসংস্কারে! পণ্ডিতকুল-অধ্যুষিত নবদ্বীপে শাস্ত্রীয় জ্ঞান-বিদ্যাচর্চার যথেষ্ট সমাদর ও প্রভাব থাকলেও—প্রেম ও ভক্তিধর্মের কিছুমাত্র আদর ছিল না। সংখ্যালঘু বৈষ্ণবেরা বিদ্রুপাত্মক কণ্ঠে অভিহিত হতেন 'হরি-ভজা' বলে। জাতিভেদ, জাত্যভিমান, স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা-বিচার তখন সমগ্র দেশে মানুষে মানুষে গড়ে তুলেছিল ঘোর ব্যবধান,—ভেদজ্ঞানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। সমাজে ধর্মানুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের ছিল এক চেটিয়া অধিকার। ধর্মের নামে নানা কদনুষ্ঠান-ও ... তা দিকে দিকে। শূদ্রেরা ছিল দারুণ অবজ্ঞায় অবজ্ঞাত—প্রচণ্ড অবহেলায় অবহেলিত। সমাজ-দেহে প্রাণ ছিল না,—অচেতন জড়-পঙ্গু সমাজ যেন ক্রমশঃই এগিয়ে যাচ্ছিল ধ্বংসের

দিকে।—সুতরাং ধর্মরক্ষার্থ ভগবানের দেহ-পরিগ্রহ করে অবতরণেরও ছিল এ-এক উপযুক্ত সময়।.........

হরিনাম-প্রচারের মাধ্যমে ধ্বংসোন্মুখ কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই জড় সমাজের বুকে সহসা প্রবল ধাক্কা দিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। দেশ-বিশ্রুত-কীর্তি অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের আসন থেকে নেমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি তখন ভক্তজনের প্রাণের সিংহাসনে। বহুজন-চিত্তে তাঁর আসন গড়ে উঠেছে ভগবানের অবতার-রূপে।—তাঁর পার্ষদগণের কণ্ঠে বিঘোষিত হলো- তাঁরই যুগান্তকারী এক বৈপ্লবিক বাণী,—'সকলে হরিনাম গ্রহণ কর। জাতি-বর্ণ আবার কি ?—যে নাম গ্রহণ করবে সে মুচি হলেও শুচি। যে ভক্ত সেই ব্রাহ্মণ।'—

যাবতীয় ভেদজ্ঞানের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে অগ্রসর হলেন তিনি যেন এক অচিন্তিত-পূর্ব সম-অধিকারের এবং এক নব-জাতীয়তার ভিত্তি-রচনায়। উপেক্ষিতের দল সাগ্রহে ছুটে এলো নবীন আশা-ভরসা বুকে শ্রীগৌরাঙ্গের নবধর্মের আহ্বানে। সমাজের বুকে জাগলো এক নবীন সাড়া—নব চেতনা। বিরোধীদলের যাবতীয় অস্ত্র—এবং প্রচণ্ড রাজ-শক্তিও ব্যর্থ হয়ে গেল এক তরুণ সমাজ বিপ্লবীর অলৌকিক ব্যক্তি-সত্তার কাছে। জাতিভেদ, জাত্যভিমান ইত্যাদি ভুলে মানুষ চিনলো মানুষকে শুধু মানুষ বলে। জাতির ভাণ্ডারে শ্রীগৌরাঙ্গের এই মহান অবদানের তুলনা কোথায় ? আজ প্রায় পাঁচশত বৎসর পরেও দিকে দিকে যেন তারই আবর্তন চলছে।...তাঁর আবির্ভাব বাংলা-সাহিত্যেও যুগ-প্রবর্তন করে।

কৃষ্ণপ্রেমের আকুলতা, সাংসারিক অনাসক্তি, তার ওপর এক আকস্মিক ঘটনার সংঘাত—শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে উম্বুদ্ধ করে তুলেছিল জীবের কল্যাণে—সন্ন্যাস-গ্রহণে। তাঁর সন্ন্যাসের ন্যায় মর্মান্তিক ঘটনা জগতে বিরল। শীতের নিশীথে শচীদেবীর আকুল কণ্ঠের "নিমাই-নিমাই" আহ্বান কে ভুলতে পারে ? বৃদ্ধা জননীর বুকে শোকের প্রচণ্ড আগুন জেলে সন্ন্যাস নিয়ে তিনিও কিন্তু জীবনে স্বস্তি পান্‌নি। মাকে দুঃখ দিয়ে, মায়ের দুঃখে তাঁরও চোখে বার বার জল পড়েছে। এ জন্য তিনি সময়ে সময়ে অপরাধীও মনে করতেন নিজেকে। মায়ের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি। নীলাচলে থেকেও তিনি মায়ের খবর রাখতেন। দিব্যোন্মাদনার সময় যখন জড়-জগৎ তাঁর মন থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল,—তখনও ক্বচিৎ মায়ের স্মৃতি ভেসে উঠতো তাঁর মনে। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি প্রেমও যে তাঁর অন্তরের কোণে ফল্গু-ধারার মত বয়ে যেতো,—সে পরিচয়ও পাওয়া যেতো তাঁর কোন কোন কার্যে। মা এবং পত্নীর দুঃখ এতই বেজেছিল তাঁর বুকে,—যে, তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে যাতে আর কেউ অনুরূপ কিছু না করে,—সে বিষয়ে তিনি সর্বদাই ছিলেন সজাগ।

নিজে সন্ন্যাস নিলেও গার্হস্থ্য-ধর্মকে তিনি অবহেলার চক্ষে দেখতেন না। গৃহীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতিও ছিল যথেষ্ট।—শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে তিনিই জোর করে সংসারী করেছিলেন। গৃহী হতে তাঁর নিষেধ ছিল না,—'সংসারের কূপমণ্ডুক' হওয়াতেই ছিল তাঁর আপত্তি। তিনি তাঁর গৃহী-ভক্তদের ভাল-মন্দের এবং সুখ-দুঃখেরও প্রায়ই খবর রাখতেন। সে বিষয়ে যথাযোগ্য উপদেশ-ও দিতেন তাঁদের। তিনি ছিলেন ভক্ত-বাৎসল্যের আধার। গৌড়ভক্তেরা যখন নীলাচলে তাঁকে দর্শন করতে আসতেন, তখন তাঁদের নিয়ে যেন এক বিশাল গোষ্ঠী-পরিবারই গড়ে উঠতো মহাপ্রভুর। ভক্তদের দেওয়া নিতান্ত তুচ্ছ উপহারও তাঁর কাছে ছিল মহামূল্য।

মহাপুরুষদের জীবনে ঐশ্বর্য-বিভূতি অথবা অলৌকিকত্বের আরোপ প্রায় সর্বদেশেই প্রচলিত আছে দেখা যায়। পাশ্চাত্যবাসী সমধিক সংস্কার-মুক্ত উদার মন নিয়েও এগুলিকে মেনে নিয়েছেন মহাত্মা বিশুখৃষ্টের জীবনে। দিব্যপুরুষদের জীবনে কিছু কিছু দিব্যভাব

থাকাই স্বাভাবিক। তাঁদের জীবনী-অবলম্বনে কিছু রচনা করতে গেলে—বিশেষ কাব্য-উপন্যাস প্রভৃতি রস-সাহিত্য,—কিছু কিছু দিব্যভাবের ছায়া এসে পড়া বিচিত্র নয়,—হয়ত অপরাধও নয়। ঐতিহাসিকের কঠোর দৃষ্টির কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার, —অথবা অবতার-কল্প মহাপুরুষ রূপেই পূজিত। তাঁর জীবনেও ঐশ্বর্য-বিভূতি ও অলৌকিকত্বের আরোপ থাকা একান্তই স্বাভাবিক। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র-আলোচনায় এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম কথাই বলেছেন। তবে আমার দৃষ্টি ঐতিহাসিকের নয়,—সাহিত্যিকের। আমাব কর্তব্য—চরিত্রের মহিমা ও গৌরব সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রেখে রস-সৃষ্টি। তবু আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির ধারণা,—ভগবান শ্রীচৈতন্যের জীবনে যে-সকল ঐশ্বর্য-বিভূতি বা অলৌকিকত্ব আরোপ করা হয়েছে,—সেগুলির প্রভাব তাঁর আসল চারিত্রিক মহিমার ওপর খুব বেশি নয়। এ-গুলিকে ক্ষেত্রানুযায়ী বিশেষ বিচার-বিবেচনায় গ্রহণ বা বর্জন করেও তাঁর দেবকল্প সামগ্রিক মানবীয় রূপটি ফুটিয়ে তুলতে অসুবিধা বা অঙ্গহানি হয় না। পাঠকা-পাঠিকাগণেরও আপন-আপন বিশ্বাস-মতে এগুলিকে গ্রহণ-বর্জন করে তাঁর মহান সুন্দর রূপটি খুঁজে পেতে কোন অসুবিধা নেই।

সুতরাং ঐশ্বর্যাদির অযথা চাপে যাতে তাঁর প্রেম-সুন্দর মানবিক রূপটি কোথাও আচ্ছন্ন হয়ে না পড়ে,—সে-বিষয়ে আমি সর্বত্র যথেষ্ট অবহিত হয়েছি। মানুষ হিসাবে-ও ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ কত বড়,—তাঁর ভগবৎ-সত্তার মধ্যেও আমি সে হৃদয়গ্রাহী ছবিটি তুলে ধরতে চেয়েছি পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে।—'নারায়ণ অবতীর্ণ হয়েছেন নররূপে,'—এর পটভূমিকায়—'নর স্বকীয় মহিমায় উন্নীত হয়েছেন নারায়ণত্বে',—এই ছবি আঁকবার প্রয়াস পেয়েছি আমি। তবে তাঁর ছিন্নভিন্ন রূপ-ধারণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে—যে সকল কথা উক্ত হয়েছে,—আমার বিশ্বাস, তার মধ্যে একটি দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে। এর কোনটিই বোধ হয় দেহগত নয়,—সবই ভাব-গত।—এবং এগুলি ভাবরূপ। ভাবাবেশের মধ্যেই যখন এ-গুলি প্রকটিত হয়েছে,—এবং একমাত্র ভাবাবিষ্ট ভক্তচক্ষুই এ-গুলি দর্শন করেছে,—অন্যের সে-সৌভাগ্য হয়নি,—তখন এগুলি ভাব-জগতের ক্রিয়া ছাড়া আর কি? ভগবানের ভাবরূপ ভক্তের ভক্তিনিবিষ্ট মনশ্চক্ষুর ওপর প্রতিফলিত হওয়াও বিচিত্র নয়। অবশ্য এর জন্যে চাই ভগবানেরই কৃপা। প্রকৃত ভক্তের ভাগ্যে সে কৃপা সুলভ।

যাঁর পূত প্রেমাশ্রু-প্লাবনে দিগ্-দিগন্ত পুণ্য-ধৌত হয়েছে;—স্বাধীন নরপতি গজপতি প্রতাপরুদ্র থেকে সুরু করে—কত রাজা-মহারাজা, কত ঐশ্বর্যশালী গোষ্ঠীপতি, সমাজ-পতি, ঐশ্বর্যের মোহ, পদমর্যাদার অভিমান বিসর্জন দিয়েছেন অকাতরে যে প্রেমময়ের এক কণা করুণার আশায়;—দবির খাস ও সাকর মল্লিক পরিণত হয়েছেন যাঁর মহিমায় রূপ-সনাতনে; বাসুদেব সার্বভৌম, প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মত কত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পাণ্ডিত্যের অভিমান দলিত করে—লুটিয়ে পড়েছেন যাঁর চরণ-প্রান্তে; কত পাষাণ-পাষণ্ড, পাপী-তাপী, নরঘাতক দস্যু,—রূপোপজীবিনী বেশ্যার চিত্তমালিন্য দূর হয়ে গেছে যাঁর করুণা-বিগলিত নয়ন-সুধায়; বিভূতিলেশহীন সহজ-সুন্দর-রূপেই যিনি লক্ষকণ্ঠে অভিনন্দিত হয়েছেন,—'যতিবেশী হরি, গৌরবর্ণ কৃষ্ণ' বলে—তাঁর ভগবত্তা প্রমাণিত হতে কোন ঐশ্বর্য-বিভূতির অপেক্ষা রাখে? তাঁর আত্মবিস্মৃত প্রেম-বিগলিত অবিরাম নয়ন-ধারার চেয়ে অলৌকিকই বা আর কি আছে জগতে? সর্ব-গুণ-গরিমায় দীপ্ত সমুদ্রের মতই গভীর—আকাশের মতই উদার এই মহিমময় পুরুষ নররূপেও ছিলেন নারায়ণের মতই মহীয়ান্। স্বার্থের সংঘাতে ক্ষত-

বিক্ষত, দ্বেষ-হিংসায় জর্জরিত এই জগতে তাঁর প্রেম-সুন্দর মহান চরিত্রের যত আলোচনা হবে,— মনাব-সমাজের কল্যাণের পথ ততই সুগম হবে,—তাতে আর সন্দেহ কি?

মহাপ্রভুর জীবনে ঘটনার সমাবেশ অসংখ্য। 'চরিত-রূপায়নে অপরিহার্য ঘটনাগুলিকে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গতির দিকে যথোচিত লক্ষ্য রেখেই আমি এই আলেখ্য-রচনার প্রয়াস পেয়েছি। বিশদ বর্ণনায় যেখানে ঘটনা বা বিষয় অযথা ভারাক্রান্ত হতে পারে, সেখানে অতিরঞ্জন-স্পৃহা আমি যথাসম্ভব পরিহার করেই চলেছি।

মহাপুরুষদের জীবন-লীলা-সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর মতভেদ প্রায়ই দেখা যায়। আমি অবশ্য মূলতঃ মহাজনদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি;—তবু যে আমি সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারবো,—এ-দুরাশা আমার নেই। তবে নানা জটিলতা-মুক্ত করে আমি মহাপ্রভুর যে সরল-সুন্দর দেবকল্প মানবিক রূপটি ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছি,—একান্ত বিনয়ে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেই দিকে।

খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে পাঠক-পাঠিকাগণ সে-দিকে দৃষ্টি দিয়ে আমার বিচার করলেই অনুগৃহীত হবো। আমার শক্তি ক্ষুদ্র,—তাই ত্রুটি-বিচ্যুতি বিস্তর ঘটাই সম্ভব। আশা করি, সুধী-সাধারণ সেগুলিকে ক্ষমার চক্ষে দেখে,—এর মধ্যে যদি কিছু গুণ থাকে,—সেই টুকুই গ্রহণ করবেন। আমার প্রয়াস আংশিকভাবে সফল হলেও আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

পরিশেষে নিবেদন,—মহাপ্রভুর লীলা-সংবরণ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে,—কোনটি যে ঠিক,—এবং কি-যে সত্য,—তা মহাপ্রভুই জানেন! তবে একথা সর্ববাদিসম্মত যে,—শেষ কয়েক বৎসর বিশ্ব-সংসারের কারো সঙ্গে তাঁর প্রায় কোন সম্পর্কই ছিল না,—এবং আটচল্লিশ বৎসর বয়সেই তিনি লীলা-সংবরণ করেন।

মহালয়া—১৩৬৩
৪১, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট
কলিকাতা-৩

স্নেহার্থী
গৌরগোপাল

১

'কই গো বৌমা,'—আঁতুড়ঘরের দরজার সম্মুখে এগিয়ে এসে ডাকলেন এক বৃদ্ধা—'খোকা কেমন হয়েছে দেখি?' প্রচুর আগ্রহ ঝরে পড়লো তাঁর কণ্ঠে; ক্ষীণ-দৃষ্টি যথাসম্ভব প্রসারিত করে চাইলেন তিনি ঘরের ভেতর দিকে।

পাড়া ভেঙে প্রতিবেশিনীরা এসেছেন শচীদেবীর ছেলেকে দেখতে। বৃদ্ধা এসেছেন, প্রৌঢ়া এসেছেন, যুবতীরা এসেছে; কিশোরী-বালিকা কেউই বাদ যায়নি। ভিড় জমে উঠেছে শচীদেবীর গৃহাঙ্গণে। শিশুর অসামান্য রূপের কথা ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে পাড়ার ঘরে ঘরে। তাই তাকে দেখবার আশায় অন্তর যেন অধীর হয়ে উঠেছে সকলের!

উঠানের মাঝে ছিল এক নিমগাছ। তারই তলায় হয়েছে আঁতুড়ঘর। প্রাণের সমস্ত মমতা দিয়ে শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বসে আছেন শচীদেবী। —মহিমময়ী মাতৃমূর্তি! স্নেহভারে চক্ষু দুইটি আনত—অনিমিখ্—অর্ধ-মুদিত! শীর্ণ-শান্ত মুখে বাৎসল্যের প্রগাঢ় ছায়া,—আনন্দের মধুর দীপ্তি! যেন বিশ্ব-সংসার ভুলেই চেয়ে আছেন শিশুর অপূর্ব-সুন্দর কচি মুখখানির দিকে!—এ কে এলো তাঁর কোলে?—আকাশের চাঁদ কি গায়ের যত কলঙ্ক মুছে নেমে এসেছে নাকি?...অথবা কোন দেবশিশু অমর্ত্য থেকে পথ ভুলে এসে পড়েছে মর্ত্যের আঙিনায়?

মায়ের স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টিতে জগতের সব শিশুই অবশ্য সুন্দর!—সব শিশুই নয়নরঞ্জন। প্রাণের সমস্ত রস আহরণ করে প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জুড়ে—ধূপের মাঝে গন্ধের মতই—আপন আত্মার মাঝে লুকিয়ে থাকে যে পরম বাঞ্ছিত অতিথি,—হঠাৎ রূপ ধরে সে বাইরের আলোকে এলে,—কোন্ জননীর দুই চোখ জুড়িয়ে না যায় তাকে দেখে? কিন্তু এ শিশুতো শুধু মায়েরই নয়নানন্দ নয়,—এ যে বিশ্বমোহী! ধরিত্রীর ধূসর ধূলায় এ বুঝি 'নন্দনের' এক অনাঘ্রাত অম্লান পারিজাত! পুষ্প-পেলব শুভ্র-সুন্দর ক্ষুদ্র ওই দেহখানি,—ও যেন রক্তমাংসের গড়া নয়; বিধাতা বুঝি একান্ত নিরালায় বসে প্রাণের যত

মাধুরী দিয়ে গ'ড়ে তুলেছেন ওকে! আপন সৃষ্টির সৌন্দর্যের মাঝে স্রষ্টা কি অবশেষে নিজেই ডুবে গেছেন ওকে সৃষ্টি করে? কে জানে!...

বৃদ্ধার কথায় শচীদেবীর চমক ভাঙে। অপলক চোখে পলক পড়ে। মুখ ফিরিয়ে বসেন এদিকে আসন-পিঁড়ি হয়ে। দু'হাত দিয়ে পরম যত্নে ছেলেকে তুলে ধরেন কোলে। মুখে কথা নেই,—ভাবের আবেগে হারিয়ে ফেলেছেন যেন কণ্ঠের ভাষা!

একসঙ্গে বহু জনের সতৃষ্ণ আকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় শিশুর দিকে।—মুহূর্তে মুগ্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যায় সকলে! এত রূপ! ক্ষুদ্র এক শিশুর দেহ ভরে এত লাবণ্য! এ দুর্লভ রূপ কি পৃথিবীর? না পৃথিবীর বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত সুদূর কোন কল্পলোকের?

বর্ণ কাঁচা সোনার ন্যায়,—সর্বাঙ্গ জুড়ে একটি মধুর স্নিগ্ধ দীপ্তি। সোনায় গড়া দেহ যেন জ্যোৎস্না দিয়ে ধোয়া। কচি ঢলঢলে মুখখানি অনুপম সুন্দর!—অলঙ্কার শাস্ত্রে যাকে বলে;—'উপমেয়োপমা',—এ যেন ঠিক তাই। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বুঝি ওই অতুল মুখকান্তির সঙ্গে সুমিল সামঞ্জস্য রেখেই গঠিত। সদ্যোজাত শিশু,—কিন্তু মাথায় নিকষ-কালো রেশম-কোমল কুঞ্চিত ঘন একমাথা চুল। উদার প্রশস্ত ললাট! ভুরু দুটি গুণটানা ধনুর আকারে—কোন্ দক্ষশিল্পী যেন ধীর তুলিকার টানে এঁকেছে মনের মত করে। আকর্ণ বিস্তৃত আয়ত নয়ন দুটি—যেন দুটি পদ্ম-পলাশ! কচি অধর যুগ্মে গোলাপের অনবদ্য শোভা! হাত ও পায়ের তলায় ফুটন্ত রক্তকমলের স্বচ্ছ রক্তিমাভাই বুঝি বিচ্ছুরিত হচ্ছে!

বড় নেই—ছোট নেই—বৃদ্ধা থেকে সুরু করে এতটুকু বালিকা পর্যন্ত তন্ময় হয়ে দেখলো সে অদৃষ্টপূর্ব রূপ-সম্ভার—দেখলো পৃথিবীর বুকে যেন এক অচিন্তনীয় পরম বিস্ময়। চোখের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও নেচে উঠলো তাদের বিপুল পুলকে।...ওই ক্ষুদ্র দেহ তো শুধু রূপ-সৌন্দর্যেরই আধার নয়,—ও যেন আনন্দেরও উৎস।...যত দেখে ততই যেন ডুবে যায় সকলে শিশুর রূপের ধ্যানে। দেখার সাধ বুঝি আর মেটে না তাদের!

'চমৎকার!'—অপার উচ্ছ্বাসে বলে ওঠেন বৃদ্ধা,—এ-যে সত্যিই সোনার চাঁদ মা!...আমাদের এতটা বয়স হলো কিন্তু এত রূপ আর জীবনে দেখলুম না। এ নিশ্চয়ই কোন দেবতা ছলনা করতে এসেছেন মা তোমার কোলে! তুমি অসীম ভাগ্যবতী! প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি—বেঁচে থাক তোমার ছেলে শতায়ু হয়ে।...এ তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে মা!"

'আহা, তাই হোক্, তাই হোক্!'—সঙ্গে সঙ্গে অপরা এক বর্ষীয়সী সায় দেন, পরম শুভেচ্ছায়,—"স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই সুকৃতি ভাল। ওদের মনের

গুণেই দেবতা কৃপা করেছেন। বিশ্বরূপেরই তো রূপের তুলনা নেই,—এ আবার তাকেও হার মানিয়েছে!"

প্রাণের চেয়ে প্রিয় সন্তানকে মুক্ত কণ্ঠে আশীর্বাদ করলে কৃতার্থ না হয় কোন জননী? শচীদেবীর বুকও দুলে উঠলো গভীর আনন্দে—অসীম কৃতজ্ঞতায়। সমগ্র হৃদয় ভরে এলো এক অনুপম মাধুর্য-রসে! স্নেহ-কোমল শান্ত মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো অব্যক্ত উল্লাসে! বললেন প্রীতিবিহ্বল কণ্ঠে—তোমাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মা! তোমাদেরই আশীর্বাদে ওই এক ফোঁটা বিশ্বরূপকে কোলে পেয়েছি,—আজ আবার তার দোসর পেলাম। দুটি ভাই ভগবানের দয়ায়—তোমাদেরই পাঁচজনের হয়ে বেঁচে থাক;—আর আমার চাইবার কিছু নেই।

'চাইবার তোমার আর বাকিই বা কি আছে শচীবৌ?'—শিশুকে দেখে শচী-দেবীর ননদ-সম্পর্কীয়া এক প্রৌঢ়ার মনে একটি অপার্থিব পুণ্যভাবের উদয় হয়েছিল। ঘন ঘন তাঁর মনের কোণে জেগে উঠছিল, বালগোবিন্দের চিত্রায়িত 'মধুর মুরতিঃ' ভাবছিলেন তিনি আপন মনে, সেই দ্বিভুজ মুরলীধরই কি গায়ের রঙ বদলে ফিরে এসেছেন শিশুরূপে শচীর অসীম পুণ্য ফলে? আবেগ-স্ফুরিত কণ্ঠেই বলে উঠলেন তিনি,—'তেমন চাওয়া চাইতে না পারলে এমন দুর্লভ ধনকে কি পাওয়া যায় কোলে?—মা হওয়া তোমারই সার্থক হয়েছে বৌ।'

—বলতে বলতে বাষ্পের ভারে সহসা তাঁর স্বর আটকে গেল।...স্থির নেত্রে শচীদেবী চেয়েছিলেন তাঁর ভাবমুগ্ধ মুখখানির দিকে। এক পরম প্রাপ্তির পরিপূর্ণ তৃপ্তির আবেগে তাঁর কণ্ঠের ভাষাও তখন আত্মপ্রকাশের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে!

২

সেদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা। সন্ধ্যা সবে নেমে এসেছে ধরিত্রীর বুকে। মেদুর মলয় বাতাস নানা ফুলের সুবাস মেখে মাতিয়ে তুলছে চারিদিক। পূর্ব দিগন্তে নীল নির্মল আকাশের উদার ললাটে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছেন পূর্ণকল শশধর,—বড় একখানি সোনার থালার মত। সূক্ষ্ম রজতধারার মত স্নিগ্ধ মৃদু কৌমুদী-রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে বৃত্তাকার ব্যাসের প্রান্ত থেকে মণ্ডলী আকারে। মধুর সে মন-বিমোহন দৃশ্য শুধু উপলব্ধির বস্তু;—কিন্তু অব্যক্ত—অনির্বচনীয় !

থেকে থেকে কেঁপে উঠছেন মৃগাঙ্ক দেবতা। বুঝিবা রাহুর ভয়েই।... সমুদ্র-মন্থন-লব্ধ সুধা দেবদৈত্যের মধ্যে মোহিনী বেশে ভাগ করে দিচ্ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু দেবতাদের দিয়ে বাকিটুকু তিনি নিজেই পান ক'রে ফেললেন নিঃশেষে। ও দিক থেকে সূর্য চন্দ্র চীৎকার করে উঠলেন সমস্বরে, —ওই, ওই, রাহুদৈত্য দেবতাদের দলে ভিড়ে গিয়ে লুকিয়ে সুধাপান কর্‌ছে! —অমনি ছুটলো শ্রীকৃষ্ণের সংহার-অস্ত্র সুদর্শন,—কেটে ফেললে রাহুকে দুভাগ করে।—কিন্তু ফল হলো উল্‌টো। সুধা পেটে যাওয়ায় রাহু মরলো না,— বরং ছিল একজন, হলো দু'জন। মাথার দিকটা রাহু,—আর নীচের দিকটা কেতু।

সেই থেকে সূর্য-চন্দ্রের ওপর রাহুর ভীষণ আক্রোশ। সেই যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত আক্রোশ তার শেষ হবার নয়। সুযোগ পেলেই সূর্য-চন্দ্রকে সে গ্রাস করে,—কখনো বা সম্পূর্ণ, কখনো বা আংশিক। তখন হয় সূর্যগ্রহণ কিম্বা চন্দ্রগ্রহণ।...অবশ্য এটা পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।...কিন্তু এই পৌরাণিক সংস্কারই ‍তা ধর্মপ্রাণ হিন্দু নর-নারীর প্রাণে পুণ্য ভাবের সঞ্চার করে আসছে যুগ গ ধরে।

আজও সেই চন্দ্রগ্রহণের দিন। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে রাহু স্পর্শ চন্দ্রকে। কলনাদিনী পুণ্যতোয়া জাহ্নবী-তীরে অসংখ্য পুণ্যকামী

স্নানার্থী নর-নারীর মুহুর্মুহু হরিধ্বনিতে এবং ঘনঘন শঙ্খ-ঘণ্টারোলে মুখরিত হয়ে উঠ্‌লো নবদ্বীপ,—ভরে উঠ্‌লো নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস সেই সমবেত উদাত্ত আরাবে।...কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হলো ভগবদস্তোত্র সুললিত ছন্দে—অমৃতনিস্যন্দী ভক্তিপ্লুত সুরে।...গঙ্গার জল-কল্লোল যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো সেই কল-কোলাহলে।—সে এক মহাপুণ্যময় মুহূর্ত—যুগ-যুগান্তব্যাপী তপস্যার এক পরম শুভ লগ্ন!

সেই পুণ্যলগ্নে—সেই দিগন্তপ্লাবী হরি-হরি-ধ্বনির মধ্যে—চন্দ্র যখন রাহু-গ্রস্ত;—তখন জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শচীদেবীর কোলে উদয় হলেন নিষ্কলঙ্ক রাহুমুক্ত নদীয়ার চাঁদ,—বুঝিবা কোন কল্পলোকের বাণী বহন করে বিশ্বের কল্যাণে।—প্রায় পৌণে পাঁচ শত বৎসর পূর্বের—১৪০৭ শকের ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দের সেই পুণ্যদা ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিটি আজিও তাই অপার মহিমায় স্মরণীয় হয়ে রয়েছে,—এবং থাক্‌বেও অনন্তকাল ধরে। এক মহা-জীবনের মহাবতরণের সেই চির-অবিস্মরণীয় দিনটির কথা কে বিস্মৃত হতে পারে?

ত্রয়োদশ মাস গর্ভধারণের পর সন্তান প্রসব করেন শচীদেবী। তাই শিশু আকারে সাধারণ শিশুর চেয়ে কিছু বড়ই হয়েছিল।...যখন দশমাস দশ দিন পার হয়ে গেল,—অথচ সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো না, তখন স্বামী স্ত্রী উভয়েই বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পাড়ার প্রবীণা স্ত্রীলোকগণের মনেও জাগলো অপার বিস্ময়—এবং কেমন একটা সন্দেহও। কিন্তু শচীদেবীর পিতা অশেষ শাস্ত্রদর্শী সুপণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তী আশ্বাস দিলেন কন্যাকে,—"কোন চিন্তা নেই মা তোমাদের। আমি গণনা করে দেখেছি, তোমার গর্ভে এবার এক মহাপুরুষের উদ্ভব হয়েছে। জগতে তিনি অসাধারণ ব্যক্তি বলে পূজিত হবেন। তাই তাঁর গর্ভবাসের কালও সাধারণ গণ্ডী অতিক্রম করছে। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক,—আর মনে মনে শুধু সেই পরম কল্যাণময় ভগবানকে স্মরণ কর। কারো কোন কথায় বিচলিত হয়ো না।"

পিতার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ওপর শচীদেবীর ছিল অখণ্ড বিশ্বাস। তিনি আর কোনভাবে চঞ্চল না হয়ে ধীর স্থিরচিত্তে শিশুর শুভাগমের দিনটির অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশুর দিকে প্রথম দৃষ্টিতে চেয়েই শচীর মনে হলো,—তাঁর পিতার কথাই বুঝিবা সত্য;—এ শিশু সাধারণ নয়,—সামান্য নয় —অলৌকিক!

—বায়ুর সাহায্যে গন্ধের মতই শিশুর জন্মের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে।...বৈষ্ণবাগ্রগণ্য অদ্বৈতাচার্যের প্রাণ হঠাৎ নেচে উঠলো সেই শুভ

মুহূর্তে বিপুল আনন্দে। তিনি প্রাণভরে হরিনাম সংকীর্তন করতে লাগলেন। ...অথচ এ আনন্দের উৎস যে কোথায় তাও ঠিক খুঁজে পেলেন না।—আচার্যের সহধর্মিণী মহাসতী সীতাঠাকুরাণী সেই সংবাদ পেয়ে পরম বৈষ্ণব শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নী মালিনী দেবীকে সঙ্গে করে এলেন জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী—নবাগত শিশুকে আশীর্বাদ করতে। শচীদেবীর কনিষ্ঠা ভগিনীও এলেন তাঁদের সঙ্গে। শিশুর জন্যে নিয়ে এলেন তাঁরা আশীর্মাল্য—নানা মূল্যবান মাঙ্গলিক উপহার দ্রব্য।

দুই চোখ ভ'রে দেখলেন তাঁরা শিশুর অপার্থিব রূপ—অপ্রাকৃত সৌন্দর্য! হৃদয়-কন্দরে জেগে উঠ্‌লো তাঁদের এক অপূর্ব ভাব-হিল্লোল। সমগ্র অন্তর দিয়ে শিশুকে আশীর্বাদ করে এক অনাস্বাদিত শান্তরসে আপ্লুত হয়ে ফিরে গেলেন তাঁরা স্ব-স্ব ভবনে।...মন তখন তাদের পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে,—কিন্তু কেন? সে কথা বুঝি আজকের নয়!

শীঘ্রই এক শুভদিনে শিশুর মাতামহ পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তী তার নামকরণ করলেন,—বিশ্বম্ভর। তাঁর বিশ্বাস,—ভবিষ্যতে এই শিশু বিশ্বকে ধারণ এবং পোষণ করবে,—তাই ওই নামই তার উপযুক্ত।—সমাগত আত্মীয়-স্বজন—অধ্যাপক-উপাধ্যায়গণও সমর্থন করলেন এই নাম সানন্দ অন্তরে। যেহেতু ভাবীকালের বুকে শিশু যে এক অসামান্য মহিমায় প্রতিভাত হয়ে উঠ্‌বে,—এ ধারণা দৃঢ় হয়ে উঠেছিল তাঁদের মনে—শিশুর সুলক্ষণাক্রান্ত সর্ব-অবয়বের দিকে চেয়ে।

শচীদেবীর অন্তরে কিন্তু কিভাব জেগেছিল,—তিনি একান্ত আগ্রহে—হিতৈষিণীগণের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ছেলের নাম রাখলেন—নিমাই। নিম-গাছের তলায় জন্ম হয়েছিল সেইজন্যে,—না অপদেবতাদের কাছে শিশুকে তিক্ত করে রাখার সংস্কারে তিক্ত নিমের নামে তার নাম রাখলেন,— সে অবশ্য একান্ত তাঁরই অন্তরের কথা।...কিন্তু জগতে মায়ের গৌরব ম্লান করে কে?—মায়ের দেওয়া এই নামেই শিশু পরিচিত হয়ে উঠলো নবদ্বীপের ঘরে ঘরে—অবশেষে দূরে-দূরান্তরে। তিক্ত নিমই যেন মাতৃ-আশীর্বাদ-পূত হয়ে অমিয়-মধুর হয়ে উঠ্‌লো!...

৩

জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ। নিবাস ছিল তাঁর শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে। বিদ্যার্জনের অভিপ্রায়েই তিনি আসেন নবদ্বীপে শিক্ষার্থী-রূপে।

বাণীর লীলা-নিকেতন নবদ্বীপ,—আকাশে বাতাসেও যেন তার অনুরণিত হচ্ছে নিখিল বিশ্বের জ্ঞানবিদ্যাদায়িণী দেবী বীণাপাণির অমর বীণার মধুর ঝঙ্কার। দূর-দূরান্তর থেকে বিদ্যার্থীরা আসতেন জ্ঞানের প্রবল পিপাসা নিয়ে নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করতে।...জ্ঞানবিদ্যার মহাপীঠ নবদ্বীপের গৌরবের কাছে তৎকালীন রাজধানী গৌড়েরও গর্ব খর্ব হয়ে গিয়েছিল। অধ্যাপক-উপাধ্যায়-অধ্যায়ী—এদের মহামিলনের ক্ষেত্রই ছিল যেন নবদ্বীপ!

সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শন, বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি প্রভৃতি প্রায় সর্ব শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা হতো নবদ্বীপে। পল্লীতে পল্লীতে ছিল চতুষ্পাঠী।... মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম তখন নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজে প্রদীপ্ত ভাস্করের মতই বিরাজ করতেন।...অবিস্মরণীয় ন্যায় গ্রন্থ 'দিধীতির' রচয়িতা পণ্ডিত রঘুনাথ,—অদ্যাপি প্রচলিত রঘুনন্দন-স্মৃতির গ্রন্থকার পণ্ডিত রঘু-নন্দন, তন্ত্রশাস্ত্রের অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমেরই ছাত্র।...এঁদের প্রতিভালোকে শুধু সেদিনই নয়,—আজিও সমগ্র বাংলা উদ্ভাষিত হয়ে রয়েছে। বাঙ্গালী হয়েছে ধন্য—হয়েছে কৃতার্থ!

পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমই মিথিলা থেকে ন্যায়শাস্ত্র আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করে এসে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন নবদ্বীপে।...তার পূর্বে একমাত্র মিথিলাতেই হতো ন্যায়ের অধ্যাপনা।—অথচ পুঁথির নকল আনার যো ছিল না সেখান থেকে। অদ্বিতীয় স্মৃতিধর পণ্ডিত সার্বভৌম তাই একান্ত নিরুপায় হয়েই বিপুল উদ্যমে, আগ্রহে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র ন্যায়-শাস্ত্রই কণ্ঠস্থ করে ফিরে এসেছিলেন বাংলায়। সেদিন বাংলার শিক্ষা ও

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি সুচিরকালের যে অভাব পূর্ণ করেছিলেন—তার জন্যে বাঙ্গালী মাত্রেরই তিনি চির-নমস্য। মহাকালের বুকে তাঁর এই কালজয়ী অপার গৌরব হীরকদীপ্তির মতই সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন এই বাসুদেব সার্বভৌমেরই সহপাঠী। ছাত্র হিসাবে অধ্যাপক-সমাজে তাঁর সুনাম ছিল প্রচুর। তাঁর বুদ্ধিও ছিল তীক্ষ্ম—মেধাও ছিল প্রখর। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি বিশেষ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যও অর্জন করেন। তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয়, সৌম্যদর্শন, রূপবান পুরুষ। যৌবনে তাঁর সুঠাম-সুগঠিত দেহের রূপলাবণ্য দেখে লোকে কন্দর্পের সঙ্গেই তুলনা করতো তাঁর। বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞানের জন্য অনুরাগী ব্যক্তিগণ 'পুরন্দর' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন তাঁকে।

পণ্ডিত নীলাম্বর বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হন এই রূপগুণসম্পন্ন মেধাবী ছাত্রটির দিকে।—এবং সাগ্রহে তাঁর জ্যেষ্ঠাকন্যা শচীকে সম্প্রদান করেন তাঁর হাতে। জগন্নাথও সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেন শচীদেবীকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে। সত্যই এই মিলন সকল দিক দিয়েই হয়েছিল পূর্ণ এবং সার্থক।

—জ্ঞানবিদ্যার অনুরাগী জগন্নাথের মন স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়েছিল বাণীর কমলবন নবদ্বীপের দিকে। কাজেই বিয়ের পর থেকেই তিনি বসবাস করতে সুরু করেন নবদ্বীপে। শ্রীহট্টদেশীয় আরও অনেকে যে পাড়ায় বাস করতেন,—সেখানেই তিনি নির্মাণ করেন তাঁর বাসগৃহ।...নবদ্বীপের মেয়ে হলেও শ্রীহট্ট-পাড়ায় বধূরূপেই পরিচিতা ছিলেন শচীদেবী।

অধ্যাপনা এবং শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্মাদি করেই সংসার নির্বাহ করতেন জগন্নাথ। অবস্থায় দরিদ্র হলেও অন্তরের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন উদার, নিঃস্বার্থ এবং নির্লোভ। সরল জীবন যাপন এবং সৎচিন্তাই ছিল তাঁর জীবনাদর্শ। শচী-দেবীও ছিলেন সর্বাংশে স্বামীর সুযোগ্যা সহধর্মিণী,—স্বামীর সংসার-যাত্রা-পথে অতন্দ্র ও নিষ্ঠাবতী সহচরী।

গৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন দেব-বিগ্রহ রঘুনাথ। স্বামী-স্ত্রী কায়মনে তাঁর সেবারাধনা করতেন পরম ভক্তিভরে। তাঁরই চরণে জানাতেন তাঁরা অন্তরের আকুতি—ভক্তিপ্লুত নিষ্কলুষ জীবন-যাপনের ঐকান্তিক প্রার্থনা।...দুর্গম সংসার পথে সেই করুণাময় দেবতার শ্যাম-সুন্দর মূর্তির দিকে চেয়েই তাঁরা সুখে দুঃখে দিনগুলি পার করতেন।

এ জগতে ভগবান যাদের নিত্যানন্দ-রসপানের অধিকার দিয়ে ধন্য করেন,—বহু অনিত্য দুঃখের প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে বুঝিবা প্রথমটা পরীক্ষা করেন তাদের। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এই নিগূঢ় লীলা-রহস্য বোঝবার মত শক্তি জগতে ক'জনের আছে?—এই জটিল রহস্য পদে পদে বুঝতে ভুল করে

মানুষ;—অনিত্য দুঃখের আঘাত সহ্য করতে না পেরে ফিরে দাঁড়ায় নিত্যের পথ থেকে।...অলক্ষ্যে ভগবানও বুঝিবা একটু হেসে পরীক্ষা শেষ করেন তাঁর।

কিন্তু পার্থিব দুঃখের দুঃসহ আঘাত ধর্মপ্রাণ মিশ্রদম্পতিকে কোনদিনই দমিয়ে দিতে পারেনি।...চিরনিত্যমুখী চিত্ত তাঁদের সংসারের বহু ঝড়-ঝাপটা সহ্য করেই উন্মুখ হয়ে থাকতো সেই সচ্চিদানন্দের পানে। প্রথমে পরপর আটটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে তাঁদের। কিন্তু আটটি কন্যাই অকালে চলে যায় কালের গ্রাসে। এই কঠোর সন্তান-বিয়োগের ব্যথা ধীরভাবেই সহ্য করেন জগন্নাথ ও শচী।...অবশেষে ভগবানের অনুগ্রহে নবম সন্তানরূপে জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ নেমে আসে তাঁদের কোলে। তাঁদের তৃষিত মরুবক্ষে ছুটে যায় যেন মন্দাকিনীর—সুশীতল ধারা! জনক-জননীর স্নেহবুভুক্ষু অন্তর বিশ্বরূপকে পেয়ে পরম সান্ত্বনা লাভ করে।...সে আজ দশবৎসর পূর্বের কথা।...

—তা বিশ্বরূপও ছিল গর্ব করবার মতই ছেলে! রূপেগুণে তারও যেন আর তুলনা ছিল না। বাল্যেই তার মধ্যে দেখা গিয়েছিল প্রতিভার বিকাশ। নম্র-মধুর, ধীর-স্বভাব,—অসামান্য মেধাবী, প্রগাঢ় পাঠানুরাগী বালক বিশ্বরূপকে যে দেখতো,—তারই অন্তর উথলে উঠ্‌তো অমেয় স্নেহে,—পরম প্রীতি-পুলকে।—উচ্ছ্বসিত নীরব প্রশংসার বাণী ফুটে উঠ্‌তো তার বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে।...সন্তান-বিয়োগ-বিধুরা জননীর সে ছিল নয়নমণি,—প্রাণের প্রাণ! ...সুপণ্ডিত পিতার স্নেহ-মুগ্ধ চোখের সম্মুখে তুলে ধরতো সে ভবিষ্যৎ-গৌরবের প্রোজ্জ্বল দীপশিখা।...এতদিন বিশ্বরূপই ছিল জনক-জননীর এক-মাত্র অবলম্বন,—বংশের সমূহ আশা-ভরসার স্থল।

আশ্চর্য যে, দশবৎসর বয়সেই তীক্ষ্ণধী বিশ্বরূপ জ্ঞান অর্জন করেছিল বিভিন্ন শাস্ত্রে। তার ক্ষুদ্র বুকের মাঝে ছিল এক বিরাট উদার অন্তর: এবং চিত্তটি ছিল বৈরাগ্যের গৈরিক মাধুর্যে সুমধুর!...সে-যেন ছিল তার জন্মলব্ধ সহজাত অধিকার,—যুগ-যুগান্তসঞ্চিত সাধনার এক অমৃতময় ফল। বালক-চিত্তের সে গূঢ় রহস্য কিন্তু সহজে কেউই বুঝতে পারতো না।

বিশ্বরূপের পর নিমাই,—এ যেন মণি-কাঞ্চন নয়,—'হীরা-মাণিক্যের' সংযোগ! সংসার মধুময় হয়ে উঠ্‌লো জগন্নাথ ও শচীর কাছে। তাঁদের মনে হলো—করুণাময় দেবতা রঘুনাথ যেন সকল শোক-তাপ দূর করে—জীবনে পরিপূর্ণ আনন্দ এনে দিয়েছেন তাঁদের।...অন্তরের শতকণ্ঠে জয়গান করতে লাগলেন তাঁরা সেই অচিন্ত্য—অদ্বয় পরমেশ্বরের। এই দুটি শুচি-শুভ্র অম্লান কুসুম যে তাঁরই অপার করুণার দান; এদের কেন্দ্র করে—বাৎসল্য-প্রেমের অমিয়-অভিষেক-ধারায় অভিষিক্ত কি করা যাবে না হৃদয়-সিংহাসনে,—

—সেই স্নেহ-প্রীতি-প্রেম-বাৎসল্য প্রভৃতি সর্বরসের উপভোক্তা—গোকুলের গোপেশ্বরকে?—কালিন্দীর কালোজল যার আকুল-করা বাঁশীর তানে কল্‌কল্‌ ছল্‌ছল্‌ করে উঠ্‌তো?—ভাবতে ভাবতে চোখের কোণে জল টল্‌টল্‌ করে ওঠে মিশ্র-দম্পতির!

বালক বিশ্বরূপও ছোট ভাই নিমাইকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা!...মায়ের কোল থেকে কচি ভাইটিকে বুকে নিয়ে প্রাণ যেন ভরে ওঠে তার।—এত সুখ, এত তৃপ্তি—এত আনন্দ সে যেন আর কোনোদিনই পায়নি। চুম্বনে চুম্বনে নিমাইয়ের কোমল মুখখানি ভরে দেয় সে,—মৃদুমধুর হাস্যে অধর দুটি রেঙে ওঠে তার,—'মা, মা,' মায়ের দিকে সস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে সে বলে পুলক উচ্ছ্বাসে,—"খোকা কেমন ফুট্‌ ফুট্‌ করে আমার দিকে চেয়ে আছে দেখো।...সত্যি মা,—কি সুন্দর দেখতে হয়েছে আমাদের নিমাইকে!...দেখো, দেখো মা, এইটুকু ছেলে তবু কেমন মিষ্টিমিষ্টি হাস্‌ছে!—ও বুঝি আমাকে চিনতে পেরেছে মা! বুঝলে মা, এতদিন একাএকা আমার কিছুই ভাল লাগতো না। এবার নিমাইকে পেয়েছি,—আর ভাবনা কি?

—বলতে বলতে আরও জোরে বুকে চেপে ধরে সে নিমাইকে।...শচী তখন আত্মহারা। তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে পড়ছে একবার বিশ্বরূপের দিকে,—আবার পরক্ষণেই নিমাইয়ের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাতৃপ্রাণ ভ'রে উঠ্‌ছে অনন্ত আশায়—অপরিমেয় আনন্দে!

৪

"না, না, ওর জন্যে তুমি ভয় পেয়ো না।"—বললেন মালিনীদেবী শচীকে গঙ্গায় স্নান করতে যাবার পথে,—"দেবতারাই হয়ত আসেন নিমাইয়ের কল্যাণে। তোমার ছেলে যে শাপভ্রষ্ট দেবতা! মানুষের কি অত রূপ হয়?"

শচীদেবী কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে ফিরে চান অপরা এক বৃদ্ধা সঙ্গিণীর দিকে। যেহেতু বয়স বেশি,—সেহেতু বিজ্ঞতা সম্বন্ধে একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই একটা অভিমান ছিল এই বৃদ্ধার মনে,—তিনি কিন্তু ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ করেন,—উঁহু, তা নয়।...ওসব অপদেবতার কাজ। ছেলের ওপর নিশ্চয়ই তাদের নজর পড়েছে। এমন আমরা ঢের দেখেছি।...ও "জাত হারিনীর" কাণ্ড-ছাড়া আর কিছু নয়। ওঝা ডেকে তুমি ঝাড়ফুঁক করাও বৌমা,—জগন্নাথকে বলে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা কর,—পণ্ডিত ডেকে নৃসিংহ-স্তোত্র পাঠ করাও,—তবেই ছেলের মঙ্গল হবে।

মালিনী শচীদেবীর সখী,—এবং প্রায় তাঁরই সমবয়সী। বৃদ্ধার কথা তিনি মন দিয়ে মেনে নিতে না পারলেও—প্রকাশ্যে তাঁর বয়সের সম্মান রেখেই বলেন,—'তা উনি যা' বলছেন, তাই করে দেখ। হাজার হোক,—আমাদের চেয়ে উনি অনেক বড়,—জানাশোনাও অনেক আছে।'...

শুধু বাপ-মা বা দাদারই নয়,—পাড়া-পড়শীরও অন্তরে পরম প্রীতি সঞ্চার করে মায়ের কোলে দিনের পর দিন বড় হচ্ছে নিমাই,—যশোদার কোলে শিশু কৃষ্ণের মতই আত্মভোলা স্নেহে,—প্রাণঢালা আদরে। কোন রোগ-ব্যাধিই তার নেই, কোন অমঙ্গলও কোনদিন স্পর্শ করেনি তাকে। তবু তাকে নিয়ে আজকাল গুরুতর ভাবনা হয়েছে শচীদেবীর।

প্রায়ই তাঁর মনে হয়,—কে যেন নিমাইয়ের ঘরে ঢুকছে,—কে যেন সহসা বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে।—অথবা তার শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেউ,—আর সারা ঘরখানা এক জ্যোতির্ময় 'প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু মনেই হয়,—চোখে কোনদিন দেখতে পান না কোন দেহধারী জীবকে,—সবই যেন

অশরীরী আত্মার খেলা। অথবা নিছক মনের বিভ্রান্তি কি না,—তাও ঠিক বুঝতে পারেন না শচী।

প্রথম প্রথম কথাটা চেপে রাখেন তিনি। কিন্তু ছেলের অমঙ্গলের দিক চিন্তা করে আর চেপে রাখা সম্ভব হয় না তাঁর পক্ষে।—সবই প্রকাশ করে ফেলেন আজ স্নানের পথে। এবং জননীর সন্দিগ্ধ চিত্তে স্বভাবতঃই বৃদ্ধার যুক্তিই বদ্ধমূল হয়ে যায় দৃঢ়ভাবে।...স্নানের পর বাড়ী ফিরে সব কথাই প্রকাশ করেন তিনি স্বামীর কাছে।

পুরুষের চিত্ত দৃঢ়,—কিন্তু পিতার প্রাণ স্নেহ-দুর্বল। জগন্নাথও চিন্তিত হয়ে পড়েন সব কথা শুনে। অবিলম্বেই তিনি বৃদ্ধার যুক্তিমত সর্ববিধ ব্যবস্থাই করে ফেলেন।...কিন্তু দিন যেমন চলছিল, তেমনি চলতে থাকে।... শচীর শঙ্কা-সন্দেহও যায় না,—আর নিমাইয়ের কোন অকল্যাণও হয় না কোনদিন।...

—দেখতে দেখতে নিমাইয়ের অন্নপ্রাশনের কাল এসে পড়ে।...পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে—পাঁজিপুঁথি দেখে—শুভকার্যের শুভদিন স্থির করেন মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী। বাড়ীতে মহোৎসব পড়ে যায়।...হোক না দরিদ্রের বাড়ী; উৎসব তো শুধু দ্রব্যাদির আয়োজনেই বা আড়ম্বর-অনুষ্ঠানেই মহান হয় না?—প্রকৃত পক্ষে সেই উৎসবই মহোৎসব,—যার প্রতি ক্ষুদ্র বস্তুতে—প্রতিটি ক্ষুদ্র আয়োজনে মিশিয়ে থাকে—অন্তরের মহান সম্পদ। যাকে কেন্দ্র করে উৎসব,—তার প্রতি থাকে সকলের প্রাণের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা, প্রীতি এবং অনুরাগ। নিমাইয়ের অন্নপ্রাশন,— এই ব্যাপারটাই যেন শুধু জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে নয়,—পাড়ার ঘরে ঘরে আনন্দ জাগিয়ে তোলে একটি পুণ্যোজ্জ্বল পর্বের মতই।

বিশ্বরূপের আনন্দই যেন সবচেয়ে বেশি।—সে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু—মামাতো ভাই লোকনাথকে নিয়ে নানা কাজে ছুটে বেড়ায় প্রচুর উৎসাহে। বিশ্বরূপ-আর লোকনাথ,—দুটিতে যেন একটি। বয়স দুজনেরই প্রায় সমান, —লোকনাথ সামান্য কিছু দিনের ছোট। উভয়ে যেন এক মন, এক প্রাণ, এক আত্মা! বিশ্বরূপকে দাদা বলে ডাকতে লোকনাথ যেন অজ্ঞান—আত্মহারা, যেখানে বিশ্বরূপ,—সেইখানেই লোকনাথ। যেন রামের পেছনে রাম-গত-প্রাণ —লক্ষ্মণ চলেছেন অবিরত ছায়ার মত।

নূতন জগতে এসে নিমাই আজ প্রথম করবে অন্নগ্রহণ। তাকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রথামত উপযুক্ত বেশ-ভূষায়। অঙ্গে চার পাঁচখানি সুশোভন স্বর্ণালঙ্কার। প্রশস্ত ললাট জুড়ে চন্দনের ফোঁটা,—গলায় মোটা করে গাঁথা একখানি ফুলের মালা,—পরণে টক্‌টকে লাল রঙের ছোট একখানি পাটের

কাপড়,—কাঁধে অনুরূপ একটি চাদর। কিন্তু বিধাতা যাকে অলৌকিক-শ্রী। সাজিয়ে কপালে জয়টীকা এঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন সংসারে,—তার সাজ-সজ্জাই বা কি,—আর বেশভূষাই বা কি?—নিমাইয়ের অলোক-সুন্দর রূপ-প্রভার কাছে এসব সাজ-সজ্জা যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তার সোনার অঙ্গে উঠে স্বর্ণালংকারও যেন স্বীয় দীপ্তি হারিয়ে ফেলেছে। উজ্জ্বল লাল রঙের পাটের কাপড়ে তাকে উজ্জ্বল করেছে,—না তার বর্ণের উজ্জ্বলতায়—কাপড়টাই আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,—তাই বা কে বলতে পারে?

তবু এই বেশভূষায় নিমাইকে আজ মানিয়েছে চমৎকার! অভিভূত হয়ে সকলে চেয়ে আছে তার দিকে। যেন কোন যাদু মন্ত্রে মুগ্ধ আত্মহারা হয়ে উঠেছে সকলে!

আশ্চর্য এই যে, নিমাইকে দেখে শুধু চোখই জুড়ায় না, প্রাণও নেচে ওঠে-আনন্দ-তরঙ্গে! অতি পাপীও তার দিকে চেয়ে ক্ষণেকের জন্যে ভুলে যায় পাপচিন্তা! আবার তাকে কোলে করলে সর্বাঙ্গে জেগে ওঠে এক অননুভূত পুলক শিহরণ! তাই পাড়ার মেয়েরা অনেক সময় যেচে এসে তাকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এ-কি শুধু তার অসামান্য রূপ-সৌন্দর্যের জন্য?—না, কোন অলৌকিক সত্তা আছে ওই ক্ষুদ্র শিশু দেহে?—

—নিমাইকে পিঁড়িতে বসিয়ে ধান-কড়ি, সোনা, রূপা, টাকা-পয়সা এবং গীতা, ভাগবত প্রভৃতি দু'তিনটি ধর্মপুস্তক রাখা হলো তার সামনে হিন্দুর চিরাচরিত প্রথামত।...সংস্কার এই যে, এ-সময় শিশু যে জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হবে,—তার থেকে তার উত্তরজীবনের আভাষও পাওয়া যাবে,—সম্পূর্ণ না হোক—অনেকটা। নিমাই কিছুক্ষণ ধরে সম্মুখের জিনিষগুলি মন দিয়ে নিরীক্ষণ করলো,—তারপর হঠাৎ যেন তার প্রিয়তম বস্তুটিই খুঁজে পেয়েছে,—এই ভাবে চোখ দু'টি বড় বড় করে সাগ্রহে টেনে নিলে ভাগবত গ্রন্থখানি—দু'হাত দিয়ে।

নির্বাক বিস্ময়ে চাইলেন সকলে নিমাইয়ের মুখের দিকে। চোখে মুগ্ধ-নিষ্পলক-গভীর দৃষ্টি!— এত জিনিষ থাকতে শিশু বেছে নিলে কি-না ভাগবত? যার প্রতিটি পৃষ্ঠা—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্তলীলা-রসামৃতে পরিপূর্ণ!—কেন জাগলো এ প্রেরণা এতটুকু এক শিশুর বুকে?

শিশুর চপল অনভিজ্ঞ দৃষ্টি হঠাৎ যেন পরম বিজ্ঞ হয়ে স্থির নিবদ্ধ হয়ে গেছে তখন বইখানির ওপর,— অন্য কোনদিকে দৃষ্টি তার নেই।—দুই একটি পাতাও ওলটাচ্ছে সে আপন মনে।—

ও-দিকে নীলাম্বর চক্রবর্তীর দুই চোখে ফুটে উঠেছে এক গভীর প্রসন্নতা—এক পরম প্রশ্ন! এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসেই চেয়েছিলেন তিনি দৌহিত্রের

অশরীরী,—সহসা বলে ওঠেন সোৎসাহে,—কণ্ঠে পরিপূর্ণ আবেগ,—"আমি জানি, আমি জানি! আমার গণনা মিথ্যা হতে পারে না,—হবেও না। শচীর এই ছেলেটি ভবিষ্যতে—একজন মহাপুরুষ হবে। তার অনেক লক্ষণ আমি লক্ষ্য করেছি ওর মধ্যে।"—দৃষ্টি ফিরিয়ে চাইলেন তিনি কন্যা জামাতার পানে; তাঁদের চোখেও তখন এক নিবিড় রহস্যের ছায়া ফুটে উঠেছে!

—বালক বিশ্বরূপ কিন্তু গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবছে।—হয়ত কল্পনার নেত্রে দেখবার চেষ্টা করছে সে—তার প্রাণপ্রিয় ভাইটির ভাবীরূপ। তার দৃষ্টি ঘন ঘন পড়ছে একবার নিমাইয়ের সুন্দর মুখখানার দিকে,—আর বার ভগবানের লীলাকাব্য 'ভাগবত' খানির ওপর!

অনুষ্ঠান শেষে জগন্নাথ নিমন্ত্রিত সকলকে এবং দীন-দরিদ্রদেরও ভোজন করালেন গভীর আগ্রহে—অখণ্ড নিষ্ঠায়! আয়োজন তাঁর প্রচুর না হলেও কোন দিক দিয়ে অ-পরিমিত নয়। অন্তরের শ্রদ্ধাপ্রীতি-সংমিশ্রণে প্রতিটি আহার্য বস্তুই হয়েছিল পরম হৃদ্য—একান্ত উপাদেয়। সকলেই পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে আহার করে প্রাণ ভরে কামনা করলেন শিশুর দীর্ঘ জীবন। তাঁদের পরিতৃপ্তি যেন অমৃত সিঞ্চন করলো জগন্নাথ ও শচীর অন্তরে।

৫

'নিমাই, নিমাই!'—ব্যাকুল দৃষ্টিতে প্রাঙ্গণের চারিদিকে চাইলেন শচীদেব। কিন্তু কই নিমাই? দ্রুতপদে ছুটলেন ধৈর্যহারা জননী সদরের দিকে! সহসা বিশ্বরূপ ঢুকলো বাড়ীতে। 'নিমাইকে দেখলি?' সভয় নেত্রে পুত্রের দিকে চেয়ে আকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করেন শচী।

কেন, কি হলো নিমাইয়ের?—মায়ের অধীরতায় বিশ্বরূপও চঞ্চল হয়ে ওঠে। দৃষ্টিতেও ফুটে ওঠে তার চিন্তার ছায়া,—'নিমাই বাড়ীতে নেই?—সপ্রশ্ন চোখ তুলে—কিছুটা শঙ্কিত ভাবেই চায় সে মায়ের পানে।

ব্যগ্রকণ্ঠেই উত্তর দেন শচীদেবী,—"বাড়ীতে থাকলে আর খুঁজে বেড়োবো কেন বাছা?—এই খেলা করছিল উঠানে,—রান্নাঘরে ঢুকেছি আর সেই ফাঁকে হামা দিয়ে—"

'অ্যাঁ—সে কি মা?'—বিশ্বরূপের চঞ্চলতা সীমা ছেড়ে যায়,—স্বরও কেঁপে ওঠে তার দারুণ উদ্বেগে,—'দেখ, দেখ, খিড়কি দিয়ে পাশের বাড়ী চলে গেছে না-কি। সদর দিয়ে কোথাও যায়নি। আমি তো এই পথ ধরেই আসছি,—তাহলে দেখতে পেতুম।"

আর দাঁড়ালেন না শচীদেবী। দাঁড়াবার মত মনের অবস্থাও তখন তাঁর ছিল না। চোখ মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তাঁর। রুদ্ধশ্বাসে ছুটলেন তিনি খিড়কি দিয়ে পাশের বাড়ীতে।...

ঠিক বলেছে বিশ্বরূপ। দুষ্টু ছেলে তখন পাশের বাড়ীর উঠানে বসে বেশ মজা করেই একটা পাকা কলা খেতে সুরু করেছে। প্রাণ ফিরে এলো শচীর দেহে—চোখে মুখে ফিরে এলো সজীবতা,—"তবে রে দুষ্টু, ডাকাত,—তোর পেটে পেটে এত বুদ্ধি!"—পেছন থেকে আচম্বিতে দুই ব্যগ্র বাহু দিয়ে ধরে তুলে নিলেন তিনি নিমাইকে বুকের মাঝে। বুকের ভেতরটা তখনও কাঁপছে তাঁর দুরুদুরু করে।

এই দু'তিনদিন আগেও কি কাণ্ডই না করে বসেছিল নিমাই। সদর

.নমে হামা দিয়ে ধাওয়া করেছিল গঙ্গার দিকে। .ছন থেকে শচী যত ধরতে যান,—খরখর হামা দিয়ে .ক। কি দ্রুতই না হামা দিতে পারে সে?—যে সব .শখেছে,—তারাও বুঝি অত দ্রুত চলতে পারে না। শেষে .র একজন লোক তাকে ধরে এনে দেয় মায়ের কোলে। ওঃ, .ড়লে এখনও শচীর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

.লো কি কাকী মা?'—শচীকে দেখেই বাড়ীর কমবয়সী বৌটি আসে,—হাসিমুখেই বলে,—'নিমাই চলে এসেছে,—আপনি বুঝি টের-ও ন?'

"টের পেলে কি এত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসি মা! যেই একটু ফাঁক পেয়েছে অমনি খিড়কি দিয়ে তোমাদের বাড়ী এসে হাজির। হামা দিয়েই ও বোধহয় গোটা শহরটাই ঘুরে আসতে পারে মা!"—প্রীতি-মধুর কৌতুকে ঈষৎ স্নিগ্ধ হাসি ফুটে ওঠে শচীর মুখে।

'যা বলেছেন!'—বৌটিও প্রীতির হাসি হেসে উত্তর দেয়,—'দিব্যি হামা দিতে দিতে এসে বসলো আমাদের উঠানে,—নাড়ুগোপালের মত। কোলে নিতে গেলাম, কিছুতেই এলো না,—তখন ঐ কলাটা হাতে দিলুম।

হুঁ,—সস্নেহ দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বলেন শচীদেবী,—"কলা আর সন্দেশ এ দুটি জিনিষ,—ভারী ভালবাসে খেতে।"—হঠাৎ তিনি যেন ব্যস্ত হয়ে ওঠেন,—'তা এখন যাই মা,—বিশ্বরূপ ভাইয়ের জন্যে ভেবে এতক্ষণ বুঝি সারা হয়ে গেল! ও-বেলায় আসবো আবার।'—আর এক পলকও দেরি না করে দ্রুতপদে খিড়কি দিয়েই তিনি ফিরে আসেন বাড়ীতে।

'এই যে, ওদের বাড়ীই চলে গিয়েছিল বুঝি?'—আশ্বস্ত চিত্তে সানন্দেই বিশ্বরূপ বলে ওঠে,—'দেখ, আমি ঠিকই বলেছিলাম।'—সঙ্গে সঙ্গে সাগ্রহে দুই হাত বাড়ায় সে—নিমাইকে কোলে নেবার জন্যে।

মায়ের কোল থেকে নিমাইও ঝাঁপ দিয়ে আসে দাদার কোলে,—মুখে এক-মুখ হাসি,—যেন দাদার কোলেই মজা আছে বেশি। ভাইটিকে বুকে পেয়ে প্রগাঢ় স্নেহে ঘন ঘন তার মুখে চুমা দিতে থাকে বিশ্বরূপ। একটু পরেই দাদার কোল থেকে নামবার জন্যে কিন্তু ছট্‌ফট করে নিমাই,—বন্দীদশা তার ভাল লাগে না,—হামা দিয়ে গোটা উঠানটা চ'ষে বেড়াতে চায় সে। বিশ্বরূপ আর না পেরে নামিয়ে দেয় তাকে কোল থেকে।—অমনি খর হামা দিয়ে একে-বারে দশহাত দূরে চলে যায় নিমাই,—হঠাৎ পেছন ফিরে একবার মা ও দাদার দিকে তাকায়। কিন্তু বিশ্বরূপ হাত বাড়িয়েছে দেখলেই হেসে তর তর এগিয়ে যায়! যেন একটা মজাই পেয়ে গেছে!

নিমাই যখন হামা দেয়,—তখন কি মধুরই না লাগে তার অঙ্গভঙ্গী। বিশ্বরূপ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে ; শচীরও পা যেন আর নড়ে না। চেয়ে থাকেন তিনি নিমাইয়ের দিকে সম্মোহিত নেত্রে। গৃহ-প্রাঙ্গণও বুঝি শিশুর নর্ম-লাস্যে সজীব হয়ে ওঠে!...

৬

শচীদেবীর আনন্দ আর ধরে না। নিমাই হাঁটতে শিখেছে। অবশ্য পা এখনও পুরোপুরি বশ হয়নি তার। দু'চার পা হাঁটে, আবার ধপ করে পড়ে যায়। আবার ওঠে,—আবার পড়ে। যত পড়ে,—হাঁটার উৎসাহ ততই যেন বেড়ে যায় তার। অদূরে দাঁড়িয়ে শচীদেবী দেখেন,—চোখে মায়ার গাঢ় অঞ্জন, —মুখে পরিতৃপ্তির মৃদু হাসি! নিমাই পড়ে গেলেই—ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসেন তাকে তুলতে। মায়ের সাহায্য কিন্তু নেবে না নিমাই,—সে তরতর করে খানিকটা হামা দিয়ে গিয়েই আবার উঠে দাঁড়ায়,—কচি অধর দুটি রেঙে ওঠে সাফল্যের হাসিতে। মায়ের সঙ্গে ছেলের এই চাতুরীর খেলায়,—মাকেই হার মানতে হয় অবশেষে।—এই পরাজয়ে শচীর কি তৃপ্তি!

সেদিন কোন্ সময় নিমাই চুপিচুপি ঢুকে পড়েছে ঠাকুর রঘুনাথের ঘরে। পূজার ঘণ্টা এবং শাঁখটার ওপর তার ভারী লোভ! বাবাকে দেখেছে সে ও-দুটোই বাজাতে। প্রথমে ঘণ্টাটি তুলে নাড়া দিলে নিমাই। ঠুং ঠুং করে বেজে উঠ্‌লো ঘণ্টা। কি মজা! নিমাই খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠ্‌লো। তার পর শাঁখটা তুলে তাতে ফুঁ দিতে লাগলো গাল ফুলিয়ে বাপের মতই। কিন্তু শাঁখ আর বাজে না। কিছুতেই বাজাতে না-পেরে-নিমাই জোরে জোরে ঠুক্‌তে লাগলো শাঁখটাকে মেঝের ওপর—শব্দ পেয়েই শশব্যস্তে ও-ঘর থেকে ছুটে এলেন শচীদেবী। "ওমা, ওমা, শাঁখটা ভেঙে ফেলবি নাকি?"—

আচম্বিতে শাঁখটা কেড়ে নিলেন তিনি নিমাইয়ের হাত থেকে। আর যায় কোথা? গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলো নিমাই। ব্যস্ত সমস্তভাবে শচী তুলে নিলেন তাকে কোলে—এলেন ঘর থেকে বাইরের হাওয়ায়,—"না, না, কাঁদে না। ও যে পুজোর শাঁখ, নিতে নেই। আমি তোমাকে ভাল শাঁখ এনে দেব গঙ্গার ঘাট থেকে।"—প্রগাঢ় আদরে ও স্নেহে তিনি চোখ দুটি মুছিয়ে দিলেন নিমাইয়ের। কিন্তু নিমাই কি অত সহজে ভুলবার ছেলে,—কোলের মধ্যেই সে হাত পা ছুড়ে আরও জোরে কাঁদতে লাগলো। শুভ্র কচি গণ্ড দু'টি দিয়ে ঝরতে লাগলো তার অজস্র অশ্রুধারা!—জোর করেই সে মায়ের কোল থেকে নেমে আবার তেমনি গড়াগড়ি দিতে লাগলো বারান্দায়!

মুস্কিলে পড়লেন শচীদেবী। পাশের বাড়ী থেকে প্রতিবেশিনীরাও ছুটে এলেন নিমাইয়ের কান্নার শব্দে। তারাও চেষ্টা করলেন নানাভাবে নিমাইকে শান্ত করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে হলো সকলকেই। এমন সময় বাইরের কাজ সেরে "শ্রীহরি, শ্রীহরি"—বলতে বলতে বাড়ীতে ঢুকলেন জগন্নাথ মিশ্র।—কি আশ্চর্য, অমনি নিমাই একেবারে চুপ! ডাগর ডাগর চোখ মেলে এদিক সেদিক চাইতে লাগলো, যেন খুঁজছে কাকে। নির্বাক বিস্ময়ে ভাবতে থাকেন সকলে,—কি ব্যাপার? এই এত কাঁদছিল! শচীর মনে কিন্তু সহসা একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল। নিমাইয়ের মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন তিনি।

চার পাঁচদিন পরে ব্যাপারটা জলের মতই পরিষ্কার হয়ে গেল শচীর কাছে। তিনি বুঝলেন তাঁর ধারণাই সত্য। কি কারণে নিমাই আজ আবার বায়না ধরে তেমনি কাঁদতে থাকে। শচী কোনমতেই তাকে শান্ত করতে না পেরে সেদিনের ধারণামত উচ্চকণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন,—শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি।

ব্যস, আগুনে যেন জল পড়লো। উদ্যতফণা ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ যেন নিমেষে মুগ্ধ হয়ে পড়লো মন্ত্রবলে। হরিনাম শুনে নিমাই আগের দিনের মতই ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাইতে লাগলো চারিদিকে। যেন ভুলে যাওয়া একান্ত আপন-জনের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে কেউ।—অথবা শিশু বুঝি জাতিস্মর,—তাই হরিনাম শুনে পূর্বজন্মের কোন অন্তরঙ্গ সুহৃদের কথা স্মরণ হওয়ায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তার বিরহে!

অবাক স্তব্ধ হয়ে যান শচীদেবী নিমাইয়ের এই ভাবান্তর দেখে। সম্পূর্ণ সন্দেহ মুক্ত হবার জন্যে তিনি আর-ও কয়েকবার উচ্চারণ করেন,—'শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি!'

নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নিমাইও যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। না, আর সন্দেহ করার কিছু নেই!—শচীদেবী ভাবেন আপন মনে,—কিন্তু ঐটুকু ছেলে

—হরিনামের মাহাত্ম্য কি বোঝে?—হরিনাম শুনে—৺
ঘটে কেন?—ভেবে ভেবে আকুলই হয়ে ওঠেন শচী,—
করতে পারেন না। স্নেহাতুর মায়ের মনে—সম্ভব-অস
চিন্তাই না জেগে ওঠে!...

কথাটা তিনি শীঘ্রই একদিন বললেন স্বামীকে। জগঃ
ক্ষণ কি-যেন ভেবে উত্তর দিলেন,—আগের জন্মে ও বোধ
ভগবানের। পূর্বজন্মের সংস্কারে তাই হরিনাম শুনে মুগ্ধ
তোমার ভাববার কিছু নেই।

অবশ্য শচীকে ভাবতে নিষেধ করলেও তাঁর নিজের মনে ৫
থেকেই যায়।—স্বামীর আশ্বাসে শচীদেবী স্বস্তির নিশ্বাস
ভাববার না থাকলেই হল। আমার তো বাপু, দেখে শুনে ৩
ভগবান আমার নিমাই বিশ্বরূপের কল্যাণ করুন,—তারা আমাদে
হয়ে বেঁচে-বত্তে থাক,—তার বেশি কিছু চাইনে। ভক্ত যিনি তিনি ...
থাকুন।

জগন্নাথ একবার চোখ তুলে স্ত্রীর দিকে চান,—কিন্তু আর কোন উচ্চবাচ্য করেন না; নীরবে পুঁথি-পত্রের পাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে মগ্ন হয়ে যান তার মধ্যে। শচীদেবীর মনের খট্‌কা অবশ্য সরে যায় ক্রমে ক্রমে। অধিকন্তু নিমাই বায়না ধরে কাঁদতে সুরু করলে তাকে শান্ত করবার একটা অমোঘ মন্ত্রই যেন পেয়ে যান তিনি। এরপর যখনই নিমাই কেঁদে গড়াগড়ি দিতে থাকে,—তখনই শচী-দেবী হরিধ্বনি করে হাততালি দেন। ব্যস,—দুরন্ত নিমাই-ও অমনি ঠাণ্ডা! তার যত উপদ্রব বন্ধ হয়ে যায়।—চেয়ে থাকে মায়ের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে —যেন আবার বলছে হরিধ্বনি করতে।

কিন্তু নিমাই যত 'দামাল' হয়ে ওঠে,—ততই 'সামাল সামাল,' করে হিমসিম খেতে হয় শচীকে। দুরন্তপণায় নিমাইয়ের জুড়ি ঐ-বয়সী ছেলে বুঝি আর দেখা যায় না। একটু চোখের আড়াল হয়েছে কি,—অমনি সে একটা কিছু করে বসবে। মুস্কিল হয়েছে শচীদেবীর। জগন্নাথ সংসার নির্বাহের ধান্ধায় বাইরে কাজে কর্মেই ব্যস্ত,—আর বিশ্বরূপ তো বইয়ে আর মুখে ঠায় বসে আছে টোলে। এদিকে শচীরও গৃহকর্মের অন্ত নেই। তবু তিনি ছাড়া নিমাইয়ের খবরদারী আর কে করবে? অষ্ট প্রহরই তাঁকে থাকতে হয় রীতিমত সতর্ক হয়ে নিমাইয়ের জন্যে। কিন্তু কাজের মানুষের পক্ষে প্রতিটি মুহূর্ত—সতর্ক থাকা কি সম্ভব? হাজার সতর্ক থাকলেও কেমন করে কোন দিক্ দিয়ে যে অসতর্ক মুহূর্ত এসে যায়,—তা বোঝাই মুস্কিল।

.না করছেন। নিমাই কয়েকটা রঙীন খেলনা নিয়ে
সে। রান্নার ফাঁকে-ফাঁকে শচীদেবীর সজাগ দৃষ্টি
কন্তু ভাতের ফেন গালতে গিয়ে শচীদেবীর মন কিছু-
ই নিবিষ্ট হয়ে পড়ে। আর সেই ফাঁকেই নিমাই চুপি
উঠানে নেমে আপন খেয়ালেই গুটি-গুটি চলে যায়—
়লা পতিত জায়গাটা ছিল সেখানে।

বেরিয়ে বারান্দায় নিমাইকে না দেখে আকুল হয়ে ওঠেন
ই, নিমাই,"—ব্যাকুলকণ্ঠে ডাক্‌তে থাকেন ছেলেকে।

ড়া দেবে? পাগলিনীর মতই বাড়ীর এদিক সেদিক ছুটো-
কন শচীদেবী নিমাইয়ের খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে বাস্তুর
সতেই মুহূর্তে শঙ্কায় বিস্ময়ে এবং আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যান
ব মত। পা-দুটো কাঁপতে থাকে থর থর করে। গলার রসও
ুকিয়ে গেছে তখন। চীৎকার করতে গিয়েও কণ্ঠে স্বর আনতে পারেন
না।—কিন্তু বুকের মাঝে আকুল ক্রন্দন গুমরে ওঠে,—হায়, হায়, হায়! গেল-গেল!

নিমাই তখন এক প্রকান্ড সাপকে ধরেছে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে অবলীলা-ক্রমে। ভয়-ডরের কোন চিহ্নই নেই তার মুখে।—বরং যেন হেসে ভেঙ্গে পড়ছে সে বিষধরের সঙ্গে খেলা করার আনন্দে। আর সাপটাও কি তেমনি! কোন অনিষ্টই সে করছে না ঐ ক্রীড়ামোদী অজ্ঞান শিশুর। খল ভুজঙ্গও যেন শিশুর অলোক-সুন্দর রূপে মুগ্ধ হয়ে ভুলে গেছে যাবতীয় খলতা,—ভুলে গেছে স্বীয় স্বভাব-ধর্ম। হিংসার তীব্র জ্বালা নেই তার কুটিল চোখে,—একবার হিস্‌ করে ফনা তুলছে,—আবার পরক্ষণেই একান্ত শান্তশিষ্টের মত মাথা লুটিয়ে দিচ্ছে নিমাইয়ের কোলের ওপর।

দংশন প্রবৃত্তি ভুলে গিয়ে ক্রূর ভুজঙ্গের অন্তরে সহসা জেগেছে কি তবে আত্মভোলা বাৎসল্য-প্রেম?—অথবা শিশুকে দেখে কালীয় নাগের বংশধরের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,—দ্বাপরের সেই কালীয়দমন-রূপী নৃত্যচপল অভয়বংশীবাদন শ্রীকৃষ্ণের শিশু মূর্ত্তি?—কে জানে!

চক্ষে পলক নেই—বক্ষে বিপুল স্পন্দন,—অবাক-নিস্পন্দ হ'য়ে চেয়ে থাকেন শচীদেবী,—স্থির-বিস্ফারিত নেত্রে সেই ভয়াবহ অথচ চিত্ত-বিমোহী বিস্ময়কর দৃশ্যের দিকে। বাহ্যজ্ঞান যেন লুপ্ত হ'য়ে গেছে তাঁর,—হৃদয়-তন্ত্রীতে বেজে উঠছে শুধু অনন্তশয্যায় শায়িত শ্রীমধুসূদনের সর্বভয়বারী পুণ্যনাম,—চোখের ওপর ভেসে উঠছে যেন তাঁরই করুণা-সুন্দর অভয় মূর্তি।

সহসা চমক ভাঙে তাঁর। বাহ্যজ্ঞান ফিরতেই নিমাইয়ের জীবনাশঙ্কায়

আকুল হ'য়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু ভরসা হয় না,—সেই অবস্থায় নিমাইকে রেখে কাউকে ডাকতে যেতে,—পা'দুটোও যেন মাটিতে বসে গেছে তাঁর। এমন সময় বিশ্বরূপ যেন দৈব-প্রেরিত হয়েই এসে পড়ে সেখানে। টোল থেকে বাড়ী ফিরে—মা ও নিমাই কাউকে দেখতে না পেয়ে—সে-ও এসে পড়েছে সেখানে তাদেরই খোঁজে। কিন্তু হাজার হোক,—সে বালক।...সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্য চোখে পড়তেই চীৎকার করে ওঠে দারুণ আতঙ্কে। হঠাৎ চীৎকার করে উঠলে যে সাপ উত্তেজিত হ'য়ে ছোবল মেরে বসতে পারে নিমাইকে,—এত সব ভেবে দেখার মত মনের অবস্থা তখন তার নয়।

সাপটা কিন্তু সেরূপ কিছুই করে না। বিশ্বরূপ চীৎকার করে উঠতেই সে নিমাইকে ছেড়ে বক্রগতিতে চলে যায় আপনার পথে। কিন্তু কি আশ্চর্য,—নিমাই আবার ধাওয়া করে তার পিছু পিছু। সাপটাও যেন একবার ঘুরে তাকায় তার দিকে। কিন্তু বিশ্বরূপ বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে এসে নিমেষে কোলে তুলে নেয় নিমাইকে।—দু'হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরে তাকে নিবিড়ভাবে।

ইতিমধ্যে দু'একজন প্রতিবেশিনীও এসে পড়েছিলেন সেখানে,—ব্যাপার দেখে তাঁদেরও বিস্ময়-আতঙ্কের সীমা ছিল না। তাঁরা বলেন,—নিমাইয়ের আজ পুনর্জন্ম হলো। ওর নামে মা-মনসার পূজো দাও। সাপটি বোধহয় বাস্তু সা[illegible]ই নিমাই আজ রক্ষা পেয়েছে।

নিমা[illegible]ন্তু তখনও সাপটার গমনপথে অঙ্গুলি সংকেত করে সোৎসাহে বলে আ[illegible]ায়,—দাদা, থাপ!

হুঁ, থাব'[illegible]—ভাইটিকে বুকে ফিরে পেয়ে বিশ্বরূপের তখন যেন নিজেরই দেহে প্রাণ ফিরে এসেছে,—প্রগাঢ় স্নেহে নিমাইয়ের মুখচুম্বন করে—গাঢ় কণ্ঠেই সে বলে,—কিন্তু থাপ যে এখুনি কামড়ে দিতো বোকা!...আর যেয়ো না কোন-দিন সাপ ধরতে। ওরা ভারী দুষ্টু,—কামড়ে দেয়! যাবে না তো?

দু'চোখে আকুলতা নিয়ে চায় সে নিমাইয়ের দিকে। নিমাই কি বোঝে,—সেই জানে,—তবে একান্ত শিষ্ট অনুগত ভাইটির মতই উত্তর দেয়,—না দাবো না।

শচীদেবী এতক্ষণ যেন চলে গিয়েছিলেন কোন শূন্যে...এখন তাঁর মনে হলো,—তিনি ফিরে এসেছেন বাস্তব জগতে। একটা পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি মাথা নত করেন বিপদবারণ নারায়ণের চরণে।

৭

'প্রভু, এবার এসো। জীব অধোগতির চরম সীমায় নেমে গেছে। তোমার কৃপা ছাড়া তাদের যে উদ্ধারের উপায় নেই প্রভু! এসো, এসো প্রেমময়, সর্ব-দুঃখহর,—আর দেরী ক'রো না...ভক্তি নেই—প্রেম নেই—বিশ্বাসও নেই; শুধু তর্ক—শুধু সন্দেহ—শুধু অবিশ্বাস,—নাস্তিকতায় দেশ ছেয়ে গেছে দয়াময়। অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারে পড়ে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য জীব ছুটে যাচ্ছে অধঃ-পাতের পথে,—তুমি ছাড়া কে তাদের দেখাবে সত্যের পথ?'

পরম ভাগবত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য আহ্বান করছিলেন পাপতাপ-হারী মঙ্গলময় ভগবানকে। কণ্ঠ তাঁর বাষ্পের আবেগে আকুল। দুই চোখের কোণ বেয়ে ঝরে পড়ছে দরদর ধারা। ভক্তি—প্রেম—বিশ্বাসহীন মানবের অধোগতি তিনি যেন আর দেখতে পারছেন না! অধর্মের প্রাদুর্ভাব, ধর্মের গ্লানি দেখে দেখে দীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তাঁর অন্তর।...জ্ঞানের গর্বে [illegible] হ'য়ে মানুষ সকল জ্ঞানের আকর,—সকল জীবের আশ্রয়স্থল—সেই 'বাসুদেব',—পরমেশ্বরের প্রতি করছে উপেক্ষা, তাই শ্রীমৎ আচার্যপ্রভু ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন,—ধরণীর বুকে তাঁর অবতরণের জন্য।—শুধু আজ নয়,—বহুদিন থেকে তাঁর ভক্তিপ্লুত কণ্ঠ অন্তরের ব্যথা-বেদনার আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে—এসো, এসো প্রভু, এসো!

তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস,—তাঁর এই আকুল আহ্বান নিশ্চয়ই পৌঁছবে—সেই দীনার্তশরণ ভগবানের কর্ণে,—নেমে আসবেন তিনি ধরিত্রীর বুকে—নররূপে জীবের দুঃখ দূর করতে।—জীবের অন্তরের অবিশ্বাস, তর্ক—সন্দেহ, মূঢ়তা দূর করে—প্রাণে প্রাণে—প্রেমের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করতে। তাঁর অন্তঃকর্ণে অবিরত বেজে উঠছে বিশাল কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরের বটবৃক্ষতলে—পার্থ-সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—যা বলেছিলেন যুদ্ধবিমুখ মোহাবিষ্ট ধনঞ্জয়কে—সেই মহাবাণী—যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানং অধর্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্ ॥

ধর্মের গ্লানি হতে কি আরও বাকী আছে?—অধর্মের অভ্যুত্থানে ধরিত্রী কি আর্তনাদ করছে না?—ভাবতে লাগলেন শ্রীআচার্য,—তবে—তবে—দেহ ধারণ করে তাঁকে যে আসতেই হবে,—তাঁরই অভয়বাণীর মর্যাদা রাখতে—তাঁরই অধঃপতিত জীবকে উদ্ধার করতে।...কিন্তু কত দেরী?...দয়াময়, আর দেরী কত?

অদ্বৈতাচার্যের পূর্বনাম,—কমলাক্ষ মিশ্র! নিবাস,—শান্তিপুর। তবে নবদ্বীপেও একখানি বাড়ী আছে তাঁর।...কিন্তু কে-জানে,—সে-কোন্ দৈবী-প্রেরণায় বেশির ভাগই সময় থাকেন তিনি নবদ্বীপে।...অল্প বয়সেই নানা-শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করে তিনি পরম কৃষ্ণভক্ত মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট দীক্ষা লাভ করেন। গুরুদত্ত মন্ত্রে কঠোর তপস্যা ও সাধন-ভজন দ্বারা আত্মোন্নতি সাধন করে, অধ্যাত্মমার্গেও লাভ করেন তিনি বিপুল শক্তি। তিনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত,—এবং গভীর কৃষ্ণপ্রেমানুরাগী। প্রেমে ও ভক্তিতে, জ্ঞানে এবং পাণ্ডিত্যে, সারল্যে ও মহত্ত্বে তিনি বহুজনের কাছে ছিলেন দেবতার মতই শ্রদ্ধেয়।

কিন্তু বৈষ্ণবদের সেরূপ কোন প্রভাব তখন ছিল না নবদ্বীপে।...অল্প কয়েকটি বৈষ্ণব নিয়ে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণবসভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অদ্বৈতাচার্য। বৈষ্ণবেরা তখন পদেপদে উপেক্ষিত এবং অবহেলিত হচ্ছেন নবদ্বীপ-সমাজে। তাঁদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেরও যেন অন্ত নেই। পথে-ঘাটে তাঁদের দেখলেই লোকে টিটকারী দেয়,—হাসিঠাট্টা করে মজা দেখে।

তাছাড়া, দেশের জনসাধারণের ধর্মজীবনও তখন ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন!—অধিকাংশ লোক তখন মনসা, চণ্ডী, বাশুলী, ধর্মরাজ প্রভৃতির পূজায় মশগুল! ...এই সব অনুষ্ঠানে তমোধর্মেরই প্রভাব ছিল প্রবল। কতকটা তন্ত্রমতে দেব-দেবীর পূজা করে—মদ্য-মাংস খেয়ে—নেচে গেয়ে রাত্রি জাগরণ করাই ছিল যেন ধর্মানুষ্ঠানের এক বিশিষ্ট অঙ্গ।...বৈষ্ণবাচরিত প্রেমধর্মের কথাও তখন কারো মনে জাগতো না।...জাত্যভিমান, ভেদাভেদজ্ঞান—এগুলির প্রভাবও তখন বড় কম নয়।

অবশ্য নবদ্বীপে জ্ঞানমার্গী, শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতদেরই সমাদর তখন বেশী। ...যিনি যত শাস্ত্রজ্ঞানী,—তিনি তত সম্মানিত। শুধু বিদ্যার্জন—শুধু শাস্ত্র-চর্চা,—শাস্ত্রের কূট তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি নিয়েই নবদ্বীপ তখন উন্মত্ত।...কি বৃদ্ধ—কি প্রৌঢ়—কি যুবক—কি বালক,—সকলেরই মুখে বিদ্যার আলোচনা,—সকলের মুখে শাস্ত্রীয় তর্কের বন্যা ছুটে যাচ্ছে।...মেয়েরাও শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত এবং পাণ্ডিত্যের পক্ষপাতী।...যিনি যত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের স্ত্রী অথবা জননী,—তাঁর গৌরব এবং গর্ব যেন ততই বেশি।...প্রগাঢ় শাস্ত্রদর্শী, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণই

তখন নবদ্বীপ হিন্দু-সমাজের নেতা।...অসীম তাঁদের প্রভাব,—অকাট্য তাঁদের যুক্তি,—অলঙ্ঘ্য তাঁদের বাক্য,—অনতিক্রম্য তাঁদের নির্দেশ।

ন্যায়শাস্ত্রের অনুশাসনে নৈয়ায়িকগণ তখন দশবার ভগবানকে গড়ছেন,—এবং ভাঙছেন।...বেদান্তের সূত্র ব্যাখ্যা করে বৈদান্তিক প্রচার করছেন,—অদ্বৈতবাদ,—দৃঢ়কণ্ঠে বলছেন,—'সোঽহং'। জটিল তর্কশাস্ত্রের বিচারে সুতার্কিক পণ্ডিতগণ প্রচার করছেন,—তাঁরাই শ্রেষ্ঠ,—তাঁরা আবার পূজা করবেন কার? এমন কি ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেও নিজেদের মর্যাদার হানি বোধ করছেন তাঁরা। বিভিন্ন মতবাদী—বিবিধ শাস্ত্রের বিচার-তরঙ্গে হাবু-ডুবু খেতে খেতে অন্তরের সরল বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন তাঁরা,—কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে অবশেষে ঘোষণা করে বসছেন—ভগবান নেই। আকণ্ঠপীত জ্ঞান-সুরার মাদকতায় প্রেম ও ভক্তি-সুধা তাঁদের কাছে উপহাসের বস্তু হয়েই দাঁড়িয়েছে।

ফলে প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ, বিশ্বাস,—এ-সব যেন বাংলার জ্ঞানবিদ্যাপীঠ—নবদ্বীপ-সমাজের আধ্যাত্মিকক্ষেত্র থেকে কূট তর্কের বন্যায় কোথায় ভেসে যাচ্ছে। আবার আর একদিকে চলছে,—শাস্ত্র-পুরাণ-নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক পূজা-পার্বণ, যাগ—যজ্ঞ—হোম—ব্রত—উপবাস মহাসমারোহে। নবদ্বীপ হিন্দু-সমাজের এই অবস্থায়—স্বল্পসংখ্যক বৈষ্ণব,—যাঁদের তপস্যা শুধু ভগবানের নামকীর্তন,—প্রাণের সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে প্রেম ও ভক্তির মন্দাকিনী ধারায় তাঁর অভিষেক,—দীনতা এবং সহিষ্ণুতাই যাঁদের প্রেমধর্মের সোপান,—তাঁদের যে পদে পদে অপদস্থ হতে হবে—সে আর বিচিত্র কি?...জ্ঞানের চেয়ে ভক্তির মূল্য যাঁদের কাছে বেশি, জ্ঞানীর চেয়ে ভক্ত যাঁদের চোখে বড়,—শাস্ত্রাভিমানী পণ্ডিতদের কাছে তাঁরা যে মূঢ় বলেই গণ্য হবেন,—এতেই বা আশ্চর্য হবার কি আছে?

তা বলে কি বৈষ্ণবাচার্যগণ জ্ঞানী বা পণ্ডিত ছিলেন না?—না, তাঁদের শাস্ত্রীয় জ্ঞান ছিল কম?—তাঁরাও এক একজন ছিলেন দিগগজ পণ্ডিত,—সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে তাঁদেরও অধিকার ছিল অসাধারণ। কিন্তু তাঁরা প্রেমের যূপকাষ্ঠে জ্ঞানের গর্বকে বলি দিয়েছিলেন।—অথবা জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফলে তাঁদের অন্তরে প্রেমের যে দীপ-শিখা জ্বলেছিল একান্ত সহজাতভাবেই;—প্রবল বাতাসের মত জ্ঞান তা নির্বাপিত না করে—ঘৃতরূপেই বৃদ্ধি করেছিল তার প্রজ্বলন-শক্তি!...পক্ষান্তরে জ্ঞানমার্গী পণ্ডিতেরা পুঁথিপত্রের মধ্যে খুঁজে বেড়াতেন, সচ্চিদানন্দ প্রেমের ঠাকুরকে,—কিন্তু পাতার পর পাতা ওলটাতে ওলটাতে তাঁদের জীবনের পাতা ভরে উঠতো অবিশ্বাসে,—নিবিড় বিশ্বাসেই যাঁকে পাওয়া যায়,—তর্কে তর্কে চলে যেতেন তিনি দূরে—বহুদূরে।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ধ্যানস্তিমিতনেত্রে ডাকছিলেন ভগবানকে গভীর নিষ্ঠায়,—তাঁর প্রেমমুগ্ধ অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে—ফুটে উঠছিল প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর রূপ।...দু'একটি করে শিষ্যের সমাগম হচ্ছে, কিন্তু আচার্যের ভাববিহ্বল ধ্যানমূর্তি দেখে—কেউ কোন কথা বলতে সাহস করছে না।...কক্ষের মধ্যে এক অখণ্ড নীরবতা।—সেই নীরবতাও যেন এক পুণ্যময় ভাবে পরিপূর্ণ!

সহসা আচার্য 'শ্রীহরি, শ্রীহরি' বলতে বলতে নেত্র উন্মীলন করলেন,—'এই যে তোমরা এসেছ।'—সম্মুখে শিষ্যগণকে দেখেই সানন্দে প্রীতি-সম্ভাষণ জানালেন তাঁদের ঃ কিন্তু মুহূর্তে শিষ্যদের চোখমুখের অপ্রসন্নতা দেখে সস্নেহ চঞ্চল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তোমাদের চোখমুখের ভাব ভারী ভারী ঠেকছে কেন? কেউ বুঝি কিছু বলেছে?'—আচার্যের সূক্ষ্ম দৃষ্টি যেন তাদের অন্তর ভেদ করে অন্তরতম ব্যথাটিকে ধরে ফেলেছে।

একজন শিষ্য বললেন বিমর্ষকণ্ঠে,—প্রভু, আর তো সহ্য হয় না! এতদিন আমাদের নিয়েই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চলছিল,—কিন্তু এবার ভগবানকে নিয়েও সুরু করেছে ঠাট্টা তামাসা করতে।

আচার্য মৃদু হাসলেন,—উদার প্রশান্ত হাসি,—'সে আর বেশি করছে কি? ভক্তকে যারা বিদ্রূপ করে,—ভগবানকে বিদ্রূপ করা তো তাদের কাছে বড় কথা নয়।...ভগবান এবং ভক্ত,—এ দুই যে পরস্পর অভিন্ন।...তাই ভক্তকে দেখলেই মনে পড়ে ভগবানকে। তোমাদের দেখে যদি তাদের ভগবানকে মনে পড়ে থাকে,—তাহলে সে-তো আনন্দেরই বিষয়।...প্রেমময়ের লীলা কে বুঝবে? এমনি করেই বিদ্রূপ করতে করতে অবিশ্বাসী একদিন তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, পাপী-তাপী, মূর্খ-পণ্ডিত, দীন-ধনী,—সকলকেই কল্পতরুর মত প্রেম দান করাই যে—সেই প্রেমের ঠাকুরের লীলা-মাধুর্য।'

সহসা ভাবের আবেগে আচার্যের কণ্ঠরোধ হয়ে যায়। সমাগত বৈষ্ণব শিষ্যগণ চেয়ে থাকেন তাঁর সৌম্য শান্ত মুখের দিকে—বিপুল কম্ভ্রমে—ঘনীভূত শ্রদ্ধায়।—একটু পরে কণ্ঠের জড়তা দূর করে আবার বলেন আচার্য,—'কিন্তু তোমাদের তো বিচলিত হলে চলবে না।...বৈষ্ণবের আদর্শ তো তা নয়।...'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।'—এই হচ্ছে বৈষ্ণবের আদর্শ। যে যাই বলে, বলুক,—তোমরা নিজের নিজের কাজ করে যাও নীরবে—সমাহিত চিত্তে। তিনি শীঘ্রই আসবেন। জীবের এই অধোগতি তিনিই বা আর দেখবেন কতদিন?...জীব যে তাঁরই।

সহসা চমকে ওঠেন আচার্য—আসবেন?...না, না আমার মনে হচ্ছে,—এসেছেন। আমি যেন তাঁর পায়ের নূপুর-শিঞ্জন শুনতে পাচ্ছি।...বাতাসে যেন তাঁর শ্রীঅঙ্গের পুণ্যমধুর সৌরভ ভেসে আসছে। কানে বাজছে তাঁর যেন

দূরাগত বাঁশরীর অমিয় তান।...কিন্তু এখনও বুঝি—প্রকট হবার সময় হয়নি। ...ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর,—যথাসময়েই প্রকট হবেন তিনি।...আর প্রকট হলে আমাকে তাঁর কৃপা হবেই : নইলে যে তাঁর দীনার্তশরণ নামে কলঙ্ক পড়বে। আমি যে বড় বেদনায়—জীবের কল্যাণে শরণ নিয়েছি তাঁর!

আচার্যের কণ্ঠে আর স্বর যোগায় না। সমগ্র অন্তর উদ্বেলিত হয়ে প্রেমাশ্রু ঝরে পড়ে তাঁর ভক্তি-নম্র দুই চোখ ছাপিয়ে।...বৈষ্ণবগণের মুখেও আর কোন কথা ফুটছে না। পরমভক্ত অদ্বৈতাচার্যের আশ্বাসবাণী অমৃতধারার মতই তখন ছুটে যাচ্ছে তাঁদের তৃষিত অন্তরের দুকূল প্লাবিত করে। যেন এক পরম শুভদিনের শুভাগমের আশায় এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছেন তাঁরা!...তাঁদের চোখও ছলছল করে ওঠে সেই পুণ্যদিনের কথা স্মরণ করে।

৮

"ও বাছা, শোন শোন! শীগগির এসোতো একবার!"—পথের একপাশে সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়িয়ে ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকলেন শচী পাড়ার একটি চৌদ্দ-পনেরো বছরের কিশোরকে। আহ্বানমাত্র ছেলেটি একান্ত অনুগতের মত ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে এসে প্রণাম করলো শচীদেবীকে,—"কি বলছেন কাকীমা?"

"বাবা, বড় মুস্কিলে পড়েছি,"—শচীদেবীর কণ্ঠে পূর্বের মতই ব্যাকুলতা—"নিমাই ছুটে পালিয়েছে এইদিকে—বাড়ি থেকে। তার পিছু পিছু এতটা ছুটে এসেও আমি তাকে ধরতে পারলাম না।...মেয়েমানুষ—আর তো যেতে পারি না বাবা। তুমি যদি একটু এগিয়ে দেখো! নয়ত এখনই কোথায় গিয়ে শহরের গোলমালে হারিয়ে যাবে।"

"আচ্ছা, আপনি বাড়ি যান। আমি ধরে আনছি—তাকে যেখানে পাই।—এরই মধ্যে আর কতটা যাবে?"—বলতে বলতে ছেলেটিও ব্যাকুলভাবে ছুটলো সামনের পথ ধরে নিমাইয়ের উদ্দেশে।

ভারী বিব্রত হয়ে পড়েছেন শচীদেবী আজকাল নিমাইকে নিয়ে।—এবং শুধু তিনি একাই নয়,—জগন্নাথ মিশ্র, বিশ্বরূপ,—এমন কি পাড়া-পড়শীরাও নিমাইয়ের জন্যে সর্বদা ভেবেই আকুল—কোন ফাঁকে কখন যে ছুটে কোথায় পালিয়ে যাবে,—তার ঠিক-ঠিকানা নেই। হামা দেবার সময়ই তো তাকে সামলানো হতো ভার।—এখন আবার বয়স হয়েছে প্রায় আড়াই বৎসর। কিন্তু দীঘল ছাঁদের স্বাস্থ্যপুষ্ট-নীরোগ নিটোল দেহ—কে বলবে আড়াই বছরের,—যেন চার বছরের ছেলে!

লম্বা লম্বা পা ফেলে যখন ছোটে, তখন তাকে ধরে কার সাধ্যি?...এই কয়েকদিন আগে তো একেবারে গঙ্গার তীর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল,—বিশ্বরূপ ঊর্ধ্বশ্বাসে পিছু পিছু ছুটে তবে তাকে কোন রকমে ধরে আনে।—যা হোক, কিছুক্ষণ পরে ছেলেটি—নিমাইকে চ্যাংদোলা করে ধরে নিয়ে আসে শচীদেবীর কাছে।...সহজে কি আনতে পেরেছে?—নিমাইকে ধরতে হিমসিম খেয়ে গেছে বেচারা।...শচীদেবীর কাছে নিমাইকে নামিয়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে,—"এই নিন, এবার থেকে ডাকাতকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখুন। বাপ, ধরা কি দিতে চায়? আর একটু হলেই হাটের গোলমালে গিয়ে মিশে যেতো আর কি?"

এতক্ষণে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন শচীদেবী। সস্নেহে ছেলেটির দিকে চেয়ে বলেন গাঢ়কণ্ঠে,—বেঁচে থাক বাবা, চিরজীবী হয়ে। আজ তুমি বড় উপকার করলে।

আত্মপ্রশংসা শোনবার জন্যে আর সেখানে অপেক্ষা করে না সরলমনা কিশোর। নিমাইকে বুকে তুলে ধরে—গভীর দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বলেন শচী, হ্যাঁরে, নিমাই,—এমনি করে কি তুই কোনদিন কোন বিপদ বাধাবি রে? না, বাপু, তোকে নিয়ে তো আর পারি না।

নিমাই কিন্তু তখনও কোল থেকে নামবার জন্যে ছটফট করে।..."ছিঃ, ছিঃ," —সহসা তার বেশভূষার দিকে দৃষ্টি পড়ে যায় শচীদেবীর,—"এই কত সুন্দর করে সাজিয়ে দিলাম,—আর এরই মধ্যে—ধূলোমাটি মেখে একেবারে যেন ভূত হয়ে এলি!"

ভূত অবশ্য নিমাই আজই হয়নি। শচীদেবী রোজ দু'বেলা তাকে সাজিয়ে দেন মনের মত করে। যেমন যশোদা সাজাতেন তাঁর আদরের দুলাল গোপালকে —পরম যত্নে—পরিপূর্ণ মমতায়।...মাথায় মোহন চূড়া বেঁধে,—কপালে চন্দনের ফোঁটা আর চোখে কাজল দিয়ে—গলায় পরিয়ে দেন এক ছড়া স্বর্ণহার।...সুগোল —সুডোল বাহুদুটিতে—স্বর্ণবলয়,—পায়ে রূপার ঝুমুর দেওয়া মল।...তার-পর সর্বাঙ্গ তার মুছিয়ে দেন নির্মল করে।...নিমাইয়ের গোরা অঙ্গ তখন

ঝকঝক করে ওঠে কষিতকাঞ্চনের মত।...জগৎ ভুলে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন স্নেহ-মুগ্ধা জননী নিমাইয়ের দিকে।

কিন্তু নিমাই-এর কাছে সে-সব সাজ-সজ্জার কিছুমাত্র মূল্য নেই। তখনই এখান থেকে ওখানে,—এ বাড়ী থেকে ও বাড়ীতে গিয়ে—সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠে। তখন আর ধূলো মাটি কে গ্রাহ্য করে? শচীদেবীর অত সাধের সাজ-সজ্জা—সূত্রছিন্ন পুষ্পমাল্যের মতই বিপর্যস্ত হয়ে যায়। সোনার অঙ্গ ধূলায় ধূসর হয়ে ওঠে।

কিন্তু তাতেও শিশুর অঙ্গে যেন এক অপরূপ বিচিত্র সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। মা তার ভূত বললেও,—তাকে দেখে শিশু 'ভূতনাথ' বলেই মনে হয় তখন।... কখনো বা সেজেগুজে গিয়ে—কারো গৃহ-প্রাঙ্গণে দু'বাহু তুলে "হরি হরি" বলে নাচতেই সুরু করে দেয় নিমাই।

কি সুন্দর সে নৃত্য-লাস্য।...কত মধুরই না লাগে নিমাইয়ের কচিমুখে —হরি হরি ধ্বনি। মন প্রাণ যেন কেড়ে নিতে চায়। হরিনামে নিমাইয়ের প্রীতি যেন জন্মগত। বাড়ীর মেয়েরাও আনন্দে হাততালি দিয়ে বলতে সুরু করেন—হরি—হরি।—নিমাইয়ের উৎসাহ যেন দ্বিগুণ বেড়ে যায়। নাচতে নাচতে যেন নিজেকেও ভুলে যায় নিমাই। তার নাচার তালে তালে যারা নিকটে থাকে,—তাদের অন্তরও নাচতে থাকে তালে তালে—।

আবার কোন কোন দিন নিমাইয়ের অপূর্ব নৃত্যলীলা দেখতে—লোক জমে যায় শচীদেবীর গৃহ-প্রাঙ্গণেই। শচীদেবী তাকে সাজিয়ে দেন অপূর্ব বেশ-ভূষায়। এখানে তার সাজ-সজ্জা অনেকটা অবিকৃত থাকে।...সুবিন্যস্ত সজ্জায় তার অশিক্ষিত নৃত্যের অকৃত্রিম ভঙ্গিমা যে মাধুর্যের সৃষ্টি করে,—যুগযুগ ধরে নৃত্য শিক্ষা করেও কি কেউ সে মাধুর্যের কণামাত্রও সৃষ্টি করতে পারবে? লজ্জা-কুণ্ঠা-সরম-সংকোচমুক্ত,—বাধা-বন্ধনহীন—অকপট-চপল শিশু,—প্রাণের আনন্দ বা উচ্ছ্বাস তার সীমাবদ্ধ নয়। গৃহ-প্রাঙ্গণও যেন নাচতে থাকে তার সঙ্গে। তার নাচের ছোঁয়াচ লেগে যায় অন্যের মনেও।...বড়রা লজ্জায় না পারলেও—ছোটরা এসে সোৎসাহে যোগ দেয় তার সঙ্গে।

শচীদেবী—অপলক নেত্রে রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে থাকেন তাঁর নৃত্যপাগল ছেলেটির দিকে।...এমনি করেই বুঝি চেয়ে থাকতেন জননী যশোদা—তাঁর গৃহ-প্রাঙ্গণে নৃত্যরত শিশু কৃষ্ণের দিকে।...সহসা চমকে ওঠেন শচীদেবী।—ছেলেটা কি শেষে হরিনাম করতে করতে পাগলই হয়ে যাবে নাকি? নাচতে নাচতে নিজেকে সামলাতে না পেরে—নিমাই কখনো কখনো পড়ে যায়—প্রাঙ্গণের কঠিন মাটিতে,—আবার তখনই উঠে দাঁড়ায়।—কিন্তু ততক্ষণে হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসেন শচীদেবী,—আহা, সোনার অঙ্গে বুঝি ভারী লেগেছে নিমাইয়ের! আকুল

স্নেহে ছেলেকে তুলে নেন তিনি কোলে।...অতিশ্রমে তখন মুক্তাবিন্দুর মত ঘাম জমেছে নিমাইয়ের কপালে;—অন্য সকলের দিকে চেয়ে মিনতির সুরে বলেন শচী,—আজ আর থাক,—নিমাই বড় ক্লান্ত হয়ে উঠেছে।

বর্ষীয়সী মহিলারা নিমাইকে শচীদেবীর কোল থেকে নিয়ে কাড়কাড়ি করতে থাকেন পরস্পরের মধ্যে। অজস্র আশীর্বাদ ঝরে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ থেকে নিমাইয়ের শিরে,— অন্তরে ছুটে যায় তাঁদের অপার্থিব এক ভাবের ধারা। 'শোন গো নিমাইয়ের মা!'—একজন বলে ওঠেন শচীদেবীর দিকে চেয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে,—"তেমার ছেলের বর্ণ উজ্জ্বল "গৌর", আর হরিনামে সে মাতোয়ারা, তাই আজ থেকে ওর নাম রাখছি আমরা,—'গৌরহরি'।

আনন্দের কলগুঞ্জন উঠলো সকলের মাঝে,— গৌরহরি, গৌরহরি।...হ্যাঁ হ্যাঁ, গৌরহরিই বটে। শুধু নামে নয়,—আসলে।

একজন বলে,—গৌরহরিই বল,—আর গৌরগোপালই বল,—সবই মানায় ওকে। গোপালই যেন জন্মেছে গৌর হয়ে—শচীর ভাগ্যফলে। নিমাই—বিশ্বরূপ,—দুইটিই যেন হীরের টুকরো,—বেঁচে থাক বাছারা শতায়ু হয়ে।

শচীর মাতৃ-প্রাণে পুলকসিন্ধু উথলে উঠলো! তাঁর কণ্ঠের ভাষা রুদ্ধ হয়ে গেল কৃতজ্ঞতার আবেগে। ভক্তিনতচিত্তে বর্ষীয়সীদের প্রণাম করলেন তিনি। চোখের দুই কোণে তাঁর তখন মুক্তাবিন্দুর মতই অশ্রু টল টল

৯

পাকা চোর মেষমালী। যাচ্ছে শহরের রাস্তা দিয়ে। এ-রাস্তায় গোলমাল বরাবরই একটু বেশি। তার ওপর আজ যেন কি-একটা পর্ব উপলক্ষে গোলমাল আরও বেড়ে গেছে। লোকজন এবং গাড়ী-ঘোড়ার ভিড়ে যেন পথ পাওয়াও কঠিন। চোর ছ্যাঁচড়দের বেশ একটু সুবিধাই হয়ে গেছে আজ।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় মেষমালী—'এই দাঁড়া দাঁড়া,'—বলে তার সঙ্গীর হাত ধরে টেনে,—'এদিকে আয়, একটা কথা বলি। জবর খবর আছে।'

দুজনে পাশ কেটে দাঁড়ায় সন্তর্পণে।...“ঐ দেখ”—মেষমালী আঙ্গুল তুলে দেখায় সঙ্গীকে,—“কেমন একটা সুন্দর ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে। দেখেই মনে হচ্ছে,—সঙ্গে কেউ নেই, একাই হয়ত বাড়ী থেকে চলে এসেছে।...যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকাও মেরে গেছে গোলমালে।...দেখছিস না,—কেবলই ফ্যাল ফ্যাল করে চাইছে এদিকে সেদিকে? সঙ্গে কেউ থাকলে কি আর ওভাবে ঐটুকু ছেলে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতো?”

ছেলেটি কিন্তু আর কেউ নয়,—আমাদের নিমাই। কোন্ সময় ফাঁক পেয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাড়ী থেকে। তারপর পাড়া ছেড়ে একেবারে শহরের বড় রাস্তায়। ঘুরতে ঘুরতে খেয়ালের বশেই এসে পড়েছে এতদূর।...এখানে এসেই কিন্তু গোলমালে পড়ে—ভুলে গেছে বাড়ী ফেরার রাস্তা। কিন্তু—ভয়-ডরের চিহ্নও নেই তার মুখে। দিব্যি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা করে গাড়ীঘোড়া—রঙ-বেরঙের নানা জিনিস—লোকজন এবং আরও এমন কত কি দেখছে।...একে তার ভুবন-ভোলানো রূপ—তায় গায়ে তিন চারখানা ভারী ভারী সোনার গয়না,—কতক্ষণ আর না দুষ্টলোকের নজরে পড়বে?

ও-দিকে বাড়িতে—আর শুধু বাড়িতেই বা কেন,—সারা পাড়ায় তখন হুলস্থূল পড়ে গেছে। বিশ্বরূপ আশঙ্কায় আকুল হয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে ভাইকে,—বন্ধু লোকনাথকে সঙ্গে করে।...পিতা জগন্নাথও হয়রাণ হচ্ছেন খুঁজে খুঁজে।

পাড়ার কোন-কোন ছেলেও এ-পথে—ও-পথে সন্ধান করে বেড়াচ্ছে তার।...প্রতিবেশীদেরও এক একটি মুহূর্ত কাটছে যেন প্রবল উদ্বেগে।

আর শচী?—তাঁর কথা তো বলবারই নয়। পাগলিনীর মত তিনি একবার সদর—একবার বাড়ী করছেন।...উদ্বেগাকুল জননীর প্রাণের সে বিপুল আর্তি বর্ণনার নয়,—উপলব্ধির।...চোখমুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তাঁর।...তার ওপর নিমাইয়ের গায়ের অলঙ্কারের কথা মনে পড়ে—তাঁর অন্তরাত্মা শিউরে উঠছে পুত্রের ঘোর অকল্যাণ-চিন্তায়।...হায় হায়, দুষ্ট লোকের চোখে পড়লে কি আর তার রক্ষা আছে!...নিজেকে আর সামলাতে না পেরে—কেবলই ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠেন শচীদেবী। সর্ববিপদধারণ হরিকে ডেকে—জানাচ্ছেন প্রাণের আকুতি,—হে মধুসূদন,—হে ঠাকুর, শিশু নিমাই তোমার নামে পাগল। ...তুমিই তাকে রক্ষা কর প্রভু। ফিরিয়ে এনে দাও আমার বুকে।—দরদর জল ঝরে পড়ছে তাঁর চোখে।

এদিকে নিমাইয়ের ওপর নজর পড়তেই লুব্ধ হয়ে ওঠে মেঘমালীর সঙ্গীর দৃষ্টি,—'তাই তো সর্দার, গায়ে যে বেশ ভারী ভারী তিন চারখানা গহনাও আছে দেখছি।'

'আরে চুপ!'—মেঘমালী সাবধান করে তার সঙ্গীকে জোরে কথা না বলতে,— 'নয়ত কি আর ছেলেটার রূপ দেখতে বলছি তোকে। আসল কথা ঐ গয়না! চল, ছেলেটাকে বাড়ী পেঁৗছে দেব বলে কাঁধে নিয়ে চম্পট দিই। গয়না ক'খানা কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেব কোথাও।'

'কিন্তু ছেলেটাকে খুব বোকা মনে হচ্ছে না সর্দার,'—সঙ্গীটি বলে,—'বরং একটু সেয়ানাই লাগছে। আর বয়সও চার বছরের কম হবে না। যদি চেঁচায়, বা সহজে যেতে না চায়—তবেই ফ্যাসাদ।'

'হুঃ, ফ্যাসাদ না কচু!'—উপেক্ষায় ঠোঁট উলটিয়ে উত্তর দেয় মেঘমালী,— 'এখানে কে কার খবর রাখছে! বলে নিজের নিজের নিয়েই সব অস্থির।... একবার ভুলিয়ে একটু তফাতে নিয়ে যেতে পারলেই—ব্যস, তখন গলাটি টিপে—

মেরে ফেলবে একেবারে—অ্যাঁ।—চমকে ওঠে মেঘমালীর সঙ্গী,—আহা অমন সুন্দর ছেলে!—কার বুকের মাণিক।—কোন রাজা-বাদশার ছেলেই হবে বুঝি। নইলে কি আর অত রূপ—

'চোপ!'—রুদ্ধ রোষে গর্জে ওঠে মেঘমালী,—'আর দয়া দেখাতে হবে না। গয়নাগুলো বুঝি এমনই আসবে,—না? চুপি চুপি আয় পিছু পিছু—দয়া পরে দেখাবি।'

স-সঙ্গী এগিয়ে আসে মেঘমালী নিমাইয়ের কাছে,—'কি খোকা, পথ হারিয়ে গেছ বুঝি? তা ভাবনা কি? চল, তোমাকে বাড়ী পেঁৗছে দিই।'—বলেই সে

নিমেষে নিমাইকে কাঁধে তুলে নেয়। নিমাই কিন্তু একেবারেই ভয় পায় না,—ঘাবড়েও যায় না,—বেপরোয়া চেপে বসে মেঘমালীর কাঁধে—নিশ্চিন্ত—নির্বিকার। তারপর যেন প্রভুর মতই আদেশ করে—চল!

মেঘমালীর কাঁধে নিমাইকে দেখে মনে হয়, যেন এক ভীষণ দৈত্যের কাঁধে চড়ে চলেছে এক নরলোকদুর্লভ দেবশিশু।...যেতে যেতে পথে কারো কারো নজরেও পড়ছে তারা,—কিন্তু নিমাইয়ের নিশ্চিন্ত ভাব,—এবং অম্লান চোখ-মুখ দেখে—কেউ কোন সন্দেহ করছে না,—ভাবছে বুঝিবা কোন ধনীর ছেলেকে বাড়ীর কোন পাইক-বরকন্দাজ কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে।

চলতে চলতে কেমন যেন একটা আনন্দ জাগছে মেঘমালীর প্রাণে।...সে আনন্দ গহনার লোভে নয়,—অথচ কিসের তাও যেন বুঝতে পারছে না সে।... তার সঙ্গীটি যাচ্ছে পিছু পিছু,— মাঝে মাঝে সে চাইছে নিমাইয়ের দিকে,—আর ভাবছে,—আহা, এমন সুন্দর ছেলেটিকে পাছে সর্দার মেরেই ফেলে! সর্দার ওকে একবার তার কাঁধে দেয়?—একবার ছেলেটিকে সে কোলে পায়? —প্রাণটা তার নিতান্ত অহেতুক আগ্রহে চঞ্চল হয়ে ওঠে!

—মেঘমালী কিন্তু চলেছে তো চলেছেই—তার মনে হচ্ছে সে ঠিকই যাচ্ছে —নিজের আস্তানার পথে। কিন্তু তার আস্তানাটা কি এখান থেকে এতই দূর?...হঠাৎ চমকে উঠে সে থমকে দাঁড়ায়,—এই রাস্তাই ঠিক বটে তো?—আবার পরক্ষণেই যেন মনে হয়,—না সে ঠিকই যাচ্ছে।...পেছনে মুখ ফিরিয়ে তাড়া দেয় সঙ্গীকে—আয়, আয় পা চালিয়ে আয়।

নিমাই কাঁধ থেকে ডেকে বলে—ওগো, আমাদের বাড়ী আর কতদূর?

'এই যে এসে পড়েছি।'—মেঘমালী মিছে কথা বলে আশ্বাস দেয় তাকে। নিমাই বলে,—"আমার যে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। শীগ্‌গির চল।"—মেঘমালী উত্তর দেয় এবার একটু শ্লেষভরেই,—"এই যে আর দেরি কি? খাবার তো তোমার ধরাই আছে।"—মনে মনে বলে,—"জন্মসাধ খাইয়ে দেব,—একটু থাম।"

অবশেষে মেঘমালী কিন্তু যে বাড়ির সদরে ঢুকলো,—সেখানে পৌঁছতেই সোৎসাহে হাততালি দিয়ে বলে উঠ্‌লো নিমাই,— "হরি—হরি!"—এই তো আমাদের বাড়ি,—দাও, শীগ্‌গির নামিয়ে দাও আমাকে।'—নামবার চেষ্টা করে সে কোল থেকে।

হঠাৎ যেন স্বপ্নের পর জেগে উঠলো মেঘমালী,—একি, নিজের আস্তানা মনে ক'রে এ কোথায় এসে ঢুকেছে সে? ছেলেটা আবার বলে, আমাদের বাড়ি। ...নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না মেঘমালী।...ভাল করে চারদিক চেয়ে দেখতেই কিন্তু তার বুক কেঁপে উঠ্‌লো দারুণ আতঙ্কে,—অ্যাঁ, এ যে ভদ্দরলোকের পাড়া?...এ কোথায় যেতে কোথায় এসে পড়লো সে? রাত্রি নয়,

—যে নিশির ডাকে সে পথ ভুলে এসেছে!...তবে—তবে?

মাথা খারাপ হয়ে উঠ্‌লো তার। তাড়াতাড়ি নিমাইকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে—সে বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে।—সঙ্গীর-ও যেন সেই একই ধাঁধা লেগেছিল,—এখন্‌ ধাঁধা কেটে যেতে ত্রস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো সে,—কি ব্যাপার সর্দার?

'আর ব্যাপার! চল, চল, পালিয়ে চল শীগ্‌গির—নয় মরবি ধরা পড়ে।" —ছুটলো মেষমালী দিক্‌বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে—পিছু পিছু ছুট্‌লো তার সঙ্গী—বুকের মাঝে তখন যেন তাদের ঝড় বইছে।

এদিকে গৃহপ্রাঙ্গণে নেমেই নিমাই দু'চার পা এগিয়ে এসে ডাকলো,—মা, মা!

অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা—অর্দ্ধজ্ঞানহারা শচীদেবীর কর্ণে সেই অতিপরিচিত প্রাণারাম সুমধুর আহ্বান বাজলো সুস্পষ্ট ভাবেই। ঐ একটি ডাকেই কি বিপুল সঞ্জীবনী ছিল,—শচীদেবীর মূর্চ্ছা ভেঙ্গে গেল,—জ্ঞান ফিরে এলো। ধড়মড় করে উঠে—আলথালুবেশেই স্খলিতচরণে বাইরে এলেন তিনি,—"এই যে আমার হারানিধি,—এই যে আমার প্রাণের নিমাই,—চোখের মণি','—আত্মহারা ভাবে ছুটে এসে বুকে তুলে নিলেন তিনি তাকে।—তাঁর দুই বাহু যেন শত বাহু হয়ে চেপে ধরতে চাইলো নিমাইকে।...মাত্র দুই এক ঘণ্টার মধ্যে কত যুগ-যুগান্তর যেন পেরিয়ে গেছে তাঁর।—কোন্‌ সুদূর অজানা দেশ থেকে যেন নিমাই ফিরে এসেছে তাঁর শূন্য বিচ্ছেদাতুর বুকে।...কণ্ঠের ভাষা তাঁর স্তব্ধ হয়ে গেছে,—বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘন ঘন দেখেন তিনি নিমাইয়ের মুখখানি,—আর মাথা থেকে সর্বাঙ্গে পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিয়ে—আপদ-বালাই সবই যে দূর করে দেন তার।

ইতিমধ্যে বিশ্বরূপ এবং লোকনাথও বাইরে থেকে এসে পড়লো,—জগন্নাথও এলেন। বলা বাহুল্য—সকলকেই নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে। কাজেই নিমাইকে শচীদেবীর কোলে দেখে—যুগপৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে স্নেহে এবং আশ্বাসে প্রশ্ন করলেন তাঁরা সমস্বরে—"এই যে এই যে নিমাই,—কোথায় ছিল? ...কে আনলে খুঁজে?" শচীদেবীর মুখে এতক্ষণে কথা ফুটলো। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠেই তিনি বললেন —কাউকে তো খুঁজে আনতে দেখিনি, হঠাৎ ওর "মা"—ডাকে বাইরে এসে দেখি,—একলাই উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে।...ভগবান রক্ষা করেছেন। নয়, এত দয়া আর কার হবে?

জগন্নাথ নিমাইকে শচীর কোল থেকে নিজের কোলে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'বাবা নিমাই,—তুমি কোথায় গিয়ে পড়েছিলে বাবা,— কেমন করে বাড়ী এলে?'

নিমাই শুধু বললে,—"আমি ঐ দূরে রাস্তায় গিয়ে পড়েছিলুম,—দুজন লোক আমাকে কাঁধে করে বাড়ি পেঁাছে দিয়ে গেল,—তারা কে আমি জানি না। কখনো তাদের দেখিনি।"

"বুঝেছি বুঝেছি",—জগন্নাথ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলে উঠ্‌লেন,—"এ ভগবানেরই অপার করুণা।...তারই প্রেরণা-বশে নিমাইকে ওরা বাড়ি পেঁাছে দিয়েছে। নয়, এত বড় শহরের রাস্তার অপরিচিত লোক আমাদের বাড়ি চিন্‌লো কি করে?

সংবাদ পেয়ে পাড়া-পড়শীরাও ছুটে এলেন অপার আনন্দে শচীদেবীর গৃহে।...নিমাইকে দেখে সকলের মনে হলো,—যেন তাদেরও কোন একান্ত আপন হারানিধি ঘরে ফিরেছে।...

এ-দিকে মেষমালী তার সঙ্গীকে নিয়ে একটা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে বসেছে।...দুজনেরই তখন আশ্চর্যের সীমা নেই। তাদের কাছে ব্যাপারটা এখন যেন ভোজবাজির মতই মনে হচ্ছে,—কে তাদের পথ ভুলিয়ে নিয়ে গেল ঠিক ঐ ছেলেটারই বাড়িতে;—ঐ ছেলেটাই কি কোন যাদু জানে না-কি?

মেষমালী বললে তার সঙ্গীকে,—দেখ ভাই, ও ছেলে সামান্যি ছেলে নয়,—ও নিশ্চয়ই দেবতা।...নইলে কি অমন হয়? আর জানিস্ ভাই,—ও যতক্ষণ আমার কাঁধে ছিল,—ততক্ষণ আমার এত ভাল লাগছিল যে,—ওকে কাঁধ থেকে নামাতেই ইচ্ছা হচ্ছিল না।—এই হাত দিয়ে কত খুন—জখমই করেছি,—কিন্তু তোকে সত্যি বলছি,—ওকে মেরে ফেলার ইচ্ছা যখনই করছিলাম,—তখনই যেন প্রাণ আমার কেঁপে উঠ্‌ছিল!

সঙ্গিটি বললে,—আমি তোমাকে বলেইছিলাম সর্দার,—অমন রূপ কি আর যে-সে ছেলের হয়? তোমার ভাগ্যি ভাল,—ওকে এতক্ষণ কাঁধে করেছ।... আমাকে তো একবার দিলে না?

'আবার শুনলি?'—আপনভাবেই মেষমালী বললে,—বাড়ি ঢুকেই হরি-হরি বলে হাততালি দিয়ে উঠ্‌লো। ঐটুকু ছেলে—হরি—হরি বলে হাততালি দেয়। অবাক কান্ড! দেখবি, বড় হলে ও একটা মস্তলোক হবে। তা দেখ, আজ থেকে আমি চুরি-ডাকাতি সব ছাড়লুম,—ভগবানের নাম করে গতর খাটিয়ে খাবো। মরে গেলেও আর কোন মন্দ কাজ করবো না।...ওই ছেলেকে কাঁধে ক'রে অবধি আমার প্রাণটা কি রকম হয়ে গেছে ভাই।

চোখ দুটো ছলছল করে উঠ্‌লো মেষমালীর। সঙ্গিটি বললে, আমারও ঐ এক কথা। অমন ছেলের অনিষ্ট করার কথা যখনই তুমি বলেছ,—তখনই মনে ধিক্কার জন্মে গেছে আমার। আমি আর পাপ পথে যাচ্ছি না।

এমনই আরও সব আলোচনা করতে করতে তারা উঠে পড়লো সেখান থেকে।......

১০

শুধু চঞ্চলই নয়—ক্রমে ক্রমে নিমাই বেশ দুরন্তও হয়ে উঠ্‌তে থাকে।... অবশ্য রীতিমত কড়া নজর রাখার জন্য সে—একবারে যেখানে খুশী পালিয়ে যেতে পারে না,—তবে সুযোগ পেলে—বাড়িতে এমন কি প্রতিবেশীদের বাড়ি গিয়েও নানা উৎপাত করতে সুরু করে। কিন্তু কি এক সহজাত মাধুর্য নিয়ে জন্মেছে সে,—তার মুখের দিকে চাইলে কেউই রূঢ় হতে পারে না তার ওপর। নির্বিচারে সাতখুন মাপ হয়ে যায় তার।

তাকে নিয়ে শচীদেবীর যত আনন্দ—চিন্তাও তার থেকে কিছু কম নয়। আর চিন্তা কি একদিকে?—পাছে নিমাই হঠাৎ কোথাও পালিয়ে যায়,—পাছে সে কারো বাড়িতে গিয়ে উৎপাত করে—এসব তো আছেই,—আবার রাত্রে তাকে কোলের কাছে নিয়ে শুয়েও দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না শচীদেবীর।... সারা রাতই শচীদেবীর মনে হয়, যেন নিমাইয়ের শিয়রে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে,—অথবা চারিদিক থেকে অনেকে ঘিরে রয়েছে তাকে।

শচীদেবীর সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে! ...এ-কি তন্দ্রাঘোরে তিনি ভুল দেখলেন?—ভাবতে থাকেন শচীদেবী,—অথবা এ অলীক স্বপ্ন?—কিম্বা এখনও নিমাইয়ের ওপর অপ-দেতার নজর আছে? ...ভেবে ভেবে কোন কুল-কিনারাই পান না তিনি। পরদিন নিমাইকে ডেকে বলেন,—"আজ থেকে তুমি তোমার বাবার কাছে শোবে।"

ডাগর ডাগর চোখ দুটি মিলে প্রশ্ন করে নিমাই, "কেন মা?" শচীদেবী কিন্তু ভেঙে ফুটে কিছু বলেন না। কি জানি, ছোট ছেলে, হয়ত ভয় খেতে পারে।...তিনি মনগড়া যাহোক-তাহোক কিছু বলে নিমাইকে ভুলিয়ে দেন।

আর একটা ব্যাপারও আজকাল বিস্ময়ের উদ্রেক করে—স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মনে।...নিমাই যখন বাড়ীর মধ্যে এদিক-সেদিক ঘোরা ফেরা করে,—তখন তার পায়ে যেন নূপুরের মধুর বাদ্য বাজে—ঝুম্—ঝুম্—ঝুম্!...কিন্তু পায়ে তো তার নূপুর নেই!...তবে?

জগন্নাথ শচীদেবীর দিকে চেয়ে বলেন,—"এ ছেলের দেহে গোপাল বিরাজ করেন।—নয়, এমন কি হতে পারে?—

কথাটা কিন্তু শচীদেবীর অন্তরে সেরূপ কোন প্রভাবই আনতে পারে না!

মহর্ষি বিশ্বামিত্র এসেছেন মহারাজ দশরথের কাছে।—রাক্ষসদের অত্যাচারে ও'র যজ্ঞ রক্ষা হচ্ছে না। রামকে নিয়ে গিয়ে তাঁর সাহায্যে রাক্ষস বধ করে যজ্ঞ পূর্ণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু দশরথ কথাটা শুনেই চমকে উঠে যেন ভয়ে ভয়েই বললেন,—সে কি মহর্ষি?...রাম যে দুধের ছেলে,— সে কি রাক্ষস নাশ করতে পারে? তার চেয়ে বলুন,—সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমি নিজেই যাচ্ছি।...বিশ্বামিত্র জানেন,—রাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ—ভগবানের অবতার। রাক্ষসবধের জন্যেই তিনি নররূপে অবতীর্ণ। মহর্ষি বশিষ্ঠও রামের ভগবত্তার উল্লেখ করে নিশ্চিন্ত হতে উপদেশ দিচ্ছেন দশরথকে। কিন্তু অপত্য স্নেহ-মুগ্ধ দশরথ কিছুতেই কিছু বুঝতে চাইছেন না।—রাম তো তাঁর কত দুঃখের ছেলে,—সে আবার ভগবান হলো কবে? দশরথের কাছে—রাম ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবানও নয়,—বীরও নয়,—স্নেহের দুলাল মাত্র।—তাই বাৎসল্যের মোহে তাঁর অন্তরে রামের জীবন সম্বন্ধে আশঙ্কা ছাড়া আর কিছুই জাগ্‌ছে না।

শিশু কৃষ্ণ মুখব্যাদন করে যশোদাকে দেখিয়েছিলেন বিশ্বরূপ।...যে রূপ দেখে,—দেবজয়ী মহাবীর অর্জুনও ভয়ে—বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে বলেছিলেন,—

'কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥

হে সহস্রবাহু বিশ্বমূর্তি, তুমি তোমার সৌম্য চতুর্ভুজ মূর্তি আবার ধারণ কর। এই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে—"ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।"—আমার মন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে।—কিন্তু সেই বিশ্বরূপ দেখে বাৎসল্যরসে অভিভূতা জননী যশোদা—করলেন ঠিক তার বিপরীত। তিনি গোপরাজ নন্দকে ডেকে বললেন চিন্তিতভাবেই,—"আমার গোপালের ঠিক কোন অসুখ করেছে,—বৈদ্য ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।"—দুরন্ত কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে বাঁধছেন তিনি, —যত দড়ি আনছেন,—সবই ফুরিয়ে যাচ্ছে।...একবারও মনে জাগছে না,—ঐটুকু ছেলেকে বাঁধতে এত দড়ি কোথায় যাচ্ছে?

বাৎসল্য-মুগ্ধা শচীদেবীরও সেইরূপ কোন ঐশ্বর্যভাবের মোহ জাগলো না মনে,—বরং তিনি চিন্তিত হয়ে বলে উঠ্‌লেন,—যেই বিরাজ করে করুক বাপু,—আমার নিমাইয়ের যেন কোন অকল্যাণ না হয়।...আমার নিমাই—নিমাই হয়েই বেঁচে থাক—আমার কোলে। গোপাল যেখানে আছেন, সেইখানেই থাকুন।

ও-ঘর থেকে নিমাই তখন ডাকছে,—"বাবা, এ-ঘরে এসো,—একলা আমার ভয় পাচ্ছে।"

ব্যস, জগন্নাথেরও গোপাল থাকলেন মাথায়। সে সব চিন্তাও তাঁর ভেসে গেল অপত্যস্নেহের স্রোতে। শশব্যস্তে ও-ঘরে ছুটে গিয়ে বললেন,—ভয় কি —ভয় কি, এই যে আমি কাছেই রয়েছি। গভীর স্নেহে তিনি ঘন ঘন হাত বুলাতে লাগলেন নিমাইয়ের মাথায়।

সন্তান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যিনিই হোন,—মাতাপিতার কাছে—সে সন্তানই।...তার বেশি আর কিছু নয়—কেউ নয়।

নিমাইয়ের জন্মের পর থেকে অলৌকিক যা কিছু দেখছেন শচীদেবী,—কোনটিই বিন্দুমাত্রও 'শান্তভাব' জাগাতে পারে না,—তাঁর মনে।...বাৎসল্যভাব-বিহ্বলাজননী যেন তার প্রত্যেকটিতেই নিমাইয়ের অকল্যাণের ছায়াই দেখ্‌ছেন। তাই নিমাইয়ের মঙ্গলের জন্য কত দেব-দেবীর কাছে মানতেরও তাঁর অন্ত নেই। যদিও নিমাই বেশ সুস্থই আছে,—কোন দিন তার কোন অকল্যাণই ঘটেনি,—তবু শচীদেবীর মাতৃপ্রাণ উদ্বিগ্ন হয়েই আছে তার জন্যে।

আজকাল আবার নিমাইকে নিয়ে তিনি যেন আরও একটু বিব্রত হয়ে উঠেছেন।...বিশ্বরূপ এর আগে বিকালের অনেকটা সময় বাড়ীতে থাকতো,—কারণ টোলে সে সময় তার পড়াশোনা সেরূপ কিছু হতো না। বাড়ীতে থাকলেই সে নিমাইকে নিয়ে খেলাধূলা ক'রে মায়ের কাজের অনেকটা আসান করতো। শচীদেবীও নিমাইয়ের জন্যে নিশ্চিন্ত থাকতেন। কিন্তু এখন বিশ্বরূপ যোগ দিয়েছে অদ্বৈত-সভায়। বয়সে কিশোর হলে কি হবে?... পরমার্থিক সুধারসের জন্য এই বয়সেই তার প্রাণ হয়ে উঠেছিল অস্থির।... শুধু জ্ঞানের চর্চা এবং শাস্ত্রের কচকচিতে তার চিত্ত যেন ঠিক শান্তি পেতো না।—দৈবক্রমে একদিন অদ্বৈতাচার্যের বৈষ্ণব-সভায় গিয়ে—সেখানে প্রেমময় সচ্চিদানন্দের অপার মহিমার আলোচনা শুন্‌তে শুন্‌তে বিভোর হয়ে উঠ্‌লো তার কিশোর প্রাণ। প্রেম-ভক্তির আলোচনা যেন তার অশান্ত চিত্তে প্রবাহিত করলো শান্তির সুস্নিগ্ধ বারিধারা।...তার মনে হলো, যা সে চাইছিল সমগ্র অন্তর দিয়ে,—এতদিনে যেন ঠিক তাই পেয়েছে।

সেই থেকে সকালে টোলের পড়াশোনা শেষ করে বিকেলে গিয়ে বসে থাকতো সে অদ্বৈত-সভায়। অনেক সময় সারাদিনই বসে থাকতো সেখানে। স্নানাহারের কথাও মনে থাকতো না তার। বৈষ্ণবাগ্রণ্য আচার্যের প্রেমধর্মের আলোচনা শুধু সে কানেই শুনতো না,—উপলব্ধি করতো—অন্তরের নিবিড় অনুভূতি দিয়ে। শ্রবণ, দৃষ্টি, মন-হৃদয় সব একাগ্র করে শুনতো সে আচার্যের

অমৃতময় ব্যাখ্যা। আচার্যেরও অন্তরে অপার স্নেহ জেগে উঠেছিল,—প্রেম-ভক্তি-বুভুক্ষু এই কিশোরটির উপর।...

কিন্তু এতে বিকেল বেলাটা সে নিমাই সম্বন্ধে মাকে যেটুকু সময় নিশ্চিন্ত করে রাখতো,—এখন আর তা হতো না। বারবার বলেও শচীদেবী বিশ্বরূপকে ঘরে রাখতে পারতেন না। ফলে প্রায় সারাদিনটাই নিমাইয়ের খবরদারী করতে হতো শচীকেই। তবে রক্ষা এই যে, নিমাই আর পাড়া ছেড়ে বড় একটা কোথাও যেতো না।

তবু শচীদেবী কতই না ভাবতেন তার জন্যে! কিন্তু বাড়ীর মধ্যে অবিরত বন্ধ হয়ে থাকা ক্রীড়াশীল চঞ্চল শিশুর পক্ষে কি সম্ভব?...কঠোর শাসনে সেটাকে সম্ভব করে তোলা হলেও শিশুর স্বভাব-ধর্মেরই ওপর যে তাতে আঘাত পড়ে।—এবং তাতে তার দেহ-মনও যে খারাপ হয়ে উঠবে,—সে বিষয়েই বা সন্দেহ কি? তাই বিকাল বেলাটা নিমাইকে ছেড়ে না দিয়েও উপায় ছিল না শচীর।

কিন্তু পাড়া-পড়শীরা নিমাইকে পেয়ে যেন মজাই পেয়ে যেতেন।...'হরি-হরি' বলে তাঁরা তাকে এমন নাচাতে থাকতেন—যে,—নিমাই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে উঠেছে,—ঘন ঘন আছাড় খাচ্ছে, সর্বাঙ্গে তার দরদর ঘাম ঝরছে, এসব দিকেও লক্ষ্য থাকতো না তাঁদের।...একদিন তো শচীদেবী এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে—হঠাৎ গিয়ে পড়ে সে দৃশ্য দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন,—"হাঁ-গো, হাঁ-গো, করছ কি?"—ব্যাকুল কণ্ঠে বল্লেন তিনি,—ছেলেটার যে কোন বিপদ হয়ে যাবে! ও না হয় হরি নামে পাগল হয়ে যায়,—তা বলে তোমরাও কি একটু বুঝবে না বাছা!

বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এসে নিমাইকে তিনি তুলে নেন কোলে।...পাড়া-পড়শীরাও এতক্ষণে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হন।...নিমাইকে তাঁরা সকলেই ভাল বাসেন,—তাই শচীর কথায় বিন্দুমাত্রও ক্ষোভ জাগে না তাঁদের মনে।

১১

"ওমা, ওমা ছুঁয়ে দিলি আমাকে।"—বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই চমকে উঠে সরে যান শচীদেবী,—'দেখছিস না, চান করে শুদ্ধ কাপড় পরে ঠাকুর দেবতার কাজ করছি। ছিঃ, ছিঃ, তোর কি-একটুও বুদ্ধি শুদ্ধি হবে না রে নিমাই?' বামুনের ঘরের ছেলে,—যত বড় হবি, তত আচার-আচরণ শিখবি,—তা নয় তোর সবই উল্‌টো। '

নিমাই তখন কৌতুকে মুচকি মুচকি হাস্‌ছে।—শচীদেবীর একটু শুচিবাই আছে,—চতুর নিমাই ধরে ফেলেছে সেটি ঠিকই।...তাই সে মায়ের সঙ্গে একটু কৌতুক করবার জন্যে যখন তখন—বিশেষ যখন শুদ্ধাচারে কোন কাজ-কর্ম করেন,—হঠাৎ ছুটে এসে ছুঁয়ে দেয় তাঁকে। শচীদেবী বিব্রত বিরক্ত হয়ে চীৎকার করে উঠলে,—ভারী মজা লাগে তার। মা-অন্ত-প্রাণ নিমাই ইতিমধ্যে কয়েকবারই দেখেছে,—মাকে কোনরকমে রাগিয়ে দিলে—তাঁর আদর ভালবাসা আরও বেশি করে আদায় করা যায়। মার কথার উত্তরে সে উপেক্ষাভরেই বললে,—তা ছুঁয়েছি তো-কি হবে?

'কি হবে?'—মায়ের চোখ দুটি বড় বড় হয়ে ওঠে,—"তোর কি 'জাতধর্ম' কিছু আছে?...কত নোংরা জিনিষই যে ঘেঁটে বেড়াস!...মানুষের ফেলে দেওয়া এঁটো হাঁড়িকুড়ি,—আস্তাকুঁড় কিছু তোর বাদ-বিচার নেই। এতে ঠাকুর দেবতারা খুবই রাগ করেন,—জানিস্‌?"

'কেন, রাগ করবে?'—চোখ ঘুরিয়ে উত্তর দেয় নিমাই—"আমিই কি ঠাকুর-দেবতার চেয়ে কিছু কম নাকি?"

'ওমা',—শচীদেবী—বিস্ময়ে ভয়ে গালে হাত দেন,—ছেলের কথা শোন! বলি, হাঁরে নিমাই,—এমন সব কথা কি বলতেও আছে? ওতে যে অপরাধ হয় বাছা!

নিমাই কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করে না। তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে পরম কৌতুকে। শচীদেবী আর কি করেন? আবার হাত-পা ধুয়ে কাপড়

বদলাতে যান। কিন্তু কাপড় ছেড়ে ফিরে এসে নিমাইয়ের কাণ্ড দেখে তাঁর গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়। নিমাই তখন—গৃহ-বিগ্রহ রঘুনাথের ঘরে ঢুকে—নৈবেদ্যের থালার ঢাকা খুলে সন্দেশ খেতে সুরু করেছে—অখণ্ড তৃপ্তিতে।... নৈবেদ্য তখনও ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়নি।—শচীদেবীর আর সহ্য হয় না। রাগের বশে তিনি ধরতে ছোটেন নিমাইকে—"আজ আর তোকে আস্ত রাখবো না, তুই আমার ধর্মকর্ম সব মাটি করলি! তোকে মুচির ঘরে জন্মাতে হতো,—ভুলে জন্মেছিস তুই বামুনের ঘরে।"

নিমাই কিন্তু এমন দৌড় দেয় যে, তার নাগাল পাওয়া শচীদেবীর সাধ্যেরই বা'র! অথবা নিমাই এমন নোংরা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়,—যার ত্রিসীমানা মাড়াতেও ঘৃণা বোধ করেন শচীদেবী। দূর থেকেই তিনি শাসাতে থাকেন দুরন্ত ছেলেকে।...নিমাই বেশ বোঝে,—শুচিবাইগ্রস্তা জননী ওখানে দাঁড়িয়ে সারাদিন তিরস্কার করলেও একটু এগিয়ে এসে তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবেন না। সুযোগ পেয়ে সে অভ্যস্ত কৌতুকে তেমনি হাসতে থাকে।

একটু পরে—শচীদেবীর রাগ পড়ে গেলে,—তিনি অন্তরে বিশেষ অস্বস্তি বোধ করেন—নিমাইকে তিরস্কার করেছেন বলে। ফলে শেষ পর্যন্ত নিমাই-য়েরই হয় জয়। শচীদেবী নানা মিষ্ট কথায় তাকে ভুলিয়ে ফিরিয়ে আনেন ঘরে।...অবশ্য শুধু মিষ্ট কথাতেই কাজ হয় না,—মিষ্টান্নও দিতে হয় তার হাতে।...

সেদিন হঠাৎ নিমাইয়ের যে কি হলো,—সে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে।...অথচ কেন যে, সে কাঁদছে, তার কিছুই বোঝা যায় না। আজ আর শতবার হরি নাম করলেও নিমাই চুপ করে না; বরং তার কান্না—ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। শচীদেবী তাকে ভোলাবার জন্যে নানা জিনিষ এনে দেন তাঁর হাতে,—প্রগাঢ় স্নেহে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আকুল কণ্ঠে বলেন,—নিমাই, বল তোর কি চাই,—আমি তাই দেব তোকে।...ঘরে না থাকে, যেখানে পাই, সেখান থেকেই এনে দেব।

নিমাই কিছু বলেও না,—চুপও করে না! কেঁদে কেঁদে যেন অজ্ঞান হবার যোগাড়।...অবশেষে মায়ের অনেক আশ্বাস এবং সান্ত্বনার পর সে বললে,—হিরণ্য ভাগবত ও জগদীশের বাড়ীতে—একাদশীর যে নৈবেদ্য আছে,—তা এনে আমাকে খেতে দাও।

'অ্যাঁ—সে কি বাছা!'—বিভীষিকা দেখে যেন শিউরে উঠলেন শচীদেবী,—"ঠাকুরের নৈবেদ্য কি অমন করে খেতে চাইতে আছে? ওতে যে অপরাধ হয়! —ঠাকুরকে নিবেদন করা হোক,—তখন বরং প্রসাদ এনে দেব তোমাকে।...নয়, ঐ সব জিনিষ আমি বাজার থেকে কিনিয়ে এনে দিচ্ছি তোকে।

'না, তা হবে না !'—দৃঢ়তা ফুটে ওঠে নিমাইয়ের কণ্ঠে,—"নিবেদনের আগেই আমাকে ঐ নৈবেদ্য খেতে দিতে হবে। নইলে আমি আজ সারাদিনই কাঁদবো।"

মুস্কিলে পড়লেন শচীদেবী। এ কথা কি কাউকে বলা যায়?...না, এ প্রস্তাবই করা চলে?...লোকে যে তারই গালে চড় মারবে!...তাছাড়া, ছেলের এমন অন্যায় প্রবৃত্তির কথা লোকের কাছে তিনি বলবেনই বা কোন লজ্জায়?

কিন্তু তাঁকে কিছুই বলতে হলো না। কথাটা কোনরকমে গিয়ে উঠ্‌লো—হিরণ্য ভাগবত ও জগদীশের কানে। তাঁরা জগন্নাথেরই প্রতিবেশী দুই ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ। নিমাইয়ের আবদারের কথা শুনেই ছুটে এলেন তাঁরা জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে—যেন রহস্য দেখতে! কিন্তু নিমাইয়ের দিকে চাইতেই সহসা মনে হলো তাঁদের,—তাই তো, এই শিশু আজ একাদশী, জানলো কেমন করে?—পাড়ার লোকের নাম না হয় জানতে পারে। কিন্তু তিথির খবর?—ভাবতে ভাবতে নিমাইয়ের অপরূপ রূপমাধুর্যের মধ্যে ডুবে গেলেন তাঁরা আত্মহারা হয়ে।

সহসা কে যেন তাঁদের অন্তর থেকে বলে উঠলো,—এই সুন্দর পবিত্র দেহে—স্বয়ং গোপাল বিরাজ করছেন, তিনিই চাইছেন—তোমাদের নৈবেদ্য খেতে।... দৈববাণী শুনে মানুষ যেমন চমকিত হয়,—নিজেদের অন্তরবাণী শুনেও তেমনি তাদের সমগ্র চিত্তে এক আনন্দের শিহরণ জাগলো। তাঁরা তন্দণ্ডেই নিজেদের বাড়ীতে ছু'টে এসে—সমস্ত নৈবেদ্য নিয়ে গিয়ে—ধরে দিলেন নিমাইয়ের সম্মুখে—"খাও"—পুলকাবেগেই বললেন তাঁরা,—"তুমি খেলেই গোপালের খাওয়া হবে। তুমিই আমাদের গোপাল।"

নিমাইয়ের মনে আনন্দ যেন আর ধারে না। খুশীতে তার চোখমুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। সে সেই নৈবেদ্য নিয়ে—কিছু নিজে খেলে,—কিছু অন্যকে বিলিয়ে দিলে,—কিছুটা বা গায়ে মাখলে অথবা ছড়িয়ে দিলে। নিমাইয়ের কাণ্ড দেখে—কি-যে ভাব জাগলো ব্রাহ্মণদের মনে,—তাঁদের চোখ ভ'রে উঠলো জলে।

শচীদেবীর মুখে কিন্তু তখন আর কথা নেই। বিস্ময়ে চিন্তায় বুঝিবা হতবাক হ'য়ে গেছেন তিনি। নিমাইয়ের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ভাবছেন,—তাইতো,—সত্যিই কি ছেলেটার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে না-কি?... তা না হ'লে দিনের পর দিন—এমন সব মতি-গতি হবে কেন?

দারুণ সন্দেহ জাগলো শচীদেবীর মনে। তিনি আর স্থির থাকতে না পেরে—তার কনিষ্ঠা ভগিনীকে ডেকে পাঠালেন।...তাঁরও বিয়ে হয়েছিল এখানেই আচার্যরত্ন পরম ভাগবত চন্দ্রশেখরের সঙ্গে। দিদির আহ্বানে তিনি এসে সব শুনে বললেন,—"তাই তো, দিদি, নিমাইয়ের ব্যাপার আমি কিছু বুঝতে পারছি না। অমন সুন্দর ছেলে,—কিন্তু কেন যে এমন স্বভাব হচ্ছে

ভগবান জানেন। তা তুমি পাড়ার আরও দু'একজন "গিন্নীবান্নী"কে ডেকে পাঠাও। দেখি তাঁরা কি বলেন?

শচীদেবী তাই করলেন।...কেউ যুক্তি-পরামর্শ করতে ডেকেছে শুনলে—বিজ্ঞা গৃহিণীরা যথেষ্ট সম্মান এবং আনন্দ বোধ করেন। শচীদেবীর অনুরোধ মত তাঁরা অবিলম্বে এসে উপস্থিত হলেন জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে।

'এসো মা,—এসো।'—পরম আপ্যায়নের সুরেই শচীদেবী অভ্যর্থনা করলেন গৃহিণীদের—বসতে আসন দিলেন তাঁদের সমাদরে; তারপর তুল্‌লেন নিমাইয়ের মতি-গতির কথা। এতদিন নিমাই সম্বন্ধে অনেক কিছু কথা চেপে রাখতেন তিনি। আজ কিন্তু বললেন সবই প্রকাশ করে।—"মাঝে মাঝে নিমাই এ'টো হাতেই ঘরের জিনিষপত্র ছুঁয়ে দেয়; কিছু যদি চেয়েছে, না পেলে আর রক্ষা নেই!—আবার কিছু বলতে গেলে—রাগ করে ঘরের হাঁড়ি কুঁড়ি ভাঙ্‌তে সুরু করে,—তা না হয় করুক,—সে আমার ঘরকথা।—কিন্তু ঠাকুরদের নৈবেদ্য খেতে চাওয়া,—অথবা ঠাকুর-দেবতাকে গ্রাহ্য না করা,—এসব আবার কি?...কি করলে নিমাইয়ের আমার সুমতি হয়,—তোমরা তার যুক্তি দাও।"

বিজ্ঞা গৃহিণীরা কিছুক্ষণ যেন খুবই ভাবলেন,—তার পর ধীরে ধীরে মাথা তুলে বললেন,—এ-সব তো ভাল লক্ষণ নয় মা। শীগ্‌গির এর প্রতিকার করতে হবে।

ঠিক এমন সময় নিমাই এসে দাঁড়ালো তাঁদের সামনে।...জনৈকা গৃহিণী তাকে দেখতেই বলে বসলেন,—'নিমাই তুমি বামুনের ছেলে,—তোমার বাবা মস্ত পণ্ডিত,—সর্বদা শাস্ত্র আর ঠাকুর-দেবতা নিয়েই তাঁর কাজ; কিন্তু তুমি নাকি ঠাকুর দেবতাকে মান না?'

অম্লান বদনে বলে উঠ্‌লো নিমাই একান্ত অবহেলাভরে,—"আমি আবার কোন দেবতাকে মান্‌বো? আমাকেই সবাই মানবে।"

উত্তর শুনে তো সকলে অবাক!...নিমাই বলে কি?...নিশ্চয়ই এর ওপর অপদেবতার ভর হয়েছে পুরোপুরি!...শচীদেবীর মুখ চোখ তখন শুকিয়ে গেছে! ভয়ে ভয়ে তিনি বললেন,—"শুনলে? শুনলে ছেলের কথা? এমন যে কত কথাই শুনি ওর মুখে,—সে আর বলে কাজ নেই। আমার তো ভয়ে-ভাবনায় রাত্রে ঘুম পর্যন্ত হয় না। ও-তো অবোধ,—ওর হয়ে আমিই ঠাকুর-দেবতার কাছে মনে মনে হাজার বার ক্ষমা চাই।"

'এ আর দেখতে হবে কেন বাছা?'—গৃহিণীরা একমত হয়ে এবার মুখ ফুটে বললেন,—"ওর ওপর অপদেবতারই ভর হয়েছে। আগে ভাল করে ষষ্ঠী-দেবীর পুজো দাও,—তিনিই নিমাইয়ের কল্যাণ করবেন। তারপর না হয় মিশ্র-ঠাকুরকে দিয়ে একটি শান্তি-স্বস্ত্যয়নেরও ব্যবস্থা করলেই হবে।

শচীদেবী সর্বান্তঃকরণে তাঁদের পরামর্শ মেনে নিলেন। মনে মনে তখনই তিনি বার বার মাথা নোয়াতে লাগলেন—ষষ্ঠীদেবীর চরণে!

১২

পূজার উপচারাদি নিয়ে তাড়াতাড়ি পথ হাঁটছিলেন শচীদেবী।...সঙ্গে তাঁর পাড়ার কয়েকটি মেয়ে। যাবেন তিনি ষষ্ঠীতলা। কিন্তু পথের বাঁকে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তিনি যেন স্বস্তি পাচ্ছেন না। যেহেতু হঠাৎ যদি নিমাইয়ের নজরে পড়েন,—তবেই বিভ্রাট! হয়ত ষষ্ঠীর নৈবেদ্যই চেয়ে বসবে খেতে। ঠাকুরদের নৈবেদ্য খেতে চাওয়া যেন তার একটা জিদ্ হয়ে দাঁড়িয়েছে।—তা গোচরে, অগোচরে,—জোর করে যে ভাবেই পারে।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয়।—হঠাৎ কোত্থেকে নিমাই এসে দাঁড়ায় সামনে একেবারে পথ আট্‌কে,—"কোথায় যাচ্ছো মা?...ও-কি নিয়ে যাচ্ছো কাপড় ঢাকা দিয়ে?"

দারুণ উদ্বেগে, শচীদেবীর যেন হৃৎকম্পই উপস্থিত হয়—এইরে, আর রক্ষা নেই। একেবারে এসে পড়ছে সামনেই। "না, না, এ কিছু নয় বাবা",—দু' একটা ঢোক গিলে চঞ্চল কণ্ঠেই বলেন, তিনি খুব মিষ্টি করে,—"তুমি ঘরে যাও—আমি শীগ্‌গির আস্‌ছি। ওই ওদের জন্যে কিছু শাক-বেগুন নিয়ে যাচ্ছি,—আমাদের বাড়ীতে হয়েছিল না?—তাই।

'শাক-বেগুন?'—ভ্রূকুটি করে বলে নিমাই,—"কই দেখি মা?"—মায়ের ছলনা বুঝতে পেরেছে নিমাই,—"শাক-বেগুন তো অত করে ঢাকা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছ কেন? আমাকে একবার দেখাও না!"

'তাহলেই সেরেছে!'—মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন শচীদেবী। চতুর নিমাইয়ের কাছে কোন রকম ছলনাই টিক্‌বে না বুঝে—তিনি সত্য কথা বলেই ছেলেকে বোঝাবার চেষ্টা করেন,—"নিমাই, তুমি তো আমার খুব ভাল ছেলে বাবা,—তবে কেন অবুঝের মত কাজ কর। আজ ষষ্ঠী পূজা কি-না,—তাই

এই সামান্য কিছু নৈবেদ্য আর ফুল ইত্যাদি নিয়ে যাচ্ছি ষষ্ঠীতলায়।... তোমারই মঙ্গলের জন্যে আমি যে মানত করেছি বাবা। যাও, তুমি ঘরে যাও, —আমি ফিরে এসে—তোমাকে এই এতো বড় বড় দুটো সন্দেশ দেবো।" হস্ত-সঙ্কেতে তিনি সন্দেশের আকারটাও বুঝিয়ে দেন নিমাইকে লুব্ধ করতে।

নিমাই কি ভুলবার ছেলে?—সে একটু হেসে জবাব দেয়,—"তা ঘরে গিয়ে যা দেবে, তখন দেবে। এখন তো ষষ্ঠীর জন্যে যা নিয়ে যাচ্ছ—দাও।—নইলে তোমাকে যেতে দেবো না ষষ্ঠী তলায়।"

হায়রে, যার মঙ্গলের জন্যে এতকাণ্ড,—সেই কিনা নিজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়!...শচীদেবীর মনের ভেতরটা ছেলের অমঙ্গলাশঙ্কায়—ধক্ ধক্ করে ওঠে। তিনি এবার মৃদু তিরস্কারের সুরেই বলেন,—ছিঃ নিমাই, ও-রকম কথা কি বলতে আছে?—মা ষষ্ঠীর কাছে অপরাধ হবে যে?

'কে মা ষষ্ঠী?'—নিমাই জোর গলায় বলে ওঠে—"ও-ষষ্ঠী-ফষ্ঠী আমি জানি না। আমার মা তো তুমি, আমি তোমাকেই জানি। কি নিয়ে যাচ্ছ, আগে আমায় দাও—ষষ্ঠীকে দিতে হয়—পরে দিও।"

শচীদেবী এবার আতঙ্কে জিভ কেটে বলেন,—ছিঃ,, ছিঃ, ছিঃ, বামুন-পণ্ডিতের ঘরে তুই একটা অকালকুষ্মাণ্ড জন্মেছিস!—লেখাপড়া শিখবি না,—মুখ্যু হয়ে থাক্‌বি,—কেবল খেলাধুলো দুরন্তপনা;—আর নেচে বেড়ানো নয়ত পাড়ার ছেলেদের নিয়ে হৈ-হৈ!—এতে আর বুদ্ধি শুদ্ধি হবে কি করে?

—নিমাইয়ের বয়স এখনও পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়নি। তবে হ্যাঁ—কিছুদিন হলো হাতে খড়ি হয়েছে তার। কিন্তু পড়াশোনায় একদম মন নেই তার,—পড়তে বা লিখতে বললে গায়ে যেন জ্বর আসে। তাই জগন্নাথ কোন কোন দিন রেগে উঠে মারতে যান নিমাইকে। শচীদেবী তাড়াতাড়ি তাঁকে বাধা দেন, —ও-কি, ঐটুকু ছেলেকে কেউ আবার মারতে যায় না-কি? তোমার ভয়েই তো ওর চোখ মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে!...ওর কি আর লেখাপড়ায় মন দেবার বয়স হয়েছে?—দুধের ছেলে!...সময়ে আপনার থেকেই পড়তে বস্‌বে।

জগন্নাথ নিরস্ত হন। কিন্তু শচীদেবীর দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন, —"তুমিই তো বেশি আদর দিয়ে ওর মাথা খাচ্ছ!"—কিন্তু পরক্ষণেই নিমাইয়ের ভয়ার্ত্ত মুখের দিকে চেয়ে তাঁর চিত্ত দুর্বল হয়ে যায় স্নেহের আবেগে। তিনি তাড়াতাড়ি নিমাইকে বুকে নিয়ে বলেন,—এবার থেকে দাদার মত মন দিয়ে লেখাপড়া করবে,—কেমন?

পিতার ভয়ে নিমাই তখনকার মত অগত্যাই বলে,—হুঁ।...কিন্তু ঐ পর্যন্তই; সে 'হুঁ' আর কোনদিন সত্য হয় না।

আজ কিন্তু নিমাইয়ের ওপর ভারী চটে গেছেন শচীদেবী!—মাগো, ডাকাত

ছেলের কথা শুনে গায়ে যে কাঁটা দিয়ে আসে!...তিনি জোর করে নিমাইয়ের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে চান। নিমাই কিন্তু না-ছোড়বান্দা। ষষ্ঠীর জন্যে খৈ-কলা—সন্দেশ যা নিয়ে যাচ্ছ,—সব দিতে হবে। নইলে রইলো তোমার ষষ্ঠী পুজো এইখানেই।...আমি খেলেই তোমার ষষ্ঠী মা খুশী হবে। তার পেট ভরে যাবে।

'শুন্‌ছো, শুন্‌ছো?'—সঙ্গের মেয়েদের দিকে চেয়ে বলেন শচীদেবী,—ছেলের কথা শুন্‌ছো! বলে কিনা, "ও খেলেই ষষ্ঠীর খাওয়া হবে।"—পরে ষষ্ঠীর উদ্দেশে হাতযোড় করে বলেন,—"হে মা ষষ্ঠী, অবুঝ ছেলের অপরাধ নিয়ো না মা!...ওর মতিগতি ভাল করে দাও।"

জনৈকা সঙ্গিণী বলেন ঈষৎ শ্লেষভরে হেসে,—ওগো নিমাইয়ের মা, তোমরা ছেলের নাম রেখেছো বিশ্বম্ভর।...তা' ও বিশ্বম্ভরই বটে বাপু!...গোটা বিশ্ব খেলেও ওর বুঝি পেট ভরবে না।...আমরা তোমাকে এতদিন কিছু বলিনি,—পাছে তোমরা দুঃখ পাও। আর নিমাইয়ের মুখের দিকে চাইলেও বলতে ইচ্ছা হয় না,—তাই চুপ করে থাকি।...কি যে আছে তোমার নিমাইয়ের মুখে!... নইলে গুণের ওর অন্ত নেই। পাড়ার হেন বাড়ী নেই,—যেখানে তোমার নিমাই হঠাৎ কোন সময় ঢুকে কিছু চুরি করে না খেয়ে আসে।...তা দুধ সন্দেশ-কলা বাতাসা—নাড়ু যাই কিছু পাক না সামনে।...ও-যেন বৃন্দাবনের সেই ননীচোরা গোপাল হয়ে বসেছে।

কথা শেষ করেই মহিলাটি হেসে ওঠেন রঙ্গভরে,—কিন্তু তার কথাগুলি যেন শেল বিঁধলো শচীদেবীর বুকে!...নিমাইকে খাইয়ে তাঁর যেন সাধ মিটতে চায় না;—তাই নিমাই যখন যা খেতে চায়,—যে জিনিষ সে ভালবাসে,—শচীদেবী তাই তুলে দেন তাঁর হাতে। তাতে তাঁর কত তৃপ্তি—কতই না আনন্দ!...সেই নিমাই আবার যায় পরের বাড়ী চুরি করে খেতে!...যার জন্যে তাঁকে আজ এইসব কথা শুনতে হলো!

মনটা খুবই অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে শচীদেবীর। কিন্তু তখন আর সে প্রসঙ্গে কোন কথাই বলেন না নিমাইকে। ওপাশ থেকে সঙ্গিনীটি আবার বলে ওঠেন, —"তা দাও, দাও, কিছু দাও নিমাইয়ের হাতে। শিশু নারায়ণ! তাতে মা ষষ্ঠী কোন অপরাধ নেবেন না।...না-দিলেও তো ও ছাড়বে না।"

তা বটে!...শচীদেবী মনে মনে কি বুঝে—একটি সন্দেশ তুলে দেন নিমাইয়ের হাতে।...নিমাই তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে পথ ছেড়ে চলে যায় বাড়ীর দিকে। ষষ্ঠীতলায় গিয়ে বারবার দেবীর উদ্দেশে মাথা ঠুকে—নিমাইয়ের অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাইলেন শচীদেবী। যুগপৎ ভক্তি ও স্নেহের তাপে তাঁর অন্তর্বেদনা বিগলিত হয়ে ঝরে পড়লো অশ্রুরূপে।

১৩

কখন দুপুর বেলা গড়িয়ে গেছে,—অথচ বিশ্বরূপের যেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছু নেই।...ঘণ্টার পর ঘণ্টা অদ্বৈত-সভায় বসে আছে সে।—জগৎ সংসার ভুলে শুন্ছে আচার্যের প্রেম ও ভক্তি ধর্মের ব্যাখ্যা।...এদিকে শচীদেবী ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন তার জন্যে,—আপন মনেই তিনি বলছেন,—তার ঐ এক ছেলে হয়েছে। এই বয়সেই যেন বিরাগী হয়ে উঠ্লো। এখন কোথা পড়াশোনা করে—দুটো আমোদ-আহ্লাদ করবি,—নিমাইকে নিয়ে একটু পড়াতে বসবি,— দুটো ভালমন্দ খাবি,— তা নয়, কেবল টোল—আর—বৈষ্ণব সভায় গিয়ে বসে থাকা।...ও সবের তো বয়েস আছে রে বাপু,—এই বয়সে কি ও-সব সাজে?

দাদা যে এখনও ভাত খায়নি,—নিমাই তা' জানতো। এর আগে সে-ও দু'তিনবার খবর নিয়েছে দাদারণ...দাদার ওপর তার অগাধ ভক্তি,—আর দাদারও অসীম স্নেহ ছোট ভাইটির ওপর।...মাকে দুঃখ করতে শুনেই নিমাই বলে উঠলো,—আমি যাবো মা,—ডেকে আনবো দাদাকে?

ষষ্ঠী পূজার পর নিমাইয়ের কল্যাণে শান্তি-স্বস্ত্যয়নও করিয়েছিলেন শচীদেবী। নিমাই কিন্তু শোধরায়নি। "অপদেবতার প্রভাব" তার ওপর তেমনই রয়ে গেছে। তাই শচীদেবী তাকে বড় বিশ্বাস করতেন না।...কি জানি সে কি করতে গিয়ে কি করে বসবে! কিন্তু বিশ্বরূপের জন্যে তিনি বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন; তাই অগত্যা বললেন,—"পারবি?—না, তুইও গিয়ে কোথাও খেলায় মাতবি?" 'না—মা!'—নিমাই বেশ সুবোধ ছেলের মতই জবাব দিলে,—"এই এক দৌড়ে যাব, আর আসবো।...দাদা যে এখনও খায়নি মা,— আমি কি—সেটা ভুলে যাব না কি?"

এই সামান্য কথায় দাদার ওপর নিমাইয়ের যে দরদ ঝরে পড়লো,—না শচীদেবীরও অন্তর স্পর্শ করলো নিবিড় ভাবে।...দু'ভায়ের এই স্নেহ-প্রীতি তাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মনে জাগিয়ে তোলে এক স্বর্গীয় সুখ—নির্মল

আনন্দ। সানন্দেই আদেশ করলেন শচীদেবী,—"তাই যা তো বাছা, ডেকে আন। নইলে কি তার আর হুঁস হবে?"

কথা শেষ হতে না হতেই নিমাই গিয়ে পড়লো একেবারে রাস্তায়।.... অদ্বৈতসভা অবশ্য খুব দূরে ছিল না। নিমাই অবিলম্বে সেখানে উপস্থিত হয়ে ডাকলো বিশ্বরূপকে,—"দাদা, দাদা, তোমার কি ক্ষিদে লাগে না।...শীগ্‌গির এসো; মা ভাত বেড়ে বসে আছে। নিজেও খায়নি।"

স্নেহের ভাইটির আহ্বানে সহসা চমক ভাঙ্গলো বিশ্বরূপের।

—"কে রে নিমাই!"—প্রীতি-উচ্ছল কণ্ঠে মৃদু হেসে বললে সে,"—তুই ডাকতে এসেছিস।...তাহলে তো কাজের লোক হয়ে গেছিস তুই। আচ্ছা চল, —আমি যাচ্ছি একটু পরেই॥

"না—এক্ষুনি এসো,"—দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিলে নিমাই,—আমার সঙ্গেই তোমাকে আসতে হবে। নাও, নাও ওঠ। মা ভাবছে

"বাপু, ডেকে আনতে বললে তুই দেখছি বেঁধে নিয়ে যাবি!"—কৌতুকে বিশ্বরূপের কণ্ঠ তরল হয়ে উঠ্‌লো,—পরে আচার্যকে প্রণাম করে—তাঁর মৌন-সম্মতি নিয়ে—উঠে পড়লো সে।

এ-দিকে অদ্বৈতাচার্য তখন যেন অভিভূত হয়েই ভাবছেন নিমাইয়ের কথা। অনেকের মুখে এমন কি নিজের সহধর্ম্মিণী সীতাদেবীর মুখেও ইতিপূর্বে অনেক কথাই শুনেছেন তিনি নিমাই সম্বন্ধে। তার জন্মের সময়েও এক অজানা আনন্দে তাঁর প্রাণ নেচে উঠেছিল বটে,—কিন্তু সে ছিল এক পুণ্য-মুহূর্তের অজ্ঞাত প্রভাব। তার কথা স্মরণ থাকবার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু চোখে তো তাকে কখনো দেখেননি! আজ প্রথম দেখতেই তাঁর মনে নানা প্রশ্ন উঠ্‌তে লাগলো।...ছেলেটি এমন করে আমার চিত্তকে আকর্ষণ করছে কেন? একে দেখে ভাগবত ভাবই বা জাগে কেন অন্তরের মধ্যে?...এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন এক অপার্থিব জ্যোতিঃ; চোখে মুখে যেন এক পরম প্রশান্তি,—এ যেন আমার একান্ত আপনার জন।—এই গৌর-সুন্দর শিশুকে দেখে মনে পড়ে যেন সেই শ্যাম-সুন্দরের কথা।...কেন?...কেন?

আচার্য ভাবতেই লাগলেন বসে বসে নিমাইয়ের কথা

—বাড়ীর পথে দাদার হাত ধরে ধীরে ধীরে চলছিল নিমাই। বিশ্বরূপের স্পর্শেও সে যেন আনন্দলাভ করে। পক্ষান্তরে বিশ্বরূপের প্রাণেও জাগে ঠিক সেই একই আনন্দের শিহরণ।...সহসা বিশ্বরূপ প্রশ্ন করলো মৃদু কণ্ঠে,—হাঁ-রে নিমাই?

'উঁ'!—দৃষ্টি তুলে চাইলো নিমাই দাদার মুখের দিকে। বিশ্বরূপ বললে, —মায়ের কাছে শুনলুম, তুই নাকি পরের বাড়ীতে গিয়ে এটা-ওটা চুরি ক'রে

খেয়ে আসিস্?—স্নেহের সঙ্গে যেন কিসের একটা ব্যথাও জড়িয়ে রয়েছে তার স্বরে,—"কেন, তা করিস ভাই?...তোর যা খেতে সাধ যায়,—তুই আমাকে বলবি,—ঘরে না থাকে—মা তোকে দিতে না পারেন,—আমি এনে দেব যেখান থেকে হোক্।...লোকে তোর নিন্দে করবে,—শুনিয়ে শুনিয়ে পাঁচ কথা বলবে মা'কে,—মা চোখের জল ফেলবেন,—এ-টা কি ভাল?...না, আমাদের সহ্য হয়?

'বাস্তবিক নিমাই সম্বন্ধে কোন বক্রোক্তি সহ্য হয় না বিশ্বরূপের।...সে ভাবে,—নিমাইয়ের মত এমন সুন্দর ছেলে ক'টা হয়?...ও-যে সত্যিই দেবশিশু। ...পৃথিবীর অনির্মল বাতাস লেগে পাছে ও ম্লান হয়ে যায়!...লোকে ও-কে ঠিক বোঝে না,—তাই পাঁচ কথা বলে! এই রূপ—এই অম্লান সৌন্দর্য—শিশুচিত্তের এই হরিনামোন্মত্ততা,—আত্মপর ভেদ-হীন এই সারল্য,—এমন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল—নীরোগ সুঠাম দেহ,—এ-কি ধরণীর ধূলার বস্তু?...

আবার পাঁচ বছরের সুকুমার শিশু নিমাইও ভাবে,—বিশ্বরূপের মত এমন দাদা—আর কার আছে? এইতো এত ছেলেমেয়ের সঙ্গে সে খেলাধুলো করছে,—কই, কারো তো—এমন দাদা নেই। যতই দুরন্ত হোক নিমাই,—দাদার কাছে সব সময় শান্ত-শিষ্ট—একান্ত অনুগত। বাপকে যদিই বা নিমাই একটু ভয় করে,—মা'কে তো তার মোটেই ভয় নেই,—কিন্তু দাদার অবাধ্য সে হ'তে চায় না। দাদার প্রতি তার ভক্তিও যত—আনুগত্যও তত।...অনেকদিন ভাত খেতে চায় না নিমাই—শচীদেবীকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে—তাকে এক একটি গ্রাস মুখে দেওয়াতে হয়। কিন্তু বিশ্বরূপ তাকে নিয়ে খেতে বসলে,—নিমাই —না-কি দ্বিগুণই ভাত খেয়ে ফেলে।—তবে একথাও অবশ্য ঠিক যে, মা'কে তার ভয় না থাকলেও—মায়ের প্রতি মমতা তার গভীর।...যে কোন কারণেই হোক শচীদেবীর চোখে জল দেখলে সে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে।...মায়ের ওপর দরদ ফুটে ওঠে তার প্রতিটি কথায়।

দাদার জিজ্ঞাস্যের উত্তরে—নিমাই সহসা কিছু বলতে পারলো না।...বিশ্বরূপের স্নেহার্দ্র বেদনার্ত কণ্ঠে সেও যেন ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।... বিশ্বরূপ আবার জিজ্ঞাসা করলো,—"কি-রে, কই কিছু বলছিস না যে?—আর যাবি পরের বাড়ী চুরি করে খেতে?"

'না।'—প্রচুর দৃঢ়তার সহিত এবার উত্তর দিলে নিমাই,—"আর যাবো না দাদা।"

আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠলো বিশ্বরূপ। আকুল স্নেহে ভাইটিকে কোলে তুলে নিয়ে বারবার তার মুখচুম্বন করতে লাগলো প্রগাঢ় প্রীতিভরে।...

১৪

এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ এসে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে।...ব্রাহ্মণ পরম কৃষ্ণভক্ত,—বালগোপালের উপাসক।...উপাস্যের প্রতীক এক শালগ্রাম শিলা কণ্ঠদেশে ধারণ করেই ঘুরে বেড়ান তিনি—দেশের নানা তীর্থস্থানে। তীর্থভ্রমণই তাঁর জীবনের কাজ। মুখে অবিরতই কৃষ্ণনাম জপ করছেন। অন্তরের প্রগাঢ় ভগবৎ-প্রেম—তাঁর চোখেমুখেও প্রতিফলিত করেছে একটি দিব্যজ্যোতিঃ,—এক পরম প্রশান্তির স্নিগ্ধ সৌকুমার্য্য!

ব্রাহ্মণ কিন্তু অন্যের হাতে পাক-করা কোন আহার্যই গ্রহণ করেন না। স্বপাক অন্ন আগে পবিত্র মনে তাঁর উপাস্যের উদ্দেশে নিবেদন করে,—পরে প্রসাদ গ্রহণ করেন।...জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবী সানন্দে এবং নিষ্ঠাভরেই রন্ধনের যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে দিয়েছেন তাঁকে।...রন্ধনের জায়গাটিও গোবর-গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছেন।...বিশেষ প্রীত হয়েছেন ব্রাহ্মণ—গৃহস্থের সাদর আপ্যায়নে—তাঁদের ঐকান্তিক আতিথেয়তায়।

রন্ধনাদি শেষ হলে ব্রাহ্মণ সযত্নে ভোগ সাজিয়ে তাঁর উপাস্য বালগোপালকে নিবেদন করতে বসলেন। একাগ্রচিত্তে তিনি স্মরণ করছেন তাঁর ঠাকুরকে,—এমন সময় কোত্থেকে হঠাৎ নিমাই এসে—ভোগ থেকে একগ্রাস অন্ন তুলেই দিলে তার নিজের মুখে।...হাঁ—হাঁ—করে উঠলেন ব্রাহ্মণ।...“কি হলো, কি হলো?”—বলে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন জগন্নাথ,—পিছু-পিছু এলেন শচীদেবী।...নিমাইয়ের হাতে মুখে তখন ভাত।...মুহূর্তে চোখ মুখ শুকিয়ে গেল স্বামী-স্ত্রীর।

নিমাইয়ের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে জগন্নাথ দারুণ ক্ষোভে বললেন,—ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কি করলি হতভাগা? যত বয়স বাড়ছে,—ততই তুই গোঁয়ার হচ্ছিস!—শচীর দিকে চেয়ে বললেন,—“দেখ তোমার আদুরে ছেলের কাণ্ড!...ক্ষুধার্ত অতিথি ব্রাহ্মণ—বেলা প্রায় দুপুর,—কত কষ্টে এতক্ষণ ধরে রান্নাবান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দিচ্ছেন,—প্রসাদ পাবেন বলে; কিন্তু সব পণ্ড করে দিলে—

ঐ সৃষ্টিছাড়া ছেলে!—বলতে বলতে তিনি রুক্ষ হয়ে উঠলেন,—"দূর হ' হত-ভাগা,"—সরোষে নিমাইয়ের দিকে অগ্রসর হয়ে ধরতে গেলেন তাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্যস্তভাবে উঠে তাঁকে বাধা দিলেন,—না, না, মিশ্রমশায়, ওর ওপর রাগ করবেন না; চার-পাঁচ বছরের শিশু—ওর কি জ্ঞান আছে?...ওকে শাসন করে কি লাভ? না, না, কিছু বলবেন না ওকে।

সহসা নিমাইয়ের মুখের দিকে ভাল করে তাকাতেই দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে গেল তাঁর, কি-এক গভীর স্নেহ-প্রীতিও জেগে উঠলো তাঁর মনে,—বললেন,—আহা, এমন চাঁদের মত মুখে কি কান্না মানায় মিশ্রমশায়। ছেড়ে দিন,—যা হয়ে গেছে।

শচীদেবীর কাছে তো নিমাইয়ের সাতখুনই মাপ।...দৈবাৎ নিমাইকে তিরস্কার করে ফেললে—সেদিন তাঁর অন্তরে যেন আর সোয়াস্তি থাকে না। ছেলেমানুষ না বুঝে যখন করেই ফেলেছে,—তখন আর বকেঝকে লাভ কি? সবিনয়ে ব্রাহ্মণকে বললেন তিনি,—"তাহলে আমি আবার ভোগের আয়োজন করে দিই; দয়া করে আপনি আর একটু কষ্ট করুন। তা'নাহলে আপনার ঠাকুর—এবং আপনিও উপবাসী থাকবেন। গৃহস্থের পক্ষে তার চেয়ে যে আর অমঙ্গল নেই!"

তা'বটে!—ব্রাহ্মণ ভাবলেন,—তিনি অতিথি; এ'দেরও আতিথেয়তার ত্রুটি নেই,—এক্ষেত্রে তিনি যদি তা না করেন,—গৃহস্থের গৃহ-ধর্মকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। ...কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করে—বরং সাগ্রহেই তিনি উত্তর দিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে মা, আপনি দিন যোগাড় করে।

এতক্ষণে জগন্নাথ প্রাণে যেন কিছু সান্ত্বনা পেলেন,—শচীদেবীরও মনের গ্লানি সরে গেল দূরে।...অবিলম্বে তিনি আবার সবই যোগাড় করে দিলেন পূর্বের মতই। ব্রাহ্মণ আবার রাঁধলেন যত্ন করে।—জগন্নাথ পত্নীকে বললেন,—এবার নিমাইয়ের ওপর একটু লক্ষ্য রাখবে,—হঠাৎ যেন আবার এসে কিছু একটা না করে বসে।

শচীদেবী উত্তর দিলেন,—নিমাই বাড়ীতে নেই,—পাশের বাড়ী খেলা করতে গেছে।—নিশ্চিন্ত হলেন জগন্নাথ।

কিন্তু কি আশ্চর্য,—ব্রাহ্মণ আবার যেমনি ভোগ নিবেদন করতে বসেছেন তাঁর উপাস্য দেবতাকে, অমনি নিমাই বুঝিবা সকলের অলক্ষিতেই হঠাৎ এসে পড়লো সেখানে, আর এসেই ভোগের থালার দিকে হাত বাড়ালে।

হাঁ—হাঁ—হাঁ। থাম,—থাম, থাম। ব্রাহ্মণ আবার ব্যগ্রভাবে বাধা দিতে গেলেন; কিন্তু ততক্ষণে হয়ে গেছে,—নিমাই একমুঠো ভাত তুলে পুরে দিয়েছে নিজের মুখে।

নাঃ, আজ আর আমার ঠাকুরের ভোগ হলো না,—সখেদে বলে ওঠেন ব্রাহ্মণ, —আর আমার কপালেও তিনি আজ অন্ন লেখেননি।

ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন জগন্নাথ। ব্রাহ্মণের খেদোক্তি শুনে চমকে ওঠেন তিনি,—"কি হলো, কি হলো? আবার কি হলো।"—বলতে বলতে এগিয়ে এসে দেখেন,—সেই এক ব্যাপার। এবার মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো পুরন্দর মিশ্রের। 'আজ আর ওকে আস্ত রাখবো না।'—সামনের লাঠিগাছটা তুলে নিয়েই তিনি ছুটে গেলেন নিমাইয়ের দিকে—"আমার ধর্ম-কর্ম সব মাটি করলে ও,—বামুনের ঘরে একটা গাছের বাঁদর জন্মেছে।"

স্বামীর প্রচন্ড মূর্তি দেখে শচীদেবী বাধা দিতে সাহস করলেন না তাঁকে ঃ কিন্তু অতিথি ব্রাহ্মণ জোর করে কেড়ে নিলেন লাঠিখানা তাঁর হাত থেকে,—"আপনি জ্ঞানী পন্ডিত মানুষ, আপনার কি অবোধ শিশুর ওপর—এই রাগ সাজে?...ওকে মারলে—এ লাঠির আঘাত যে আমার বুকেই বাজবে!...আহা, দেখুন না, ফুলের মত মুখটি ভয়ে শুকিয়ে গেছে!...আপনি শান্ত হোন। আমার ঠাকুর আজ আমার কপালে অন্ন লেখেননি তো পাবো কোথায়?... নইলে দু'দুবারই কি—এমনি হয়।...এ সেই ঠাকুরেরই লীলা!

—"তবে কি আপনি আমার বাড়ীতে এসে অভুক্ত থাকবেন?" দারুণ ক্ষোভের সুরই এবার বেজে উঠলো জগন্নাথের কণ্ঠে,—'তাহলে ঠাকুর শুধু আপনারই নয়,—আমাদের কপালেও আজ অন্ন লেখেননি। আপনাকে অভুক্ত রেখে কি আমরা খেতে পারি প্রভু!'

'না, না, অভুক্ত থাকবো কেন?'—ব্রাহ্মণ ব্যগ্রকণ্ঠেই বললেন,—স্বরে তাঁর অভিমান বা খেদের লেশমাত্র নেই,—"আপনারাই বা না খেয়ে থাকবেন কি কারণে?—আমাকে বাড়ীতে ফলমূল যা আছে দিন,—আমি তাই ঠাকুরকে নিবেদন করে দিয়ে প্রসাদ পাই।"

উপায় কি?—আর কি রান্না করার সময় আছে? মধ্যাহ্ন গড়িয়ে বিকেল হতে চললো,—জগন্নাথের নির্দেশমত শচীদেবী দুধ, কলা, সন্দেশ, পাকা পেঁপে ইত্যাদি যা ঘরে ছিল,—তাই যোগাড় করে দিলেন—ব্রাহ্মণের জলযোগের জন্যে। কিন্তু হঠাৎ এমন সময় বিশ্বরূপ টোল থেকে এসে পড়লো বাড়ীতে।...অতিথি ব্রাহ্মণকে দেখেই সর্বাগ্রে সে প্রণাম করলো তাঁকে পরম ভক্তিভরে।

'এ-টি কে?'—ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন জগন্নাথকে। "আমারই বড় ছেলে।" —উত্তর দেবার সময় জগন্নাথের অন্তর দুলে উঠলো আনন্দে এবং গৌরবে।

ব্রাহ্মণ তখন স্থিরনেত্রে চেয়ে আছেন বিশ্বরূপের মুখের দিকে,—দৃষ্টি তাঁর বিমুগ্ধ—বিহ্বল।—পঞ্চদশ বর্ষীয় কিশোরের চোখে মুখে তিনি দেখলেন এক অসামান্য প্রতিভার দীপ্তি,—এক মীমাংসিত পরম প্রশ্নের সুদিব্য ছায়া,—

এক অপার্থিব ভাব-হিল্লোল।—"আপনি ভাগ্যবান,"—বললেন তিনি মিশ্র-মশায়কে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে,—"তাই এমন সুপুত্র লাভ করেছেন,—আমি বহু স্থান ঘুরেছি,—কিন্তু এমন একটি উজ্জ্বল রত্ন কোনদিন পড়েনি আমার চোখে।... আপনার কনিষ্ঠ পুত্রও—এখন কিছুটা বাল্যচাপল্য থাকলেও—ভবিষ্যতে জ্যেষ্ঠেরই অনুরূপ হবে।...শ্রীকৃষ্ণ আপনার পুত্রদের কল্যাণ করুন।"

কৃতার্থম্মন্য জগন্নাথের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেলো আনন্দের আবেগে। এরপর বিশ্বরূপ কিন্তু অতিথির ভোজন বিভ্রাটের কথা শুনে বিশেষ দুঃখিত হলোঃ ব্রাহ্মণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলো,আবার একবার রন্ধন করতে,—কেননা, সামান্য জলযোগ করে তিনি দিন কাটাবেন,—এটা বিশ্বরূপ কোন রকমেই মেনে নিতে পারলো না অন্তর দিয়ে। কোনরূপ ওজর-আপত্তি না শুনে সে নিজেই তখন যোগাড় করে দিলে—সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

বিশ্বরূপকে দেখে ব্রাহ্মণ অভিভূত,—কাজেই তার অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না তিনি।...আবার যথারীতি রন্ধনাদি করে দেবতার উদ্দেশে ভোগ দিতে বসলেন। ...কিন্তু কোথায় ছিল নিমাই,—ঠিক সময়েই আবার এসে একান্ত সহজভাবেই হাত দিয়ে বসলো ভোগের থালায়। ব্রাহ্মণ আবার উঠলেন হাঁ—হাঁ—করে,—কিন্তু এবার নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকাতেই—তিনি নিমেষে তড়িত-স্পর্শের মতই চমকে উঠলেন, অ্যাঁ—অ্যাঁ, এ কি—এ কি ?...কে—এ ?—কে—এ ? অপার বিস্ময়ে স্তব্ধ-নিথর হয়ে গেলেন তিনি; সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ উপস্থিত হলো তাঁর —এক অননুভূত আনন্দের শিহরণ জেগে উঠলো বুকে,—এই তো—এই তো তাঁরই প্রাণের ঠাকুর বালগোপাল!...তবে কি—তবে কি—ঠাকুর স্বয়ং এসে এ দীন ভক্তের নিবেদিত ভোগ বারবার আস্বাদ করেছেন, ভ্রান্ত আমি, বুঝতে পারিনি তাঁর লীলার রহস্য ?—তবে কি এই সুঠাম-সুন্দর-চপল শিশুই—না, তিনি আর ভাবতে পারলেন না,—ধীরে ধীরে তাঁর মাথা নুয়ে পড়লো মাটিতে, —কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ" ॥

নিমাই অবশ্য তখন কখন অন্তর্হিত হয়ে গেছে সেখান থেকে।

ব্রাহ্মণ কিন্তু সে কথা আর কারো কাছে প্রকাশ করলেন না; মন তখন তাঁর এক অপার্থিব মধুর রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে,—সমগ্র জীবনের একাগ্র সাধনা-লব্ধ ফল—আজ যেন প্রত্যক্ষ হয়ে তাঁর জন্ম ও জীবনকে ধন্য করেছে—অপার সার্থকতায়। মহা-আনন্দে তিনি নিমাইয়ের উচ্ছিষ্ট সেই অন্ন গ্রহণ করলেন পরম তৃপ্তিভরে।...জগন্নাথ ও বিশ্বরূপ তাঁর আহারের সংবাদ নিতে এলে

তিনি বললেন,—আজ তিনি অন্ন নয়,—"পরমান্নই" ভোজন করেছেন, আহারের এত তৃপ্তি জীবনে তিনি আর কোনদিনই পাননি।

—এরপর তিনি বিদায় নিলেন জগন্নাথ মিশ্রের কাছ থেকে। কিন্তু কোথাও গেলেন না নবদ্বীপ ছেড়ে। গঙ্গার তীরে কুটির বেঁধে বাস করতে লাগলেন একান্ত দীনভাবে—নিতান্ত অকিঞ্চনের মত।...মাঝে মাঝে গোপনে এসে দেখে যেতে লাগলেন নিমাইকে—কিন্তু সে রহস্য ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দিলেন না কাউকে।

সশিষ্য রাজপথ দিয়ে যাচ্ছেন মুরারি গুপ্ত। বিংশবর্ষীয় প্রিয়দর্শন তরুণ যুবক,—জাতিতে বৈদ্য। এই বয়সেই নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সুপণ্ডিত বলে খ্যাতিলাভ করেছেন নবদ্বীপে।—চরিত্র উদার—অকপট এবং নিষ্কলুষ। দয়া-মায়াও আছে প্রাণে। জাতীয় বৃত্তি কবিরাজীতেও কিছু কিছু দখল আছে। কিন্তু ঘোর অদ্বৈতবাদী। ভগবান স্বীকার করেন বটে,—কিন্তু তাঁর সঙ্গে অভেদ মনে করেন নিজেকে,—অর্থাৎ 'সোঽহং' মতের পরিপোষক। তাই ভগবদ্ভক্তি বা প্রেম এসব মানেন না একেবারে। বৈষ্ণবদের নাম-সংকীর্তনেও তাঁর শ্রদ্ধা নেই,—বরং উপেক্ষার ভাবই আছে।—মোটের ওপর একটু পণ্ডিত-ম্মন্য ব্যক্তি।

পূর্বনিবাস ছিল তাঁর শ্রীহট্টে—বর্তমান নবদ্বীপেই—জগন্নাথ মিশ্রেরই প্রতিবেশী;—বিশেষ সম্মানের চক্ষেই দেখেন তিনি জগন্নাথকে। কিন্তু কি জানি কেন,—পাঁচ বছরের শিশু নিমাই তাঁর ওপর বিশেষ প্রসন্ন নয়।...মানুষের মতবাদও যেমন—চাল-চলনও কতকটা সেইরূপই হয়। মুরারির চাল-চলন অথবা কথাবার্তা শিশু নিমাইয়ের অন্তরে তাঁর প্রতি বিরাগ সঞ্চার করতো কি-না,—সে কথা বলাও শক্ত।

রাস্তা দিয়ে চলেছেন মুরারি—যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করতে করতে,—শিষ্যেরা শুনে যাচ্ছে নীরবে,—মাঝে মাঝে—দুর্বোধ্য মনে হলে দু'একটা প্রশ্ন করছে তারা।...ব্যাখ্যা করতে করতে ঘন ঘন নানা ভঙ্গীতে মাথা নাড়ছেন মুরারি,—হাতও নাড়ছেন রকমারি ভঙ্গীতে; চোখের তারাও ঘুরছে—যেন ব্যাখ্যার তালে তালে। এ ধরণের আড়ম্বরপূর্ণ অঙ্গ-সঞ্চালন অনেক সময় উপহাসেরই উদ্রেক করে দর্শকের মনে।

পিছু পিছু আসছিল নিমাই—তার সমবয়সী কয়েকটি ছেলের সঙ্গে,—সেই যেন ছেলের দলের সর্দার। ছেলেরাও তার সর্দারী মেনে নিয়েছে নির্বিচারে—এবং নির্বাক্যে,—এই নেতৃত্বের অধিকার নিমাইয়ের যেন সহজাত।—পেছনে নিমাই মুরারির অঙ্গ-সঞ্চালন অনুকরণ করে—তাঁকে বিদ্রূপ করতে

করতে চলেছে,—মাঝে মাঝে সে কৌতুক-হাস্যে সাথীদেরও ইঙ্গিত করছে,—ছেলের দল সেই উপহাসে আমোদ পেয়ে হেসে উঠছে খল্ খল্ করে!

শিশুকণ্ঠের অসঙ্কোচ উচ্চ হাসি! মুরারির কানে বার্‌বার বাজছে,—কিন্তু তিনি একবারও পেছন ফিরে চাইছেন না—শেষ পর্যন্ত কিন্তু চাইতেই হলো—হাস্যরোলের আতিশয্যে। পেছনে দৃষ্টি ফেরাতেই তাঁর চোখে পড়লো,—তাঁকে অনুকরণ করে নিমাইয়ের উপহাস,—কিন্তু সভাবতঃ তিনি একটু ধীর,—তাই নিজেকে সংযত করে—আবার আগের মত ব্যাখ্যা করতে করতে অগ্রসর হলেন।...পেছনে আবার হাস্যরোল উঠলো,—এবার দৃষ্টি ফিরিয়েই মুরারি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন,—'কে বলে একে ভাল ছেলে?'—নিমাইকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন,—জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে একটা অকালকুষ্মাণ্ড জন্মেছে! একেবারে পলাশফুল—শুধু রূপই আছে,—গুণের গন্ধও নেই।

বটে!—মন্তব্য শুনে মনে মনে রুষ্ট হয়ে উঠলো নিমাই।—আচ্ছা, চল তুমি তোমার বাড়ীতে,—তারপর দেখাব তোমায় মজা।—মুরারি অবশ্য তখন আর পেছনে না চেয়ে—এগিয়ে পড়েছেন।

এর পর মুরারির আহারের সময় নিমাই তার বাড়ীতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর 'ভাতের' থালাটা দিলে নোংরা করে।...ভীষণ চটে গেলেন মুরারি,—রক্ত চক্ষে চাইলেন নিমাইয়ের দিকে।—কিন্তু এ-কি? চমকে উঠলেন তিনি,—নিমাইয়ের মুখে আর শিশুভাব নেই,—তার পরিবর্তে—পরম বিজ্ঞের গাম্ভীর্যপূর্ণ একটি সম্ভ্রমসূচক দেব-ভাব ফুটে উঠেছে সেখানে,—যাকে কোন মতেই উপেক্ষা করা যায় না,—সঙ্গে সঙ্গে নিমাইয়ের কণ্ঠেও ফুটলো,—এক বিজ্ঞতম ভাষা,—'মুরারি, মাথা নাড়া, হাত নাড়া ছাড়,—হরি হরি বল।—কৃষ্ণের ভজনা কর,—ভগবানের সঙ্গে নিজেকে যে অভেদ মনে করে,—সে মূঢ়।'

—বালকের মুখে একি কথা।—বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে উঠলেন শাস্ত্র-জ্ঞানী মুরারি গুপ্ত!—না, না এ তো নিমাইয়ের কথা নয়। তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন মহান আত্মার আবির্ভাব হয়েছে, নিশ্চয়ই কোন অতীন্দ্রিয় শক্তির আবেশ জেগেছে নিমাইয়ের মধ্যে। ভাবতে ভাবতে তিনি যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেললেন, তখনও তাঁর অন্তঃকর্ণে ঘন ঘন বাজছে,—মুরারি কৃষ্ণের ভজনা কর। ভগবানের সঙ্গে নিজেকে যে অভেদ মনে করে সে মূঢ়!

নিমাই তখন অন্তর্হিত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু সেইদিন থেকেই নিমাইয়ের প্রতি একটা প্রগাঢ় আকর্ষণ এবং কেমন যেন একটা অনুরাগও জেগে উঠলো মুরারির মনে।

১৫

দেখতে দেখতে বিশ্বরূপ পড়লো ষোল বছরে,—নিমাইয়ের বয়স হলো ছয়। ...আমাদের দেশে একটা চলতি কথা আছে,—যেমন তেমন হোক পুত, ষোল বছরে দেখবে রূপ।—তা ষোড়শবর্ষীয় তরুণ বিশ্বরূপের রূপ দেখবার মতই হয়েছে,—নাম যেন সার্থক হয়েছে তার,—বিশ্বমোহন রূপই তার বটে।—উজ্জ্বল গৌরবর্ণ—স্বাস্থ্য-প্রাচুর্য সারা দেহে যেন ঢল ঢল করছে। অন্তর-ভরা সৌন্দর্যের নির্মল জ্যোতিঃও ফুটে উঠেছে তার চোখে মুখে।

সহসা একদিন তার দিকে চেয়ে জগন্নাথ মিশ্রের সাধ জাগলো,—বিশ্বরূপের এবার বিয়ে দিতে হবে। ছোট টুকটুকে একটি বৌ এসে—ঘর আলো করবে, মলের ঝমঝম শব্দ করে ঘুরে বেড়াবে—এঘর থেকে ওঘর—শচীর পিছু পিছু মেয়ের মত, নিমাইয়েরও জুটবে একটি খেলার সাথী; খেলবে সে পুতুল পুতুল খেলা ছোট্ট দেবরটিকে নিয়ে,—কি চমৎকার!— দৃশ্যটা কল্পনা করতেও যেন আনন্দের শিহরণ জাগলো—জগন্নাথের সর্বাঙ্গে। আগ্রহের আকুলতায় তিনি অবিলম্বেই প্রকাশ করলেন তাঁর সদ্য-জাগ্রত আকাঙ্ক্ষার কথা পত্নী শচীদেবীর কাছে।

মুহূর্তে শচীদেবী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন এক পরম কাম্য শুভদিন-সমাগমের সম্ভাবনায়। আট আটটি কন্যাকে হারিয়ে তিনি লাভ করেছেন—বিশ্বরূপকে তাঁর স্নেহ-বুভুক্ষু মাতৃঅঙ্কে—হোক বিশ্বরূপের বয়স মাত্র ষোল,—তবু সকাল সকাল তার বিয়ে দেওয়াই যে শচীদেবীর বহুদিন-পোষিত অন্তরের এক মধুময় সাধ! এতদিন শুধু কেমন একটা সংকোচেই তিনি বলতে পারেননি সে কথা স্বামীকে,—বিশ্বরূপের বয়সের কথা ভেবেই।...এখন স্বামীরও সে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে দেখে তিনি উত্তর দিলেন বিহ্বল কণ্ঠে,—"ভগবানের দয়ায় যত শীগগির সে শুভদিন আসে,—ততই আমার আনন্দ। তুমি একটি দশ-এগারো বছরের লক্ষ্মীর মত সুন্দরী মেয়ের সন্ধান কর। যেন আমার বিশ্বরূপের পাশে বিশ্বরূপা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে এক সুখকর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন তিনি,—আজ বিশ্বরূপের বিয়ে, কাল নিমাইয়ের পইতে—তারপর আবার নিমাইয়ের বিয়ে—দু'টি লক্ষ্মীর মত বৌ—নাতি-নাতনীতে ভর্তি ঘর-সংসার,—ওঃ কতই-না আনন্দের। —নারীহৃদয়ের সহজাত কামনার আবেগে—শচীদেবীর সুদূর-প্রসারী কল্পনা —সীমা-সরহদ্দী না রেখেই এগিয়ে যেতে লাগলো দূরে বহুদূরে—তাঁর কল্পনানেত্রে ফুটে উঠলো ক্রমাগত সুদূর ভবিষ্যতের এক পরমসুন্দর ছবি! কিন্তু হায়,—ভবিষ্যতের কথা তিনি যদি জানতেন!

এরপর আর কি? মহা-আনন্দেই মিশ্রমশায় একটি পাত্রীর সন্ধান করতে লাগলেন। কথাটা কিন্তু এ-কান ও-কান করে অবশেষে উঠলো গিয়ে বিশ্বরূপের কানে। শুনেই সে একেবারে মুষড়ে পড়লো; সুন্দর-কোমল মুখখানির ওপর নেমে এলো যেন রূঢ় বিষাদের ছায়া। সঙ্গে ছিল পরমবন্ধু লোকনাথ। বন্ধুর ভাবান্তর দেখে—সে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো,—কি হলো দাদা?

"শুনলি না কি হলো?"—বিশ্বরূপের স্বর যেমন গভীর তেমনি ক্ষুণ্ণ,— "বাবা আমার বিয়ের জোগাড় করছেন?"

"তা তো শুনলাম,—কিন্তু তাতে হলো কি?"

হলো কি?—লোকনাথ যেন সব জেনেও অজ্ঞের মত প্রশ্ন করেছে,—এই ভাবে সবিস্ময়েই বলে বিশ্বরূপ,—"তুই এতদিন সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেও এই প্রশ্ন করলি? আমি কি সংসারে আবন্ধ হতে চাই?"

তা বটে,—এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারে লোকনাথ।...সে বেশ জানে,—বিশ্বরূপ একরূপ আজন্ম বৈরাগী,—তার ওপর অদ্বৈত-সভায় গিয়ে —সেখানে ভগবৎ-প্রসঙ্গ শুনে শুনে—এই বয়সেই তার অনিত্যের মোহ কেটেছে, —মন ছুটেছে নিত্যের পানে।—শাশ্বত প্রেমের মধুর রসাস্বাদনের জন্য তার চিত্ত হয়ে উঠেছে উন্মুখ-ব্যাকুল।...গাঁটছড়ার বাঁধনে—তাকে বাঁধতে চাইলে সে কি নিতে পারে সে-টা—সহজভাবে?

তাড়াতাড়ি নিজের ভুল সংশোধন করে বলে লোকনাথ,—বুঝেছি দাদা, বুঝেছি। আমারই ভুল হয়েছিল। কিন্তু পিসেমশায়ের কথা ঠেললে তিনি খুবই দুঃখ পাবেন ভাই।—"দূর বোকা! আমি কি বাবার কথা কখনো অমান্য করতে পারি?" বিশ্বরূপ যুক্তকরে পিতৃ-উদ্দেশে একটি প্রণাম করে বলে— "কিন্তু আমি বাড়ীতে না থাকলে তিনি আর কাকে আদেশ করবেন?"...পরে এদিক সেদিক একবার চেয়ে নিয়ে একটু নিম্ন কণ্ঠে বলে—শোন, বলিস না কাউকে,—আমি শীগ্‌গির সংসার ত্যাগ করবো,—সন্ন্যাসী হবো।

"সন্ন্যাসী হবে?"—সোৎসাহে বলে ওঠে লোকনাথ,—"তবে আমিও সন্ন্যাসী হবো।" যেন একটি কথাতেই সংসারের যাবতীয় প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেল

তাদের।—"তোমারও যে গতি, আমারও সেই গতি। সত্যি দাদা, আমি তোমাকে ছেড়ে এক মুহূর্তও টিকতে পারবো না।"—ছলছল করে ওঠে তার সরল দুইটি আয়ত নেত্র এক আশু বিচ্ছেদের আশঙ্কায়।—"কিন্তু মামা যে দুঃখ করবেন ভাই?"—চিন্তিত স্বরে বলে বিশ্বরূপ।—সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথ ঘুরে জবাব দেয়,—"আর পিসে মশায় বুঝি করবেন না তোমার জন্যে?...না, দাদা, আমাকে তুমি ছেড়ে যেতে পারবে না,—সে আমার সইবে না।"—আকুল হয়ে ওঠে তার স্বর,—"যেখানেই যাও, আমাকে সঙ্গে নাও। দেখ, তোমারও তো একজন চেলার দরকার?—আর আমি তো তোমার চিরদিনের চেলা—আমাকে ফাঁকি দিয়ো না দাদা।"—সে কাতর ভাবেই বিশ্বরূপের হাতদুটি চেপে ধরে,—"আর আমারই বা কিসের সংসারের মোহ?"—কেঁপে ওঠে তার স্বর ভাবেব আবেগে।

বিশ্বরূপ কিছুক্ষণ কি ভেবে উত্তর দেয়—বেশ, তাই হবে। কিন্তু দেখিস্—ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন কিছু জানতে না পারে। যেদিন যাবো,—তার আগের দিন বলবো তোকে। তুই প্রস্তুত থাকিস।

'আচ্ছা!'—নির্বিকার কণ্ঠে বললে লোকনাথ।...বিশ্বরূপের অনুচর—বিশ্বরূপের অন্তরঙ্গ, পড়াশোনাও করছে বিশ্বরূপের সঙ্গে,—জ্ঞানে-বিদ্যায় এবং অন্তরের দিক দিয়েও সে বিশ্বরূপের যোগ্য বন্ধু। বিশ্বরূপের হাওয়া তার গায়ে না লাগবেই বা কেন? এতক্ষণে সে যেন কৃতার্থ হলো; তার বুক থেকেও যেন একটা গুরুভার নেমে গেল; বললে সে আবার আশ্বস্ত কণ্ঠে,—"আমি সব সময়ই প্রস্তুত,—তুমি ডাকলেই হচ্ছে।"

"আচ্ছা, যা এখন খাওয়া দাওয়া করগে।"—আকাশের দিকে একবার তাকালো বিশ্বরূপ,—"বেলা হয়েছে অনেক।"—

অতঃপর দুই কিশোর বন্ধু,—সংসারের যাবতীয় সুখ-আনন্দ যাদের সম্মুখে পড়ে রয়েছে,—জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-আহ্লাদের স্পর্শও এখনও লাগেনি যাদের গায়ে; বয়স যাদের আমোদ-প্রমোদের, হাসি-খেলার; স্নেহ-প্রীতি ও মায়া-মমতার নিবিড় দুশ্ছেদ্য আবেষ্টনী অবিরত যাদের বেঁধে রেখেছে চারিদিক থেকে,—ঘিরে রেখেছে দুর্লঙ্ঘ্য গণ্ডীর মত,—তারা এক নিত্য প্রেমের টানে,—সসীমের বন্ধন কেটে অসীমের পানে যাত্রা করতে,—নিতান্ত সহজ-ভাবেই—কিন্তু একান্ত অনুরাগে পরামর্শ করে—যে যার ঘরে এসে পৌঁছল। ...শহরের সংকীর্ণ পথে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে—তারা সীমাতিক্রান্ত অনন্ত পথে চিরদিনের যাত্রী হবার পরিকল্পনা ঠিক করে ফেললে। সংসারের রঙীন ভবিষ্যৎ যে বয়সে বিবিধ বর্ণবৈচিত্র্যের সৃষ্টি ক'রে—ঘন ঘন ডাকে হাতছানি দিয়ে—সে বয়সে তাদের চোখের সামনে সব লুপ্ত করে দিয়ে ফুটে উঠ্‌লো মাত্র.

একটি পথ—যা নাকি শেষ হয়েছে গিয়ে—সেই সচ্চিদানন্দ প্রেমময় পুরুষের অভয় চরণ-প্রান্তে।

দু'একদিন পরে শচীদেবীর হাতে একখানি পুঁথি দিয়ে বিশ্বরূপ বললে, —'মা'—তার স্বর একবার কেঁপে উঠ্‌লো,—"নিমাই যখন বড় হবে,—তখন এই পুঁথিখানি তাকে দেবে। বলবে,"—একটা ঢোক গিল্‌লে সে,—"বলবে,"—আবার আট্‌কে গেল তার কথা,—তার পর জোর করে বলেই ফেললে কোন রকমে,—"তোমার দাদা, এটি তোমাকে দিয়েছে,—যত্ন করে পড়বে।"

'তার মানে?'—সাশ্চর্যে চাইলেন শচীদেবী পুত্রের মুখের দিকে,—"আমি দিতে যাবো কেন?—তুই নিজেই দিবি। তুই নিজে হাতে দিলে ও মাথায় তুলে নেবে,—রেখে দে তোর কাছে।"

'কিন্তু মা,'—বিশ্বরূপের কণ্ঠ জড়িয়ে আসে, তবু গলাটাকে ঝেড়ে নিয়ে ইতস্ততঃ করে বলে সে,—'এই—এই, মরা-বাঁচার কথা তো কিছুই বলা যায় না মা?...তাই—তাই বলছিলুম—

'ষাট্‌-ষাট, বালাই!'—শচীদেবীর স্বরে গভীর আর্ত্তি ফুটে ওঠে,—মুখেও পড়ে আতঙ্কের ছায়া,—"ও-কি কথা বাছা?—দুধের ছেলে তুই,—তোর মুখে কি ওই সব কথা সাজে?...আমি মা হয়ে বেঁচে থাকবো আর তুই,—"কথাটা আর শেষ করতে পারেন না তিনি—শিউরে ওঠেন মনে প্রাণে; তারপর বিশ্বরূপের দিকে ভাল করে চাইতে সত্যিই চমকে ওঠেন,—"তোর চোখ দুটো ছলছল করছে কেন রূপ?...কি তোর মতলব বলতো পষ্ট করে।"—

"কোথায় চোখ ছলছল করছে মা,"—মুহূর্তে সহজ ও স্বচ্ছন্দ হবার চেষ্টা ক'রে—কৃত্রিম হাস্যে বিশ্বরূপ উত্তর দেয়,—"তুমি মনে মনে ভাবছো শুধু, পাছে আমাদের অকল্যাণ হয়,—চোখে দেখ্‌ছো শুধু,—আমাদের দুঃখ—বেদনা,—কিন্তু তোমার মত মা যাদের,—তাদের কি কোনদিন অকল্যাণ হয় মা?—না, তারা কোনদিন আনন্দ ছাড়া দুঃখ পায়?"—পরে কণ্ঠে প্রচুর উৎফুল্লভাব এনে বলে,—"আমি তো সেজন্যে বলছি না, মা।...তবে এত লেখাপড়া শিখছি,—বড় হয়ে তো ঘরে বসে থাকবো না,—হয়ত কতদূরে কাজে-কর্মে চলে যেতে হবে,—দু'একবছর বাড়ী আসাই হবে না। তাই পুঁথিটা তোমার কাছেই রাখছি। যত্ন করে রাখাও তো দরকার? নিমাই তো আর কালই বড় হয়ে উঠ্‌ছে না?—নইলে, নিমাইকে নিজের হাতে দেওয়া কি আমার অসাধ?"

হায়রে, সরল প্রাণা স্নেহবিমূঢ়া জননীর মন। ষোল বছরের বালক পুত্র, —যাকে গর্ভে ধরেছেন,—তার ছলনায় ভ্রান্ত হয়ে ওঠে। একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যেন আশ্বস্ত হয়েই বলেন শচী,—ও, তাই বল! তবে আবার মরা-বাঁচার কথা মুখে আনছিস কেন বাপু?"—আর কোন দ্বিধা না করে পুঁথিটা তিনি

তন্দণ্ডেই একটি তোরঙ্গের মধ্যে রেখে দিলেন,—অবশ্য পরিষ্কার নেকড়ায় দপ্তরের মত করে বেঁধে। একান্ত পুত্রগত-প্রাণা—সরলা জননীর সঙ্গে ছলনা করতে বিশ্বরূপও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠ্ছিল—অন্তরে অন্তরে।...কিন্তু পাছে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, এই ভয়ে—এই ছলনার আশ্রয় না নিয়ে সে-যেন আর উপায় দেখছিল না।...

এরপর শীঘ্রই বিশ্বরূপ গৃহত্যাগের দিন স্থির করে ফেললে, এবং যথা-সময়েই সে কথা বললে লোকনাথকে। যুক্তিমত লোকনাথ নিজে প্রস্তুত হয়ে সেদিন রাত্রে এসে শুয়ে পড়লো নিমাইদের বাড়ীতে—বিশ্বরূপের সঙ্গে একই শয্যায়। দুই বন্ধু এমন অনেকদিনই শুতো,—সুতরাং এ-নিয়ে কারো সন্দেহ করারও কারণ থাকলো না কিছু।...

রাত্রি তৃতীয় যাম,—নৈশ প্রকৃতি নিস্তব্ধ—নীরব, কোন দিকে কোন সাড়া শব্দ নেই। মাঝে মাঝে দু'একটা রাত্রিচর পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে,—বৃক্ষ-শাখে কোন কোন ঘুমন্ত পাখীরও পাখা নাড়ার শব্দ আসছে কানে। মাথার ওপর ঝিক্‌মিক করছে অসংখ্য তারা। আকাশ যেন কোটি কোটি চোখ মিলে চেয়ে আছে ধরিত্রীর তামসী সৌন্দর্যের পানে। সমগ্র শহর গাঢ় ঘুমে অপচেতন।

সহসা বিশ্বরূপ ও লোকনাথ উঠে দাঁড়ালো শয্যা ছেড়ে,—জেগেই ছিল তারা,—মুহূর্তের জন্যেও চোখ বোজেনি আজ,—আর চোখ বোজাই কি যায়? ...অদূর থেকে বিশ্বরূপ অন্ধকারের মধ্যে যথাসম্ভব দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলো,—নিদ্রিতা মায়ের স্নেহতপ্ত বুকের কাছে নিমাই ঘুমুচ্ছে—অসাড়ে, একটু তফাতে পৃথক শয্যায় পিতা নিদ্রা যাচ্ছেন পরম নিশ্চিন্তে।

দূর থেকেই বিশ্বরূপ মাতা-পিতার পুণ্যচরণোদ্দেশে প্রণাম জানালো পরমভক্তিভরে। দীর্ঘ ষোল বৎসর ধরে যাঁরা প্রাণের সমস্ত মমতা ঢেলে—নিজেদের সুখ দুঃখ সব তুচ্ছ করে পালন করেছেন—কত না আনন্দে,—কত না আশা-আকাঙ্ক্ষায়,—আজ তাঁদের অকৃত্রিম নিবিড় স্নেহের বন্ধনী নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতই—ছেদন করে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষায় প্রচণ্ড আঘাত হেনে চলে যেতে হবে তাকে;—অবশ্য আত্মসুখের জন্য নয়,—জীবনব্যাপী কঠোর আত্মপীড়নকে বরণ করার জন্যেই; কিন্তু তবু তার বুকের ভেতরটা ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠ্‌লো; আবার নিমাইয়ের কথা ভাবতে গিয়ে সে আর অশ্রু রোধ করতে পারলো না।...পাছে ডুকরে কেঁদে ফেলে,—কান্নার কোনরূপ শব্দ হয়,—এই আশঙ্কায় সে নিমেষে আত্মদমন করলো বহু কষ্টেই।

তারপর—মনে মনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে বললে আত্মগতভাবে,—

"হে প্রেমময় বাসুদেব, সর্বজীবের আধার,—তুমিই নিমাইকে রক্ষা করো। তোমার চরণেই তাকে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি।"

এদিকে লোকনাথ তখন স্পন্দিত বুকে অপেক্ষা করছিল বিশ্বরূপের জন্যে। ...সহসা বিশ্বরূপ দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে এসে চুপি চুপি বললে তাকে,—নে চল, চল।

অগ্রসর হলো উভয়ে ক্ষিপ্র স্খলিত চরণে। সহসা বিশ্বরূপের কানে যেন বেজে উঠ্‌লো,—দাদা!' এ-কি? নিমাই কি ঘুম ভেঙে ডাকছে নাকি তাকে,—থমকে দাঁড়ালো বিশ্বরূপ,—উৎকর্ণ হয়ে থাকলো কিছুক্ষণ,—কিন্তু না, নিমাই তেমনি ঘুমুচ্ছে,—এ-তার মনের ভ্রম!—কিন্তু নিমাই তাকে দেখতে না পেয়ে সত্যিই তো "দাদা, দাদা" বলে কাঁদবে,—কে ভুলাবে তখন তাকে?...বাবা-মা কি পারবেন?

—আবার কিছুক্ষণের জন্যে দুর্বল হয়ে পড়লো বিশ্বরূপ। তার মনে হলো, নিমাই যেন মুহু মুর্হু তাকে—'দাদা' বলে ডাক্‌ছে।...সহসা তার চমক ভাঙলো,—এ-কি? কি করছে সে? এই চিত্ত-দুর্বলতা কি তার যোগ্য,—বিশেষ এই মুহূর্তে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলো সে রাত ভেঙে আস্‌ছে,—আর দেরী করলে—লোকজন উঠে পড়বে! এবার ক্ষিপ্তের মতই সে এক নিশ্বাসে একেবারে সদর পেরিয়ে গিয়ে—লোকনাথকে ডাকলে চাপা স্বরে,—আয়, আয়, আয়।

ও-দিক থেকে বিশ্বপ্রকৃতিও যেন তাদের হাতছানি দিয়ে ডেকে উঠ্‌লো,—আয়, আয়, আয়।

দুই কিশোর বন্ধু—এক বস্ত্রে—হাতে মাত্র একখানি করে পুঁথি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো—অনিশ্চিতের পথে চিরজীবনের মত। পেছনে পড়ে থাকলো,—মায়াময় সংসারের যাবতীয় মায়ার বাঁধন,—তার স্নেহ-মমতা-প্রীতি-ভালবাসা—সব কিছু। ব্যর্থ হয়ে গেল তাদের নিবিড় মৌন বেদনা। নিষ্ফল হয়ে গেল তাদের মূক আবেদন।

—রাত্রিটা ছিল শীতকালের,—পারাপারের খেয়াতরীও ছিল না তখন গঙ্গার ঘাটে। এক হাত তুলে ধরে—পুঁথি দুটিকে জল থেকে কোন রকমে বাঁচিয়ে—দুই অসম সাহসী সংসার-বিরাগী-কিশোর বন্ধু বহু কষ্টে সাঁতার কেটেই উঠ্‌লো গিয়ে—গঙ্গার ও-পারে। তার পর?—মোহাঞ্জন-মুক্ত প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে—দিগন্ত-বিস্তৃত অনন্ত পথ। যাত্রী—দুটি সরলপ্রাণ—অদম্যচিত্ত সংসার-বিবাগী কিশোর।

১৬

কথাটা যখন জানাজানি হলো,—তখন বেলা দুপুর। জগন্নাথ বা শচী-দেবী কারো তখন খাওয়া দাওয়া হয়নি,—আর হলোও না। শচীদেবী আছাড় দিয়ে কাঁদতে লাগলেন,—মিশ্র মশায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন বজ্রাহতের মত।...পুরুষ মানুষ তিনি,—স্ত্রীলোকের মত উচ্চ স্বরে কাঁদতে না পারলেও,—তাঁর দুই চোখে বইতে লাগলো যেন শ্রাবণের ধারা,—প্রাণের ভেতরটা হাহাকার করতে লাগলো নিদাঘ-দগ্ধ মরুভূমির মতই!

শচীদেবীর আকুল ক্রন্দনে পাড়া ভেঙ্গে লোক এসে পড়লো সেখানে!

ষোল বছরের ছেলে,—রূপে কন্দর্প,—বিদ্যায় বুদ্ধিতে গুণে—শীলে—সর্বজনপ্রিয়—মাতাপিতার নয়নের মণি,—তার এই মর্মান্তিক সংসার ত্যাগের সংবাদে পাড়ার লোকেরও কণ্ঠে কণ্ঠে গভীর দুঃখে ধ্বনিত হলো,—হায়, হায়, হায়।...আবার যখন সকলে শুনলো,—বিশ্বরূপ শুধু একা নয়,—তার অনুসঙ্গী হয়েছে তারই বয়সী আর একটি সুকুমার কিশোর লোকনাথ,—তখন সকলের দুঃখ-বেদনার আগুনে যেন আহুতিই পড়লো। কিন্তু তারা কেউই ভেবে উঠতে পারলো না,—কত বড় আন্তর শক্তি থাকলে,—কি প্রবল বৈরাগ্যের আগুনে—বৈচিত্র্যময় সংসারের যাবতীয় দুশ্চেদ্য আকর্ষণ পুড়ে গেলে,—তবে দুটি বালক এমনি ভাবে—নিতান্ত হঠাৎ পা' বাড়াতে পারে ত্যাগের পথে।

লোকনাথদের বাড়ীতেও সেই একই দুঃখের পালা সুরু হয়েছে। আবার অদ্বৈত-সভায়ও তখন নানা দুঃখজনক আলোচনা চল্‌ছে বিশ্বরূপকে নিয়ে।...সভ্যগণ সখেদেই বলছেন,—বিশ্বরূপের মত ছেলে যখন সংসার ছেড়ে গেল,—তখন আমরাও আর থাকবো না সংসারে! কি করবো থেকে এখানে?—চারিদিক থেকে শুধু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। বলে,—'হরি' বলে তোদের হলো কি? পেটে ভাত জোটে না,—পরণে কাপড় পাস না।...ঝ্যাঁটা মারি তোদের অমন বৈষ্ণবগিরি মুখে।—সংসারে থেকে এই সব কথা শোনার চেয়ে, বিশ্বরূপের মত সংসার ছেড়েই—সেই হরিকে ডাক্‌বো।...এই সভায় এসে—এসে—এতটুকু ছেলেরও মনে যদি বৈরাগ্য আসে,—আমাদের না-আসা লজ্জারই কথা।

অদ্বৈতাচার্য সকলকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন,—কোথাও যেতে হবে না তোমাদের। এইখানে—এই নবদ্বীপে বসেই তোমরা সেই প্রেমময়ের করুণা লাভ করবে। বিশ্বরূপকে তোমরা ঠিক চিনতে পারোনি,—ওর মনে রঙ ধরেছিল,—এখানে আসতে শুরু করার অনেক আগেই। আমাদের সাধ্য আর কতটুকু? এ ছিল তার জন্মান্তরের সংস্কার।...চোখের সামনে তার শুধু একটা পর্দা ঝুলছিল,—সেই পর্দাও সরেছে,—সে-ও সরেছে। এমনিই হয়।...তাছাড়া, ঐ যে ওর ছোট ভাইটি—নিমাই না কি-নাম? ডাকতে আসতো ওকে প্রায়ই; ওর দিকে চেয়েও আমার মনে হয় ও-যেন ছাইচাপা আগুন! —জানিনা, ও—আবার কবে কোনভাবে প্রকাশ পাবে।...তা যাহোক তোমরা নিজের নিজের কাজে অবহেলা করো না।...

বৈষ্ণব-সভা থেকে কোন কোন সভ্য এসে পড়লেন কর্তব্যবোধে জগন্নাথের বাড়ী,—পুত্রবিচ্ছেদাতুর মাতা-পিতাকে সান্ত্বনাদান করতে।...কিন্তু আট-আটটি কন্যা বিয়োগের শোকানল নির্বাপিত করে,—মা-বাপের কোলে এসেছিল যে সর্বগুণধর পুত্র—অমৃতধারার মতই;—তার এই মর্মচ্ছেদী গৃহত্যাগের দুর্বিষহ ব্যথায় মা-বাপের মনকে শান্ত করতে পারে,—জগতে কোথায় আছে সে সান্ত্বনার ভাষা?—ঘটনাস্থলে এসে তাঁদের কণ্ঠে যেন আর কথা ফুটলো না। স্তব্ধভাবে চেয়ে থাকলেন তাঁরা বেদনায় আকুল—আশাহত স্বামী-স্ত্রীর দিকে। —দুটি সজীব-সবুজ গাছ যেন সহসা প্রচণ্ড ঝটিকায় দলিত-মথিত হয়ে উঠেছে।

তবু পাশ থেকে একজন প্রৌঢ় প্রতিবেশী বললেন,—দেখ পুরন্দর, এমনভাবে ভেঙ্গে না পড়ে—বরং এক কাজ কর। এরই মধ্যে তারা এমন কিছু দূরে চলে যায়নি। শুনলুম গঙ্গা পার হয়ে—শান্তিপুরের পাশ দিয়ে গেছে তারা—বাছা বাছা দু'তিন জন লোককে—তাদের সন্ধানে পাঠিয়ে দাও; কিন্তু এক্ষুনি,—আর দেরী নয়।...যেখানেই তাদের দেখতে পাবে,—সেখান থেকেই ফিরিয়ে আনবে। আমার মনে হয়, বেশ সন্ধানী চটপটে লোক হলে সন্ধ্যার আগেই কোথাও না কোথাও ধরে ফেলবে তাদের।

'তা হয়ত সম্ভব!'—গভীর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে উত্তর দেন জগন্নাথ,—"কিন্তু ফিরিয়ে এনেও খুব লাভ হবে বলে মনে হয় না।—বৈরাগ্যের কল্পনাও যে বয়সে জাগে না,—সেই বয়সে যারা এই ভাবে সন্ন্যাস নিতে পারে,—তারা যে বিজ্ঞ বৃদ্ধের চেয়েও সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয় হয়ে উঠেছে,—তাতে আর সন্দেহ কি?...আজ ফিরিয়ে আনবো,—কাল আবার শেকল কাটবে। আর তাদের ধরে রাখবে কে?

বুকের ভেতর ব্যথা গুমরে উঠ্‌ছে,—মাঝে মাঝে চোখের জলও মুছছেন,—তবু, জগন্নাথের এই বিস্ময়কর ধৈর্য দেখে অবাক হয়ে যায় সকলে।...উদ্গত অশ্রু রোধ করে জগন্নাথ আবার বলেন,—তা ছাড়া, সে তো কোন সুখের মোহে বা স্বার্থের প্রেরণায় আমাদের এইভাবে ছেড়ে যায়নি,—আমাদের দুঃখে ফেলে নিজে সুখের পথ বেছে নিলেও বা একটা কথা ছিল! ধর্মের প্রেরণায় কঠোর দুঃখের—অপরিসীম কষ্টের পথই বেছে নিয়েছে সে; ষোল বছরের ছেলে, যদি নিত্যের আহ্বানে—সংসারের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-আনন্দ—সবই বিসর্জ্জন দিয়ে বৈরাগ্যের পথে পা দিতে পারে,—আমি পঞ্চাশ বছরের বুড়ো কেমন করে আত্মসুখ ও স্বার্থের বশে তাকে ফিরিয়ে আনতে ছুট্‌বো?

করুণ নেত্রে তিনি একবার চাইলেন সকলের দিকে,—তাঁর ছলছল দৃষ্টির মধ্যে ফুটে ওঠে নিবিড় অন্তর্বেদনার গভীর ছায়া।—"তা, ছাড়া, ভেবে দেখুন" —বাষ্প-জড়িত কণ্ঠে আবার বলেন তিনি,—"তার কাজে আমাদের মাথা হেঁটও হয়নি;—বরং আমরা মাথা উঁচু করেই তার পরিচয় দিতে পারবো সকলের কাছে। সে বংশের গৌরব। তার বিচ্ছেদ-ব্যথা আমাদের পক্ষে প্রাণঘাতী সন্দেহ নেই,—কিন্তু প্রাণ থাকতে আমি তাকে স্বার্থের বশে ধর্মপথভ্রষ্ট করতেও পারবো না।

বিচ্ছেদ-কাতর—স্নেহাতুর পিতার মুখের এই কথা যে কত বড় পুত্র-প্রাণতার পরিচয়,—তা ভাবতে গিয়েও যেন আগন্তুকগণ অভিভূত হয়ে পড়লেন। ...এতক্ষণে একজন বৈষ্ণবের মুখে ভাষা যোগাল।—বলে উঠ্‌লেন তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে,—"এই তো জগন্নাথ মিশ্রের মত পুণ্যাত্মা ব্যক্তির কথা।...এমন বাপ না হলে কি এমন ছেলে হয়? যে বংশে একজনও কেউ সন্ন্যাসী হয়,—সে বংশের গৌরবের কি অন্ত আছে,—না তার পুণ্যেরই সীমা আছে?...

বস্তুতঃ তখন লোকের ধারণা বা বিশ্বাসও ছিল এমনি।...তাই এবার সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকও বলে উঠ্‌লেন,—তা' বটে,—তা বটে! বিশ্বরূপ খুবই মহৎ কাজ করেছে। সংসারী লোকের পক্ষে যদিও এ ঘটনা অতি দুঃখের;—তবু এর গৌরবের দিকটা সত্যিই ভেবে দেখতে হয়।

শচীদেবীর কান্নার কিন্তু বিরাম ছিল না; তাঁর মাতৃপ্রাণের কাছে এসব কথা ছিল যেন নিতান্তই অসার! তাঁর মনে হচ্ছিল,—এই মুহূর্তেই যদি কেউ—বিশ্বরূপকে ফিরিয়ে এনে দেয় তাঁর কোলে,—তবে তিনি চিরঋণী হয়ে থাকবেন তার কাছে! কিন্তু হায়, মর্মাহতা জননীর প্রাণের সে আকুল কামনা শুধু তাঁর বুকের মাঝেই গুমরে উঠ্‌ছিল। মাঝে মাঝে তিনি ভাবছিলেন অদ্বৈতাচার্যের কথা। তাঁর ধারণা, ওঁর সভায় গিয়ে-গিয়েই—বিশ্বরূপ ক্রমেই

বিরাগী হয়ে উঠ্‌লো সংসারে। মায়ের মন তো?—এমন কত সম্ভব-অসম্ভব চিন্তাই না জেগে ওঠে সেখানে,—কে জানে!

নিমাই কিন্তু তখনো এদিকের কিছুই জানতো না। শচীদেবী সর্বাগ্রেই তাকে ধরে বেঁধে গ্রাস কয়েক ভাত খাইয়ে দিয়েছিলেন। ব্যস,—আবার কি? ছাড়া পেয়ে সে এতক্ষণ খেলায় মেতে ছিল পাড়ার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। হঠাৎ এক সময় মায়ের কান্নার শব্দ এসে পেঁছল তার কানে। চমকে উঠলো নিমাই খেলার মধ্যেই,—"আমার মা বুঝি কাঁদছে ভাই,"—কেমন একটা বিষণ্নতা ফুটে উঠলো তার প্রসন্ন চোখে মুখে,—"দাঁড়া, শীগ্‌গির দেখে আসি—মা কাঁদে কেন?"

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসে সে বাড়ীর মধ্যে। সেখানে তখন লোকারণ্য।... অবাক এবং যেন কিছু শঙ্কিতও হয়ে ওঠে নিমাই। এদিকে শচীদেবী তাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে—তার ধুলায় ধূসর দেহ্ সজোরে আঁকড়ে ধরলেন বুকে। শুচিবাইগ্রস্তা শচীর আজ আর শুচি-অশুচি বিচার নেই! —অন্যদিন হলে নিমাইকে ধুয়ে মুছে তবে তুলতেন কোলে। কেঁদে উঠ্‌লেন তিনি আরও আকুল হয়ে—নিমাইকে বুকে পেয়ে।

অবিলম্বেই—আসল ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো নিমাইয়ের কাছে,—সে শুনলো,—জানলে এবং বুঝলেও তার দাদা সন্ন্যাসী হয়েছেন,—আর কখনও আসবেন না বাড়ী। "দাদা, দাদা গো,"—বলে কেঁদে উঠেই মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লো সে।..."দাদা-অন্ত"-প্রাণ তার, তার দারুণ বিচ্ছেদের ব্যথা সহসাই তার স্নায়ু কেন্দ্রে করলো প্রচণ্ড আঘাত। দাদার অনস্তিত্বের কল্পনায় নিমাইয়ের কাছে গোটা সংসারটাই যেন শূন্য হয়ে গেল এক নিমেষে।

"দেখ, দেখ, দেখ,"—বলে ওঠেন সকলে ব্যাকুল হয়ে,—"নিমাই বুঝি মুর্চ্ছা গেছে!"

জগন্নাথ ও শচী আতঙ্কে অধীর হয়ে ওঠেন। বিশ্বরূপের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে তাঁরা ব্যগ্র হয়ে পড়েন নিমাইয়ের চৈতন্য-সম্পাদনায়।...সে তো বুকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে চলে গেছেই,—আবার তার জন্যে নিমাইকেও হারাতে হবে নাকি? শোকাতুর দম্পতির বুকের পাঁজরাগুলোর মধ্যেও যেন কাঁপন ধরলো। চোখ-মুখ যেন তাদের শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঘন ঘন—জলের ছিটে দিচ্ছেন তাঁরা নিমাইয়ের চোখেমুখে—মাথায় দিচ্ছেন তালপাতার বাতাস। অন্যান্য সকলেও নিমাইয়ের দিকে চেয়ে আছেন অদম্য অধীরতায়।

যা' হোক, কিছুক্ষণ পরে—সকলের চিত্তে আশার সঞ্চার করে—ধীরে ধীরে চোখ খুললো নিমাই। যেন গভীর নিদ্রা থেকেই জেগে উঠলো সে!...জগন্নাথ ও শচী বুঝলেন,—নিমাইয়ের কাছে আর বিশ্বরূপের জন্যে শোক করা চলবে

না,—মনের শোক, রাখতে হবে মনের মধ্যেই চেপে,—নিমাই যাতে প্রফুল্ল মনে থাকে,—তাই করতে হবে তাঁদের। নইলে কোনদিন আবার নিমাইকেও হারাতে হবে। না, না, সে দৃশ্য কল্পনা করাও মর্মান্তিক।

মূর্চ্ছা ভেঙে নিমাই ধীর কণ্ঠে বিজ্ঞলোকের মতই বলে,—বাবা, মা, দাদা সন্ন্যাসী হয়েছে, হোক! তোমরা ভেবো না; আমি লেখাপড়া শিখবো, বড় হবো,—তোমাদের সেবা করবো,—তোমাদের দুঃখ দূর করবো।

মূর্চ্ছার সময় নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞান যখন লুপ্ত হয়েছিল,—তখন তার মনের মধ্যে জেগেছিল কি তবে অন্তর্চেতনা,—এবং এই কথাগুলি কি সেই চেতনারই বহির্প্রকাশ?—কে জানে!

* * *

এদিকে বিশ্বরূপ ও লোকনাথ ক্রোশের পর ক্রোশ পথ হেঁটে চলেছে,—সেই অচিন্ত্য, অদ্বয় পরমপুরুষের প্রেমের আহ্বানে।...নানা মধুর স্মৃতি-বিজড়িত দীর্ঘ ষোড়শ বর্ষের অতীতের কথা যেন সম্পূর্ণ মুছে গেছে তাদের মন থেকে।...অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্বরূপ দীক্ষা গ্রহণ করলো—পুরী সম্প্রদায়-ভুক্ত এক সন্ন্যাসীর কাছে।—গুরু তাঁর নাম দিলেন,—"শঙ্করারণ্য পুরী।" সে দীক্ষিত হবার পরই লোকনাথ তারই কাছে মন্ত্র গ্রহণ করে—হলো তার দণ্ড-কমণ্ডলু বাহী—অন্তরঙ্গ শিষ্য।—গুরু-শিষ্যের মন ভরে ওঠে এবার এক শাশ্বত আনন্দে।

নবীন-কিশোর সন্ন্যাসী শঙ্করারণ্যপুরী সশিষ্য পরিব্রাজকরূপে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন,—তীর্থ থেকে তীর্থে,—তাঁর কাম্যবস্তুর সন্ধানে। অন্তরে জ্বলতে লাগলো তাঁর সর্বগ্লানিহর—নিত্যপ্রেমের দীপশিখা—অম্লান—অনির্বাণ।

১৭

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পর দুরন্ত নিমাই কিন্তু একেবারে শান্ত হয়ে উঠেছে।...আর তার সে চাঞ্চল্য—সে উৎপাত,—সে রাগ—অভিমান কিছুই নেই। যেন বুঝেছে সে,—দাদার বিচ্ছেদে কাতর বাপ-মাকে, শান্তি এবং সান্ত্বনা দেবার দায়িত্ব এখন তারই। সে দুরন্তপনা বা উপদ্রব করে বেড়ালে—তাঁদের বুকের আগুন জ্বলে উঠবে দ্বিগুণ তেজেই।

এখন রোজ সে পিতার কাছে একান্ত শিষ্টভাবে বসে মন দিয়ে পড়াশোনা করে। সুপণ্ডিত পিতা—গভীর আনন্দে এবং পরম স্নেহে—শিক্ষাদান করেন,—তাঁদের ভবিষ্যতের একমাত্র আশা,—সন্তান-বিয়োগ ও বিচ্ছেদ-বিধুরা শচীদেবীর একমাত্র অঞ্চলের নিধি—প্রাণাধিক সন্তান নিমাইকে।—বুদ্ধিমান—তীক্ষ্ণধী নিমাই—পিতা একগুণ বললে—সহজেই দ্বিগুণ শিখে ফেলে। যেন বিষয়টা তার পূর্ব থেকেই ছিল—সম্পূর্ণ অধিগত।...বিস্ময়ে, আনন্দে, অভিভূত হয়ে যান জগন্নাথ নিমাইয়ের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে।—এমন শ্রুতিধর এবং স্মৃতিধর বালক যেন তিনি আর জীবনেও দেখেননি।

এবং শুধু পড়াশোনাতেই নয়,—প্রতিটি বিষয়েই এখন সে মাতাপিতার একান্ত বাধ্য। যাতে তাঁরা আনন্দ পান,—সেইভাবেই চলে নিমাই। দেখে শুনে শচীদেবীর প্রাণে যেন আর আনন্দ ধরে না, জগন্নাথের অন্তরেও পুলক-প্রবাহ ছুটে যায়। বিশ্বরূপের বিচ্ছেদের ব্যথা যেন ভুলেই যান তাঁরা নিমাইয়ের এই বিস্ময়কর পরিবর্তনে।...শুধু পিতার কাছেই নয়,—তাদের কুলগুরু ও কুলপুরোহিত সুপণ্ডিত বিষ্ণু এবং সুদর্শনের কাছেও নিমাই নিয়মিত পাঠ নেয়,—এই দুই অধ্যাপকও বিস্মিত হয়ে যান—সাত বছরের নিমাইয়ের অপূর্ব প্রতিভায়।

—দিন বেশ চলছিল,—না ছিল কোন উদ্বেগ,—না ছিল কোন চিন্তা।... পরম আনন্দে এবং শান্তিতেই সংসার-যাত্রা নির্বাহ করছিলেন জগন্নাথ ও শচী-দেবী। বিশ্বরূপের গৃহত্যাগে—তাঁদের অন্তরে যে স্থান শূন্য হয়েছিল,—

নিমাই-ই যেন তা পূর্ণ করে দিয়েছিল—কল্পনাতীত ভাবে! কোন ক্ষোভ বা অভাব বোধ ছিল না আর মিশ্র দম্পতির মনে।

কিন্তু কিছুদিন পরে—সহসা মোড় ফিরলো আবার অন্য দিকে।...এক অলীক তুচ্ছ ঘটনা প্রচুর গুরুত্ব নিয়েই চেপে বসলো জগন্নাথের বুকে।... একদিন সুপ্তি ভঙ্গের পর নিমাই মাকে বললে,—দেখো মা, আমি একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি।

—'কি স্বপ্ন বাবা?'—কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাইলেন জননী—পুত্রের মুখের দিকে।—সাত বছরের ছেলে,—সে আবার কি স্বপ্ন দেখেছে!

নিমাই বললে,—দেখলুম, দাদা যেন মস্ত সন্ন্যাসী হয়েছে। আর আমার কাছে এসে বলছে,—আয় নিমাই, আমার সঙ্গে, তুই-ও সন্ন্যাসী হবি।—সহসা চম্‌কে উঠলেন শচীদেবী,—বুকের ভেতরটাও যেন তাঁর একবার কেঁপে উঠ্‌লো। নিমাই কিন্তু বলে চলেছে,—আমি তখন দাদাকে বললুম,—আমি যে বড্ড ছোট দাদা,—তা ছাড়া, তুমি চলে গেছ সন্ন্যাসী হয়ে,—আমিও চলে গেলে,—বাপ-মাকে দেখবে কে?"

'বাবা রে আমার!'—আকুল উচ্ছ্বাসে সজোরে নিমাইকে বুকে চেপে ধরেন শচীদেবী,—তোর একশো বছর পরমায়ু হোক,—ভগবান তোকে এমনি সুমতিই দিন।"—ঝর ঝর করে খানিকটা জল ঝরে পড়লো—তাঁর দুটি চোখ থেকে—নিমাইয়ের মাথার ওপর—পূত আশীর্বাদ-ধারার মতই।

কথাটা উঠ্‌লো গিয়ে জগন্নাথের কানে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠ্‌লেন তিনি,—তবে কি—তবে কি, বিশ্বরূপ নিমাইকেও ঘরছাড়া করবে না—কি? ওরে নিষ্ঠুর, না, না, আর না। তোরই ব্যথা জ্বলছে দিবানিশি তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি—বুকের মাঝে,—ভুলে আছি শুধু নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়েই; আবার তাকেও নিয়ে যাস্‌নে আমাদের কোল থেকে ছিনিয়ে।

বালকের মত ডুকরে কেঁদে উঠ্‌লেন তিনি যেন এক অসহনীয় ব্যথার দুঃসহ কল্পনায়,— যেন এক অনাগত নিষ্ঠুর ভবিষ্যের আতঙ্কে।

এরপর কথাটা যদিও ক্রমে ক্রমে ভুলে গেলেন শচীদেবী,—অলীক স্বপ্নের কথা সম্পূর্ণ অলীক হয়েই মিলিয়ে গেল তাঁর চিত্তের মধ্যে,—কিন্তু জগন্নাথ মুহূর্তের তরেও ভুলতে পারলেন না,—যেন জগদ্দল পাথরের মতই চেপে বসলো তাঁর বুকে।

দিবানিশি তিনি ভাবেন,—ঐ একটা ছেলে বিস্তর লেখাপড়া শিখে—যেই বুঝলো,—সংসার অনিত্য,—অমনি বাপ-মা সব ছেড়ে—দণ্ড কমণ্ডলু নিয়ে বেরিয়ে পড়লো অনিশ্চিতের পথে। আবার এ ছেলেটাও হয়ত—লেখাপড়া শিখে—কোনদিন ওরই মত শেকল কেটে—উড়ে চলে যাবে দিগ-দিগন্তে!...

ভাবতেই আতঙ্কে সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে তাঁর—না, না, সে আঘাত আর সইবে না,—শচীও তাহলে আর বাঁচবে না!—ভাবতে ভাবতে তিনি যেন উদভ্রান্ত হয়ে উঠ্‌লেন; এবং দিবানিশি ওই এক-চিন্তাই যেন পেয়ে বসলো তাঁকে।

, অবশেষে তিনি স্থির করলেন,—আর পড়তে দেবেন না নিমাইকে।...মূর্খ হবে?—হোক। তবু তো ঘরে থাকবে! পণ্ডিত হয়েই বা লাভ কি?—এই যে আমি কত শাস্ত্র অধ্যয়ন করলাম,—কিন্তু কি হয়েছে আমার?—দুটি উদরান্নের চিন্তায় ছুটোছুটির যেন অন্ত নেই।—আর ওই তো—কত মূর্খ,—কেমন রাজার হালে দিন কাটাচ্ছে,—কোন অভাব নেই তাদের।...থাক নিমাই মূর্খ হয়ে.—যিনি জীব দিয়েছেন তিনিই আহার দেবেন; দুটি অন্ন নিমাইয়ের জুটবে কোন রকমে।

অটল হয়ে উঠলো তাঁর সিদ্ধান্ত। পরদিন সকালে নিমাইকে ডেকে বললেন তিনি দৃঢ়কণ্ঠে,—'শোন নিমাই, আজ থেকে তোমাকে আর পড়াশোনা করতে হবে না, বই-দপ্তর তুলে রেখে দাও। আর যেন কোনদিন তোমাকে পড়াশোনা করতে না দেখি।—জানবে, এ তোমার বাপের আদেশ।'

নিমাই কোন প্রতিবাদ করলো না,—একবারও জিজ্ঞাসা করলে না যে,—কারণ কি?...নির্বিচারেই মেনে নিলে পিতার আদেশ।...বই-দপ্তরের সঙ্গে সম্বন্ধও একেবারে ছিন্ন করে বসলো সেই দিন থেকে।...কিন্তু কিছুতো একটা করা চাই? বালকের স্বভাব,—একেবারে চুপচাপ বসে থাকা কি সম্ভব? চপলতাই যে বয়সের ধর্ম,—সেই বয়সে ঘটনাচক্রে, মতি-গতি বদলে নিমাই ডুবিয়ে দিয়েছিল আপনাকে পড়াশোনার মাঝে।...এখন পিতার ঢালাও হুকুম পেয়ে সে-ও বেপরোয়া হয়ে উঠলো! দুরন্তপণায় আগে যদিই বা পথে ছিল,—এখন একেবারে দাঁড়ালো গিয়ে পথ ছেড়ে।

শচী প্রথমটা চুপ করেই ছিলেন,—এখন নিমাইয়ের উৎপাতের জ্বালায় অস্থির হয়ে অনুযোগ করলেন স্বামীর কাছে,—"লেখাপড়া তো ছাড়িয়ে দিলে ওকে,—কিন্তু দু'দিনেই কি হয়ে উঠেছে,—দেখছো?"

"দেখছি।"—কঠোর দৃঢ়তা ফুটে ওঠে জগন্নাথের কণ্ঠে,—"তা হোক,—তবু আর পড়াশোনার নামও ওকে আমি করতে দেবো না। ছোট ছেলে—উৎপাত করছে একটু,—করুক।"

স্বামীর অনমনীয় ভাব দেখে আর উচ্চবাচ্য করতে সাহস হলো না শচী-দেবীর।...স্বামীর ইচ্ছা বা নির্দেশের ওপর—কোন দিন কোন কথা তোলা বিশেষ অভ্যাসও ছিল না তাঁর!...তা'ছাড়া, নিমাই পড়েশুনে পণ্ডিত হলে বিশ্বরূপেরই পথ ধরবে,—স্বামীর এই যুক্তির কাছে—স্বীয় মতের দৃঢ়তাও যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। তাঁরও মনে মাঝে মাঝে আতঙ্ক জেগে ওঠে,—

তা বিশ্বাসই বা কি ?...বহু শাস্ত্র পড়েই তো বিশ্বরূপ সংসারে বিবাগী হয়ে উঠলো!

১৮

যত দিন যায়,—নিমাইয়ের দুরন্তপণা ততই বেড়ে ওঠে।...পাড়ার সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলাও করে যত,—মারামারিও তার চেয়ে কম করে না কিছু। আবার মার যত না খায়,—মেরে আসে তার চেয়ে অনেক বেশি। সুস্থ-সবল-সর্বাবয়বপুষ্ট—সুদীর্ঘ গঠন বালক নিমাইয়ের সঙ্গে পেরে ওঠা অন্যান্য ছেলের সাধ্যের বাইরে! মারের চোটে কাঁদতে কাঁদতে—কেউ কেউ শচীদেবীর কাছে এসে নিমাইয়ের নামে অভিযোগ করে।—কি আর করেন শচী-দেবী ? নানা মিষ্টকথায় ভুলিয়ে, আদর করে হাতে মোণ্ডা-মেঠাই দিয়ে—তাদের বিদায় করেন।...

আবার শাসন করবারই কি যো আছে তাকে?...তা'হলে ঘরের একটিও বাসন-কোষণ আর আস্ত থাকবে না; জগন্নাথের নজরেও কিছু কিছু পড়ে,—কানেও আসে কিছু কিছু। কিন্তু তিনি—যেন সহসা অসীম ধৈর্যশীল হয়ে উঠেছেন,—দেখেও দেখেন না,—শুনেও শোনেন না!...তবু দু-একসময় তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে বৈকি ? তখন ক্রুদ্ধ হয়ে লাঠি নিয়ে ছোটেন নিমাইকে মারতে। শচীদেবীর হয় উভয় সংকট,—তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে নিমাইকে আড়াল করে দাঁড়ান; বলেন,—'ঐ লাঠি পিঠে পড়লে ও-কি আর বাঁচবে?' নিমাইয়ের কচি মুখ—আর লাঠির বহর—দুটির কথা ভেবে জগন্নাথও যেন চমকে উঠে নিজেকে সামলে নেন।

মজা এই যে,—ছেলেরা নিমাইয়ের কাছে মারও খায়,—আবার নিমাই তাদের নিয়ে খেলা না করলেও মন ভরে না তাদের।...কাল যে বেদম প্রহার খেয়েছে—নিমাইয়ের হাতে—আজ সেই সর্বাগ্রে এসে ডাকে নিমাইকে—খেলা করতে যেতে! হুলের জ্বালা ভুলে বুঝিবা মধুর লোভেই ছুটে আসে তারা। আবার যাকে

নিয়ে নিমাই খেলা করতে চায় না,—তার চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে,—"কেন, আমি তোর কি দোষ করেছি?...তুই-ই তো আমাকে মারলি কাল,—এই দেখ, এখনো হাতে দাগ রয়েছ।"—দাগটা দেখিয়েই আকুতি-ভরা দৃষ্টিতে নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে বলে,—"নিবিনা ভাই, আমাকে সঙ্গে?...তোর পায়ে পড়ি নিমাই,"—এবার যেন কেঁদেই ফেলবে বেচারা।...নিমাইও আর পারে না,—তাড়াতাড়ি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে,—"দূর বোকা, কে বলছে, তোকে নেবো না।"

স্নানের সময় দলবল নিয়ে নিমাই চলে যায় গঙ্গার ঘাটে। সদলে তাকে উপস্থিত হতে দেখে স্নানার্থী নরনারীর বুক কেঁপে ওঠে! যে যত শীগগির পারে—স্নান সেরে উঠে আসে তীরে। কি জানি বাবা, যে ডাকাত ছেলে সব। হাত পায়ে ধরে কাউকে কুমীরের মত টেনেই নিয়ে যাবে—অগম জলে!—এদিকে সর্বাগ্রে নিমাই, পরে একে একে তার অনুচরের দল ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তরঙ্গায়িত গঙ্গার বুকে। দুরন্ত চপল বালকগণের সানন্দ কলরবে—গঙ্গার জলও যেন আনন্দে কলকল ছলছল করে ওঠে।—শিশুর প্রাণখোলা হাস্যরোলে মুখর হয়ে ওঠে পূতসলিলা জাহ্নবীর অনন্তবিস্তার বক্ষ।...তারপর সুরু হয় সাঁতারকাটা, সে কি উদ্দাম সন্তরণ।—হাত-পা আছড়ে গঙ্গার জলকে তোলপাড় করে তোলে সকলে।—পায়ের জল সজোরে ছিটকে পড়ে চারিদিকে,—লাগে স্নানরত নরনারীর মাথায়, মুখে গায়ে—পিঠে—সর্বাঙ্গে।...বিরক্ত হয়ে রূঢ়কণ্ঠে তিরস্কার করতে থাকে সকলে; নিমাইকে উদ্দেশ করে বলে,—বামুন-পণ্ডিতের ঘরে—এই একটি আকাট মূর্খ জন্মেছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? সাথীদের সঙ্গেও নিমাইয়ের দুষ্টামির অন্ত নেই।—কাউকে হয়ত জোর করেই—ডুবিয়ে দেয় জলে,—সে খানিক নাকানি-চোবানি খেয়ে কোন রকমে সামলে ওঠে। আবার মুখে জল ভরে—পিচকারীর মত করে—কারো কানে হয়ত খানিকটা জলই ঢুকিয়ে দেয় নিমাই,—সন্তরণরত কারো পিঠেই হয়ত চেপে বসে সে ঘোড়া চাপা হয়ে,—এমন কত কাণ্ডই যে সে করে,—কে তার ফিরিস্তি দেবে?

গঙ্গাতীরে অসংখ্য স্নানার্থীর মেলা। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থেকে সুরু করে বালক-বালিকা পর্যন্ত। স্নানের পর—মাটির মূর্তি গড়ে—যে যার ইষ্টপূজো করছে।—কিন্তু কার সাধ্য পূজায় মন দেয়? হঠাৎ কারো হয়ত শিবলিঙ্গ নিয়েই ছুটে পালালো নিমাই;—কাউকে বা অস্নাত অবস্থায় গিয়ে আচম্বিতে দিলে ছুঁয়ে,—সে "হাঁ-হাঁ"—করে উঠলো; নিমাই অবশ্য তখন বহুদূরে,—চেপেছে আর কারো ঘাড়ে।

গঙ্গাতীরে সাত থেকে সুরু করে দশ-এগারো বছর বয়সের কুমারী মেয়েরাও নানাবিধ কুমারী ব্রতপূজার অনুষ্ঠান করে। সে বেচারাদেরও নিস্তার নেই নিমাইয়ের উপদ্রব থেকে। হঠাৎ হয়ত ঝড়ের মত তাদের মাঝে গিয়ে পড়ে

বলে,—"এই কার পুজো করছিস তোরা? রাখ ও-সব; নে, আমার পুজো কর, বল, কি চাস? আমিই বর দেবো তোদের।"—বলেই হয়ত সেখানে চেপে বসে যায়।...মেয়েরা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে,—"যা, যা, এখান থেকে। তুই দেবতা নাকি যে, তোর পুজো করবো?"

'দেবতাই তো।'—একান্ত সহজকণ্ঠেই উত্তর দিয়ে জোর করে তাদের সাজি থেকে ফুল নিয়ে নিজেই নিজের মাথায় চাপিয়ে নেয় নিমাই,—'দে এবার—আমার ভোগ দে।—কি, দিবি না?—আর ধৈর্য থাকে না তার, নৈবদ্যের থালা হতে সন্দেশ-কলা স্বচ্ছন্দে তুলে নিয়ে দিব্যি খেতে সুরু করে দেয়। রুক্ষ চোখে রূঢ় দৃষ্টিতে চায় মেয়েরা তার দিকে;—কণ্ঠেও ফুটে ওঠে যথেষ্ট উষ্ণতা —"তোর বড় বাড় বেড়েছে, না?...দাঁড়া আজই গিয়ে তোর বাবাকে সব বলে দেব। ঠাকুরদেবতার নৈবেদ্য কেড়ে খেলি,—বুঝবি মজা পরে।

বেপরোয়া নিমাই। কারো রাগ বা তিরস্কার অথবা ভয়-দেখানো গ্রাহ্যই করে না সে—সেই মুখেই অপর কারো কাছে গিয়ে বলে,—"এই, আমাকে বিয়ে করবি?...দে, তোর ঐ ফুলের মালাটা আমার গলায়,— আমি তোর বর।—একেবারে গলা বাড়িয়ে দেয় সে।" মেয়েটি কিছু লজ্জিত হয়,—আবার রীতিমত শাসাতে থাকে নিমাইকে। নিমাই বলে,—কেন, আমার মত সুন্দর বর পাবি কোথা?...বেশ, বেশ, আমিও শাপ দিচ্ছি,—তোর বুড়ো বর হবে।"—মেয়েটির পিত্তি জ্বলে যায় ওর কথা শুনে। বলে,—"আজই যাব শচী পিসিমার কাছে,—তোর বজ্জাতি বের করে দেব,—ভাল করে।

'আচ্ছা, তাই দিবি।'—নিমাই নির্বিকার। এগিয়ে যায় সে আর একটি মেয়ের দিকে। এ-মেয়েটির নাম লক্ষ্মী, নবদ্বীপেরই বল্লভাচার্যের কন্যা। ...নিমাইকে দেখে এর প্রাণ কিন্তু আনন্দে নেচে ওঠে, অন্যের মত ভয় পায় না সে,—আর নিমাই যা বলে—তাই করে প্রতিবাদের কথা না তুলে, শান্তভাবেই। —নিমাই যদি বলেছে, পুজো করতে। লক্ষ্মী ধীরে ধীরে তার সাজির ফুলগুলো দিয়ে দেয় তার মাথায়।—যদি চেয়েছে নৈবেদ্য খেতে,—লক্ষ্মী অমনি থালাটা তুলে দেয় তার হাতে।...সঙ্গিনীরা তার কাণ্ড দেখে, অবাক। কেউ কেউ বলে.—লক্ষ্মী যে ভারী ঠাণ্ডা মেয়ে,—ওই দস্যুছেলের ভয়েই কাঠ হয়ে গেছে,—তাই যা বলছে, তাই করছে। কি আর করে বেচারা? লক্ষ্মী কিন্তু —পুজোর ফুল আর নৈবেদ্য দিয়ে নিমাইয়ের দিকে শান্ত আয়ত নেত্র দুটি মিলে চেয়ে থাকে,—মুগ্ধা পুজার্থিনীর মত;—নিমাইয়ের চোখের দৃষ্টিও বিহ্বল হয়ে ওঠে। চলে যায় সে অন্যদিকে—পুজায় তুষ্ট দেবতার মতই প্রসন্ন মনে।

কিন্তু রোজ রোজ এত সব উৎপাত-উপদ্রব লোকে আর কত সইবে?—

ক্রমেই নানা অভিযোগ-অনুযোগ আসতে লাগলো জগন্নাথ এবং শচীদেবীর কাছে। অধীর হয়ে উঠলেন স্বামীস্ত্রী উভয়েই—পরের মুখে নিমাইয়ের বিরুদ্ধে নানা রকম অপ্রীতিকর মন্তব্য শুনে শুনে।...শচীদেবীর তো লোককে নানা মিষ্টকথায় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—অথবা সেরূপ পাল্লায় পড়লে ক্ষমা চেয়ে,—অথবা নিমাইকে এবার থেকে রীতিমত শাসন করবেন—কথা দিয়ে—লোককে শান্ত করা একরূপ অভ্যাসই হয়ে গেছে,—কিন্তু জগন্নাথের মাথায় এবার যেন আগুনই জ্বলে ওঠে। চোখের সামনে যা পান,—তাই নিয়ে রুদ্রমূর্তিতে তিনি ছুটে যান গঙ্গার তীর পর্যন্ত,—ক্রোধের আতিশয্যে মনে মনে গর্জে ওঠেন,—আজ হতভাগাকে একেবারে শেষ করে ফেলবো।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যারা উপদ্রুত হয় এমন কি ঐ কুমারী মেয়েরা পর্যন্ত—মিশ্রঠাকুরকে ক্রুদ্ধ মূর্তিতে আসতে দেখলেই ব্যগ্র কণ্ঠে সাবধান করে নিমাইকে,—এই, এই নিমাই, পালা, পালা, ঐ দেখ তোর বাবা আসছে,—মস্ত লাঠি নিয়ে—তোকে মারতে।...চকিতে নিমাই একবার রাস্তার দিকে চায়,—আর তার পরেই এমন দৌড় মারে যে,—একেবারে যেন হাওয়া। কোথায় গিয়ে যে লুকিয়ে পড়ে,—তা একমাত্র সেই জানে।

জগন্নাথ হাঁপাতে হাঁপাতে তীরে পেঁাছে সকলকে জিজ্ঞাসা করেন,—"কই, কোথায় গেল সে হতভাগা?"—ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তিনি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করেন নিমাইয়ের সন্ধানে।...হয়ত কুমারী মেয়েরাই একান্ত সহজ কণ্ঠেই বলে ওঠে,—"কে নিমাই—কই, আজ তো সে আসেনি এখনো।"—মনটা তাদের নিমাইয়ের প্রতি সহানুভূতিতে ভরে ওঠে,—"আহা, অমন সোনার অঙ্গে লাঠি পড়বে!"

জগন্নাথ নিজের কাছে নিজেই যেন কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে আসেন বাড়ী। নিমাই তখন বাড়ীতে লক্ষ্মী ছেলের মত বসে আছে মায়ের কাছেঃ যেন কিছু জানে না। আর এমন নিরীহ ছেলে আর হয় না।...তার মুখের দিকে তাকিয়েই জগন্নাথ যেন বিভ্রান্ত হয়ে ওঠেন; তাঁর চিত্ত দুর্বল হয়ে যায়;—স্নেহ-দুর্বল—পিতৃপ্রাণ ভরে ওঠে মায়া-মমতায়। শচীদেবীর অবশ্য কিছুই বুঝতে বাকী থাকে না।...

১৯

নিমাইয়ের উপদ্রব কিন্তু সমান তালেই চলতে থাকে। সেদিন যতরাজ্যের ফেলে-দেওয়া হাঁড়িকুঁড়ি জড় করে এক মস্ত স্তূপ বানিয়ে নিমাই বসে আছে তার ওপর রাজা-মহারাজার মত।...কোন বিকার নেই মনে। রুচি-অরুচি, শুচি-অশুচির প্রশ্নও যেন তার চিন্তার বাইরে। মণি-মুক্তা-খচিত রত্ন-সিংহাসনে বসেও যেন এত সহজ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না কেউ। দৃশ্যটা সহসা পড়ে গেল শচীদেবীর দৃষ্টিতে।...সর্বাঙ্গ ঘৃণায় রি-রি করে উঠলো তাঁর।—"হাঁ-রে নিমাই."—তিরস্কারের ভঙ্গীতেই তিনি বললেন, আবার তুই এইসব অনাচার করতে সুরু করলি?...বামুনের ঘরের ছেলে তুই,—ছিঃ, ছিঃ, তোর কি ঘৃণাও জাগলো না-রে মনে? জ্ঞান-গম্যি কি তোর কোনদিন হবে না?

'কি করে হবে?'—সুস্পষ্ট ঋজু উত্তর নিমাইয়ের,—"তোমরা আমায় লেখা-পড়া শিখতে দেবে না; 'মুখ্যু' করে ঘরে রেখে দেবে,—আমি কি করে বুঝবো কোনটা ভাল—কোনটা মন্দ? লেখাপড়া না শিখলে কি মানুষের জ্ঞান-গম্যি হয়?—বেশ তো, নাই বা দিলে আমায় পড়তে,—আমারও যা খুশী—তাই করবো, তখন কিন্তু আমায় আর দোষ দিয়ো না।

পাড়ার দু'তিনটি মেয়ে ইতিমধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে।...নিমাইয়ের কথা শুনেই বলে ওঠেন তাঁরা,—তা নিমাই তো ঠিক কথাই বলেছে, নিমাইয়ের মা?...ওর দোষ কি?—তোমরাই তো লেখাপড়া শিখতে না দিয়ে—ওকে মাটি করছো!...আসলে নিমাই তোমার খুবই ভাল ছেলে,—অন্য সব ছেলেকে পড়া-শোনার জন্যে কত সাধ্য-সাধনাই না করতে হয়!—তোমাদের ভাগ্যি যে,—নিমাই নিজে থেকেই পড়তে চাইছে।...জানিনে বাপু, ওর বাপই বা কি বুঝেছেন!

—কথাটা শচীদেবীরও মনে ধরে। এমন কি নিজের পেটের ছেলের মুখে এই কথা শুনে তার ওপর প্রতিবেশিনীদের মন্তব্যে—তাঁর যেন একটু লজ্জাই হয়। তাঁর সমগ্র অন্তর অকুণ্ঠায় স্বীকার করে যে,—বাপ-মা হয়ে তাঁরা কর্তব্যের হানিই করছেন। ছেলেকে মানুষ না করে—একটি অপদার্থই করে

তুলছেন তাঁরা।...না, এ অন্যায় আর চলতে দেবেন না তিনি,—স্বামীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিমাইয়ের পড়াশোনার ব্যবস্থা যে-করেই হোক করবেন।

ব্যগ্রকণ্ঠে ছেলেকে সম্বোধন করে তিনি বলেন,—বেশ, বেশ, তুমি উঠে এসো ওখান থেকে,—আমি কালই তোমার বাবাকে বলে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে তোমার পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেবো।...তুমি লেখাপড়া শিখবে,—পণ্ডিত হবে,—আমরা আর কোনদিন তোমায় বাধা দেবো না।

'সত্যি বলছো তো?'—ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চায় নিমাই, —"না, মিছে কথা বলে আমাকে ভোলাতে চাচ্ছ?"

'না, না, সত্যি বলছি।—মা কি ছেলেকে কখনও ছলনা করে?'

'বেশ।'—নিমাই হাঁড়ির স্তূপ থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বলে,—'আজ তোমার কথামত কাজ করছি, কিন্তু যদি পড়তে না দাও,—এমন উপদ্রব সুরু করবো যে,—তখন বুঝবে সে-কথা!...পড়তে দিয়েই দেখো,—আমি খুব ভাল ছেলে হয়ে যাবো।...তোমাকে কোনদিন জ্বালাবো না,—কোনদিন কোন্ খারাপ কাজ করবো না,—আর এমনি পড়া পড়বো যে,—আমার সঙ্গে কোন ছেলেই পারবে না।

'বেশ বেশ,।'—আনন্দে—আশায় শচীদেবীর মুখে প্রসন্নতা ফুটে উঠলো। ...কথাগুলি যে তাঁর মাতৃপ্রাণের ঐকান্তিক কামনার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি!... উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে তিনি বললেন,—তোমাকে আর কিচ্ছু বলতে হবে না। তুমি আমার সোনা ছেলে। এখন এসো,—আমার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতে যাবে।

নিমাই এবার যেন একান্ত অনুগত হয়ে উঠেছে। সানন্দে মায়ের কাছে এসে শান্ত হাস্যে বললে,—চল।—কিন্তু কালই বাবাকে বলতে হবে।

'একশোবার বলবো!'...

২০

এদিকে জগন্নাথের কাছেও অনেকে নিমাই সম্বন্ধে অনুযোগ করতে সুরু করেছে,—"কি হে পুরন্দর,—এ তোমার কেমন রীতি-নীতি বলো তো? নিজে এত বড় পণ্ডিত হয়ে—ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখতে দিচ্ছ না!...অথচ নিমাই তোমার বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। তোমার দোষেই বেচারা বয়ে যাচ্ছে। ছেলে লেখাপড়া শিখে সন্ন্যাসীই হোক—আর রাজাই হোক,—তুমি কেন পিতার কর্তব্যে অবহেলা করবে?—কাল দিনে জ্ঞানের অভাবে নিমাই যদি চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবি করে বেড়ায়,—তার দায়িত্ব তো তোমারই বাপু।

অনেকের অভিযোগ ও অনুযোগ শুনতে শুনতে, আর নিমাইয়ের অধোগতি দেখে দেখে, জগন্নাথেরও এবার যেন কিছু চৈতন্য হয়েছিল।..."অজাত মৃত মূর্খেভ্যঃ—ইত্যাদি"—শ্লোকটি বার বার জেগে উঠছিল তাঁর মনে।...বিশ্বরূপ লেখাপড়া শিখে—সন্ন্যাসী হয়েছে,—তাতে শুধু তাঁর নিজের নয়,—বংশেরও সুনাম বেড়েছে; কিন্তু—নিমাই মূর্খ জড় হয়ে যদি যাবজ্জীবন এমনি দগ্ধ করতে আরম্ভ করে,—নানা কলঙ্কের কাজ করে বেড়ায়,—তবে কি সে বড় সুখের হবে?—সে-যে সন্ন্যাসী হওয়ার চেয়েও মর্মদাহী,—ছেলে শুধু সংসারে থাকলেই তো সংসার সুখের হয় না,—ছেলেকে মানুষ হতে হবে।—নয় সে ছেলের কি দরকার।...আর তিনি কি চিরদিন বেঁচে থাকতে সংসারে এসেছেন যে,—ছেলেকে নিয়ে ঘর-সংসার করবার মোহে—ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন? শিক্ষিত ছেলে—নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিবিবেচনামত—তার কল্যাণের পথ বেছে নেবে;—তাতে পিতার অগৌরব নেই,—কিন্তু কোন পিতৃত্বের অধিকারে তিনি ছেলের কল্যাণের পথে কণ্টক হয়ে দাঁড়াতে চান?

সুতরাং—জগন্নাথ মিশ্রের মনের এই অবস্থায় শচীদেবীকে আর বেশি বেগ পেতে হলো না—নিমাইয়ের পড়াশোনার ব্যাপারে।...কথাটা স্বামীর কাছে তুলতেই তিনি বললেন,—"তাই হবে, তাই হবে। আমার ভাগ্যে ভগবান যা লিখেছেন, তা তো আর খণ্ডাবে না? আমি কেন বাপ হয়ে ছেলের কল্যাণের পথে বাধা দিই।"

শচীদেবী ভাবতেও পারেননি যে,—এত সহজেই স্বামীর মত বদলাবে। অনায়াসে স্বামীর সম্মতি পেয়ে—আনন্দের সীমা থাকলো না তাঁর।...এতদিনে তিনি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলেন।...ক্ষেত্র যেভাবেই প্রস্তুত হয়ে থাক,—বীজ বপনমাত্র যদি অঙ্কুরের উদ্গম হয়;—তখন কে ভাবতে যায়—ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো কেমন করে?

পরদিনই মিশ্রমশায় নিজে নিমাইকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে।

গঙ্গাদাস ছিলেন ব্যাকরণে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তাই দূর-দূরান্তর থেকে বহু ব্যাকরণশিক্ষার্থী আসতো তাঁর কাছে ব্যাকরণ পড়তে।...তাঁর বহু ছাত্রও বিশিষ্ট বৈয়াকরণ বলে খ্যাতি অর্জন করেছিল দেশে।

তাঁর টোলে বর্তমানে যে-সব ছাত্র পড়ছিল,—নূতন ছাত্র নিমাই-ই হলো তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ। বালক থেকে সুরু করে পঁচিশ-তিরিশ বৎসর বয়স্ক ছাত্রেরা অধ্যয়ন করতো তাঁর টোলে। নিমাই-ও অবশ্য ব্যাকরণই পড়তে সুরু করলো।—সহসা কোন যাদুমন্ত্রে সে যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছেঃ অখণ্ড নিষ্ঠায় সে মগ্ন হয়েছে বিদ্যার্জনে,—অধ্যয়নে নিমগ্ন ধীর প্রশান্ত,—প্রগাঢ় অনুরাগে অনন্যচিত্ত নিমাইকে দেখে মনেও হয় না,—এই সেই দুরন্ত নিমাই,—যার উপদ্রবে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী থেকে গঙ্গাতীর পর্যন্ত অতিষ্ঠ এবং সন্ত্রস্ত-ও।

দিন-কয়েকের মধ্যেই গঙ্গাদাস বুঝলেন তাঁর নূতন ছাত্রটি অসাধারণ প্রতিভাধর বালক।...এত সহজে জটিল ব্যাকরণ-সূত্রের অর্থ—তাঁর বয়স্ক ছাত্রেরাও বুঝতে পারে না।—একটা সূত্র শিখতে শিখতে—নিমাই যেন কোন এক সহজাত শক্তিতে আরো পাঁচটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে ফেলে।...স্বভাবতই মেধাবী—প্রতিভাবান ছাত্রের ওপর গুরুর আকর্ষণ হয় বেশি। যে গ্রহণ করতে পারে,—গুরুর অন্তর যেন—ভাণ্ডার উজাড় করেই দান করতে চায় তাকে। এই একই কারণে শস্ত্রাচার্য দ্রোণের টান ছিল—তাঁর একশত পাঁচ শিষ্যের মধ্যে অর্জুনের ওপর সবচেয়ে বেশি। প্রতিভাধর পিতা তাঁর প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখতে চান উপযুক্ত পুত্রের মধ্যে,—গুরুও তেমনি তাঁর অধীত বিদ্যাকে উজ্জীবিত করে রাখতে চান—তাঁর যোগ্যতম শিষ্যের প্রতিভায়।...

২১

দেখতে দেখতে নিমাই পড়লো নয় বৎসরে। জগন্নাথ তার শুভ উপনয়ন-ক্রিয়ার আয়োজন করলেন।...বহু অধ্যাপক পণ্ডিত আত্মীয়-স্বজন নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন এই আনন্দানুষ্ঠানে।...মুণ্ডিত-মস্তক তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, নিমাই যখন গেরুয়া বস্ত্র পরে—কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি এবং হাতে দণ্ড নিয়ে—দাঁড়ালো এসে শচীদেবীর সামনে ভিক্ষার জন্যে,—তখন নবীন ব্রহ্মচারী পুত্রকে দেখে শচীর মনে হলো,—এ যেন তাঁর পুত্র নিমাই নয়,—কোন দেবশিশু!...চকিতে একবার ব্রহ্মচারী-বেশী বিশ্বরূপকে-ও মনে পড়ে গেল তাঁর।...সে-ও একদিন ঠিক এমনিভাবেই এসে দাঁড়িয়েছিল সর্বাগ্রে তাঁরই কাছে।...চোখ দুটো তাঁর সহসা ঝাপসা হয়ে এলো,—কিন্তু আজ এ-শুভদিনে—নিমাইয়ের কল্যাণের কথা ভেবে তিনি মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে ফেললেন।

বাস্তবিক নিমাইয়ের সর্বাঙ্গে যেন এক দিব্যজ্যোতিঃই ফুটে বেরুচ্ছিল। ...সমাগত সকলেই তন্ময়ভাবে চেয়েছিলেন তার দিকে। ব্রাহ্মণের দশবিধ সংস্কারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কার মাত্র আজ হয়েছে নিমাইয়ের,—কিন্তু নিমাই যেন সহসা যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত তপোপ্রভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

শচীদেবীর পরে—জগন্নাথ থেকে সুরু করে অনেকই ভিক্ষা দিলেন নূতন ব্রহ্মচারীকে।...কে যেন একটি সুপারি ফেলে দিলেন তার ভিক্ষার ঝুলিতে। নিমাইয়ের কি খেয়াল জাগলো,—সে তৎক্ষণাৎ সুপারিটি মুখে পুরে—চিবিয়ে ফেললো। অমনি সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠলো তার,—বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে সে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।...চারিদিক থেকে সকলে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলো—কি হলো, কি হলো? নিমাইয়ের সর্বাঙ্গে তখন অজস্র ঘাম নির্গত হচ্ছে;—চোখে-মুখে কিসের যেন একটা গভীর আবেগ,—মূর্চ্ছা গেলেও অবশ্য কোন মালিন্য নেই তার মুখে,—জগন্নাথ ও শচী দু'দিক থেকে দু'জনে তার কানে—হরি হরি ধ্বনি করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরেই নিমাইয়ের মূর্চ্ছাভঙ্গ হলো। যেন ঘুম থেকে জেগে

উঠলো—নূতন প্রাণশক্তি নিয়ে! অধ্যাপক-পণ্ডিতগণ বললেন জগন্নাথকে,—'দেখ পুরন্দর, মেয়েরা বিশ্বম্ভরের একটি নাম রেখেছে—'গৌরহরি।'...তা ও নামটি—আমরাও বলছি,—ওর উপযুক্তই হয়েছে। ও 'গৌর-হরি'ই বটে।'

একজন কাব্যের পণ্ডিত আনন্দের উচ্ছ্বাসে কৌতুক করে বললেন,—"নিমাই বিশ্বম্ভর, 'গোরা' গৌরহরি, আর অঙ্গ যখন সুগৌর,—তখন 'গৌরাঙ্গ' তো বাচ্যার্থেই ঃ লক্ষ্যার্থে হওয়ারই বা আশ্চর্য কি?" এরপর আরও কত যে নাম হবে!—এই তো সবে ন' বছরের।...এ যে সেই—"অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।"—তাই হলো হে?

—প্রচুর আনন্দে সকলেই হেসে উঠলেন হো-হো করে। স্নেহোজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাইলেন নিমাইয়ের দিকে,—দৃষ্টি দিয়ে ঝরে পড়লো তাঁদের পূত আশীর্বাদের ধারা নিমাইয়ের শিরে।

মূর্চ্ছার মধ্যে নিমাইয়ের অন্তর্চেতনায় কি জেগে উঠেছিল—সেই জানে; সকলে চলে গেলে মাকে ডেকে সে গম্ভীরভাবেই বললে,—"দেখো মা, এখন থেকে তুমি আর একাদশীর দিন ভাত খেয়ো না।

নিমাইয়ের মুখের ভাব দেখে শচীদেবীর মনে কি সম্ভ্রম জাগলো,—তাঁর মনে হলো,—এ যেন নিমাইয়ের কথা নয়; কোন দৈবনির্দেশই ধ্বনিত হলো নিমাইয়ের কণ্ঠে।...কাজেই নয় বছরের ছেলের কথা হেসে উড়িয়ে দেবার সাহস হলো না তাঁর।...সর্বান্তঃকরণ দিয়েই সে-কথা মেনে নিয়ে তিনি বললেন,—আচ্ছা বাবা,—আমি তোমার কথাই এখন থেকে পালন করবো।

২২

—দিনের পর দিন নিমাই পড়াশোনায় সুখ্যাতি অর্জন করতে লাগলো সকলের কাছে।...সকলের কণ্ঠেই এক কথা, এমন বুদ্ধিমান—মেধাবী ছেলে আর দেখা যায় না। নবদ্বীপে অধ্যাপক-পণ্ডিতের অভাব নেই,—সে যেন অধ্যাপক-পণ্ডিতদেরই পুণ্যভূমি। কাজেই ছাত্রেরা যে যার টোলেই পড়ুক,—অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গেও তাদের কিছু কিছু পরিচয় ঘটে,—বিশেষ মেধাবী ছাত্র হলে তো কথাই নেই। বালক নিমাই যে-কোন অধ্যাপক-পণ্ডিতের সঙ্গে একদিনের জন্যও পরিচিতি লাভ করে,—তিনিই শতমুখে প্রশংসা করেন তার।

দেখে শুনে জগন্নাথ ও শচীদেবীর বুক ভরে ওঠে অতুল গৌরবে,—উথলিত আনন্দে।...আজকাল বড় সুখেই নিমাইকে নিয়ে দিন যাচ্ছে তাঁদের।...কিন্তু নিমাই সম্বন্ধে কেমন একটা দুর্বলতা যেন থেকেই গেছে জগন্নাথের অন্তরে। গৃহদেবতা রঘুনাথের সম্মুখে বসে প্রায়ই তিনি প্রার্থনা করেন নিমাইয়ের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ। মাঝে মাঝে নিমাইয়ের অলোক-সামান্য রূপরাশি এবং অপার্থিব সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে চমকে ওঠেন তিনি,—কারো কু-দৃষ্টিতে পড়ে নিমাইয়ের কোন অমঙ্গল হবে না তো?...প্রাণের আকুতি ফুটে ওঠে তাঁর কণ্ঠে প্রার্থনার ভাষায়,—"হে ঠাকুর, হে রঘুনাথ,—নিমাইকে রক্ষা করো সর্ব বিপদ থেকে।"...

সেদিন কিন্তু প্রার্থনার ভাষা বদলে যায়। জগন্নাথ আকুলকণ্ঠে বার বার বলেন রঘুনাথের সম্মুখে,—'হে প্রভু, নিমাই যেন আমার সংসারে থাকে, যেন সন্ন্যাস নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে না যায়?'

শচীদেবী সন্দিগ্ধ চিত্তে সাশ্চর্যে প্রশ্ন করেন,—"এমন প্রার্থনা করছো কেন?"

জগন্নাথ মুখ ফিরিয়ে চাইলেন পত্নীর দিকে,—চোখে তাঁর জল টলটল করছে; "কাল রাত্রে হঠাৎ স্বপ্ন দেখলুম," ভারী কণ্ঠে বললেন তিনি—"নিমাই যেন মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া পরে হাতে দণ্ড কমণ্ডলু নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।"—শেষের দিকে কণ্ঠ উদ্বেল হয়ে ওঠে তাঁর কি যেন বেদনার আবেগে।

শচীদেবীর মনে কথাটা কিন্তু আর সেরূপ রেখাপাত করতে পারে না।... "না, না না,"—কণ্ঠে প্রচুর বিশ্বাস নিয়েই তিনি বলেন—"নিমাই সম্বন্ধে আর ও-সব সন্দেহ করার কিছু নেই। স্বপ্ন কি সত্যি হয় কখনো?...নিমাই যে রকম পড়াশোনার দিকে মন দিয়েছে,—মা-বাপ—নিজেদের ঘরবাড়ী—এসবেরই ওপর তার যে রকম টান,—তাতে তার মনে আর ও-চিন্তাও আসবে না কোন দিন। এ বয়সে বিশ্বরূপের মন কিন্তু ছিল উড়ু-উড়ু,—আমার নিমাইয়ের মন চেপে বসেছে সংসারে। তুমি আর ও-কথা ভেবে মন খারাপ করো না!

হায় রে মায়া-মুগ্ধ জননীর প্রাণ!—কামনাই তার কাম্যবস্তুর রূপ ধরে ভোলাতে চায় তাকে॥

—কিন্তু মানুষ—অন্যের সম্বন্ধে যতই চিন্তা করুক—যতই জানুক, আর যা কিছু কামনাই করুক; সে নিজের কথাটিই জানে না।...জগন্নাথও কি জানতেন তাঁর নিজের কথা?...জানলে আর তাঁর এত ভাবনা-চিন্তা কিসের? কিন্তু মানুষ যা জানে না,—তাই এক দিন রূঢ় সত্য হয়ে দাঁড়ায় তার পক্ষে।...ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্মের—সেই প্রশ্নেরই সমাধান করেছিলেন এক দিন। মরণশীল মানুষ,—নিত্য কত মানুষকেই মরতে দেখে,—নিজের মৃত্যুর কথাটা কিন্তু সে ভাবে না,—মুখে বললেও—অন্তর দিয়ে মানে না। অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে মৃত্যু হাসে,—আর হঠাৎই সে এক দিন পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয় তার কাছে।...সে পরোয়ানা অগ্রাহ্য করে কে?

জগন্নাথেরও বয়স হয়েছিল প্রায় ষাট বৎসর,— শরীরটাও ইদানীং বেশ ভাল যাচ্ছিল না তাঁর,— একদিন শয্যাগত হয়ে পড়লেন তিনি প্রবল জ্বরে। —আর সেই জ্বরই শেষে কালস্বরূপ হয়ে জারী করলো তাঁর মৃত্যুর পরোয়ানা। ঘর-সংসারের মায়া, পত্নীর প্রেম, বিশ্বরূপের বেদনা, নিমাইয়ের চিন্তা,—সব ছেড়ে এবং সবই ভুলে রঘুনাথের নাম করতে করতে যাত্রা করলেন তিনি—শোক-জ্বালা রোগ-তাপ-চিন্তাহীন কোন সুদূরের সেই অজানা দেশে।

এগারো বছরের নিমাই। পিতার মৃত্যুতে—শোকে আকুল হয়ে উঠলো বটে, —কিন্তু ধৈর্য সে হারালো না।...বরং স্বামীশোকাকুলা ধৈর্যহারা মা'কে সান্ত্বনা দিয়ে—পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করলো সে গঙ্গাতীরে—পুত্রের যথোচিত নিষ্ঠায়—প্রতিটি কর্তব্য পালন করে। দুই চোখ দিয়ে তার ঝরঝর করে জল ঝরছে,—বিচ্ছেদাতুর-ব্যথাহত হৃদয় তার—মুহুর্মুহু "বাবা, বাবা" বলে গুমরে উঠছে—কিন্তু কর্তব্যে সে অটল-অচল।—যেন এগারো বছরের ছেলে নয়; পরম-জ্ঞানী কোন সুবিজ্ঞ ধীর ব্যক্তি।...

২৩

"আসুন, আসুন।"—সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে উঠে শচীদেবীকে অভ্যর্থনা করলেন অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিত,—"হঠাৎ আপনি কেন?...কোন খবর থাকলে নিমাইকে দিয়ে বলে পাঠালেই তো হতো?"

নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়েই দুর্বিষহ স্বামীশোক সংবরণ করেছেন শচীদেবী।...বাইরে ধৈর্য ধরে থাকলেও,—পিতৃ-বিয়োগের আঘাত যে নিমাইয়ের বুকে গুরুতরভাবেই লেগেছে—একথা বুঝতে ভুল হয়নি স্নেহবিহ্বলা জননীর। ...তিনি ভেঙে পড়লে, নিমাইও যে ভেঙে পড়বে! তাই তিনি সবকিছু ভুলে —সমগ্র প্রাণ-মন ঢেলে দিয়েছেন নিমাইকে মানুষ করে গড়ে তুলতে।...তাঁর জপমালা হয়েছে যেন,—নিমাই,—নিমাই—নিমাই!...আর নিমাইয়েরও—মা, মা, মা!

পাছে অর্থাভাবে পিতৃহীন পুত্রের পড়াশোনার কোন ক্ষতি হয়, তাই শচী স্বয়ং এসেছেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে। স্বামীর মৃত্যুতে শচীদেবীর সংসার চলাই তো দুষ্কর; অধ্যাপকের দক্ষিণা তিনি যোগাবেন কেমন করে? নিমাইকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখাই যে তাঁর পক্ষে এখন দায়। অথচ তাঁর ইচ্ছা নয়—বহু আদরের বহু সাধের নিমাইয়ের মনে কোন দিক দিয়ে—কোন দুঃখের আঁচ লাগে। পক্ষিণী যেমন পক্ষপুট বিস্তার করে তার শাবককে অসীম মমতায় রক্ষা করে,—তেমনি শচীদেবীও কঠোর আত্মপীড়ন সহ্য করে—নিমাইকে সর্ববিধ দুঃখ-কষ্টের আওতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান। সাংসারিক কোন অভাব-অভিযোগের কথা জানতেও দিতে চান না নিমাইকে।

গঙ্গাদাসের জিজ্ঞাস্যের উত্তরে বললেন শচীদেবী—'দেখুন, আমার নিমাই তো এখন পিতৃহীন, নিঃসহায় বালক; আমার মত সম্বলহীনা বিধবা জননীর কি সাধ্য যে, তার শিক্ষার ব্যাপারে—আপনার সম্মান রক্ষা করি! তাই আমার অনুরোধ,—যদি দয়া করে—পিতৃহারা দরিদ্র বালক বলে—

বাষ্পের আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল শচীদেবীর। ওদিকে গঙ্গাদাস

পণ্ডিত কিন্তু দারুণ কুণ্ঠায় জড়সড় হয়ে উঠেছেন। অতিমাত্রায় ব্যগ্র হয়ে তিনি বললেন,—'সে কি, সে কি? এ-কথা আমাকে বলতে হবে?...এ যে আমাকে বড় লজ্জায় ফেললেন আপনি। নিমাইয়ের মত ছাত্র পাওয়াই যে অধ্যাপকের গৌরব,—তার মহাভাগ্যের কথা।...আপনার নিমাইকে পড়িয়ে আমি যে অক্ষয় ধন অর্জন করবো,—তার তুলনা কি রাজার ভাণ্ডারেও আছে?...নিমাইয়ের মত ছাত্র পেলে—একটি কেন—আমি পাঁচটিকেও তুচ্ছ অর্থের কথা না ভেবে সাগ্রহেই পড়াতে পারি।...যান, যান, আপনি বাড়ী যান; নিমাইকে শিক্ষাদানের নৈতিক দায়িত্ব আমার নিজেরই। আপনি এ-বিষয়ে আদৌ চিন্তা করবেন না।'

অধ্যাপকের উদারতায় শচীদেবীর বুকের ভেতরটা এতক্ষণে যেন হালকা হলো। পণ্ডিতের সম্মুখে গোটা কতক কৃতজ্ঞতার বাণী বলে তাঁর এতবড় সহৃদয়তাকে আর খর্ব করতে চাইলেন না শচীদেবী। মনে মনে ভগবানের কাছে অধ্যাপকের মঙ্গল কামনা করতে করতে ফিরে এলেন তিনি গৃহে। একটা পরম স্বস্তিতে তাঁর অন্তর তখন ভরে উঠেছে;—তাঁর নিমাই তাহলে বিদ্বান হবে—পণ্ডিত হবে,—তাঁর মুখ উজ্জ্বল হবে,—আঃ, কি তৃপ্তি!

ভাবীকালের বুকে যাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন,—সেই কৃষ্ণানন্দ, কমলাকান্ত, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতিও তখন গঙ্গাদাসের টোলে অধ্যয়ন করতেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন—বয়সে নিমাইয়ের চেয়ে অনেক বড়। এই মুরারি গুপ্তকেই নিমাই—পাঁচ বৎসর বয়সে—শিশুসুলভ চাপল্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো তাঁর অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করে।—এখন কিন্তু সে সোজা তাঁকে আহ্বান করে—তর্কযুদ্ধে—পঠিত ব্যাকরণ শাস্ত্রের সূত্রাদি নিয়ে;—কমলাকান্ত এবং কৃষ্ণানন্দকেও বাদ দেয় না। বালকজ্ঞানে তাঁরা নিমাইকে অবহেলা করেন। নিমাই তবু ছাড়ে না। ফলে একদিন মুরারির সঙ্গে তার রীতিমত তর্কই বেধে গেল। পরাজিত হলেন মুরারি,—সাশ্চর্যে চাইলেন তিনি নিমাইয়ের মুখের দিকে,—অমনি মনে পড়ে গেল তাঁর সাত বছর পূর্বের কথা. —এবং ঠিক সে-দিনেরই মত তিনি মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকলেন নিমাইয়ের পানে। ...নিমাইয়ের মুখে ফুটে উঠেছে তখন এক অপার্থিব দিব্যজ্যোতিঃ!

শাস্ত্রপাঠ আর শাস্ত্রালোচনা,—এ ছাড়া নিমাইয়ের যেন আর কোন কাজ ছিল না। বয়স যত বাড়ছিল,—বিদ্যার্জনের স্পৃহাও তত বেড়ে উঠছিল তার। সকাল বেলায় সে টোলে অধ্যয়ন করতো।...বিকালে চলে যেতো গঙ্গাতীরে বেড়াতে।...সেখানে দেখা হতো—বহু অধ্যাপক, পণ্ডিত এবং পাঠার্থীর সঙ্গে। ...সকলের সঙ্গেই চলতো তার শাস্ত্রালাপ; এমন কি কারো কারো সঙ্গে শাস্ত্র-যুদ্ধও বেধে যেতো। প্রতিপক্ষ যদি বৈষ্ণব হতো—তা সে যে বয়সেরই হোক, তবে তো তাকে পেয়ে বসতো নিমাই। নানা কূটতর্কে তাকে পরাস্ত করে—

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে একেবারে নাজেহাল করে ছাড়তো।...আক্রোশটা যেন বৈষ্ণবদের ওপরই বেশি! অন্যমতাবলম্বী কারো সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তার বড় বেশি বাক-বিতণ্ডা হতো না। হলেও তারা সহজেই রেহাই পেতো নিমাইয়ের হাত থেকে।—

—তেরো চৌদ্দ বছর বয়সেই নিমাই ব্যাকরণের একখানি টীকা প্রণয়ন করে। ...অধ্যাপক-পণ্ডিত-অধ্যুষিত নবদ্বীপে—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদের লেখা বই চালানোও ছিল দুঃসাধ্য।...কিন্তু নিমাইয়ের টীকা এমনি যুক্তিগর্ভ এবং সুচিন্তিত হয়ে উঠেছিল যে,—বড় ছোট প্রায় সকল অধ্যাপকের স্বীকৃতি লাভ করে,—সে টীকা চলে যায় নবদ্বীপের শিক্ষা-সমাজে। ক্রমে তা—নবদ্বীপের বাইরেও বহুস্থলে সমাদর লাভ করে। একজন কিশোর ছাত্রের এই অসামান্য কৃতিত্বে অবাক হয়ে যায় সকলে।—কণ্ঠে কণ্ঠে নিমাইয়ের খ্যাতি প্রচারিত হতে থাকে দিকে দিকে।

—গঙ্গাদাস পণ্ডিত গর্বভরে বলেন,—'হবে না?...কার ছাত্র তা দেখতে হবে তো?...আবার ছাত্রই বা কেমন,—তাও দেখতে হবে! বাইরের রূপ সৌন্দর্যও যেমন অলৌকিক,—ভেতরের মানুষটাও যে তেমনি অসাধারণ!'—বলতে বলতে গৌরবে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো অধ্যাপকের।

ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত হলে গঙ্গাদাস একদিন জিজ্ঞাসা করলেন,—'এবার কি পড়তে চাও নিমাই।'

"আজ্ঞে,"—মাথা নত করে সবিনয়ে উত্তর দিলে নিমাই—'ন্যায়' পড়বার ইচ্ছা আছে।

তা বেশ তো,—গঙ্গাদাস সানন্দেই সম্মতি জ্ঞাপন করলেন,—"তাহলে সার্বভৌম মহাশয়ের টোলেই ভর্তি হয়ে যাও।"

—"আজ্ঞে, তাই হবো।"

বাসুদেব সার্বভৌমই তখন নবদ্বীপে ন্যায়ের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক। এমন কি বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনার প্রবর্তকই তিনি। কাব্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হয়ে অনেকে আসতেন তাঁর কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে।...নিমাইও একদিন এসে ভর্তি হলো তাঁর টোলে।...কিন্তু অল্পবয়স্ক বলে সার্বভৌম মশায় বড় বেশি লক্ষ্য রাখতেন না নিমাইয়ের ওপর।...ন্যায়ের মত একটি সুকঠিন বিষয় ঐটুকু ছেলে আর কি বুঝবে?—এখন টোলে যাতায়াত করুক,—ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশায় কিছুটা মার্জিত হোক, পরে দেখা যাবে।

—কিন্তু অধ্যাপক তত দৃষ্টি না রাখলেও—টোলের ছাত্রদের দৃষ্টি বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হলো নিমাইয়ের দিকে। আলাপ-আলোচনায় তারা কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝে নিলে—এ একটি অসামান্য প্রতিভা।...'দীধিতির' গ্রন্থকার

রঘুনাথ ছিলেন এই ছাত্রদের অন্যতম।...বয়সে খানিকটা বড় হলেও অল্প দিনের মধ্যেই রঘুনাথের সৌহার্দ্য গড়ে উঠলো নিমাইয়ের সঙ্গে। কিন্তু আর এক দিক দিয়ে তিনি মনে মনে কিছু বিমর্ষও হয়ে উঠলেন। বস্তুতঃ রঘুনাথও ছিলেন প্রতিভাবান যুবক। তাঁর একান্ত আশা, ভবিষ্যতে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলে খ্যাতি লাভ করবেন। কিন্তু নিমাইয়ের প্রতিভার কাছে—নিজেকে বড়ই নিষ্প্রভ মনে হলো তাঁর।...চন্দ্রালোক যতই উজ্জ্বল ও নির্মল হোক, সূর্যালোক প্রকাশের পর—তার ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে যায়।...রঘুনাথ ভাবলেন,—নিমাইয়ের প্রতিভা বিকাশ পেলে—তাঁর প্রতিভা নিঃসন্দেহে ম্লান হয়ে পড়বে। কিন্তু তা বলে নিমাইয়ের প্রতি তাঁর কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব জাগলো না—এবং তা জাগবার সুযোগও পেলো না—নিমাইয়ের স্বভাব-মাধুর্যে, তার অকপট প্রীতি ও ভালবাসায়।

রঘুনাথ তখন থেকেই ব্রতী হয়েছিলেন—তাঁর ন্যায়গ্রন্থ দীধিতির রচনায়। হঠাৎ একদিন তিনি শুনলেন,—নিমাইও লিখতে সুরু করেছে একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ। শুনেই চমকে উঠলেন তিনি,—নিমাই ন্যায়ের গ্রন্থ লিখলে—তাঁর গ্রন্থ কি আর চলবে?—উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন নিমাইকে,—"ভাই বিশ্বম্ভর, তুমি না-কি একটি ন্যায়গ্রন্থ লিখতে সুরু করেছ?"

মৃদু হেসে উত্তর দিলে নিমাই,—"চেষ্টা তো করছি একটু একটু করে,—কিন্তু কেমন হচ্ছে কে জানে?...আমি আর ন্যায়ের কতটুকুই বা জানি!"

নিমাই তার রচনার ওপর সেরূপ গুরুত্ব না দিলেও রঘুনাথ নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তাঁর সুদৃঢ় ধারণা,—নিমাই সহজাত প্রতিভার অধিকারী,—অধ্যাপকের সেরূপ সাহায্য না পেলেও তার লেখনীমুখে যা আসবে,—তা অবজ্ঞার তো নয়ই,—বরং অন্যের রচনাই তার কাছে অবজ্ঞাত হয়ে পড়বে।... ঔৎসুক্য চাপতে না পেরে রঘুনাথ বললেন,—"আচ্ছা বিশ্বম্ভর,—তোমার লেখা আমাকে একটু পড়ে শোনাবে ভাই?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—একশোবার শোনাবো।"—একান্ত সরলভাবেই উত্তর দিলে নিমাই,—"কাল আমি খাতাখানা নিয়ে আসবো। তারপর—নৌকো করে গঙ্গার বুকে বেড়াতে বেড়াতে আমি পড়বো,—তুমি শুনবে।"

'বেশ, তাই হবে'—উত্তর দিলেন রঘুনাথ।

পরদিন অপরাহ্নে,—গঙ্গার বুকে নৌকায় বসে—নিমাইয়ের রচনা শুনতে শুনতে—মুখখানা ম্লান-পাণ্ডুর হয়ে উঠলো রঘুনাথের। হঠাৎ তাঁর দিকে চেয়ে নিমাই দেখলো,—কে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে তাঁর সারা মুখে,—চোখের কোণেও জল টলটল করছে তাঁর।

'কি হলো, কি হলো রঘুনাথ?'—ব্যগ্রকণ্ঠে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলো

নিমাই,—"বেশ তো শ্রুনছিলে,—হঠাৎ তোমার হলো কি?...ও-কি? একেবারে কে'দে ফেললে যে?...না, না, বল, বল, কি হয়েছে তোমার!"—দারুণ ব্যাকুলতায় সে একখানা হাত চেপে ধরলো রঘুনাথের।

'ভাই বিশ্বম্ভর,'—চোখ মুছে ভারীকণ্ঠে উত্তর দিলেন রঘুনাথ,—তবে শোন, কেন হঠাৎ আমি এত বিচলিত হয়ে উঠেছি। আমিও একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ লিখতে সুরু করেছি, আমার বড় আশা ছিল,—আমার গ্রন্থই—ন্যায়ের শ্রেষ্ঠ-গ্রন্থ বলে চলবে দেশে; এবং আমিই ন্যায় শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলে খ্যাতি লাভ করবো।...কিন্তু তোমার রচনা শুনে, আমার সে-আশা সমূলে নির্মূল হয়েছে।...তোমার গ্রন্থ থাকতে—আমার গ্রন্থ কেউ পাতা উলটেও দেখবে না।

"ওঃ, এই কথা!"—নিতান্ত হেলাভরেই নিমাই বললে,—"এর জন্যে তুমি একেবারে ছেলেমানুষের মত কে'দে ফেললে! তা বেশ তো,—আমার গ্রন্থ থাকতে যদি তোমার জীবনের এত বড় একটি সাধ অপূর্ণ থাকে,—তোমার সকল পরিশ্রম বিফল হয়,—তখন আমার গ্রন্থ নেই বা থাকলো?...ভাই, শান্ত হও। তোমার অন্তরে আঘাত দিতে আমি চাই না। তোমার গ্রন্থই জগতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাক,—ন্যায়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলে তোমার খ্যাতিই কাল-জয়ী হোক।—এই দেখ, তোমার কীর্তি-পথের কণ্টক,—আজ আমি তোমার সামনেই দূর করে দিচ্ছি।—সবেগে টান মেরে নিমাই তার খাতাখানি ছুড়ে ফেলে দিলে গঙ্গার বুকে।

—'নিমাই—নিমাই!'—আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠে রঘুনাথ বাধা দিতে গেলেন নিমাইকে। কিন্তু তার পূর্বেই নিমাইয়ের খাতাখানি তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ গঙ্গার অতল তলে অন্তর্হিত হয়েছে। নিমাইয়ের কত বিনিদ্র রজনীর চিন্তা-ধারা,—কত সুচিন্তিত সারগর্ভ যুক্তিজাল,—তার অসামান্য প্রতিভার কত চির-দীপ্ত স্বাক্ষর—কত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অমর নিদর্শন,—যা কালির আখরে—কালের বুকে চিরদীপ্ত চিহ্ন রাখতে পারতো,—তা ধুয়ে মুছে—ঐ খাতাখানির সঙ্গে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল—গঙ্গার জলে!

নির্বাক—নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকলেন রঘুনাথ নিমাইয়ের মুখের দিকে,—এত বড় প্রাণ বিশ্বম্ভরের বুকে?...নিমাইয়ের মুখে কিন্তু বিকার বা বিষণ্ণতার কোন চিহ্নও ছিল না। বরং এক স্নিগ্ধ শুভ্র প্রসন্নতায় তার চোখ দুটি যেন হাসছিল সিক্ত পদ্মপলাশের মতই—কারুণ্য-রসে অভিস্নাত হয়ে।

২৪

"অদ্ভুত ছেলে যা'হোক!—এত কম বয়সে নিজে টোল খুলে বসলো হে? —সাহস বটে!"—বললেন জনৈক পণ্ডিত রাজপথে চলতে চলতে—তাঁর সঙ্গী আর-এক পণ্ডিতকে।

সঙ্গী উত্তর দিলেন,—"তা সাহস আছে বৈ-কি? ঐ বয়সে—বিশেষ নবদ্বীপের মত জায়গায় অধ্যাপক হয়ে বসা কি সোজা কথা? আবার দিনের পর দিন টোলের জম-জমাট দেখছো!...মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে ছাত্র যেন আর ধরে না,—ছুটে আসছে সব নিমাই পণ্ডিতের কাছে পড়বে বলে। কে যে অধ্যাপক,—আর কে-যে ছাত্র,—চেনবার যো নেই। কোন কোন ছাত্রই হয়ত বড় হবে—অধ্যাপকের চেয়ে!—হা-হা-হা, মজা বটে!"—হেসে উঠলেন তিনি তরল কৌতুকে।

"আরে এই তো সেদিনকার ছেলে,"—বললেন প্রথম পণ্ডিত প্রত্যুত্তরে.—"বয়স আর কতোই হবে?—না হয় আঠারো উনিশই হোক।—কিন্তু অধ্যাপনা যখন করে তখন বাইরে থেকে শুনে কে বলবে,—ওর বয়সী একটি ছেলে পাঠ দিচ্ছে। মনে হবে,—কোন প্রবীণ অধ্যাপকই পড়াচ্ছেন ছাত্রদের। সরল-ঋজু-দীর্ঘ সুগঠিত দেহ,—গায়ের রঙ টক টক করছে, ঢলঢলে চোখ,—মুখখানা ঝলমল করছে প্রতিভার জ্যোতিঃতে। ললাটে অধ্যাপকের গাম্ভীর্য! ছাত্রেরা হাঁ-করে অধ্যাপকের দিকে চেয়ে—শোনে তার কথা।

দ্বিতীয় পণ্ডিতটি একটু কৌতুকপ্রিয়। তিনি হাসতে হাসতেই বলেন,—"ছাত্রদের কথা কি,—আমাদের মত বুড়ো পণ্ডিতদেরই মনে হয়,—দু'দণ্ড চেয়ে চেয়ে দেখি—ঠাকুর-দেখার মত। হা-হা-হা। এ এক নূতন কিছু দেখলাম হে। নবদ্বীপে এত কম বয়সে—আর কেউ কোনদিন টোল খুলতে পারেনি!

আসল কথা,—নিমাই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে টোল খুলে বসেছে।...গঙ্গার জলে সে শুধু তার ন্যায়-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিই বিসর্জন দেয়নি,—সেই সঙ্গে বিসর্জন দিয়েছে—ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের অদম্য স্পৃহাও।...তার এ ত্যাগ রঘু-

নাথের অনুকূলে কি-না বলা যায় না; কিন্তু সে আর কারো টোলে কোন শাস্ত্রই অধ্যয়ন করতে না গিয়ে নিজেই—অধ্যাপকের আসন অধিকার করেছে।...প্রথম প্রথম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিল অনেকে; বিরুদ্ধ আলোচনাও চলেছিল পাড়ায় পাড়ায়,—কিন্তু কিছুদিন না যেতে যেতেই সে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রূপান্তরিত হয়েছে বিস্ময়ে—সম্ভ্রমে এবং শ্রদ্ধায়।...নিজের বাড়ীতে সেরকম জায়গা না থাকায়—নিমাই 'মুকুন্দ সঞ্জয়' নামে এক ধনী ব্রাহ্মণের চণ্ডীমণ্ডপ চেয়ে নিয়েছে তাঁর কাছে টোলের জন্যে। প্রচুর আনন্দেই এবং নিজেকে ধন্য মনে করেই সঞ্জয় দিয়েছেন নিমাইকে সে অধিকার।

নবদ্বীপে বড় বড় পণ্ডিতের টোল ছিল অসংখ্য; কিন্তু তবু নিমাইয়ের টোলের উন্নতি হচ্ছে দিনের পর দিন,—তার অধ্যাপনার খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে—বায়ু-চালিত কুসুম-সৌরভের মতোই।

নিমাই এখন আর নিমাই নয়,—চতুষ্পাঠীর গণ্যমান্য অধ্যাপক,—নিমাই পণ্ডিত!

শচীদেবীর সংসারে এখন আর অভাব বা অস্বচ্ছলতা নেই; অধ্যাপনায় নিমাই-পণ্ডিতের নামও যেমন বাড়ছে, অর্থাগম হচ্ছে সেই পরিমাণে।...সংসারে ক্রমেই লক্ষ্মীশ্রী উথলে উঠছে।

নবদ্বীপে তখন পণ্ডিতদের প্রচুর সম্মান,—এক-কথায় তাঁরাই সমাজের শীর্ষস্থানীয়। রাজা-জমিদার অথবা কোন ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও দোলায় চড়ে যেতে যেতে—পথে কোন অধ্যাপক-পণ্ডিতকে দেখলে স-সম্ভ্রমে দোলা থেকে নেমে—তাঁকে অভিবাদন করেন। পণ্ডিতদের উপেক্ষা করে যাবার মত ধৃষ্টতা বা ঔদ্ধত্য কোন ধনী-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরই নেই।...বয়সে অল্প হলেও—নিমাই-পণ্ডিতও—পদাধিকার-গৌরবে—সে সম্মানের অধিকারী। বরং বয়স তাঁর কম বলে সম্ভ্রান্ত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁর গুণ ও পদের প্রতি সম্মান জানাতে অন্তরে কেমন একটা স্নেহজ আনন্দও উপলব্ধি করেন।

ছেলের দিকে চেয়ে চেয়ে শচীর বুক আজ ভরে উঠেছে আশা-ভরসায়—প্রচুর শান্তি এবং আনন্দে। শোক-তাপ সবই যেন ভুলে গিয়েছেন তিনি। যৌবনারম্ভে নিমাইয়ের রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে উঠেছে চতুর্গুণ।...নীরোগ সুগঠিত দীর্ঘ দেহ,—স্বাস্থ্যপ্রাচুর্যে এবং প্রাণশক্তিতে ভরপুর, দেখলে মনে হয় পূর্ণ যুবক। থেকে থেকে শচীর মনে জাগে এক অদম্য কামনা।...ঠিক এই সময়েই যেন তাঁর কামনার বাস্তব রূপ দিতেই বনমালী ঘটক নিয়ে এলেন নিমাইয়ের বিবাহের প্রস্তাব শচীদেবীর কাছে।

কন্যা বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী। এ-সেই লক্ষ্মী,—দুর্দান্ত বালক নিমাই গঙ্গাতীরে গিয়ে কুমারীদের কাছে পুজো চাইলে—যে স্বচ্ছন্দে চাপিয়ে দিতো

তার ফুল, নিমাইয়ের মাথায়, তুলে দিতো ঠাকুরদের নৈবেদ্যের থালা তার হাতে, —আর নিমাইও প্রসন্ন দেবতার মত—চাইতো তার দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে।

আকাশের চাঁদ যেন নেমে এলো শচীদেবীর হাতে। তাঁর কত সাধের নিমাইয়ের বিয়ে। এ-শুভদিনের প্রতীক্ষায় তিনি যে কি অধীরে দিন কেটেছেন,—তা কি অন্যে জানে! লক্ষ্মীকেও তাঁর দেখা আছে,—নামেও লক্ষ্মী,—রূপে-গুণেও লক্ষ্মী।...তবু নিমাই বড় হয়েছে—তার মনটা একটু বুঝে দেখা দরকার বৈ-কি?...হাজার হোক যোগ্য ছেলে।—"ওরে ও নিমাই,"—আদরে ছেলেকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন শচী,—"বনমালী তোর বিয়ের সম্বন্ধ এনেছে। পাত্রী লক্ষ্মী,—লক্ষ্মীর সঙ্গে তো কত খেলাই করেছিস ছেলেবেলায়?—করবি ওকে বিয়ে?"—মৃদু হাসি ফুটে উঠলো তাঁর ঠোঁটের কোণে, স্বরেও যেন মিশে রয়েছে একটু পুলকিত কৌতুকের সুর।

'তা আমাকে আর কি জিজ্ঞাসা করছো মা?'—উত্তর দিলেন নিমাই সরলভাবেই—"তুমি যা ভাল বুঝবে,—আমার তাই ভাল।...আর লক্ষ্মীও তো ভালো মেয়ে!"

ব্যস।...কাজ শেষ হয়েছে শচীদেবীর। আর পাত্র-পাত্রীরও পরস্পর হৃদয়-নিবেদন হয়ে গেছে সেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরেই। মহানন্দে শচীদেবী আপন সম্মতি জানিয়ে ঘটককে উপযুক্ত সম্মানসহ বিদায় দিলেন।—আর তার পরেই শীঘ্রই এক শুভদিনে—পুণ্য লগ্নে উভয়-পক্ষের সাগ্রহ কামনায় শুভ-কার্যও সম্পন্ন হয়ে গেল সমারোহে।...পরম স্নেহে ও আদরে শচীদেবী গৃহ-লক্ষ্মীপদে বরণ করে নিলেন—লক্ষ্মীকে।

এরপর ছেলে বৌ নিয়ে শচীদেবীর দিন কাটতে লাগলো প্রগাঢ় শান্তিতে। নিমাই সংসারী হয়েছে—ঘরআলো-করা বৌ এসেছে তার,—নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে চারিদিক—সঙ্গে সঙ্গে সমাগমও হচ্ছে প্রচুর; সুতরাং শচীদেবীর যেন আর কিছুরই অপূর্ণতা নেই,—সংসার স্বর্গ হয়ে উঠেছে যেন—সর্বাঙ্গীন পূর্ণতায়।

কিন্তু অধ্যাপক হিসাবে যতই সুনাম হোক নিমাই-পণ্ডিতের,—টোলের বাইরে—তিনি ঠিক বাল্যের মতই চপল এবং চঞ্চল। রাস্তায় ছুটাছুটি করতে মোটেই বাধে না তাঁর,—কারো পিছু পিছু দৌড়ে তাকে ধরে ফেলতে, তাঁর কুণ্ঠার লেশও নেই; ডুব-সাঁতার দিয়ে গঙ্গা পার হওয়া, উদ্দাম সন্তরণে স্নানার্থিগণকে বিব্রত করে তোলা, এগুলি যেন তাঁর নিত্যকার অভ্যাস।...বিরক্ত হয়ে অনেকে অনেক কথাই বলে,—এমন কি গালমন্দও কেউ কেউ দেয় তাঁকে। কিন্তু তিনি নির্বিকার,—রাগ যেন নেই তাঁর শরীরে।

তারপর রাস্তায় যদি সে-রকম কাউকে পেয়েছেন অমনি তার সঙ্গে লেগে

যাবেন শাস্ত্রযুদ্ধ। প্রতিপক্ষ বেশ জানে,—নিমাই-পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কে পারবে না,—সে পালাবার পথ খোঁজে,—কিন্তু নিমাই-পণ্ডিতের কাছে কি সহজে নিস্তার আছে?

মুকুন্দ দত্ত বৈদ্যের ছেলে,—শ্রীহট্টে বাড়ী,—নবদ্বীপে এসেছে অধ্যয়নের জন্যে—বৈষ্ণব এবং সুগায়কও বটে। অদ্বৈতাচার্যের সভায় কীর্তনগান করে। তাকে যদি দেখতে পেয়েছেন নিমাই-পণ্ডিত,—তার পিছু পিছু ছুটেও ধরে ফেলবেন তাঁকে।—আর তার পরেই যেহেতু বেচারী বৈষ্ণব,—সেহেতু তাকে জেরায় জেরায় করে তুলবে অস্থির।

সেদিন নিমাই-পণ্ডিতকে—ছাত্রদলসহ পথে দেখতে পেয়েই—মুকুন্দ গা-ঢাকা দিয়ে পালাচ্ছিল অন্য পথ ধরে।...ধর, ধর ধর—চীৎকার করে ওঠেন নিমাই,—মুকুন্দ তখন অবশ্য সরে পড়েছে অনেক দূরে। ছাত্রদের দিকে চেয়ে বলেন নিমাই-পণ্ডিত,—ওটা আমাকে দেখে পালায় কেন জান? যেহেতু ও বৈষ্ণব,—আর বৈষ্ণবশাস্ত্র পড়ে।...আর আমি ওদের মত বৈষ্ণব না হয়ে শাস্ত্রচর্চা করি,—তাই আমাকে ভাবে—পাষণ্ড।...কিন্তু দেখো, ওকে আমি কিছুদিন পরে এমন বাঁধনে বাঁধবো যে,—আমাকে ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না।...আর ওরা এমন কি বৈষ্ণব হয়েছে?—আমি এমন বৈষ্ণব হবো যে,—স্বয়ং শিব এসেও দাঁড়াবেন আমার দ্বারে।

হো-হো করে হেসে ওঠেন নিমাই-পণ্ডিত। ছাত্ররাও যোগ দেয় সে-হাসিতে,—তবে মনে মনে ভাবে,—তাদের অধ্যাপক বোধ হয় ঠাকুর দেবতা মানেন না।—নইলে শিবের নামে অত বড় কথা বলেন!

মাধব মিশ্রের ছেলে গদাধর,—বয়সে নিমাইয়ের চেয়ে ছোট। ন্যায়ের ছাত্র,—স্বভাবটি সরলা বালিকার মতই মধুর—কোমল;—কৃষ্ণপ্রেমানুরাগী। তাকে দেখতে পেলেই নিমাই-পণ্ডিত সাগ্রহে তার দুই হাত চেপে ধরে—আর তারপরেই সুরু করেন শাস্ত্রীয় তর্ক। গদাধরেরও কেমন একটা আকর্ষণ আছে নিমাইয়ের প্রতি,—কিন্তু তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রযুদ্ধে লিপ্ত হতে বুক দুরু দুরু করে তার। নিমাইয়ের অন্তরের গভীরেও গদাধরের প্রতি যেন একটি প্রীতি আছে,—তাই অনেক অনুনয়-বিনয় করে গদাধর রেহাই পায় তার কাছে। নিমাই বলেন প্রীতিভরে,—আবার কাল যেন তোমার দেখা পাই গদাধর। তর্কের ভয়ে গদাধর তখন পালাতে পারলেই বাঁচে।

যারা দেখেনি কখনো নিমাই-পণ্ডিতকে,—শুধু তাঁর নামই শুনেছে,—তারা হঠাৎ তাঁকে দেখলে চোখ তাদের কপালে ওঠে,—অ্যাঁ, এই নিমাই-পণ্ডিত! এত বড় অধ্যাপক!...এত সুনাম!...এ যে দেখছি চণ্ডালের শিরোমণি,—নিতান্ত অল্পবয়স্ক এক তরুণ,—অধ্যাপনা করে কিভাবে!

কিন্তু এইখানেই নিমাই-পণ্ডিত বিচিত্র মানুষ!—পথচারী নিমাই-পণ্ডিত —আর টোলে অধ্যাপকের আসনে উপবিষ্ট নিমাই-পণ্ডিত,—দুই যেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি।—অধ্যাপনার সময় তাঁর সে সৌম্য শান্ত-গম্ভীর ভাবের দিকে চাইলে মন ভরে ওঠে সম্ভ্রমে—শ্রদ্ধায়। বৃদ্ধ অধ্যাপকগণও তখন তাঁর সামনে বসে শাস্ত্রালোচনা করতে ইতস্ততঃ করেন,—ছাত্রদেরও এমন সাধ্য থাকে না,—যে বিন্দুমাত্র তারল্য বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করে।

মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এসেছেন নবদ্বীপে বেড়াতে।... পরম কৃষ্ণভক্ত,—কৃষ্ণপ্রেমে চোখ দুটি সদাই সিক্ত হয়ে আছে!...হঠাৎ পথে দেখলেন একদিন নিমাই-পণ্ডিতকে। নিমাই কিন্তু তাঁর নাম শুনেই ভক্তি-ভরে প্রণাম করলেন তাঁকে,—একদৃষ্টে চেয়ে থাকলেন ঈশ্বরপুরী নিমাই-পণ্ডিতের দিকে,—দেখতে দেখতে তাঁর প্রাণ নেচে উঠতে লাগলো আনন্দে; অথচ এ-আনন্দ কিসের তাও খুঁজে পান না, তাঁর মনে হলো,—এ-বালক যেন কোন যোগসিদ্ধ পুরুষ,—যেন এক অতীন্দ্রিয় শক্তির আধার।

মৃদুহাস্যে বললেন নিমাই, শ্রীপাদ, আজ আমার বাড়ীতে আপনাকে দয়া করে ভিক্ষা করতে হবে। তাহলে আমাদের পরস্পরকে দেখবার যথেষ্ট সুযোগ হবে।

ঈশ্বরপুরীও হাসলেন। সানন্দেই স্বীকার করলেন নিমাইয়ের আমন্ত্রণ। এমন বহু সাধু-সজ্জনকেই নিমাই-পণ্ডিত বাড়ীতে ডেকে এনে তৃপ্তিভরে ভোজন করান তাঁদের,—ভারী আনন্দ পান তাতে; শচীদেবীও অতিথি-পরি-চর্যায় প্রীতিলাভ করেন প্রচুর।...ফলে নিজের সাংসারিক ব্যয়ের চেয়ে নিমাই-পণ্ডিতের আয় অনেক বেশী হলেও—সঞ্চয় তাঁর হয় না একটি পয়সাও।

পরম আনন্দে ঈশ্বরপুরী ভিক্ষা করলেন সেদিন নিমাই-পণ্ডিতের বাড়ীতে। তার পরেও ক'দিন তিনি থেকে গেলেন নবদ্বীপে। কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্ব নিয়ে এক-খানি বই লিখছিলেন তিনি তখন। প্রতি দিন নিমাই-পণ্ডিত গদাধরকে নিয়ে তাঁর রচনা শোনেন বিশেষ আগ্রহ করেই। শ্রীপাদ বলেন,—পণ্ডিত, তোমার বয়স অল্প হলেও তুমি জ্ঞান-বৃদ্ধ,—আমার গ্রন্থে যদি কোন দোষ পাও,—সরলভাবেই আমাকে তা বলে দিও। আমি তোমার মত অনুযায়ী সংশোধন করে নেবো।

নিমাই-পণ্ডিত বলেন,—শ্রীকৃষ্ণের কথা, ভক্তের লেখা, এতে দোষ ধরে, এমন শক্তি কার?

অবিরত বিদ্যাচর্চা—আর অধ্যাপনা, শাস্ত্রালাপ,—বেশ দিন কাটছিল নিমাই-পণ্ডিতের; কিন্তু হঠাৎ তাঁর কি-হলো, তিনি বারবারই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন,—কখনো মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন।

শচীদেবীর হলো দারুণ চিন্তা,—প্রবল উদ্বেগ। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বললেন,—বায়ু কুপিত হয়েছে। বিষ্ণুতৈল মাখাতে হবে।

অবিলম্বে বিষ্ণুতৈল সংগ্রহ করে পুত্রের সর্বাঙ্গে মাখাতে লাগলেন শচী-দেবী। কিছু দিন মাখাতে মাখাতে আরোগ্য লাভ করলেন নিমাই-পণ্ডিত। শচীদেবীর প্রাণও শান্ত এবং নিরুদ্বেগ হলো। বেশি দিন ভাবতে হলো না তাঁকে সে-ব্যাপার নিয়ে। তিনি ভাবলেন,—হঠাৎ কোন শারীরিক অনিয়মেই রোগটা হয়েছিল নিমাইয়ের। কিন্তু এখন থেকে ছেলের স্বাস্থ্যের ওপর যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি পড়লো তাঁর!

২৫

—নিমাই-পণ্ডিত এসেছেন পূর্ববঙ্গ সফরে। শচীদেবী অবশ্য সহজে তাঁকে ছেড়ে দিতে চাননি; মাকে নানা কথায় প্রবোধ দিয়ে তবে আসতে হয়েছে তাঁকে। এর আগেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে। তাঁর ব্যাকরণের টীকা—পড়তো এখানকার ছাত্রেরা। অনেকের মনে মনে এমন সংকল্পও জেগেছিল,—নবদ্বীপ যাবে নিমাই-পণ্ডিতের টোলে পড়তে।

—সেই নিমাই পণ্ডিত—স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন শুনে—দলে দলে সেখানকার ছাত্রগণ আসতে লাগলো তাঁর কাছে।...সবিস্ময়ে দেখলো তারা,—যাঁর অধ্যাপনার খ্যাতি এত বিস্তৃত,—তিনি এক অল্প বয়স্ক তরুণ,—রূপ তাঁর অলোক-সামান্য,—প্রতিভার সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃতে প্রদীপ্ত তাঁর ললাট—ব্যবহার তাঁর যেমন মধুর—তেমনি প্রীতিপদ।...দেখে যেন চক্ষু সার্থক হলো সকলের।

ছাত্রেরা আসতে আসতে—আসতে লাগলো জনসাধারণ,—বৃদ্ধ বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া,—যুবক-যুবতী—বালক-বালিকা! চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল—নিমাই পণ্ডিতের নামে। এখানে যিনি এসেছেন—তিনি চঞ্চল,—কৌতুক-তরল,—তার্কিক নিমাই-পণ্ডিত নন,—যথেষ্ট ধীর নম্র-বিনয়ী সৌম্য শান্ত—গম্ভীর,—স্বীয় সুনামের অম্লান-প্রতিমূর্তিরূপেই এসেছেন তিনি এখানে।

বাল্যে যে নিমাই হরি নামে মত্ত হয়ে নাচতে নাচতে অপরকেও নাচিয়ে তুলতো হরি নামে; হরি নামের প্রতি সহজাত আকর্ষণের জন্যে—শিশু বয়সেই যার নাম রেখেছিল মেয়েরা "গৌরহরি,"—আজ তরুণ যৌবনে সেই নিমাই ঘোর তার্কিক, শাস্ত্রবেত্তা এবং বাহ্যতঃ বৈষ্ণববিদ্বেষী 'নিমাই পণ্ডিত' হয়ে উঠলেও —অন্তরে অন্তরে তিনি ছিলেন, শচীমার গৃহাঙ্গনে নৃত্যরত সেই "শিশু নিমাই।"—

তাই বুঝি তাঁর উপস্থিতির প্রভাবে এবং তাঁকে স্পর্শ করে সহসা এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটে গেল পূর্ববঙ্গ-অঞ্চলে। সেখানকার লোক—সজ্জন-দুর্জন নির্বিশেষে যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে মেতে উঠলো হরি-নাম-সংকীর্তনে।

তপন মিশ্র—নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, সাধু লোক,—সহসা একদিন এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন নিমাই পণ্ডিতকে,—"আমি মায়া-বন্ধনে পড়ে আছি,"—গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন তিনি—আপনি আমাকে দয়া করে উদ্ধার করুন।...আমি স্বপ্ন দেখেছি, আপনি নারায়ণের অবতার।

"না, না, না,"—দারুণ কুণ্ঠায় উত্তর দিলেন নিমাই,—"ও-কথা বলতে নেই, জীবে ভগবৎ-বুদ্ধি মহাপাপ। আপনি "হরে কৃষ্ণ" নাম জপ করুন,—আর কাশীতে গিয়ে বাস করুন।—সেইখানেই ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে আপনার দেখা হবে।

দ্বিধাশূন্য চিত্তে গভীর বিশ্বাসে তপন মিশ্র মেনে নিলেন নিমাই পণ্ডিতের নির্দেশ অলঙ্ঘ্য বেদবাক্যের মতই।—এবং শীঘ্রই এক শুভ দিনে আয়োজনাদি করে বেরিয়ে পড়লেন—বিশ্বেশ্বরের চরণরেণুপূত—পুণ্য ধাম কাশীর উদ্দেশে।

দেখতে দেখতে একদিন-দু'দিন করে কয়েক মাসই কেটে গেল নিমাই-পণ্ডিতের পূর্ব-বঙ্গ-অঞ্চলে। কেউ যেন তাঁকে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। অবশেষে সকলের অনুরাগের বন্ধন কেটে—একদিন সন্ধ্যার সময় এসে পেঁছলেন তিনি নবদ্বীপের প্রান্তে।

সঙ্গে এসেছে বহু ছাত্র—শিষ্য,—প্রচুর জিনিষ-পত্র টাকাকড়ি,—বস্ত্রালঙ্কার। ...রীতিমত লোকজনের সাহায্যেই বয়ে নিয়ে যেতে হলো সে-সকল জিনিষ বাড়ীতে।

কিন্তু এ-কি?...কি যেন সন্দেহ জাগলো নিমাইয়ের মনে। বাড়ীর আব-হাওয়া এমন থম-থমে কেন?...কোথাও যেন—আনন্দের চিহ্ন নেই,—সর্বত্র একটা নিরানন্দের ছায়া। মায়ের স্নেহোজ্জ্বল মুখখানি মলিন,—বিষণ্ণ,—চোখ দুটিও ভার ভার! তাঁর কত সাধের নিমাই প্রবাস থেকে এতদিন পরে ফিরেছে বাড়ীতে, —অথচ তিনি আনন্দে ছুটে এলেন না প্রসন্ন হাসিমুখে,—নিমাই,—নিমাই—

বলে ?—কি হয়েছে তবে ?...যেন ছেলের সামনে আসতেও কেমন ইতস্ততঃ করছেন তিনি !...

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই কিছু বুঝতে বাকী থাকলো না নিমাইয়ের,—তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং তীক্ষ্ন বুদ্ধি সহজেই সে রহস্য ভেদ করে ফেললে।... "বুঝেছি মা," অবিচলিত ভাবে ধীর কণ্ঠেই তিনি বললেন শচীদেবীকে,—"তোমার বৌমার কিছু অকল্যাণ ঘটেছে,—তাই তুমি মুখ তুলে আমার দিকে চাইতেও পারছো না।"

শচীর অন্তরটা উদ্বেল হয়ে উঠলো ব্যথার তাড়নায়। মুখে কিছু কথা ফুটলো না তাঁর! বুকের ভাষা যেন কণ্ঠ ঠেলে মুখে আসতে পারছে না।... নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পাড়ার যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদেরই একজন বলে উঠলেন,—হাঁ,হাঁ. তাই বটে বিশ্বম্ভর, ঠিকই ধরেছ তুমি।...হঠাৎ তাকে সাপে কাটে,—অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল—বাঁচিয়ে তুলতে,—কিন্তু তোমাকে আর কি বোঝাবো,—যার আয়ু শেষ হয়েছে,—তার জীবনের আশা করা বৃথা। 'কালই' সাপ হয়ে কেটেছিল তাকে।

নিমাই পণ্ডিতের অন্তর প্রবলভাবেই আলোড়িত হয়ে উঠ্‌লো,—লক্ষ্মীর—শুচি-শুভ্র কোমাল কচি সুন্দর মুখখানি একবার চোখের সামনে ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠলো তাঁর,—অশ্রুও ছাপিয়ে উঠতে চাইলো চোখের কোণে,—কিন্তু মুহূর্তে তিনি আত্মসংবরণ করে—মাকে বললেন সান্ত্বনা দিয়ে,—"কিন্তু আর দুঃখ করে কি করবে মা,—দুঃখ করলে সে তো আর ফিরবে না।...তার ভাগ্য ভাল ছিল,—তাই সে এতশীঘ্র সংসার-বন্ধন কেটে চলে গেছে!"—একটা উদ্‌গত দীর্ঘ নিশ্বাস—রোধ করে তিনি চলে এলেন প্রসঙ্গান্তরে।

২৬

পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে আসার পর নিমাই পণ্ডিতের টোলের ছাত্র সংখ্যা —অন্যান্য টোলের থেকে অনেক বেশি হয়ে উঠলো। ছাত্রদের কেমন যেন একটা সুদৃঢ় নিষ্ঠা এসে গেছে,—নিমাই পণ্ডিতের টোলেই পড়বে।—তাঁর কাছে অধীত-অনধীত বলে কিছু নেই,—তিনি সর্বশাস্ত্রেই সুপণ্ডিত। বয়সে তরুণ বলেই যেন তাঁর গৌরব আরও বেড়ে গেছে। অর্থাগমও হচ্ছে সেই অনুপাতে সুপ্রচুর।

কিন্তু আশ্চর্য যে,—যে নিমাই পণ্ডিত পূর্ববঙ্গে গিয়ে প্রশান্ত ও গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন সমুদ্রের মত,—নবদ্বীপে ফিরেই তিনি আবার তেমনি চঞ্চল হাস্য-মুখর—এবং কৌতুক-তরল হয়ে উঠলেন। যেন বেশ বদল করে গিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গে —ফিরে এসে আবার ধারণ করলেন পূর্বের বেশ। পূর্ববঙ্গের ব্যাপারটা যেন রহস্যচ্ছন্ন হয়ে সকলের অজ্ঞাতেই থেকে গেল।

*   *   *   *

সন্ধ্যা সবে উত্তীর্ণ হয়েছে, জ্যোৎস্না-প্লাবিত পুণ্য জাহ্নবীর তীরে বসে ছাত্রদের সঙ্গে হাস্যপরিহাস্যে শাস্ত্রালাপ করছেন অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিত। সহসা এক হুঙ্কার ছেড়ে সেখানে এসে দাঁড়ালেন—মহাপণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী। নাম তাঁর কেশব,—নিবাস কাশ্মীরে। অগাধ তাঁর ধন-সম্পত্তি। বিপুল আড়ম্বরেই ঘুরে বেড়ান এখানে ওখানে। সঙ্গে বিস্তর লোকজন,—এমন কি হাতী-ঘোড়াও থাকে। যেন শাস্ত্র যুদ্ধে নয়,—শস্ত্রযুদ্ধেই বেরিয়েছেন। পাণ্ডিত্যে তিনি সমগ্র ভারতের পণ্ডিতবর্গকে পরাজিত করে—বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন দিগ্বিজয়ী বলে। এবার এসেছেন নবদ্বীপে। নবদ্বীপ পরাজিত করলেই তাঁর দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হবে।

কিন্তু নবদ্বীপ পরাজিত করা তখন বড় সহজ ছিল না। দিগ্বিজয়ী বহু পণ্ডিত ছিলেন তখন নবদ্বীপে।...কিন্তু মজা এই যে, তিনি তর্কযুদ্ধে পণ্ডিত-সমাজকে আহ্বান জানালে,—একটা গুজব রটে যায়,—যে তিনি

সরস্বতীর বরপুত্র, বিচার-বিতর্কের সময় স্বয়ং সরস্বতী-আবির্ভূতা হন তাঁর কণ্ঠে।...শুনেই তো নবদ্বীপের পণ্ডিতদের মুখ ম্লান হয়ে উঠলো—পরাজয়ের আশঙ্কায়।...বাপ, সরস্বতীর সঙ্গে কে শাস্ত্র যুদ্ধ করবে! মানুষ যত বড়ই পণ্ডিত হোক,—তার সঙ্গে বিচার চলে,—তাতে কেউ পেছ-পাও নয়,—কিন্তু স্বয়ং সরস্বতীর সঙ্গে?—অসম্ভব কথা!...কিন্তু নবদ্বীপের সম্মান তো রাখতে হবে। বড়ই চিন্তিত হয়ে উঠলেন—নবদ্বীপ পণ্ডিত-সমাজ!'

দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীরী কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী না পেয়ে—বেড়াতে বেড়াতে চলে এলেন গঙ্গাতীরে। এসেই দেখলেন কয়েকজন এক জায়গায় বসে শাস্ত্রালাপ করছে। পূর্বেই তিনি শুনেছিলেন নিমাই পণ্ডিতের নাম।...কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা শুনে বুঝতেও পারলেন,—এঁদের মধ্যে—নিমাই পণ্ডিত কে?

জিজ্ঞাসা করলেন—নিমাইয়ের দিকে চেয়ে,—"তুমি নিমাই পণ্ডিত!"—স্বল্প বয়স্ক দেখেই তিনি—কিছুটা অবহেলা ভরেই সম্বোধন করলেন 'তুমি' বলে।

সবিনয়ে উত্তর দিলেন নিমাই পণ্ডিত,—"হাঁ, আমাকেই লোকে 'নিমাই পণ্ডিত' বলে।...আপনি?"

—"আমি পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী।" গর্ব উছলে উঠলো তাঁর কণ্ঠে! নাম শুনেই সশিষ্য নিমাই উঠে দাঁড়ালেন সম্ভ্রমে,—"আসুন, আসুন,—আমার মহাভাগ্য, তাই আপনার দর্শন পেলাম!"

"কিন্তু"—ভ্রূকুটি করে বললেন কেশব কাশ্মীরী,—আমি এসেছি শাস্ত্র যুদ্ধে সমগ্র ভারত জয় করে নবদ্বীপে;—আমার উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছি আমি। কিন্তু নবদ্বীপের কেউই যেন সাহস করে এগিয়ে আসতে পারছে না আমার সামনে; আর যদিও তোমার নাম আছে,—তবু তো দেখছি তুমি নিতান্ত বালক,—তোমার সঙ্গে আবার কি বিচার করবো?...তুমি তো ব্যাকরণ পড়াও?

'আজ্ঞে, পড়াবার আমি আর কি জানি?'—নম্র কণ্ঠেই উত্তর দেন নিমাই—"আমার জ্ঞানই বা কতটুকু?...তবে ছেলেরা আমাকে ভালবাসে,—তাই আমার কাছে পড়ে।—কিন্তু কি যে পড়াই,—আর কি-ই যে তারা পড়ে—তার কিছুই বুঝি না।...কোথায় আপনি দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী,—আর কোথায় আমি নগন্য অল্পবয়স্ক ব্যাকরণের শিক্ষক।...আমার কি সাধ্য,—আপনার সঙ্গে শাস্ত্রীয় তর্ক করি?

নিমাইয়ের বিনয়ে, তার ওপর আত্মপ্রশংসা শুনে বিশেষ প্রীত হলেন—পণ্ডিত কেশব,—"তোমার নম্রতায় সুখী হলাম।"—বললেন তিনি একটু গর্বের ভাবেই,—"কিন্তু বড় পণ্ডিত হিসাবে তোমারই নাম তো এখন শুনছি নবদ্বীপের

কণ্ঠে কণ্ঠে",—তোমার যদি আমার সঙ্গে তর্ক করার সাধ্য না, থাকে,—তবে আমাকে জয়পত্র লিখে দেবার ব্যবস্থা কর।"

—"আজ্ঞে, তা দিতে হবে বৈ-কি?"—নিমাই পণ্ডিতের স্বর পূর্বের মতই ধীর ও নম্র,—"তবে কি-না, মহাভাগ্যে যখন আপনার দর্শন পেয়েছি,—তখন আমাদের একটু ধন্য করতে হবে। সম্মুখেই প্রবাহিতা কলনাদিনী কলুষ-নাশিনী পুণ্যতোয়া জাহ্নবী,—আপনি দয়া করে—গঙ্গার মাহাত্ম্য-সূচক একটি স্তোত্র রচনা করুন,—আমরা শুনি।...এমন সৌভাগ্য আবার কবে হবে, তা তো জানি না!

দাম্ভিক ব্যক্তিমাত্রেই—আত্মপ্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। পণ্ডিত কেশবও বলা বাহুল্য,—নিজেকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলে দম্ভ রাখেন; তাই-তিনিও উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন,—"ভাল, ভাল,—তোমার যখন এত আগ্রহ,—আর আমার কবিত্ব-শক্তির পরিচয়ও তোমাদের একটু দেওয়া প্রয়োজন,—তখন শোনঃ

গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে—মুখে মুখে তদ্দণ্ডেই রচনা করে—ঝড়ের মত এক দীর্ঘ স্তোত্র—আবৃত্তি করে গেলেন পণ্ডিত কেশব।...কোথাও এতটুকু আটকালো না,—কোথাও নিমেষের জন্যে ভাববার অবকাশ নিলেন না। শক্তি তাঁর প্রকৃতই অসাধারণ,—পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের গর্ব তাঁর অসার নয়। স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাঁব দিকে তাকিয়ে থাকলো নিমাইয়ের ছাত্রগণ! অবশ্য নিমাই পণ্ডিত নিজে সেরূপ বিস্মিত হলেন না। না হলেও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন পণ্ডিত কেশবের,—"আপনার ক্ষমতা অসামান্য।—এরূপ কবিত্বশক্তি সত্যই দুর্লভ,"—পবে অনুনযের সুরেই বললেন,—এখন নিবেদন, আপনার শ্লোকের কিছু অংশ ব্যাখ্যা করে আমাদের শোনান।—

'বেশ,'—গর্বিত সন্তোষেই বললেন কেশব,—'বল, কোন্ অংশ ব্যাখ্যা করবো?"

নিমাই পণ্ডিত বললেন,—

মহত্ত্বং গঙ্গায়া সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চবণকমলোৎপত্তি সুভগা।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুবনরৈবর্চ্চ্য চরণা
ভবানী ভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুত গুণা॥

দয়া করে—আপনি এই অংশের ব্যাখ্যা করুন।

সবিস্ময়ে চাইলেন পণ্ডিত কেশব নিমাইয়ের দিকে,—আমি ঝড়ের মত স্তোত্র পাঠ করলাম,—তুমি এরই মধ্যে বর্ণে বর্ণে কণ্ঠস্থ করলে কেমন করে?

মৃদু হাসলেন নিমাই পণ্ডিত,—দেখুন, দেবী সরস্বতীর বরে কেউ কবি হয়,—কেউ বা আবার স্মৃতিধর বা শ্রুতিধর হয়ে থাকে।

'তুমি নিশ্চয়ই শ্রুতিধর।'—মুক্ত কণ্ঠে বললেন পণ্ডিত কেশব,—তোমার এ শক্তিও বিস্ময়ের। যাক,—ঐ অংশ গুণ-সম্পদে কি অপূর্ব—তা এখন শোন।"—তিনি বিশদভাবেই উক্ত শ্লোকের গুণাংশ নিয়ে ব্যাখ্যা করলেন।

"ভারী কৃতার্থ হলাম।"—আবার বললেন নিমাই,—"এখন ওর মধ্যে যদি কিছু ত্রুটি বা দোষের থাকে, দয়া করে তা বুঝিয়ে দিন।"

'দোষের ?'—তীব্রদৃষ্টিতে চেয়ে রুক্ষ মেজাজেই বললেন কেশব,—এর মধ্যে দোষ কোথায় ?—আমার রচনায় দোষ ?—আর যদিই কিছু থাকে,—তুমি তার কি বুঝবে ?...তুমি ব্যাকরণের পণ্ডিত,—ব্যাকরণ তো শিশুর পাঠ্য; কিন্তু কাব্যের দোষগুণ বিচার—অলঙ্কারশাস্ত্রের ব্যাপার।—সে শাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হলে তা বোঝাও যায় না। তুমি অলঙ্কার পড়নি,—

"না, আমি অলঙ্কার পড়িনি।"—কথার মাঝেই নম্র ভাবে স্বীকার করলেন নিমাই পণ্ডিত,—"কিন্তু শুনেছি। শুনেও তো কিছু কিছু জ্ঞান লাভ হয় ? সেই সামান্য জ্ঞানেই আপনার শ্লোকের দু' একটি ত্রুটির কথা আলোচনা করছি। যদি আমার বুঝতে ভুল হয়ে থাকে,—দয়া করে আপনি আমার অজ্ঞতা খণ্ডন করে দেবেন।

আপনার শ্লোকে 'মহত্ত্বং গঙ্গায়া' বলায়— বিধেয়াংশ প্রধানরূপে নির্দিষ্ট হয়নি, একে "অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ" দোষ বলে। তা-ছাড়া,—'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব' না বলে "শ্রীলক্ষ্মী দ্বিতীয়া ইব" বললেই বিধেয়ের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকতো, আর 'ভব' শব্দের অর্থ শিব। তাঁর পত্নী 'ভবানী' শব্দের অর্থ—শিবপত্নী বা শিবানী। কিন্তু ভবানীভর্তৃ বললে,—'শিবপত্নীর পতি' এইরকম বোঝায়,—এবং নিঃসন্দেহে শিব ছাড়া অন্য কোন পতিকেই উদ্দেশ করে।—এমনি আরও অনেক ত্রুটির কথা উল্লেখ করে নিমাই বললেন,—এখন আমার বিচার যদি ভুল হয়,—তবে আপনি আমার ভুল খণ্ডন করে আমাকে কৃতার্থ করুন।

সহসা পণ্ডিত কেশবের মুখ ম্লান হয়ে উঠ্‌লো। যেন জ্বলন্ত প্রদীপ ফুৎকারে নিভে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে—দৃপ্ত কণ্ঠেই স্বীয় পক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন—নানাভাবে। কিন্তু তাঁর কূট ব্যাখ্যা এবং বাকচাতুর্যে কোন ফলই হলো না। সকল যুক্তি খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল নিমাই পণ্ডিতের কাছে!...অতঃপর তিনি উত্তেজনায় নানা অসংলগ্ন অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বহু লোকই জমে গিয়েছিল সেখানে। সকলের সম্মুখে—এক অল্পবয়স্ক তরুণের নিকট এই দারুণ পরাজয় পাণ্ডিত্য-গর্বী কেশব কাশ্মীরীর অন্তর ক্ষোভে, অপমানে, ঘৃণায়

লজ্জায় জর্জরিত করে তুললো। হতবাক—নতশির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি স্তব্ধভাবে।

এদিকে নিমাই পণ্ডিতের ছাত্রদের তখন উল্লাসের অন্ত নেই।...পণ্ডিতের অবস্থা দেখে—তাদের কণ্ঠে ফুটে উঠ্‌লো বিদ্রূপের ভাষা।...রুক্ষদৃষ্টিতে চাইলেন নিমাই তাদের দিকে,—"ছিঃ, তোমরা সম্মানী ব্যক্তির সম্মান বোঝ না! আমার ছাত্র বলে পরিচয় দাও কি করে?"—

কেশব কাশ্মীরীর দিকে ফিরে একান্ত বিনয়ে বললেন,—"আপনি এই তরলমতি বালকগণকে ক্ষমা করুন। আমি স্বীকার করছি, আপনি অসাধারণ কবি ও পণ্ডিত। আমি আপনার শিষ্যেরও যোগ্য নই। কবিত্ব শক্তি থাকাই গৌরবের, সে শক্তি আপনার যথেষ্টই আছে। কিন্তু তার মধ্যে ত্রুটি থাকা কিছুমাত্র লজ্জার বিষয় নয়। মহাকবি কালিদাস এবং ভবভূতির কাব্যেও দোষ-ত্রুটি আছে। আপনার গঙ্গাস্তোত্রে যদি দু' একটা ত্রুটিই থাকে,—আপনার কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই। বয়সে, শাস্ত্রজ্ঞানে, অভিজ্ঞতায়—সবদিক দিয়েই আপনি আমার প্রণম্য। যাক্‌,—আজ রাত হয়েছে,—এখন গিয়ে বিশ্রাম করুন। কাল আপনার সঙ্গে আবার শাস্ত্রালাপ করবো।

বিজয়ীর এই বিনয়-সৌজন্যে পণ্ডিত কেশবের আহত চিত্তে কিছু শান্তি ফিরে এলো।...যাঁকে বালক এবং শিশু—শাস্ত্র ব্যাকরণের পণ্ডিত বলে অবহেলা করেছিলেন; তাঁরই কাছে আজ তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্যের গর্ব ধূলিসাৎ হয়েছে। কিন্তু তাঁর শিষ্টাচারে এবং সৌজন্যে তিনি প্রীত না হয়ে পারলেন না। অন্তরে যে জ্বালা জ্বলে উঠেছিল তীব্রভাবে,—তাও যেন কিছুটা শান্ত হলো। . তবে মুখে তাঁর আর কোন কথা ফুটলো না। নীরবেই ধীরে ধীরে ফিরে গেলেন তিনি নিজের বাসায়।

রাত্রিটা কিন্তু কাটলো তাঁর বিনিদ্রভাবেই। শুয়ে শুয়ে তিনি জ্ঞানবিদ্যার দেবী সারদার চরণচিন্তা করতে লাগলেন।—আহতচিত্ত সন্তান যেন মায়ের কাছে সান্ত্বনা খুঁজছে। ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়তেই তিনি স্বপ্ন দেখলেন,—যেন সিতপদ্মাসনা—মরালবাহিনী—শুভ্রবর্ণা দেবী—স্বমূর্তিতে এসে বলছেন,—"তুমি যাঁর কাছে পরাজিত হয়েছো,—তিনি সামান্য মানুষ নন্‌,—ঐশী শক্তির আধার,—তাঁর কাছে পরাজয়ে লজ্জা নেই। তিনি আমারও বন্দনীয়। তুমি তাঁকেই আত্মসমর্পণ কর। তবেই মুক্তির সন্ধান পাবে।

ঘুম ভাঙতেই তিনি তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে ছুটে এলেন নিমাই পণ্ডিতের কাছে। আজ আর তাঁর সে দম্ভ নেই। নিমাই পণ্ডিতও আজ তাঁর কাছে—সামান্য বালক নয়। কোন এক পরম সত্যের আলোকে সরে গেছে তাঁর মনের কোণের যত মোহ-অন্ধকার; যেন কোন দৈব-লব্ধ প্রজ্ঞার

প্রজ্বলিত অনলে পুড়ে গেছে,—অন্তর-নিরুদ্ধ যত মদ ও মাৎসর্যের জঞ্জাল। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে—একটি নির্মল প্রশান্তি।

নিমাই পণ্ডিতকে নমস্কার করে বললেন তিনি,—দেখুন, কালরাত্রে স্বপ্নে আমি আপনার "স্বরূপ" জেনেছি। অবিরত বিচার বিতর্ক করে করে আমার জিগীষাবৃত্তি সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সর্বদা জয়লাভ করে—জয়ের মোহে —প্রকৃত জয়ের পথ যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে আমার চোখের সম্মুখে। আপনি আমার এ মোহবন্ধন ছিন্ন করে—আমার উদ্ধারের পথ করে দিন।

ভাবাবেগে তিনি একেবারে নিমাই পণ্ডিতের পায়েই লুটিয়ে পড়লেন। 'হাঁ-হাঁ-হাঁ, ও-কি, ওকি,'— বলতে বলতে নিমাই বিপুল ব্যগ্রতায় তাঁকে হাত ধরে তুললেন,—"আসুন এদিকে,"—একটু নিভৃতে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কয়েকটি কথা বললেন তাঁর কানে কানে। কিন্তু কি বললেন,—তা তিনিই জানেন,—আর পণ্ডিত কেশবই জানেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই কেশব কাশ্মীরী বাসায় ফিরে—তাঁর সঙ্গে যা কিছু ছিল—অন্যকে অকাতরে বিলিয়ে দিলেন। তারপর নিজের লোকজনদের বিদায় দিয়ে—কৌপীন পরে দণ্ডকমণ্ডলু হাতে—চিরতরে বেরিয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশের পথে।.........

২৭

এর পর নিমাই পণ্ডিতের নাম নিয়ে হৈ-হৈ করতে লাগলো সকলে।... নবদ্বীপের মান রেখেছেন নিমাই পণ্ডিত,—ওকে 'বাদিসিংহ' উপাধি দেওয়া উচিত, কেউ বলে,—'বাদসিংহ' নয়,—তর্ক-কেশরী। যে কোন সভা-সমিতিতে, মজলিশে,—গঙ্গাতীরে—টোলে টোলে এমন কি ঘরে ঘরেও শুধু নিমাই পণ্ডিতের কথা। কোন কোন রসিক ব্যক্তি আবার কৌতুক করে বললে,—বেচারা 'দিগ্বিজয়ী' কি ভেবেছিল,—নিমাই পণ্ডিতের পাল্লায় পড়লে,—মনের ধিক্কারে একেবারে কৌপীন পরে বেরুতে হবে!

কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের কোন উচ্ছ্বাস নেই,—কোন অহঙ্কার নেই মনে, —হয়ত নিজের হাস্য-কৌতুক-প্রবণতায় ভুলেই গেছেন সে-কথা।...কবে—কি

একটা তর্ক করে গঙ্গাতীরে তিনি সারা বাংলাদেশের মুখ রক্ষা করেছেন,—কার গরজ পড়েছে সে-কথা ভাবতে! সদা চঞ্চল—নিমাই-পণ্ডিত তেমনি হাস্য-পরিহাসে ভেঙে পড়ছেন,—রাস্তায় ছুটোছুটি করছেন,—গঙ্গায় ডুব-সাঁতার দিচ্ছেন।

ঊনবিংশ বৎসরের যুবা;—একে তো অলৌকিক রূপরাশি,—অপার্থিব সৌন্দর্য নিয়েই এসেছেন সংসারে;. তার ওপর যৌবনারম্ভে সে রূপসম্ভার বসন্তাগমে রসালকুঞ্জের মতই বর্ণনাতীত সৌন্দর্যে উথলে উঠছে। মাথায়,—ঘন ভ্রমর-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশদাম—নেমে এসেছে পিঠের দিকে ঘাড়ের নীচে,—মাঝে লম্বা চেরা সিঁথি,—পরণে পট্টবস্ত্র,—স্বর্ণ-শুভ্র প্রশস্ত বক্ষের ওপর বিলম্বিত শুভ্র উপবীত,—গলায় উত্তরীয়—বাম হাতে পুঁথি,—মুখে অকপট সুমধুর মৃদু হাসি,—নিমাই পণ্ডিত অপরাহ্নে যখন শিষ্যবর্গ নিয়ে—পথে ঘুরে বেড়ান,—তখন তাঁর দিকে চেয়ে যেন তন্ময় হয়ে যায় সকলে। সৎ এবং সুন্দর কিছু দেখলে, প্রাণে যেমন অনাবিল আনন্দের ধারা ছুটে যায়,—নিমাই পণ্ডিতকে দেখেও হতো ঠিক তেমনি। পথে সহসা কোন স্ত্রীলোককে দেখলে—নিমাই কিন্তু মুহূর্তে ধীর শান্ত হয়ে উঠতেন,—শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে দাঁড়াতেন পাশ কেটে।

শ্রীবাস পণ্ডিত নিমাইয়ের পিতৃবন্ধু,—তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মালিনী ভালবাসতেন তাঁকে আপন পুত্রের মতই। শিশুকাল থেকেই নিমাই ছিলেন তাঁদের পরম প্রীতির পাত্র। শ্রীবাসের বড় আশা ছিল,—বৈষ্ণবের ছেলে নিমাই বৈষ্ণব হবে; হবে কৃষ্ণ প্রেমানুরাগী,—এবং নিমাইয়ের মত অসাধারণ প্রতিভা যদি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যোগ দেয়,—তাহলে তাঁদের আশাভরসা যে দশগুণ বেড়ে যাবে,—প্রতিপক্ষের কণ্ঠে বিদ্রূপের ভাষা আর ফুটবে না,—এ বিষয়েও শ্রীবাস ছিলেন নিঃসন্দেহ!

—কিন্তু নিমাইয়ের ভাব-গতিক, প্রেম-ভক্তির দিক না মাড়িয়ে অবিরাম শাস্ত্রালাপ,—শাস্ত্রীয় চর্চা,—সর্বোপরি বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষভাব—ইত্যাদি দেখে মনে মনে ভারী আশাহত হয়ে পড়েছিলেন শ্রীবাস। অবশ্য তার জন্যে নিমাইয়ের প্রতি তাঁর অন্তর্নিহিত স্নেহ বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

'শোন, শোন, দাঁড়াও একটু!'—সহাস্যে সেদিন শ্রীবাস পথ আটকে দাঁড়ালেন নিমাই-পণ্ডিতের—"বলি, কোথায় যাওয়া হচ্ছে এত কলরব করে?"... তারপর হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে বললেন,—"আচ্ছা নিমাই, মানি তুমি অগাধ পণ্ডিত,—নবদ্বীপের গৌরব। কিন্তু এই যে দিনরাত শাস্ত্র আর শাস্ত্র করে বেড়াচ্ছ,—ছেলেবেলায় অত হরি নাম করতে,—এখন একবার মুখেও আনছো না,—বরং বৈষ্ণব দেখলে তাকে নাজেহাল করে ছাড়ছো,—বলি এগুলো কি

ভালো হচ্ছে বাপু। পরম বৈষ্ণব জগন্নাথের ছেলে তুমি,—আমাদের কত আদরের—কত আশার,—কিন্তু দেখেশুনে আমাদের নিরাশই হতে হচ্ছে যে!"

একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন তিনি। নিমাই যতই চঞ্চল হোন,—শ্রীবাসের সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন মাথা নত করে স্থির হয়ে।...কিন্তু মৃদুমৃদু হাসছেন। সে লজ্জায়—না, প্রচ্ছন্ন কৌতুকে তা তিনিই জানেন। পিতৃবন্ধু, পিতৃতুল্য শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা-প্রীতি ছিল তাঁর অন্তরে। একটু ভেবে মনে মনে উত্তর খাড়া করে বললেন,—পণ্ডিত, আমার বয়স কম,—তাই কেউই এখন মানতে চায় না আমাকে। আরো কিছু পড়াশোনা করে—আর একটু বড় হলে লোকে মানবে আমাকে। তখন আমি একটি ভাল দেখে বৈষ্ণবের সন্ধান করে মন্ত্র নেবো,—এবং এমন বৈষ্ণব হবো যে,—অজভব পর্যন্ত আমার দ্বারে এসে উপস্থিত হবেন।

স্বভাব-সিদ্ধ তারল্যে তিনি এবার হেসে উঠলেন হো-হো করে—অনাবিল অকপট হাসি। গাম্ভীর্য বজায় রাখা আর সম্ভব হলো না তাঁর পক্ষে।

শ্রীবাস বোঝেন, নিমাইয়ের মতি এখনও বালকের মতই তরল,—ওকে ধর্মোপদেশ দেওয়া বৃথা।...তা'ছাড়া, নিমাইয়ের কথার ভাবে তাঁর এমনও একটু সন্দেহ হয় যে,—নিমাই বুঝি অবিরত শাস্ত্রচর্চা করে করে—নাস্তিক হয়ে পড়েছে! ক্ষুন্নস্বরেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—'আচ্ছা নিমাই, তুমি কি ঠাকুর-দেবতা মানো না।'

"সোঽহং"—অকুণ্ঠিত স্বরে বলে ওঠেন নিমাই,—"আমিই ঠাকুর-দেবতা! আমি আবার মানবো কাকে?" পূর্বের মতই হেসে ওঠেন তিনি হো-হো করেঃ এবং হাসতে হাসতেই চলে যান আপন পথে।...পরম বৈষ্ণব শ্রীবাস,—দীনভাব এবং সহিষ্ণুতাই—তাঁর ধর্মজীবনের আদর্শ,—স্নেহাস্পদ নিমাইয়ের এই "অহমিকা" তাঁর প্রাণে আঘাত করে শেলের মত; এবং তাঁর অন্তরপোষিত আশাও আজ যেন লুপ্ত হয়ে যায় চিরতরে।

* * *

ঘুরতে ঘুরতে সশিষ্য বাজারে এসে পড়লেন নিমাই। কিন্তু সঙ্গে কপর্দকও নেই যে কিছু সওদা করবেন। শিষ্যেরা বললে,—তবে কি জন্যে এলেন?

"আরে দেখোই না বাজারটা ঘুরে ফিরে।"—প্রায় সমবয়সী অধ্যাপক মশায় বললেন চটুল হেসে,—এসো আমার পিছু পিছুঃ কিন্তু কেউ গোলমাল করো না। বুঝেছো?

—"আজ্ঞে।"—মৃদু হাসি খেলে গেল শিষ্যদের ঠোঁটের কোণে।

সহসা পানওয়ালা ডাকে নিমাই-পণ্ডিতকে,—"ও ঠাকুর, আপনি তো পান

খেতে ভারী ভালবাসেন; এই নিন্, দেখুন আজ কি সুন্দর মিষ্টি খিলি তৈরী করেছি।"—এক খিলি পান তুলে দেয় সে নিমাইয়ের হাতে। মুহূর্তে পান-খিলিটি মুখে পুরে জবাব দেন নিমাই,—কিন্তু পান তো দিলে, দাম কই? সঙ্গে যে এক কড়াও নেই।

'দরকারও নেই!'—পানওয়ালা প্রসন্ন মুখে বলে,—"আপনি খেয়েছেন,—এই আমার ভাগ্যি।"

সশিষ্য নিমাই এগিয়ে চলেন।

'এই যে নিমাই ঠাকুর!'—সানন্দে অভ্যর্থনা করে ফলওয়ালা,—'আসুন, আসুন।...খুব ভাল কমলা, আর মর্তমান কলা আছে,—দেবো না-কি কিছু?"

"দিতে আর তোমায় নিষেধ করছে কে?"—মধুর হেসে উত্তর দেন নিমাই পণ্ডিত,—"কিন্তু এদিকে যে শূন্য!"—ট্যাঁকটা দোকানীকে দেখিয়ে হো-হো করে হেসে ওঠেন স্বভাব-সিদ্ধ হাসি।

সে হাসিতে কি ছিল, ফলওয়ালাই জানে,—"তা হোক্।" বলে সে অম্লান কণ্ঠে,—'তবু নিয়ে যান কিছু। দাম দিতে হবে না। আমার এমন কত নষ্ট হয়ে যায়। আপনাকে দিলে তো আখেরে জমাই থাকবে।—কমলা আর কলা আপনি ভালবাসেন যে!" আর কোন আপত্তি না শুনে বেঁধে দেয় সে কতক-গুলো ফল—একটা গামছা করে নিমাইয়ের হাতে,—"গামছাটা একদিন পাঠিয়ে দেবেন।"—প্রীতির হাসি হেসেই বলে অবশেষে।

শিষ্যেরা অবাক হয়ে চায় গুরুর মুখের দিকে,—কি আছে ঐ মুখে? কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে আবার এগিয়ে চলে নিমাইয়ের পিছু পিছু।

শান্তিপুরের জনৈক তাঁতি শশব্যস্তে প্রণাম করে নিমাই পণ্ডিতকে,—"কেমন আছেন?"—একমুখ হেসে কুশল প্রশ্ন করে সে,—"এবার তাঁতে ভাল ভাল কাপড় উঠেছে। নিয়ে যান একজোড়া। দেখুন, দেখি,—এই কাপড় আপনার পছন্দ কি-না।"

স্বস্থানে বসে গাঁট খুলে একজোড়া কাপড় দেখায় নিমাইকে,—'আপনার সোনার গায়ে ঝলমল করবে ঠাকুর।'

কাপড়জোড়াটা একবার নেড়ে-চেড়ে উত্তর দেন নিমাই-পণ্ডিত—'তা, হ্যাঁ এ-কাপড় আমার পছন্দ বটে। বেশ কাপড়। দাম কত?'—কিন্তু তখনই যেন নিজেকে শুধরে নেন,—তা দাম জিজ্ঞেস করেই বা আর কি করবো?...সঙ্গে তো—চোখের সঙ্কেতেই বুঝে নেয় তাঁতি নিমাই ঠাকুরের কথার শেষটা। তাড়া-তাড়ি বলে ওঠে—'তা আজ নেই,—পরেই না হয় দেবেন। পছন্দসই জিনিসটা ছাড়বেন কেন?'

'না বাপু!'—অনিচ্ছার ভাব ফুটে ওঠে নিমাইয়ের কণ্ঠে—ধারকর্জ করা

আমার স্বভাব নয়।...শোধ করতে না পারলেই তুমি দশটা 'হক কথা' শুনিয়ে দেবে.—তখন মান থাকবে না।

'ছিঃ, ছিঃ।'—তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বলে তন্তুবায়,—'আপনাকে এই সামান্য পয়সার জন্যে অপমান করতে পারি ?...যখন সুবিধে হয়,—তখনই দেবেন।'

নিমাই এগিয়ে চলেন,—না, কাজ নেই ধার করে। আরেক দিন আসবো টাকা নিয়ে,—

সহসা ব্যগ্রভাবে উঠে নিমাইয়ের পথ আটকে দাঁড়ায় তাঁতি,—'সে-কি ?... আপনার পছন্দ,—আর আমি ফিরিয়ে দেব আপনাকে ? না, না তা হয় না... নিয়ে যান। দাম চাইনে আমার। আপনি আশীর্বাদ করলে এমন ঢের লাভ হবে আমার।...বাপরে বাপ, নিমাই-পণ্ডিতের কৃপা পাওয়া কি সোজা কথা ?'

জোর করেই কাপড় জোড়াটা গছিয়ে দেয় সে। শিষ্যদের বিস্ময় তখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আর নিমাই-পণ্ডিত হাসছেন তাদের দিকে চেয়ে কৌতুকভরে।

আর কিছুটা এগিয়েই দেখা হয় পসারী শ্রীধরের সঙ্গে। কলার খোলার পাত্র, থোড়-মোচা, এই সব নিয়েই তার কারবার। পরম বৈষ্ণব। মানুষ হিসাবেও সজ্জন। ব্যবসায় যা হয়,—তার থেকেই কোন রকমে সংসার চালিয়ে আবার ঠাকুর-দেবতার সেবাও করেন।...কিন্তু বেচারা বৈষ্ণব বলেই নিমাই-পণ্ডিতের ভারী আক্রোশ তার ওপর।...কাজেই নিমাইকে বাজারে দেখলে মুখ শুকিয়ে যায় শ্রীধরের।

ছোঁ-মেরে নেওয়ার মত নিমাই-পণ্ডিত তুলে নিলেন তার গোটা-দুই খোলার পাত্র আর-কিছু থোড়।..."কাড়াকাড়ি করবেন না ঠাকুর।"—ব্যগ্র অথচ একটু শঙ্কিত হয়েই বলে ওঠে শ্রীধর,—"নেবেন নিন,—কিন্তু ন্যায্য দাম দিতে হবে।"

হাসতে হাসতে বলেন নিমাই,—'এমনিই বা দিলে শ্রীধর ? ব্রাহ্মণকে দিলে তোমার পুণ্য হবে। তোমার অনেক টাকা—কিন্তু ভারী কৃপণ তুমি।'—নিমাই চলে যেতে উদ্যত হন সেখান থেকে।

'না, না. ঠাকুর!'—শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় শ্রীধর,—'গরীব লোক আমি। টাকা কোথায় পাব ? দুটো খোলায় আমার চারটে পয়সা চলে যাবে। একটা থোড়ের দাম চার পয়সা।...তোমার পায়ে পড়ি,—আমার লোকসান করো না। ব্যবসার কড়ি বুঝে নিতে হবে। দানপুণ্য পরের কথা।'

'তবে অর্ধেক দাম নাও।'—কৌতুকে নিমাই হাসতে থাকেন। শ্রীধর বলে, —'হেই ঠাকুর, আমাকে রেহাই দাও। তোমার পাল্লায় পড়লে দেখছি রক্ষে নেই!...দাম দিয়ে নিয়ে যাও না ? কে বারণ করছে তোমায় ?'

'আচ্ছা শ্রীধর,'—এবার একটু গম্ভীর হয়েই বলেন নিমাই-পণ্ডিত,—'তুমি গঙ্গার পুজো দাও না?'

—সে-যে দেবতা।

'আর আমি?—আমি তার বাবা!'—হো হো করে হেসে ওঠেন নিমাই নিজের কথার ভাবে কৌতুক বোধ করে। শ্রীধর যেন নিজেই অপরাধ করে ফেলেছে এইভাবে আতঙ্কিত হয়ে বলে,—'ছিঃ, ছিঃ ঠাকুর, তোমার মতি কি কোনদিন ধীর হবে না?...ঠাকুর-দেবতাকেও তোমার এতো হেনস্তা!...যাক' —পরে কি ভেবে বলে, 'বকে আর লাভ কি? যখনই তোমাকে দেখেছি—তখনই বুঝেছি, আজ কপালে লাঞ্ছনা আছে।...ভাল কথা, তোমার কাছে অর্ধেক দামও চাইনে।...আমি রোজ তোমাকে একখানা থোড় আর ভাত খেতে খোলার পাত্র—এমনই দেব।...কিন্তু স্বীকার কর ঠাকুর,—আর আমাকে দেখতে পেলেই নাজেহাল করবে না?'

নিমাই হাসলেন প্রাণখোলা হাসি,—শিষ্যগণও যোগ দিলে সে-হাসিতে।... সেইদিন থেকে নিমাই শ্রীধরের দেওয়া খোলার পাত্রেই আহার করতে লাগলেন।

২৮

মেয়েটি রোজ গঙ্গার ঘাটে প্রণাম করে শচীদেবীকে। বয়স বারো-তেরো হবে,—বিয়ে এখনো হয়নি। প্রণাম করেই লজ্জিত সরল দৃষ্টি তুলে একবার চায় শচীর দিকে,—বুকের মধ্যে কত ভাষা গুমরে ওঠে,—কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না, ধীরে ধীরে চলে যায় আপন পথে।

কে এই মেয়েটি?—ভাবেন শচীদেবী,—আমাকে রোজ রোজ প্রণামই বা করে কেন? আমার মত অনেকেই তো আসেন গঙ্গাস্নানে—কিন্তু কই আর কাউকেই তো প্রণাম করতে দেখি না! ভারী চমৎকার মেয়ে কিন্তু। কি-সুন্দর মিষ্টি স্বভাব—কেমন ধীর—শান্ত,—আর তেমনি রূপ। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। নিশ্চয়ই কোন বড় ঘরের মেয়ে।

'এই মেয়েটির সঙ্গে আমার নিমাইয়ের বিয়ে হতো।'—সহসা একদিন সাধ

জেগে ওঠে শচীর মনে,—ভারী সুন্দর মিলন হতো তাহলে। কিন্তু কার মেয়ে,—আমাদের পালটি ঘর কি-না,—আর হলেও ওর বাপ আমার ঘরে মেয়ে দেবেন কি-না—কে জানে।...নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে ওঠেন শচীদেবী,—কিন্তু তবু কেমন যেন একটি গভীর আকর্ষণ জাগে মেয়েটির প্রতি—তাঁর অন্তরে। ...নিমাইয়ের আবার বিয়ে দেবার জন্যে আজ কিছুদিন ধরেই ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন শচী,—মেয়ে তো অনেক আছে,—করতেও চায় অনেকে,—কিন্তু মনের মত এমন মেয়ে আর কই? অথচ এই মেয়েটি,—প্রণামটি করেই এমনভাবে চলে যায়,—তার পরিচয়টা নেবারও সুযোগ ঘটে না শচীদেবীর।

কিন্তু মনের সাগ্রহ কামনা আর কতদিন চেপে রাখা যায়?—আর রোজ-রোজই প্রণাম করে,—বিনিময়ে একটা আশীর্বাদও তো করা উচিত!...একদিন মেয়েটি চলে যাবার আগেই তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—মা, ভারী লক্ষ্মী মেয়ে তুমি, তোমার মনের মত সুন্দর বর হোক। জন্ম-এয়োস্ত্রী হও তুমি।।

মেয়েটি চলতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো,—তার বালিকা-হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি নেচে উঠলো মধুর ঝঙ্কার দিয়ে,—মনের মত সুন্দর বর,—সে যে তোমারই ঘরে মা,—সফল হোক তোমার আশীর্বাণী,—তোমার চরণ-সেবার অধিকার কি আমায় দেবে মা?—কিন্তু বুকের প্রার্থনা মুখে ফুটলো না। তবু আজ আর চলে না গিয়ে—মাথা নুইয়ে দাঁড়ালো একটু।

গভীর স্নেহে তার চিবকটি ধরে মুখটি তুলে জিজ্ঞাসা করলেন শচীদেবী, —'তুমি কার মেয়ে মা,—কি নাম তোমার?' সলাজ মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলে মেয়েটি,—'আমি সনাতন মিশ্রের মেয়ে। নাম বিষ্ণুপ্রিয়া!

'সনাতন মিশ্রের মেয়ে।'—সম্ভ্রমে বললেন শচী,—ওঃ, তবে তো তুমি মস্ত-লোকের মেয়ে মা,—আর কি সুন্দর নামই না রেখেছেন তোমার বাবা। তা তুমি 'বিষ্ণুপ্রিয়াই' হও মা! মনে-প্রাণে আশীর্বাদ করছি আমি।

জানিনা কি-ছলে কার মুখ দিয়ে কি কথা বেরিয়ে পড়ে। আশা-ভরসায় বুক কিন্তু ভরে উঠলো মেয়েটির। আসল কথা, সরলা বালিকা মনের কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে—আত্মসমর্পণ করে ফেলেছিল নিমাই-পণ্ডিতকে অন্তরে অন্তরে। অপরিণত বুদ্ধি—অম্লান পুষ্পসম শুভ্রপুণ্যচিত্ত বালিকা সেদিন ভাবতেও পারেনি,—মনে মনে আত্মদান,—আর বিয়ে এক কথা নয়। কিন্তু সমর্পিত মন আর ফিরিয়ে নেওয়ার সাধ্যও তার ছিল না।—ফলে এই কাঁচা বয়সেই যেন এক জটিল সমস্যার মাঝেই পড়ে গিয়েছিল সে।

শচীদেবী তার মাথায় হাত বুলিয়ে আবার একবার প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে—অগ্রসর হলেন গৃহের পথে। বিষ্ণুপ্রিয়া ঠায় দাঁড়িয়ে—নির্ণিমেষ নেত্রে চেয়ে থাকলো তাঁর গমনের দিকে।

এদিকে শচীর মাথায় তখন এক মীমাংসাপেক্ষ প্রশ্ন জেগে উঠেছে,—তাই তো, সনাতন মিশ্রের কন্যা,—পালটি ঘর তো বটে,—কিন্তু সনাতন রাজপণ্ডিত,—মহাসম্মানী—সম্ভ্রান্ত ধনী,—তিনি কি মেয়ে দেবেন তাঁর নিমাইয়ের হাতে।....পিতৃহীন দরিদ্র নিমাই,—না হয় বড় পণ্ডিত হয়ে আজকাল কিছু মান-খাতিরই হয়েছে,—সংসারের অভাব-অভিযোগও আর নেই,—তা'বলে কি সনাতনের মত লোক তাকে গণ্য করবে?

—কিন্তু কামনা যেখানে আন্তরিকতায় প্রবল,—সেখানে মন বুঝি—সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্নকে দূরে ঠেলে এগিয়ে যেতে চায়।—শচীরও মনে ক্রমেই জেগে উঠলো একটা আশা এবং বিশ্বাস,—তাঁর নিমাই কিসে অযোগ্য?...ধনই কি সব?...মান-সম্মানে নিমাই বা তাঁর কম কিসে?...যে ভাগ্যবান,—সেই করবে তাঁর নিমাইকে কন্যাদান—পরম আগ্রহে। শচী আর দ্বিধা না করে কাশী মিশ্র নামে এক ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দিলেন সনাতন মিশ্রের বাড়ী,—বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে নিমাইয়ের বিবাহের প্রস্তাব করে।

সনাতন মিশ্র দুই চোখ স্থির করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন কাশী মিশ্রের পানে নীরবে। কথাটা যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না তাঁর,—অথচ এক অভূতপূর্ব আনন্দে বুকের ভেতরটা তখন তাঁর যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে! সমগ্র মন-প্রাণ দিয়ে চাওয়া; কোন দুর্লভ বস্তুর প্রাপ্তি-সম্ভাবনায় মানুষ আকস্মিক বিস্ময়ানন্দে মূক হয়ে যায়,—তাই হয়েছে সনাতনের অবস্থা।...মোট কথা, তিনি এবং তাঁর গৃহিণীও ভাবছিলেন শচীর মতই,—উভয় পক্ষেই সুরু হয়েছিল একমুখী চিন্তা,—অবশ্য আপন আপন ভাবে।—কিছুদিন ধরে সনাতন এবং তাঁর স্ত্রীরও উদগ্র কামনা জেগেছিল,—নিমাই-পণ্ডিতের হাতে তাঁদের আদরিণী কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে সম্প্রদান করতে। নিমাই ছিল তাঁদের দৃষ্টিতে—ধ্যানে—ধারণায়—বিষ্ণুপ্রিয়ার যোগ্য বর। কিন্তু তাঁরাও ভাবছিলেন—নিমাই-পণ্ডিত কি রাজী হবেন তাঁদের মেয়েকে বিয়ে করতে?...অসামান্য রূপ, অসাধারণ পাণ্ডিত্য,—দেশজোড়া মান-খাতির,—অতুল প্রভাব-প্রতিপত্তি,—কত রাজা-জমিদার ছুটে আসবেন অপরিমেয় যৌতুক-সম্ভার নিয়ে নিমাইয়ের হাতে মেয়ে দিতে,—সেক্ষেত্রে সনাতন মিশ্রের আশা কোথায়?—ভরসাই বা কি?

—কিন্তু আশাতীত দুর্লভ বস্তু ভাগ্যের জোরে আশানুরূপ সুলভ হয়েছে দেখে পরিপূর্ণ অন্তরে অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগলেন তিনি বিধাতাকে,—এবং তন্দণ্ডেই শচীদেবীর প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন,—নিমাইয়ের মা অনুগ্রহ করে আমার মেয়েকে পায়ে স্থান দিলে—আমি ধন্য হবো। শুভকার্য যত শীগ্‌গির সুসম্পন্ন হয়,—এখন তার ব্যবস্থা করুন।

ব্যস, ঘটক মহাশয়কে আর পায় কে?—প্রচুর 'সম্মানী' পাবেন তিনি শচী-

দেবীর কাছে,—এবং পাবেন এ-পক্ষেও। তাছাড়া, এ-মিলন তিনি অন্তর দিয়েই কামনা করেন।...মহানন্দে ফিরে এসে শুভসংবাদ দিলেন তিনি শচীকে।

আনন্দে গর্বে শচীদেবীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো,—সনাতন কৃতার্থ হয়েছেন তাঁর প্রস্তাবে। হবে না?—তাঁর নিমাই যে রত্ন...জহুরী না হলে জহর চিনবে কে?...তক্ষুনি প্রতিবেশিনীদের ডেকে শচীদেবী শুভসংবাদটি ঘোষণা করলেন বিহ্বলকণ্ঠে।...কৌতুকভরে নিমাই বললেন,—মায়ের চোখ-মন দুই আছে।

অতঃপর বিয়ের আয়োজনে দুই পক্ষই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

*　　　*　　　*

'নিমাই-পণ্ডিতের বিয়ের সমস্ত খরচ আমার?'—বললেন মুকুন্দ সঞ্জয় গভীর পুলকে,—'আমার চণ্ডীপণ্ডপে টোল করে দেশজোড়া নাম করেছেন নিমাই-পণ্ডিত,—এ আমারই অধিকার। আমিই মনের মত করে বিয়ে দেব তাঁর।'

'কিসের দেবে তুমি?'—প্রতিবাদ করলেন আনন্দ-উচ্ছ্বল কণ্ঠে কায়স্থ জমিদার বুদ্ধিমন্ত খান—নিমাইয়ের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ, অসীম শ্রদ্ধা—অপার স্নেহ,—'এ কি যেমন তেমন বিয়ে নাকি?—না যার তার বিয়ে? হোক নিমাই-পণ্ডিত বামুনের ছেলে। কিন্তু এ 'বামুনে বিয়ে' নয়,—রাজার ছেলের মত করে আমি বিয়ে দেব—নিমাই-পণ্ডিতের। তাক লাগিয়ে দেব আমি নবদ্বীপের লোকের।

'তা ভালো তো?'—কিছুটা আপোসের সুরে বলেন মুকুন্দ সঞ্জয়,—যেহেতু অবস্থা তাঁর যতই উন্নত হোক,—বুদ্ধিমন্ত খানের কাছে নয়,—'করুন না আপনি যত খরচ করতে চান; কিন্তু আমারই বা সাধে বাদ সাধবেন কেন?'

'বেশ, বেশ।'—প্রীত হলেন বুদ্ধিমন্ত খান,—এস, দুজনে মিলে-মিশেই করি। লোকে দেখুক,—হ্যাঁ, বিয়ে একটা হচ্ছে বটে।

তা করলেনও তাঁরা তাই।—বাদ্যে-ভাণ্ডে, আলোক-সজ্জায়,—বাজী-খেলায়, রায়বেঁশে নাচে, লোক-সঙ্গীতে, বিচিত্র শোভাযাত্রায়—তাঁরা এক অপূর্ব সমারোহ সৃষ্টি করলেন নবদ্বীপের রাজপথে।...আবার নিমাইয়ের বরবেশেরই বা সে-কি বাহার। মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মতির মালা, বাহুযুগে রত্ননির্মিত বাজুবন্ধ,—পরণে পীত বর্ণের বস্ত্র—গায়ে ঝলমল করছে বহুমূল্য রেশমী পোষাক,—তায় আবার কতই না পান্না-চুণীর কাজ। একে নিমাইয়ের সর্বজন-বিমোহন রূপ-সৌন্দর্য,—তার ওপর এই সাজ-সজ্জা,—যে দেখলো তাঁকে, সেই যেন তন্ময় হয়ে গেল এক নিমেষে। রাজোচিত দোলায় চড়ে নিমাই চললেন বিয়ে করতে।

ও-দিকে কন্যাকর্তার গৃহেও সে এক মহা-আড়ম্বরপূর্ণ বিপুল আয়োজন। অসামান্যা রূপসী,—বিকচ-চম্পক-কুসুম-নিন্দিতবর্ণা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বহুমূল্য বেশ-ভূষায় সাজানো হয়েছে—কোথাও কোন খুঁৎ না রেখে। লোকে একবার বরের দিকে চায়,—একবার চায় কনের দিকে,—মন তাদের শতকণ্ঠে বলে ওঠে,—'সার্থক মিলন।'

যথারীতি অনুষ্ঠানে শুভপরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হলো,—মহানন্দে নিমাই-পণ্ডিত নববধূসহ ফিরলেন স্ব-গৃহে।...শচীদেবীর মনে যে আকুল সাধ জেগে-ছিল, আজ তা পরিপূর্ণ হলো। বিপুল-পুলক-স্পন্দিত হৃদয়ে তিনি বধূ বরণ করলেন হুলুধ্বনি দিয়ে। প্রাণের সমস্ত আশীর্বাদ ঢেলে দিলেন পুত্র ও পুত্রবধূর মস্তকে। বাড়ীতে তিন চার দিন ধরেই চললো নানা আনন্দোৎসব।

* * *

এরপর শচীদেবীর সংসার-জীবনে নেমে এলো এক পরম বাঞ্ছিত শান্তি,—সুখ ও আনন্দ।...নিমাই-পণ্ডিত আগের চেয়ে অনেকটা ধীর হয়ে উঠেছেন—সংসারের প্রতি মনও কিছুটা নিবিষ্ট হয়েছে তাঁর।...অধ্যাপনার গৌরবে, উপার্জনের প্রাচুর্যে, জনসাধারণের সম্মান-শ্রদ্ধায়,—মায়ের অকৃত্রিম স্নেহে,—বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেম ও মমতায়,—ছাত্রদের আনুগত্য ও ভক্তিতে—নিমাই-পণ্ডিতেরও জীবনে সুরু হয়েছে যেন এক অনাগত-পূর্ব অধ্যায়।...বিষ্ণুপ্রিয়ারও মন ভরে উঠেছে—শাশুড়ীর মাতৃ-স্নেহে ও মমতায়, স্বামীর গভীর প্রেমে ও আদরে। শচীদেবীর কাছে বিষ্ণুপ্রিয়া বৃধূ নয়,—কন্যারই স্থান অধিকার করেছেন,—আর বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছেও শচীদেবী শ্বশ্রূ নয়,—জননী—মেয়ের মতই নিঃসংকোচ সরলতায়,—সলাজ মধুর পুলকিত ভঙ্গীতেই ঘুরে বেড়ান তিনি শচীর পিছু পিছু অপার আনন্দে!...

২৯

দেখতে দেখতে দুটি বছর যে কেমন করে কোন দিকে কেটে গেল,—তা যেন বোঝাই গেলো না। সুখের দিন এমনই করে কাটে,—কিন্তু দুঃখের দিন যেন কাটতেই চায় না,—এক-একটি দিনকে মনে হয়—যেন এক-একটি সুদীর্ঘ যুগ,—এমন কি তার চেয়েও দুরতিক্রান্ত।

'মা!'—নিমাই সহসা একদিন প্রস্তাব করেন মায়ের কাছে।—'আমি এবার একবার গয়াধামে যাবো স্থির করেছি; আমাকে অনুমতি দাও। শুনেছি, গয়ায় গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ড দিলে পিতৃপুরুষের আত্মার মুক্তি ঘটে।

শচীদেবীর হলো উভয় সংকট। পিতৃকর্মে নিমাইকে বাধা দিতেও পারেন না,—আবার নিমাইকে ছেড়ে দিতেও মন নেই। কি যেন চিন্তা করে বললেন, —বাছা, পিতৃকার্যে তোমায় বাধা দেওয়া আমার উচিত নয়,—এবং সে তোমার কর্তব্যও বটে। তবে আরও দু'চার মাস না হয় যাক,—তারপর—

'না, না, মা।'—মায়ের কথা শেষ হবার পূর্বেই আকুলতা প্রকাশ করেন নিমাই,—'আমার মন চঞ্চল হয়েছে, পিতৃদেবের কথা চিন্তা করে। তুমি আর বাধা দিয়ো না। শীগ্গির কাজ সেরে বাড়ী ফিরবো আমি।

শচীদেবী আর আপত্তি তুলতে পারলেন না। তবে নিমাইকে তিনি একলাও ছাড়লেন না। একজন দায়িত্বশীল—বয়স্ক ব্যক্তি অথচ দরদী আত্মীয় সঙ্গে থাকা উচিত ভেবে—শচী তাঁর ভগিনীপতি নিমাইয়ের মেসো আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখরকে দিলেন তাঁর সঙ্গে অভিভাবকরূপে।—বার বার করে বলে দিলেন তাঁকে,—নিমাইয়ের প্রতি তিনি যেন সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, এবং কাজ শেষ হলেই তাকে নির্বিঘ্নে বাড়ী ফিরিয়ে আনেন।

চন্দ্রশেখর শচীদেবীকে আশ্বস্ত করে—নিমাইকে নিয়ে এক শুভদিনে—যাত্রা করলেন গয়ার উদ্দেশে।...নিমাইয়ের দুচারজন শিষ্যও চললো সঙ্গে।...

তখন হাঁটাপথেই যেতে হতো দূর-দূরান্তর তীর্থযাত্রায়। গঙ্গার তীর ধরে—সকলে অগ্রসর হতে লাগলেন গন্তব্য পথে। দিনের পর দিন পথের

দূরত্ব কমে আসতে থাকে।...কিন্তু যতই তাঁরা গয়ার নিকটবর্তী হন,—ততই নিমাই-পণ্ডিত ধীর, শান্ত—গম্ভীর হতে থাকেন। কেমন যেন একটা পরিবর্তনের ভাব জেগে ওঠে তাঁর মধ্যে।...গয়াধামে প্রবেশ করতেই সে-ভাব আরও ঘন হয়ে ওঠে. প্রবেশ করেই তিনি যুক্তকরে প্রণাম করেন পুণ্যধাম গয়াক্ষেত্রের উদ্দেশে।

তারপর যথোচিত নিষ্ঠায় একে একে করণীয় কাজগুলি সম্পন্ন করে তিনি ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের পর আসেন চক্রবেড়ে।...এখানেই বিষ্ণুমন্দিরে এক পাষাণের ওপর আছে শ্রীভগবানের চরণ-চিহ্ন। পুরাণে আছে, পরম বিষ্ণুভক্ত গয়াসুর কর্তৃক স্থাপিত এই ধাম;—তারই নামে এর নাম হয়েছে 'গয়া'। প্রচণ্ড শক্তিশালী গয়াসুর যুদ্ধে দেবতাদের পরাস্ত করে—তাড়িয়ে দেয় স্বর্গ থেকে। দেবতাদের কাতর প্রার্থনায় বিষ্ণু ভক্ত-গয়াসুরের সহিত যুদ্ধ করেন।...যুদ্ধের শেষে বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে—গয়াসুর পরিণত হয় পাষাণে। পবিত্র সেই পাষাণের বুকে যুগ-যুগান্তর ধরে উজ্জ্বল হয়ে আছে ভগবান বিষ্ণুর পুণ্যচরণ-চিহ্ন! তাঁরই বরে এখানে পিণ্ডদান করলে,—পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মার মুক্তি ঘটে,—পরিতৃপ্ত হয় বিষ্ণুভক্ত গয়াসুরের আত্মা।

পিতৃকার্য সমাধা করে নিমাই অনিমেষ নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন —সেই যুগ-যুগান্তের চির-দীপ্যমান পবিত্র চরণ-চিহ্ন। এদিকে মন্দিরের পূজারীগণ তখন যাত্রীদের ডেকে ডেকে বলছেন,—'দেখ, দেখ, শ্রীভগবানের চরণ-চিহ্ন,—নয়ন সার্থক হবে,—জীবন ধন্য হবে, পাপ-তাপ দূর হবে।...বহুপুণ্যে এ-সুযোগ মিলে। ঐ চরণ থেকেই ত্রিলোক-পাবনী গঙ্গার উদ্ভব,—ঐ চরণের জন্যই মহাযোগী মহেশ্বর সর্বত্যাগী শঙ্কর!'

চোখে দেখছেন সেই চরণ-চিহ্ন, কানে ঢুকছে—পূজারীদের ভক্তিপ্লুত স্বর।—নিমাই-পণ্ডিত ভাবাবেশে একেবারে স্থির-নিশ্চল...দূরাগতসঙ্গীত-ধ্বনির মত—কার অভয় বংশীর সুর যেন—তাঁর কানে এসে বাজছে—কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করছে অন্তঃকরণে, সেখান থেকে মর্মের একান্ত গভীরে। ক্রমে ক্রমে পাষাণ,—পাষাণের বুকে চরণ-চিহ্ন,—সম্মুখের মন্দির,—আশেপাশের অসংখ্য লোকজন সবই যেন মুছে গেল তাঁর চোখের সম্মুখ থেকে;—সেখানে ভেসে উঠলো শুধু যিনি ঐ পুণ্যচরণের অধিকারী,—তাঁরই শ্যামলসুন্দর—মধুর-চিত্তহর বরাভয়প্রদ স্নিগ্ধোজ্জ্বল মূর্তি।

সর্বাঙ্গে স্পন্দন জাগলো নিমাই-পণ্ডিতের। দুই চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো দরদর অশ্রু, সে বুঝি অশ্রু নয়—শ্রাবণের ধারা।—সে ধারায় ভেসে গেল দুই গণ্ড,—ভেসে গেল বক্ষস্থল—ক্রমে ক্রমে ভেসে গেল সর্বাঙ্গ—থর থর করে কাঁপতে লাগলেন তিনি বাতাসে বেতস পত্রের মত!—বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে

তাঁর,—পায়ের তলে মাটি যেন টলমল করছে,—আর বুঝি দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি নেই,—চৈতন্যও লুপ্ত হয়ে আসছে।

অদূরে দাঁড়িয়ে একজন নিস্পন্দভাবে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন তাঁর দিকে। তিনি পরম কৃষ্ণভক্ত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী।...ভক্ত বোঝেন ভক্তির প্রকৃতি,—প্রেমিক বোঝে প্রেমের আবেগ।—ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে যখন দেখেছিলেন নিমাই-পণ্ডিতকে,—তখনই বুঝেছিলেন, এক অপার্থিব সত্তা রয়েছে এই পরম সুন্দর চঞ্চল তরুণের মধ্যে।...আজ নিঃসন্দেহে বুঝলেন সে-সত্তা কি—এবং কার?—কিন্তু আর সময় নেই, তিনি ব্যগ্রভাবে এগিয়ে এসে—নিমাইয়ের এলিয়ে-পড়া দেহখানি সযত্নে বুকে ধরে নিয়ে গেলেন তাঁকে একটু দূরে।

কৃষ্ণভক্তের পূতস্পর্শে নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো কিছুক্ষণ পরে। চোখ মিলে তাকিয়েই—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে দেখেই চিনতে পারলেন তিনি। ...'প্রভু, আমার বড় সৌভাগ্য, আজ এ-সময়ে আপনার দর্শন পেয়েছি'—বললেন ভাবাকুল স্বরে,—আপনি আমার মোহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিন,—আপনার কৃপায় আমার প্রতি প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হোক,—আমি যেন তাঁর প্রেমসুধা পান করে—জন্ম-জীবন ধন্য করতে পারি,—আর আমার অন্য কোন কামনাই নেই।'

ঈশ্বরপুরীর চোখেও তখন জল। নিমাইকে স্পর্শ করে তাঁরও সর্বাঙ্গে তখন এক অনুপলব্ধ-পূর্ব আনন্দের রোমাঞ্চ জাগছে। বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে তিনি বললেন,—'পণ্ডিত, শান্ত হও। তোমাকে চিনতে আমার বাকী নেই। তুমি যা বলবে তাই করবো। সাধ্য কি তোমাকে লঙ্ঘন করি? তবে এখন স্থির-চিত্তে বাসায় যাও,—পরে আমি দেখা করবো তোমার সঙ্গে।'

ঈশ্বরপুরীর সান্ত্বনায় কিছুটা শান্ত ও আশ্বস্ত হয়ে নিমাই ফিরে এলেন বাসায়। চন্দ্রশেখর প্রভৃতি সকলেই তখন তাঁর ভাবান্তর দেখে যেন বাকশক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন।...সেই হাস্যপ্রবণ, সদাচঞ্চল কূটতার্কিক শাস্ত্রালাপী নিমাইয়ের সহসা এ-কি পরিবর্তন?

শুভদিনে শুভক্ষণে ঈশ্বরপুরী মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন নিমাই-পণ্ডিতকে। মন্ত্র দশাক্ষরী,—গোপীজনবল্লভের! মন্ত্রদান করে তিনি গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন নিমাইকে।...দুজনের দিকে চেয়ে দু'জনেরই চোখ ছাপিয়ে জল এলো। ...কিন্তু পরক্ষণেই ঈশ্বরপুরী একান্ত ব্যস্তভাবেই নিমাইয়ের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। কারণ নিমাই এখন তাঁর শিষ্য,—শিষ্যের গুরুকে প্রণাম করা কর্তব্য,—আর গুরুরও শিষ্যের কর্তব্যে বাধা দেওয়া অনুচিত। অথচ পুরীর ধারণা হয়েছিল,—নিমাই সামান্য মানুষ নয়,—ভগবানের অবতার। এই অলৌকিক আত্মহারা প্রেমাবেশ কি সামান্য মানুষে সম্ভব?...রত্নের জ্যোতিঃ

রত্নেই প্রকাশ,—সামান্য পাথরে তার প্রকাশ কোথায়? তাই জেনে-শুনে শুধু গুরুর অধিকারে—নর-নারায়ণরূপী নিমাইয়ের প্রণাম তিনি গ্রহণ করবেন কেমন করে? জীবনে তিনি আর কোনদিনই নিমাইয়ের সম্মুখে আসেননি।...

'না, না, আমি আর বাড়ী ফিরবো না।' আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখরের দিকে অশ্রুবিহ্বল চক্ষে চেয়ে ঘনঘন মাথা নাড়েন নিমাই,—"আপনারা শান,—আমি বৃন্দাবন যাবো,—সেখানে গিয়ে—আমার কৃষ্ণকে খুঁজবো।"—বাষ্পের আবেগে কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে তাঁর। দুইচোখ দিয়ে বয়ে যায় অবিরাম ধারা,—'বলবেন মাকে, নিমাই গেছে তার শ্যামসুন্দরকে খুঁজতে। মা যেন আমার জন্যে আর বৃথা দুঃখ না করেন। আপনি—

সহসা ভাবের আবেগে পুলক জেগে ওঠে তাঁর সর্বাঙ্গে,—এই যে—এই যে আমার কৃষ্ণ—আহা-হা, কি-সুন্দর, কত মনোহর—নয়নাভিরাম শান্ত মূর্তি! মাথায় মোহন চূড়া, শিখিপুচ্ছ, গলায় বনমালা,—'কি করুণায় ভরা প্রশান্ত দুটি কমল নয়ন,—হাতে বাঁশী—'

—সিক্ত পদ্মপলাশের মত আয়ত নয়ন দু'টি কথার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অপার আনন্দে,—"আয়, আয় বুকে আয়,"—দুই ব্যগ্র বাহু প্রসারিত করে যেন ধরতে যান কাউকে,—কিন্তু পরক্ষণেই চম্‌কে উঠে—বিভ্রান্তের মত চাইতে থাকেন এ-দিকে—সে-দিকে,—অ্যাঁ—অ্যাঁ,—এই যে ছিল—কোথায় গেল—কোথায় গেল আমার কৃষ্ণ—

সহসা বাহ্যজ্ঞান যেন লুপ্ত হয়ে যায় তাঁর। চেয়ে থাকেন শূন্য দৃষ্টিতে পাগলের মত। মুস্কিলে পড়েন আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখর। শচীদেবী তাঁরই হাতে সঁপে দিয়েছেন তাঁর প্রাণের প্রাণ—নিমাইকে, নিমাইকে যদি তিনি বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পারেন,—কোন মুখে দাঁড়াবেন শচীর সম্মুখে,—কি বলবেন তাকে? পুত্রগতপ্রাণা জননীর সান্ত্বনার স্থল যে আর কেউ নেই? তাছাড়া, বিষ্ণুপ্রিয়া? সরলা—'সংসার-অনভিজ্ঞা কিশোরী,—নূতন প্রবেশ করেছে সংসার-জীবনে,—জীবনের সাধ-আহ্লাদের সে এখনও কোন আস্বাদই পায়নি,—তারই বা কি গতি হবে?

বহুকষ্টে নিমাইকে প্রকৃতিস্থ করে বলেন চন্দ্রশেখর স্নেহাতুর কণ্ঠে,—বাবা নিমাই,—তুমি তো পরম পণ্ডিত, তবে কেন, বুঝছো না? তুমি যদি বাড়ী ফিরে না যাও,—তোমার মা কি আর বাঁচবেন?...তোমার মত ছেলে যদি মা'র দুঃখ না বোঝে,—সে-ও তো বড় দুঃখের বিষয় বাবা,—তোমার কৃষ্ণ কোথায় না আছেন.—তিনি যে বিশ্বময়,—বাড়ী চল, সেখানে গিয়ে তুমি তোমার কৃষ্ণের ভজনা করবে।

চন্দ্রশেখরের সঙ্গে যোগ দিয়ে আরও অনেকে—নিমাইকে নানাভাবেই সান্ত্বনা দিলে,—বোঝালে অনেক করে। বারবার শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা তুলে তাঁর প্রাণে মায়া-মমতা জাগাবারও চেষ্টা করলে; ফলও কিছু হলো,—নিমাই বাড়ী ফিরতে সম্মত হলেন।

সারা পথটাই কিন্তু নিমাই পণ্ডিতকে নিয়ে উদ্বেগের সীমা রইলো না সঙ্গীদের।...তখনই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ছুটে যান নিমাই বিপথে, কখনো বা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে কাঁদতে থাকেন বালকের মত। যা হোক, তবু ক্রমশঃ এগিয়ে এসে পেঁছিলেন তাঁরা গৌড়ের কাছাকাছি কানাই নাটশালা গ্রামে। কিন্তু এখানে পেঁছে আবার এক কাণ্ড। একটা গাছতলায় বসে বিশ্রাম করছিলেন সকলে। নিমাই একপাশে বসেছিলেন আপনার ভাবেই বিভোর হয়ে,—চোখে বইছে অবিরাম ধারা,—সহসা উঠেই পাগলের মত ছুটলেন,—'ওই, ওই—ওই—

কিছুটা গিয়েই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন অজ্ঞানের মত। আবার অনেক করে তাঁর চৈতন্য ফিরিয়ে আনলেন চন্দ্রশেখর,—"কি হলো বাবা নিমাই ?...এমন করে ছুটে এলে কেন এখানে ?"

নিমাই নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন,—"আমি হঠাৎ দেখলুম, একটি শ্যাম-সুন্দর শিশু,—মোহন তার বেশ,—বাঁশী বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে আমার সম্মুখ দিয়ে। আমি ধরতে গেলাম তাকে—অমনি যেন কোথায়—" হু-হু করে কেঁদে ফেললেন তিনি।

চন্দ্রশেখর বুঝলেন,—নিমাই আর "নিমাই পণ্ডিত" নেই,—তার অন্তরে জেগে উঠ্ছে—কৃষ্ণপ্রেমাকুল এক পরমভক্ত,—তার কানে বাজছে আকুল করা সেই বাঁশরীর তান,—যা' শুনে কালিন্দীও বইতো উজান—কুলমান-লাজভয় ভুলে ছুটে আসতো রাধা প্রেমের আবেশে।

চন্দ্রশেখর ভাবলেন—কোন রকমে নবদ্বীপ পর্যন্ত পেঁছে শচীর ছেলে শচীর হাতে তুলে দিতে পারলেই তিনি বাঁচেন! মাতৃ-স্নেহের স্পর্শে—বিষ্ণু-প্রিয়ার মুখের দিকে চেয়ে—নিমাইয়ের ভাবাকুলতা হয়ত এতটা থাক্‌বে না।

নিমাইকে সকলের মাঝে এবং সর্বদা নিজের পাশে পাশে রেখে চন্দ্রশেখর আবার অগ্রসর হতে লাগলেন নবদ্বীপের অভিমুখে!

৮

৩০

নিমাই পণ্ডিত গয়া থেকে বাড়ী ফিরছেন শুনে অনেকে দেখা করতে এলেন তাঁর সঙ্গে।...কিন্তু এ-কি? এ কোন্ নিমাই পণ্ডিত?—যিনি গয়া গিয়েছিলেন তিনিই কি ফিরে এসেছেন নবদ্বীপে?...না,—এ কোন অন্য ব্যক্তি?

কই নিমাইপণ্ডিতের সেই কথায় কথায় প্রাণখোলা হাসি,—কই সে—কথায় কথায় শাস্ত্রীয় তর্ক,—কোথায় গেল তাঁর তরল কৌতুক বিদ্রূপ?...চোখ দুটি অশ্রু ছল্‌ছল,—নম্র-কোমল মুখখানি যেন কোন্ মধুর বেদনার ভারে কাতর—অবনত,—বিনয়-সৌজন্যে-দীনতায়—যেন লুটিয়ে পড়তে চান—সবার পায়ে,—মুখে অবিরাম কৃষ্ণ নাম,—মাঝে মাঝে সুশুভ্র গণ্ড দুটি ভেসে যাচ্ছে—অশ্রুর প্লাবনে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান সকলে। এ যে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে নিমাই পণ্ডিতের? কেমন করে এ অসম্ভব সম্ভব হলো?...চোখে এত জলই বা ঝরছে কেন অবিরাম অজস্র ধারায়? কি হয়েছে পণ্ডিতের?

নিমাইয়ের মুখে গয়ার বিষ্ণু মন্দিরের কথা ছাড়া আর কিছু নেই। সেই পবিত্র পাষাণ,—তার বুকে গদাধরের শ্রীপাদপদ্মের সেই পরম পবিত্র চিহ্ন,—ভগবানের অনন্ত মহিমা-বিজড়িত সেই পুণ্যতীর্থের মাহাত্ম্য,—শুধু এই সব কথাই ভাবাবেগে—বারবারই বলেন নিমাই পণ্ডিত। মাঝে মাঝে যেন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন,—আবার প্রকৃতিস্থ হলে পূর্বকথায় ফিরে আসেন। চোখের জলের বিরাম এক নিমেষের জন্যও নেই।

'কি হয়েছে তোমার বিশ্বম্ভর?'—জিজ্ঞাসা করেন বৈষ্ণব শ্রীমান পণ্ডিত,—কেন, এত কাঁদছো?

উত্তর দিতে গিয়েও নিমাইয়ের স্বর আটকে যায় বাষ্পের ভারে,—কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন,—ভাই, তোমরা কাল সকলে শুক্লাম্বর মিশ্রের বাড়ীতে যেও, আমি সেইখানেই বলবো তোমাদের সব কথা।

'সেই ভাল, সেই ভাল!'—আগন্তুকদের মধ্যে অন্য একজন তাড়াতাড়ি বলে

ওঠেন,—"মাত্র আজই এসেছে। আজকের দিনটা ওকে বিশ্রাম করতে দাও।... কাল সকলেই যাব শুক্লাম্বরের বাড়ীতে।"

সম্প্রতি নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে ভাল-মন্দ আলাপ-আলোচনা করা বিফল বুঝেই—সকলে বিদায় নিলেন। এবার শচীদেবী ছেলের কাছে এসে বললেন, —বাবা নিমাই, অনেকক্ষণ তো স্নান করেছ বাবা,—বাড়ীর মধ্যে চল,—দুটি খেয়ে নাও।

নিমাই একবার এ-দিক—সে-দিক চেয়ে অন্যমনস্কের মতই উত্তর দিলেন,— অ্যাঁ, কি বল্‌ছো মা?

'বাবা জায়গা করেছি,—দুটি খেয়ে নেবে চল।'—শচীদেবী প্রগাঢ় স্নেহে পুত্রের হাত ধরে বললেন,—'কি হয়েছে বাবা তোমার? ক্ষিদে-তেষ্টাও যে ভুলে গেছ! অন্যবার প্রবাস থেকে বাড়ী ফিরে—কত আনন্দ কর,—কত গল্প-গুজব কর,—কিন্তু সেই কখন এসেছো,—একবার বাড়ীর মধ্যে পর্যন্ত যাওনি। বৌ-মাকেও একবার দেখা দাওনি,—যেন কি-দুঃখে কাতর হয়ে বাড়ী ফিরেছ,—সে হাসি নেই,—সে আনন্দ নেই—"

গলা ধরে এলো শচীদেবীর। মা দুঃখ পেয়েছেন বুঝে ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন নিমাই,—"না, না, মা, দুঃখ করো না। এই পাঁচজন এসেছিল কি-না,—তাই ভেতরে যেতে পারিনি। আহা-হা, কি যে দেখলাম মা, গয়ায়।...আচ্ছা, আচ্ছা, চল চল মা, আগে খেতে দেবে।...পরে বলবো সে-কথা।"

বাড়ীর ভেতরে এসে নিমাই কোনরকমে যদিও বা দুটো ভাত মুখে দিলেন, —বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে গিয়ে তাঁকে প্রীতি-সম্ভাষণও জানালেন,—তবু শচীদেবীর মনের ভার কমলো না,—ক্ষণে ক্ষণে পুত্রের দিকে চেয়ে তিনি দেখলেন,—নিমাই সর্বদাই কি-যেন চিন্তায় আচ্ছন্ন,—যেন প্রতিমুহূর্ত এদিক-সেদিক চেয়ে খুঁজছে কাউকে। বাড়ী ফিরেছে বটে, কিন্তু দৃষ্টি যেন সংসার থেকে বহু-দূরে,—কোন শূন্যে—তাই বা কে জানে!—স্নেহময়ী পুত্রপ্রাণা জননীর অন্তর —কি এক উদ্বিগ্নতায় অধীর হয়ে ওঠে নিমাইয়ের হাব-ভাব দেখে দেখে।— আবার মাঝে মাঝে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই ভাবেন,—হয়ত 'পিতৃ-কর্ম' করে এসে বাপের জন্যে মনটা খারাপ হয়ে আছে নিমাইয়ের,—দু-একদিন বাড়ীতে থাকতে থাকতেই—আবার সেই আগের ভাব ফিরে আসবে তার।

আট-আটটি কন্যা বিয়োগের ব্যথা ভুলেছিলেন শচী যার মুখের দিকে চেয়ে, —সেই বিশ্বরূপ তাঁকে কিশোর বয়সেই ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে—সন্ন্যাস নিয়ে। —মর্মাহতা জননী তবু নিমাইকে বুকে জড়িয়ে ভুলেছেন সকল যন্ত্রণা,— পেয়েছেন অপার শান্তি!...নিমাইয়ের মন নিবিড়ভাবেই আকৃষ্ট হোক সংসারের দিকে,—আমোদ-আহ্লাদ করে পরম আনন্দেই থাকুক—লক্ষ্মীর মত বৌকে নিয়ে,

—দিবানিশি মুহুর্মুহু এই কামনাই পূর্ণ করে রেখেছে শচীর অন্তর। তাই নিমাইয়ের এতটুকু ভাবান্তরও তাঁর বুকে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে,—ঘর-পোড়া গরুর মত কি-এক আতঙ্কে তাঁর মন করে ওঠে—হারাই, হারাই।...বুকের সমস্ত স্নেহ-মমতা দিয়ে তিনি আঁকড়ে ধরে রাখতে চান নিমাইকে—যেন সে কোনদিকে ফাঁক না পায়—তাঁকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে।

গয়া থেকে ফিরবার পর—যে ভাবান্তর লক্ষ্য করছেন শচী তাঁর নিমাইয়ের মধ্যে,—এ-কে তো সামান্য বলে উপেক্ষা করা যায় না? এ-যেন ভেঙ্গে-চুরে নূতন করে কেউ গড়ে তুলেছে নিমাইকে!...কার এ-ইঙ্গিত?—কে সে? ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলেন শচীদেবী,—কোন কাজেই মন বসে না তাঁর,—যেখানেই যান,—যে কাজেই হাত দেন—নিমাইয়ের ছলছল চোখ,—হাস্যহারা করুণ মুখখানিই জ্বল জ্বল করে ওঠে চোখের ওপর। বাহ্যতঃ নিজেকে সংযত করে রাখেন বিপুল প্রয়াসে।...সহসা কি খেয়াল হয়,—নানা বেশভূষা দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজাতে বসেন মনের মত করে।...সময় যেন আর কাটে না তাঁর!...

রাত তখন গভীর,—মহানগরী নবদ্বীপ যেন তন্দ্রার কোলে অপচেতন! ...সারাদিন ক্লান্তির পর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে-যার ঘরে অসাড়ে নিদ্রা যাচ্ছে,—শচীদেবীর চোখে কিন্তু ঘুম নেই,—তখনই একটু তন্দ্রা আসে,—আবার তখনই চমকে জেগে ওঠেন তিনি। অধীর মনের কাছে ঘুম যেন হার মেনে চলে যায় বহুদূরে।

সহসা বিষ্ণুপ্রিয়া এসে করাঘাত করেন শচীর শয়ন-কক্ষের দ্বারে,—'মা, মা, শীগ্‌গির ওঠো মা,'—আকুল তাঁর স্বর,—কান্নায় যেন ভেঙ্গে পড়ছে,—একবার এ-ঘরে এসে দেখ মা,—তোমার ছেলে কেন এত কাঁদছে? এসো—এসো মা!'

'কি—কি হলো বৌমা?'—ধড়মড় করে উঠে পড়েন শচীদেবী। আলো জ্বালবারও আর ধৈর্য থাকে না তাঁর! অন্ধকারেই হাতড়াতে হাতড়াতে এসে হুড়কো খুলে ফেলেন,—"নিমাই কাঁদছে?...কেন, কেন বৌমা?"—পাগলিনীর মতই তিনি আলুথালুভাবে ছুটলেন নিমাইয়ের ঘরে,—পেছনে বিষ্ণুপ্রিয়া,—তাঁরও চোখের জল তখন গণ্ড ছাপিয়ে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে।

একটি তেলের প্রদীপ স্নিগ্ধ আলোকে জ্বলছিল নিমাইয়ের শয়ন-কক্ষে। ঘরে ঢুকেই শচী দেখলেন,—পালঙ্ক থেকে নেমে মেঝের ওপর বসে নিমাই নীরবে কাঁদছেন অঝোর ঝোরে।

দুই ব্যগ্র বাহু দিয়ে তিনি অসীম আকুলতায় নিমাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরেন—"বাবা, নিমাই, কেন এত কাঁদছো বাবা?—স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে অশ্রুর আবেগে,—কিসের দুঃখ তোমার? তুমি নবদ্বীপের গৌরব—কীর্ত্তিমান পুরুষ,—রূপেগুণে তোমার তুলনা নেই,—সকলেই তোমাকে মান্য করে,—ভাল-

বাসে অন্তর দিয়ে। ঘরে তোমার মা,—লক্ষ্মীর মত বৌ। তোমার গুণে মা-কমলাও কৃপা করেছেন দু'হাত ভরে। তবু কি দুঃখে কোন্ বেদনায় তুমি এত কাঁদছো বাবা?"

এ-রহস্য কে বুঝবে? তাই বুঝতে না পেরেই তো উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল হয়ে ছুটেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ীর কাছে।...বয়সে কিশোরী হলেও বুদ্ধিমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার তো এ-কথা অবিদিত নয় যে,—তাঁর স্বামী কীর্ত্তিমান পুরুষ,—শুধু পুরুষ নন, পুরুষের শিরোমণি। বিরাট তাঁর জ্ঞান,—অসামান্য তাঁর প্রতিভা;—হৃদয়খানি একদিকে যেমন কুসুমের মত কোমল—অন্যদিকে তেমনি বজ্রের মতই কঠোর। এমন একজন পুরুষ—রাত্রে ঘুম থেকে উঠে বসে বসে কাঁদলে,—কিভাবে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে হয়,—সে ভাষা কেমন করে যোগাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠে? কি করেই বা বুঝবেন তিনি সে গূঢ় রহস্য?...শাশুড়ীর সঙ্গে এ ঘরে ফিরে এসে অবধি তাই দুটি অশ্রুভরা চোখ স্থির করে চেয়ে আছেন স্বামীর মুখের দিকে। অধীর অন্তরে মনে মনে ভাবছেন,—মা হয়ত ছেলের ব্যথা কোথায় তা বুঝতে পারবেন।

—মাতৃ-গত-প্রাণ নিমাই,—মায়ের কাতরতা তাঁর কাছে দুর্বিষহ। সমগ্র অন্তর দিয়েই তিনি অনুভব করেন মায়ের অন্তর, সে অন্তরের পরতে পরতে নিমাই ছাড়া যে আর কেউ নেই,—একথাও অবিদিত নয় নিমাইয়ের কাছে।... কাজেই মায়ের অধীরতা বুঝে তিনি বহুকষ্টে উচ্ছ্বসিত আন্তর আবেগ দমন করে চাইলেন মায়ের দিকে শান্ত নেত্রে,—"মা, স্থির হও,"—বললেন ধরা গলায়. —"বসো এখানে। আমি কাঁদিনি মা,—আমার প্রাণ যেন গলে ঝরে পড়ছে চোখ দিয়ে। এ বড় সুখের কান্না মা,—এ-বেদনাও বড় আনন্দের। যুগ যুগ ধরে এ-কান্না যে কাঁদতে পারে,—তারই জীবন বুঝি সার্থক!...শোন মা, আমি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ স্বপ্ন দেখলাম,—শ্যামসুন্দর রূপ,—গলায় বনমালা, হাতে বাঁশী—এক কিশোর আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে। রূপের আলোকে ঘর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার!...বাঁশরীর সুরে সুধা ঝরে পড়ছে যেন।...মা, মা, সে আমার কৃষ্ণ,—আমার প্রাণধন—আমার অন্তরের রাজা —নিমাই আবার আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লেন,—'মা, তাকে আমি ভুলতে পারছি না,—সে যে ভুলবার নয় মা!'

এবার নিমাই প্রগাঢ় স্বরে বর্ণনা করতে লাগলেন কৃষ্ণ-প্রেম-তত্ত্ব;—কৃষ্ণের অনন্ত মহিমার কথা! একে তিনি পরম পণ্ডিত,—পরম জ্ঞানী,—তায় অন্তর ভরে উঠেছে তাঁর কৃষ্ণ-প্রেমের মাধুর্যে! প্রেমবিহ্বল গাঢ় কণ্ঠে যখন তিনি সেই সর্বসন্তাপহারী প্রেমময় কৃষ্ণের বর্ণনা করতে লাগলেন,—তখন বৃদ্ধা শচীদেবীর তো কথাই নেই,—কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়াও শুনতে লাগলেন—তন্ময়

হয়ে। তাঁদেরও অন্তরে বয়ে যেতে লাগলো এক অনাস্বাদিত-পূর্ব আনন্দের প্রবাহ! আত্মহারা চিত্তে—নিষ্পলক স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন তাঁরা নিমাইয়ের মুখের দিকে। কোন দুঃখ—কোন বেদনা—এমন কি জাগতিক কোন অনুভূতিও যেন আর নেই তাঁদের অন্তরে। নিমাইয়ের চিত্তের সঙ্গে—তাঁদের চিত্তও যেন মিলে মিশে এক হয়ে গেছে!

সে কথার কি শেষ আছে? সে যে সমুদ্রের মতই অনন্ত—অপার!... কথায় কথায় রাত ভেঙ্গে পড়লো।—প্রাণ-সঞ্চিত আবেগ আলোচনার মুখে অনেকটা লঘু হওয়ায় নিমাইয়ের চিত্তও তখন শান্ত হয়ে এসেছে। শচীদেবী বললেন,—'বাবা, রাত তো ভেঙ্গে এলো, এবার একটু ঘুমোও,—কাল আবার আমরা তোমার কাছে বসে কৃষ্ণের কথা শুনবো।

যদিও শচীদেবী মুহূর্তের জন্যও কামনা করেন না,—নিমাইয়ের মন সংসার-বিমুখ হয়ে—বৈরাগ্য-মুখী হোক,—তবু আজকের ক্ষেত্রে—ছেলেকে সান্ত্বনা দেবার যে আর অন্যভাষা নেই,—বুদ্ধিমতী জননীর এ-কথা বুঝতে বাকী ছিল না!...

* * *

পরদিন স্নানাহ্নিক সেরে নিমাই পণ্ডিত বেরিয়ে পড়লেন শুক্লাম্বরের বাড়ীর উদ্দেশে। পথে বৈষ্ণব দেখলেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন তাঁকে,—বিনীত দীনভাবে প্রার্থনা করেন তাঁর শুভেচ্ছা,—তাঁর প্রীতি এবং আশীর্বাদ! দুই চোখ দিয়ে দরদর অশ্রু ঝরে পড়ে। তাঁর আচরণে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যান সকলে.—এই কি সে চঞ্চল—শাস্ত্র-জ্ঞান-অভিমানী—নিমাই পণ্ডিত?... বৈষ্ণব দেখলেই যে উপহাস করতো অশেষ-বিশেষে!...যেন একটা ধাঁধায় পড়ে যান সকলে।

শুক্লাম্বরের বাড়ীতে তখন শ্রীমান পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, সদাশিব কবিরাজ প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত হয়ে নিমাইয়েরই আলোচনা করছেন,—"যা দেখলাম," —বলছেন শ্রীমান পণ্ডিত,—"তা দেখবো বলে কোনদিন কল্পনাও করিনি।—গদাধরের শ্রীপাদপদ্মের কথা বলতে তো কেঁদেই আকুল!—শয়নে-স্বপনে যেন কৃষ্ণকেই দেখছে,—আর এত নম্র-শান্ত ভাব কেউ কোনদিন দেখেছো কি—নিমাই পণ্ডিতের? পরম বৈষ্ণব হয়ে ফিরে এসেছে নিমাই গয়া থেকে। কৃষ্ণের অসীম কৃপা ছিল ওর ওপর। নয় সাধারণ মানুষের পক্ষে কি সহসা এই প্রেম-লাভ করা সম্ভব?

আলোচনা হতে হতেই সকলে দেখলেন,—নিমাই আসছেন। সেই গদ্‌গদ ভাব,—গণ্ড দুটি ভেসে যাচ্ছে অবিরাম চোখের জলে।—পা যেন টলে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে;—দীর্ঘদেহ,—আজানুলম্বিত বাহু, স্বাস্থ্যবান—সবল যুবক,—

কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছে,—চলবার মতও শক্তি নেই পায়ে। বাহ্যজ্ঞান আছে কিনা,—তাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কোন রকমে এগিয়ে এসে—হা-কৃষ্ণ,—কোথায় আমার কৃষ্ণ—বলে আচম্বিতে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

'কি-হলো—কি-হলো?'—শশব্যস্তে এগিয়ে এলেন সদাশিব কবিরাজ,—তাঁর পিছু পিছু অন্যান্য সকলে। সাশ্চর্যে দেখলেন তাঁরা, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন নিমাই পণ্ডিত।—আয়ত নেত্র দুইটি স্থির হয়ে গেছে,—শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে কি বইছে না,—তাও বোঝা মুস্কিল।

সকলে মিলে অনেক কষ্টে চৈতন্য সম্পাদন করলেন নিমাই পণ্ডিতের। চৈতন্যলাভের পর তাঁকে দেখে মনে হলো, তিনি যেন গভীর নিদ্রা থেকে এইমাত্র জেগে উঠছেন! কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক সেদিক চেয়ে নিমাই বললেন, আর্দ্রকণ্ঠে—'কই, আমার কৃষ্ণ কোথায় গেল? ভজ ভাই, সকলে মিলে কৃষ্ণ ভজনা কর। তাঁর প্রেম ছাড়া জগতের সকলই অসার,—বল, বল, মুরারি, বল সদাশিব, বল শ্রীমান,—হরেকৃষ্ণ—হরেকৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত সকলেই বলে উঠলেন সমস্বরে—,"হরেকৃষ্ণ—হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"—নিমাই প্রেমানন্দে নাচতে লাগলেন দু'হাত তুলে।—কোনো সংকোচ নেই। লজ্জা-কুণ্ঠা সব যেন দূরে চলে গেছে প্রেমের প্রবাহে!—শুক্লাম্বরের বাড়ীতে এসে যা বলবার তাঁর কথা ছিল,—তা আর কাউকেই বলতে হলো না।...বলবার পূর্বেই তাঁর এই প্রবল কৃষ্ণপ্রেমানুরাগ সে কথা বিশদভাবেই ব্যক্ত করে দিলে সকলের কাছে।

সংবাদটা যখন শ্রীবাস পণ্ডিতের কানে উঠ্‌লো,—তখন আনন্দের বেগ দমন করা অসাধ্য হলো তাঁর পক্ষে। তাঁর পরম স্নেহাস্পদ নিমাই বৈষ্ণব হয়েছে,—কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছে সে;—যা তিনি এতদিন প্রতিটি মুহূর্ত কামনা করে এসেছেন সমগ্র অন্তর দিয়ে,—আজ কৃষ্ণের কৃপায় তাই সম্ভব হয়েছে,—এ আনন্দ কি প্রাণে ধরে?—প্রাণের মধ্যে কি ততখানি প্রশস্ত স্থান আছে?... শ্রীবাসের মনে পড়লো,—নিমাই বলেছিলেন একদিন রহস্যভরে হাসতে হাসতে,—'আমি এমন বৈষ্ণব হবো যে,—অজভব পর্যন্ত আমার দ্বারে এসে দাঁড়াবেন।—তাই বুঝি হবে নিমাই!'

শ্রীবাসের একজন তরুণ শিষ্য ছিলেন তখন তাঁর কাছে।—মনে প্রাণেই সে বৈষ্ণব,—কিন্তু তারুণ্যের উদ্দীপনায়—এখনও সহিষ্ণুতা গুণটা বৈষ্ণবোচিত আয়ত্ত করতে পারেনি। বৈষ্ণবদের প্রতি ব্যাঙ্গবিদ্রূপ যেন আগুন জেলে দিতো তার অন্তরে।—নিমাই পণ্ডিত বৈষ্ণব হয়েছেন শুনে,—সগর্ব উত্তেজনায় বলে উঠলো সে,—'এবার দেখে নেবো, কে আমাদের বিদ্রূপ করে?—নিমাই পণ্ডিতের মত শক্তিমান পুরুষ যদি আমাদের দলে আসেন—তবে আর আমরা

গ্রাহ্য করি কাকে?—হরি—হরি।—জয় শ্রীহরি!'—আনন্দে স্থানকাল ভুলে নাচতেই সুরু করে দিলে সে।

এদিকে নিমাইয়ের ছাত্রেরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। নিমাই পণ্ডিত গয়া যাওয়াবধি তাদের আর পড়াশোনা হয়নি, পুঁথির একটি পৃষ্ঠাও ওলটায়নি তারা। অধ্যাপক নিমাইপণ্ডিত অবশ্য নিজের গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে তাদের পাঠ নেবার ব্যবস্থা করেই গয়া যান,—কিন্তু তারা সুস্পষ্ট কণ্ঠেই জানিয়েছে,—নিমাই পণ্ডিত ছাড়া তারা আর কারো কাছে পড়বে না। তাঁর মত অধ্যাপনা আর কে করবে?

গঙ্গাদাস অবশ্য তাতে অপ্রীত হন্‌নি,—বরং একটু গর্ববোধ করেই হেসেছেন মনে মনে,—যেহেতু নিমাই পণ্ডিত যে তাঁরই ছাত্র! 'পুত্রাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্'—এ যদি সত্য হয়,—'শিষ্যাৎ ইচ্ছেৎ'—না হবেই বা কেন?

ছাত্রেরা উদ্বিগ্নচিত্তে এদিক সেদিক জটলা পাকিয়ে বেড়াচ্ছে দেখে নিমাই পণ্ডিতের মনে পড়লো,—তিনি অধ্যাপক,—শত শত ছাত্র এসেছে দূর-দূরান্তর থেকে তাঁর কাছে পড়তে। অনেকদিন তাদের পড়াশোনা বন্ধ আছে,—এখন টোলে বসে তাদের অধ্যাপনায় মন দেওয়া তাঁর একটি বিশিষ্ট কর্তব্য। গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনিও সে কথা জানালেন নিমাই পণ্ডিতকে।

দু'তিন দিন পরে যথাসম্ভব শান্ত ও সংযত মনে নিমাই পণ্ডিত যথারীতি বসলেন গিয়ে টোলে।...ছাত্রেরা কোলাহল করে উঠলো অপার আনন্দে। চারিদিক থেকে অসংখ্য মাথা লুটিয়ে পড়তে লাগলো অধ্যাপকের পায়ে। নিমাই পণ্ডিত সকলকে আন্তরিক প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়ে এবং স্নেহালিঙ্গন দিয়ে বসলেন অধ্যাপনা করতে। কিন্তু যেই ছাত্রেরা "শ্রীহরি, শ্রীহরি" বলে পুঁথি খুলেছে,—অমনি ভাবান্তর উপস্থিত হলো তাঁর।...দুইচোখ নিমেষে ভরে এলো জলে;—সেই শ্যামসুন্দর শিশু—তেমনি মোহন বেশে বাঁশী হাতে ভেসে উঠলো তাঁর বাষ্পাচ্ছন্ন নেত্রের সম্মুখে!

সাহিত্য-কাব্য-ব্যাকরণ-বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি-শাস্ত্র যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল মন থেকে। হৃদয়তন্ত্রীতে আকুলকরা সুরে শুধু একটি কথা বাজতে লাগলো,—'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ!'—অশ্রু ক্রমশঃ ঝরতে লাগলো দরবিগলিত ধারে দুই গণ্ড প্লাবিত করে।—আর অধ্যাপনার শক্তি থাকলো না নিমাই পণ্ডিতের। করুণ নেত্রে ছাত্রদের দিকে চেয়ে বললেন গাঢ় কণ্ঠে,—"ভাই সব,—বৃথা শাস্ত্রাদি পড়ে আর কি করবে? কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ,—প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের নাম নাও,—তাঁরই ভজনা কর,—জীবন সফল হবে।'

ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে তিনি কৃষ্ণপ্রেমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে লাগলেন।

—ভাবাবেগে আকুলিত,—ভক্তিরসে সুমধুর হৃদয়গ্রাহী সে বর্ণনা শুনতে শুনতে ছাত্রেরাও—আত্মহারা চিত্তে চেয়ে থাকলো অধ্যাপকের পানে স্থির মুগ্ধ নেত্রে। সহসা বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো নিমাই পণ্ডিতের,—অ্যাঁ, এ-আমি কি করছি?' নিজের কাছে নিজেই তিনি যেন লজ্জিত হয়ে পড়লেন,—ছাত্রেরা এসেছে তাঁর কাছে শাস্ত্র-অধ্যয়ন করতে;—আর তিনি সে কর্তব্য ভুলে—পাগলের মত তাঁদের এসব কি বলছেন!

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তিনি এবার বললেন,—ভাই সব, আজ এই পর্যন্তই থাক। প্রথম দিন,—ভগবানের নাম করে মঙ্গলাচরণ হলো। কাল থেকে যথারীতি অধ্যাপনা সুরু হবে।

ছাত্রেরা কতকটা অভিভূতের মতই বলে উঠ্‌লো,—যে আজ্ঞা।

৩১

'আজ ছাত্রদের খুব ভাল করেই পড়াতে হবে,'—মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেই দ্বিতীয় দিন টোলে এসে বসলেন নিমাই পণ্ডিত। কিন্তু তিনি কি আর তাঁর নিজের আছেন যে,—যা ভাববেন, তাই করবেন? আজও টোলে বস্‌তেই তাঁর অন্তঃকর্ণে বেজে উঠলো,—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ,—অমনি আগের দিনের মতই ভাবান্তর ঘটলো তাঁর। আবার সুরু হলো সেই কৃষ্ণ-কথা,—শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মহিমার সেই ভাবাকুল কীর্তন;—প্রেমানন্দে আত্মহারা নিমাই পণ্ডিতের দুই আয়ত নেত্র দিয়ে—অজস্র অশ্রু ঝরে পড়তে পড়লো অর্ঘ্যরূপে সেই সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষের চরণে।...ছাত্রেরাও তেমনি মুগ্ধ-অভিভূতভাবে চেয়ে থাকলো অধ্যাপকের দিকে।

কিন্তু সকল ছাত্রই তো আর সমান নয়। কেউ কেউ মনে মনে অসন্তুষ্টও হয়ে উঠলো! অধ্যাপকের এ-হলো কি? আমরা এসেছি দূর-দূরান্তর থেকে শাস্ত্র-অধ্যয়ন করতে,—আমাদের বাপ-মা-ও আশা করছেন, আমরা নানা শাস্ত্র পাঠ করে পণ্ডিত হয়ে বাড়ী ফিরবো। কৃষ্ণ কথা শুনে আমাদের কি হবে?

এমন কি তারা পরস্পর যুক্তি করে একেবারে হাজির হলো গিয়ে নিমাই

'পণ্ডিতের গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে?..."কি—সংবাদ তোমাদের?"—গঙ্গাদাস প্রশ্ন করলেন তাদের দেখে,—"পড়াশোনা সুরু করেছ তো সব?"

'কি করে আর সুরু হবে বলুন?'—একটি ছাত্র অগ্রসর হয়ে বললে,—'নিমাই-পণ্ডিতের মত এতবড় অধ্যাপক সারা দেশে নেই,—তা আমরা বেশ জানি। কিন্তু গয়া থেকে ফিরে অবধি যে তাঁর কি হয়েছে,—টোলে বসে শুধু কৃষ্ণের কথা বলতে সুরু করেন,—আর ঝরঝর করে চোখে জল পড়ে। এক বর্ণও পড়াতে পারেন না। আপনি দয়া করে একবার ডেকে তাঁকে একটু বুঝিয়ে দিন,—নইলে আমাদের পড়াশোনা সব মাটি হলো।

'ও, তাই নাকি!'—হালকাভাবে একটু হেসে গঙ্গাদাস বললেন,—'নিমাইটাও 'হরিভজা' হয়েছে!...আচ্ছা, আচ্ছা, এখন তোমরা যাও,—ও-বেলা তাকে আমার নাম করে ডেকে আনবে,—আমি সব বুঝিয়ে দেব ভাল করে।'...পাছে নিমাই পণ্ডিত আর অধ্যাপনায় মন না দেন,—তাঁর কাছে তাদের অধ্যয়নের সুযোগ আর না ঘটে,—এই আশঙ্কায় ছাত্রদের একটি মুহূর্তও তখন যেন স্বস্তিতে কাটছে না; বিকাল বেলায় তারা অধ্যাপককে সঙ্গে করেই উপস্থিত হলো এসে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে। নিমাই পণ্ডিত ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন গুরুকে,—"আমাকে ডেকেছেন?"—শান্ত করুণ দৃষ্টি তুলে চাইলেন তিনি গঙ্গাদাসের দিকে।

'হ্যাঁ, ডেকেছি।'—গম্ভীর কণ্ঠে বললেন গঙ্গাদাস,—'বসো ওই আসনটায় চেপে, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। তোমরাও বসো ওই বারান্দায়, কিন্তু গোলমাল কুরো না।—বললেন ছাত্রদের উদ্দেশে।—"হ্যাঁ, তারপর নিমাই,"—দৃষ্টি ফিরলো তাঁর নিমাই পণ্ডিতের দিকে,—'এসব কি শুনছি বলো ত?' মৃদু অথচ সস্নেহ তিরস্কারের সুর বেজে উঠলো তাঁর কণ্ঠে,—তুমি আমার পরম সুহৃদ জগন্নাথের ছেলে,—আমাদের কত বড় আশা-ভরসা, গৌরবের স্থল। অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানে-পাণ্ডিত্যে-অধ্যাপনার কৃতিত্বে তুমি আমাদের মুখোজ্জ্বল করেছ, যে তোমার কাছে একটি বর্ণও পড়েছে,—সে আর পড়তে চায় না অন্যের কাছে। কিন্তু তুমি নাকি গয়া থেকে এসে অধ্যাপনার কথা ভুলে টোলে বসে শুধু কৃষ্ণনাম জপ করছো? বলি, এইটাই কি উচিত হচ্ছে তোমার?'

গভীর দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি নিমাই পণ্ডিতের দিকে,—সে দৃষ্টি যেন নিমাইয়ের অন্তর ভেদ করে তাঁর অন্তরের কথাই জানতে চায়!...সহসা কোন কথা ফুটলো না নিমাই পণ্ডিতের কণ্ঠে; একবার ছাত্রদের দিকে চেয়ে মাথা নত করে কি যেন ভাবতে লাগলেন মনে মনে।

গঙ্গাদাস আবার বললেন,—শাস্ত্র পাঠ, শাস্ত্রের অধ্যাপনা,--এ সব কি অবহেলার জিনিষ নিমাই? বিদ্যাদানের তুল্য ধর্ম আর কি আছে জগতে?

'হরি' বলে নেচে বেড়িয়ে কি গৌরব লাভ করবে তুমি? নবদ্বীপ বিদ্যার মহাপীঠ,—বয়স তোমার অল্প হলেও সে মহাপীঠের আজ তুমি গৌরব মুকুট,—কত বিদ্যার্থী তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে বিদ্যার্জনের আশায়। নবদ্বীপে বিদ্যারই আদর—পাণ্ডিত্যেরই সম্মান। বৈষ্ণবরা তো ব্যঙ্গের পাত্র।... কিসের মোহে তুমি মহাসম্মানিত আসন থেকে নেমে— বিদ্রূপের বস্তু হতে চাও?—তোমার দুঃখিনী মায়ের তুমি শুধু পরম নয়,—একমাত্র নির্ভর!...তোমার স্বর্গীয় পিতার কথা মনে কর,—মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর কথাও একবার ভাব,—বিদ্যার্জন, বিদ্যাদান এবং শাস্ত্রচর্চাই ছিল এঁদের প্রাণ,—তুমি তাঁদের সুযোগ্য উত্তরপুরুষ,—তাঁদের স্বর্গীয় আত্মা যে অতৃপ্ত হচ্ছে তোমার এই মতিগতিতে! আমি তোমার গুরু,—তুমি বিপথে গেলে—তোমাকে উপদেশ দিয়ে ঠিক পথে আনবার অধিকার আমার আছে।—তুমি পাগলামি ছেড়ে দিয়ে আগের মত অধ্যাপনায় মন দাও।

অধীর আবেগে অন্তরের দরদ মিশিয়েই গঙ্গাদাস শেষ করলেন তাঁর বক্তব্য। নিমাই পণ্ডিত তাঁর পরম স্নেহাস্পদ,—তিনি নিজে অগাধ শাস্ত্রদর্শী মহাপণ্ডিত,—শাস্ত্রের প্রতি অবহেলা—তাঁর অন্তরে শেলের মতই বাজে। তাঁর প্রিয়তম ছাত্র নিমাই পণ্ডিত শাস্ত্রের প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে—'হরি' বলে বৈষ্ণবদের সঙ্গে নেচে বেড়াবে,—এ কল্পনা করাও গঙ্গাদাসের পক্ষে গভীর বেদনাদায়ক!—পক্ষান্তরে তাঁর অন্তরের দরদ মেশানো কথাগুলির প্রতিবাদ করাও ছিল—নিমাই পণ্ডিতের কাছে সুকঠিন! নিজের অন্তরের কথা বোঝাবার মত ভাষাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। আবার গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কথাগুলির যুক্তিবত্তাও যেন সকলের সম্মুখে লজ্জিত করে তুলছিল তাঁকে। যে সব ছাত্র তাঁর নাম শুনে এসেছে দূর দেশ থেকে,—যাদের অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তিনি,—পাঠ-সমাপ্তির পূর্বে তাদের এভাবে বঞ্চিত করতেও কোথায় যেন বেদনা জাগছিল তাঁর অন্তরে। মনে হচ্ছিল,—এ শুধু ছাত্রদের প্রতিই অবিচার করা হচ্ছে না,—স্বীয় কর্তব্যহানির পাপেও তাঁকে কলুষিত হতে হচ্ছে!

তিনি অপরাধ স্বীকার করলেন গঙ্গাদাসের কাছে।—বললেন যুক্ত করে,—'ক্ষমা করুন। সত্যিই আমার ত্রুটি হয়ে গেছে। এবার থেকে টোলে বসে আমি আগের মতই মন দিয়ে পড়াবো ছাত্রদের।'

বিপুল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিত। —'তোমার কল্যাণ হোক',—বললেন নিমাইয়ের মাথায় হাত দিয়ে স্নেহবিহ্বল স্বরে,—'এতক্ষণে আমার অন্তর থেকে একটা গুরুভার নেমে গেল!' আনন্দের কলগুঞ্জনে ছাত্ররাও তখন মুখর হয়ে উঠেছে,—নিমাই পণ্ডিত আবার তেমনি করে

পড়াবেন তাঁদের, এ আনন্দ যেন ধরছে না আর তাদের বুকে। সকলে মিলে হৈ-হৈ করতে করতে অধ্যাপককে মাঝে করে অগ্রসর হলো মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডী-মণ্ডপের দিকে।

পথে রত্নগর্ভ আচার্যের বাড়ী। বাইরের চালায় কম্বলাসনে বসে—রত্নগর্ভ "ভাগবত" পাঠ করছিলেন,—তাঁর দু'তিনজন শিষ্যও বসেছিল সেখানে। সশিষ্য নিমাই পণ্ডিতকে দেখেই সাগ্রহে বলে ওঠেন রত্নগর্ভ—"এসো, এসো পণ্ডিত, দলবল নিয়ে কোথা গিয়েছিলে?" প্রীতিভরেই তিনি অভ্যর্থনা করেন নিমাই পণ্ডিতকে। তাঁকে দেখলেই কেন যে এত আনন্দ হয়,—তা কিন্তু ভেবে দেখে না কেউ!

সশিষ্য চালায় উঠে বসলেন নিমাই পণ্ডিত। অমনি সুরু হলো নানা শাস্ত্রীয় কথা। হয়ত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কথায় কিছু কাজ হয়েছিল। হঠাৎ গয়াযাত্রার পূর্বের নিমাই পণ্ডিত যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠ্‌লেন তাঁর মধ্যে। মুখে নির্গলিত হতে লাগলো গোমুখী-নির্ঝর অজস্র ধারে। উদাত্ত মধুর কণ্ঠে—অপূর্ব বাচনভঙ্গিমায়—ভাবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে সব শাস্ত্রীয় আলোচনা তিনি করতে লাগলেন,—তা শুনে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে ও আনন্দে পরিপ্লুত হয়ে সকলে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তাঁর শিষ্যদের বুক তখন গর্বে ফুলে উঠেছে,—হ্যাঁ, এমন না হলে অধ্যাপক! অতুল তাদের সৌভাগ্য,—তাই নিমাই পণ্ডিতের কাছে অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছে! আর ভয় কি? নিমাই পণ্ডিত আবার ফিরে এসেছেন তাঁর আপন ভাবে!

সহসা রত্নগর্ভ ভাগবতের একটি শ্লোক পাঠ কর্‌লেন,—

"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ—

ধাতু প্রবাল নটবেশমনুব্রতাংসে।"—

শ্লোকার্দ্ধ উচ্চারিত হতে না-হতেই—'পীতম্বর-পরিহিত, বনমালা-শোভিত—প্রবালাদিরত্নভূষিত নটবেশী শ্যামসুন্দর মূর্তি—সুস্পষ্ট ভাবেই ভেসে উঠ্‌লো নিমাই পণ্ডিতের চোখের সম্মুখে। মুহূর্তে কোথায় গেল শাস্ত্র,—কোথায় গেল তার ব্যাখ্যা। সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগলো নিমাই পণ্ডিতের,—দুই চোখ ভরে এলো জলে,—মুখে ফুটে উঠলো একটি অননুভবনীয় কারুণ্য,—নিশ্বাসও বুঝিবা রুদ্ধ হয়ে এলো,—বেতস পত্রের মত কাঁপতে কাঁপতে তিনি সহসা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

বিপুল ব্যগ্রতায় সকলে তুলে ধরলেন তাঁর দীর্ঘদেহ পরম যত্নে। ভাল করে শুইয়ে দিলেন তাঁকে একপাশে। জীবনের চিহ্নও যেন তখন তাঁর নেই। সর্বাঙ্গ যেন কি আবেশে এলিয়ে পড়েছে! ছাত্রদের মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল দারুণ ভয়ে! কেউ জলের ছিটা দিতে লাগলো মুখে,—কেউ বাতাস

করতে লাগলো মাথায়। সুখের কথা, কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য ফিরে এলো নিমাই পণ্ডিতের। এদিক—সেদিক চাইতে চাইতে রত্নগর্ভ আচার্যের মুখের ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ হলো তাঁর,—"রত্নগর্ভ, থামলে কেন? পড়, শ্লোক পড়!"

কি—সে আকুল আহ্বান! রত্নগর্ভ হেলা করতে পারলেন না, আবার পড়লেন—"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং—"

ব্যস, যেমন শোনা অমনি দু'বাহু তুলে নাচতে থাকেন নিমাই পণ্ডিত।... নাচতে নাচতে নিজেকে সামলাতে না পেরে পড়ে যান মাটিতে,—আবার ওঠেন, আবার পড়েন,—বার বার বলেন,—"রত্নগর্ভ, পড় শ্লোক পড়।"—রত্নগর্ভ যতই পড়েন, ততই নাচতে নাচতে আছড়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ভাবের আবেগে কথাও আর ফোটে না মুখে,—শুধু বলেন,—পড়, পড়, পড়।—ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে—চোখের জলে বুক ভেসে যায়,—হাত পা আছাড় খেতে খেতে অবশ হয়ে আসে,—তবু বলেন,—'পড়। পড়।'

গদাধর ছায়ার মতই অনুসরণ করেন নিমাই পণ্ডিতকে। সর্বদা এবং সর্বত্র। অনেক সময় নিমাই কিন্তু তা বুঝতেও পারেন না। আজ এখানেও এসেছিলেন তিনি। নিমাই পণ্ডিতের অবস্থা দেখে তাঁর প্রাণ কেঁপে উঠ্‌লো! এবার বুঝি কোন বিপদই ঘটে যায়!

এ-দিকে রত্নগর্ভও তখন শ্লোক পাঠে মত্ত হয়ে উঠেছেন,—নিমাইয়ের অবস্থার দিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। সহসা নিমাই এসে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন রত্নগর্ভকে। প্রেমানন্দে বিভোর নিমাইয়ের পুণ্যদেহের পূত স্পর্শে রত্নগর্ভ মুহূর্তে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে তিনিও নাচতে লাগলেন বিহ্বল চিত্তে। এদিকে নিমাই তখন আবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন!

গদাধর আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, আকুলকণ্ঠে বললেন রত্নগর্ভকে ডেকে,—'আচার্য, বন্ধ করুন, শ্লোক পড়া বন্ধ করুন, দেখছেন না নিমাই পণ্ডিতের অবস্থা!'

এতক্ষণে যেন হুঁস হলো রত্নগর্ভ আচার্যের! বাহ্যজ্ঞানহারা নিমাইয়ের দেহ তখন ধূলায় লুটাচ্ছে! এরপর নিমাই পণ্ডিত বার বার—'পড়, পড়' বললেও আচার্য আর সে কথায় কান দিলেন না। মনে মনে তখন কিন্তু তাঁর এক বিপুল দ্বন্দ্ব সুরু হয়ে গেছে,— কে এ নিমাই পণ্ডিত?—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই কি জেগে উঠেছেন তাঁর বুকে?......

*　　　*　　　*

—রাত্রে নিমাই আহারে বসলে শচীদেবী জিজ্ঞাসা করলেন,—'আজ ছাত্রদের কি পড়ালে বাবা?'

'কৃষ্ণ!'—নিমাই আপন ভাবেই উত্তর দিলেন। শচী আবার বললেন,—'আজ কোন বিষয়ের বিচার করলে?'

—"রাধাকৃষ্ণ!"

শচীর অন্তর হাহাকার করে উঠ্‌লো,—"হায়, এ-কি হলো?"—দুই চোখ ছেপে জল এল তাঁর। আকুল কণ্ঠে তিনি আবার বললেন,—ওরে, আমি কি তা জিজ্ঞেস করছি? বাছা, নিমাই, আমার কথা ভাল করে শুনে উত্তর দে বাবা! রুদ্ধ ক্রন্দনের সুরই যেন বেজে উঠলো তাঁর কণ্ঠে!...সে সুর কানে বাজতেই বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো নিমাইয়ের,—'মা, মা,' যেন একটু লজ্জিত হয়েই বললেন তিনি,—"আমার অপরাধ ক্ষমা কর! আমি একটু অন্য কথা ভাবছিলাম, জানিনা, তুমি কি জিজ্ঞাসা করেছ,—আর কি উত্তর দিয়েছি।"

শচী এবার একটু আশ্বস্ত হয়েই বললেন,—আমি জিজ্ঞাসা করছিলুম,—আজ কার সঙ্গে শাস্ত্রের কোন্ বিচার করলে?

মায়ের কাতর মুখ দেখতে পারেন না নিমাই। তাঁকে প্রীত করার উদ্দেশ্যে বললেন মৃদু হেসে,—ও, আজ রত্নগর্ভ আচার্যের সঙ্গে অনেক বিচার-বিতর্ক হলো মা!

সহজ উত্তর পেয়ে শচীর 'হারাই হারাই' চিত্তে তখন কি আনন্দ! তিনি সাগ্রহে আবার জিজ্ঞাসা করলেন স্নিগ্ধ কণ্ঠে,—তা কাল তো টোলে গিয়ে ছেলেদের পড়াবে বাবা!

'হ্যাঁ-মা!'—স্বাভাবিক কণ্ঠেই উত্তর দিলেন নিমাই,—"কাল থেকে মন দিয়ে পড়াবো তাদের।"

'বেশ!'—শচীর আহ্লাদের যেন আর সীমা থাকলো না।

পরের দিন-ও কিন্তু টোলে এসে বসতেই সেই একই অবস্থা হলো নিমাই পণ্ডিতের। সেই কৃষ্ণ-কথা আর কৃষ্ণনাম ছাড়া মুখে আর কিছুই আসে না তাঁর। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সেই একই ভাবে বর্ণনা করে যান কৃষ্ণপ্রেমের অপার মহিমা,—চোখ দিয়ে তেমনি অজস্রধারা বয়ে যায়,—সর্বাঙ্গ এলিয়ে আসে সমান আবেশে!

সহসা চমক ভাঙ্গে তাঁর—নিদ্রার ঘোর যেন কেটে যায়,—সামনে যে ছাত্রটিকে পান,—তাঁরই একখানি হাত চেপে ধরেন অপরাধীর মত,—'ভাই, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর;'—বাষ্পের আবেগে স্বর জড়িয়ে আসে,—"তোমাদের সঙ্গে আমি প্রতারণা করতে পারবো না,—অধ্যাপনা করা আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে।...দৃঢ় ইচ্ছা নিয়েই আমি তোমাদের পড়াতে আসি,—তার মধ্যে কোন ছলনা নেই,—কিন্তু এখানে এসে বসতেই—শ্যাম-সুন্দর এক শিশু যেন আমার সামনে মুরলী বাজাতে থাকে,—অমনি আমার সব ওলট পালট হয়ে যায়,—

শাস্ত্রের কথা তো দূরে,—বর্ণমাত্রও মনে পড়ে না; কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ কথা ছাড়া আর কিছুই আসে না মুখে। তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।'—বলতে বলতে অধীর হয়ে ওঠেন যেন কি ব্যথার আবেগে! অপার দীনতায় ভুলে যান যে, তিনি অধ্যাপক! কিছুক্ষণের জন্যে স্বরও রুদ্ধ হয়ে যায় তাঁর। বহুকষ্টে একটু সামলে নিয়ে আবার বলেন,—নবদ্বীপে বহু মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক রয়েছেন,—কি বয়সে, জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে আমি তাঁদের কাছে বালক; তোমরা তাঁদের মধ্যে যাঁর কাছে যার ইচ্ছা হয়,—অধ্যয়নের ব্যবস্থা কর; বিদ্যার্জনই তোমাদের উদ্দেশ্য,—আমার ধারণা, তাঁরা আমার চেয়েও তোমাদের ভালভাবে শিক্ষা দিতে পারবেন। আমি মুক্তি ভিক্ষা চাইছি তোমাদের কাছে!"

কি প্রাণস্পর্শী কাতরতা!—প্রাণের কি আকুল আবেদন!—ছাত্রদের কারো মধ্যে আজ আর কোন অসন্তোষের ভাব জাগলো না। বরং গতকাল যারা অধ্যাপকের ওপর বিরক্ত হয়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে অভিযোগ করেছিল,—তাদের চিত্তে গভীর অনুতাপই জাগলো আজ। ছাত্রদের মধ্যেও অনেকে ছিল কৃতবিদ্য এবং সুপণ্ডিত। আজ দু'তিন ধরে বিশেষ কাল রত্নগর্ভ আচার্যের ওখানে তারা যা দেখেছে,—তাতে তাদের এটুকু বুঝতে বাকী নেই যে,—তাদের অধ্যাপক যে নিত্যানন্দরসপানে বিভোর হয়েছেন,—তার থেকে তাঁর চিত্তকে শুষ্ক শাস্ত্রের প্রতি টেনে আনার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। বহু যুগ-সঞ্চিত তপস্যার ফলে এই অলৌকিক প্রেমোন্মাদনা জাগে মানুষের অন্তরে! ছাত্রেরা শুক, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তের প্রেম-বিহ্বলতার কথা শাস্ত্রেই পড়েছে,—কিন্তু চোখে দেখেনি। আজ তরুণ অধ্যাপকের ভাবাকুলতা দেখে তাদের মনে হলো, —সেই পৌরাণিক ইতিবৃত্তও যেন এর কাছে সামান্য,—অথবা ভক্তপ্রাণ ভগবানই বুঝিবা লীলা করছেন এ'র অন্তরে।

অধ্যাপকের প্রশান্ত-সরল, দিব্য প্রভায় বিভাসিত—প্রেম-মধুর অথচ কি বেদনার ভারে মলিন মুখখানির দিকে চেয়ে—ছাত্রদের সকলের চোখ ছলছল করে উঠলো। মুখপাত্রস্বরূপ একজন বয়স্ক ছাত্র বললে গাঢ় কণ্ঠে,—গুরু-দেব, ও-আদেশ করবেন না, আপনাকে ছেড়ে আমরা আর কারো কাছেই পড়তে পারবো না। এমন প্রীতি, এমন বুকঢালা স্নেহ,—এত মমতা, এত যত্ন আর আমরা কোথায় পাবো? আপনি আমাদের কত দিয়েছেন,—কি দিয়েছেন, তার হিসাব আমরা জানি না,—কিন্তু যা' দিয়েছেন,—আপনার আশীর্বাদে তাই যথেষ্ট হোক্।

'তাই হোক্,—তাই হোক্।'—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন নিমাই পণ্ডিত, —ভাই সব, আমি একবারও যদি মনে প্রাণে সেই প্রেমময় সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে

ডেকে থাকি,—তবে আমি আশীর্বাদ করি,—তোমাদের মধ্যে সর্ববিদ্যার স্ফূর্তি হোক!

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের সকলের দেহে এক অপূর্ব শিহরণ জেগে উঠ্‌লো! অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হলো যেন অমরার অমৃত-ধারা।...নিমাই পণ্ডিত আবার বললেন,—কিন্তু ভাই সব, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভই জীবনে পরম পুরুষার্থ।...যদি সেই প্রেমলাভই না হলো জীবনে,—তবে বিদ্যা, ধন-সম্মান সবই বৃথা।...সেই প্রেমের কণামাত্র লাভের সৌভাগ্যও যার জীবনে ঘটেছে,—তার সকল বিদ্যাই আয়ত্ত হয়েছে।...তোমরাও সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণ নাও,—তাঁর নাম-গান কর। আহা, কি সে মধুর নাম,— কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—রাধাকৃষ্ণ—

সহসা কিছুক্ষণের জন্য তিনি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। চোখে নেমে-এলো অজস্র অশ্রু। অভিভূত নেত্রে ছাত্রেরা চেয়ে রইলো তাঁর দিকে, তাদের হৃদয়-বীণার তারেও যেন তখন ঝঙ্কৃত হচ্ছে—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—

বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়েই নিমাই আবার বললেন,—ভাইসব, অনেকদিন এক-সঙ্গে বসে কত শাস্ত্র আলোচনা করেছি। যদি আমাকে ভালোবাস তবে আজ তোমরা আমার একটি সাধ পূর্ণ কর।...এসো, সকলে মিলে একবার কৃষ্ণ কীর্ত্তন করি।

ছাত্রেরাও তখন অন্তরে অন্তরে অধ্যাপকের ভাবে বিভাবিত হয়ে পড়েছে। তারা সানন্দে এবং সমস্বরেই বলে উঠলো প্রগাঢ় কণ্ঠে,—গুরুদেব, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

আপনাকে যেন কৃতার্থ জ্ঞান করলেন নিমাই পণ্ডিত। অন্তরে জাগলো তাঁর বিপুল উল্লাস, হাততালি দিয়ে তালে তালে নেচে গাইতে লাগলেন তিনি,—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল-গোবিন্দ শ্রীরাম-মধুসূদন।

গানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণভরা প্রেমের অর্ঘ্য যেন ঝরে পড়তে লাগলো দুই চোখ দিয়ে। আচার্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অনুকরণ ও অনুসরণ করে শিষ্যের দলও নাচতে লাগলো আত্মহারা আনন্দে তালে তালে!

৩২

এরপর নিমাই পণ্ডিতের জীবনে এলো যেন এক মহা প্লাবন! সে প্লাবনের অতল তলে তাঁর জীবন একখানি ক্ষুদ্র তরণীর মতই কোথায় তলিয়ে যেতে লাগলো! বিশ্ব-সংসার তাঁর চোখে হয়ে উঠলো কৃষ্ণময়! জলে, স্থলে, আকাশে,—সর্বত্রই কৃষ্ণ! কৃষ্ণ ছাড়া আর যেন কোথাও কিছু নেই,—কেউ নেই!

অন্তরে প্রবল কৃষ্ণপ্রেমানুরাগ,—মুখে অবিরাম কৃষ্ণ নাম,—দুটি পদ্ম-পলাশ-আঁখি ছাপিয়ে—ঝরে পড়ে অজস্র কৃষ্ণপ্রেমের ধারা—কোথায় আমার কৃষ্ণ,—কই আমার কৃষ্ণ,—কোথায় গেলে তাঁকে পাবো,—প্রতিটি মুহূর্ত্ত শুধু এই চিন্তায় আকুল হয়ে ওঠেন তিনি! কৃষ্ণপ্রেমের নব-অনুরাগে শ্রীমতী রাধার চিত্তও বুঝিবা এমনি ব্যাকুল—এমনি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল!

নিমাই—কখনো আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন শূন্য দৃষ্টিতে, সজল কালো মেঘ দেখে মনে পড়ে সেই সজলজলদাঙ্গ মুরলীধর শ্যামসুন্দরকে,—আত্ম-হারা হয়ে ওঠেন "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে,—পীতবর্ণের কিছু দেখলে মনে পড়ে যায় সেই পীতাম্বরকেই; কখনো বা স্তব্ধভাবে বসে উৎকর্ণ হয়ে শোনেন যেন—তাঁরই মোহন বাঁশীর প্রাণারাম সুর।

কখনো ঠায় বসে থাকেন এক জায়গায়—নির্বাক-নিস্পন্দ,—চোখের জলের কিন্তু বিরাম নেই,—হু-হু করে গড়িয়ে পড়ছে—দুটি শুভ্র গণ্ড প্লাবিত করে। সহসা পাগলের মত উঠে ছুটে যান,—"ওই, ওই যে আমার কৃষ্ণ" বলে যেন কাউকে ধরতে। কখনো বা বাহ্যজ্ঞানহারা হয়ে দুবাহু তুলে নাচতে থাকেন—"হরি হরি" বলে। কখনো বা বিড়বিড় করে আপন মনে কি-যে বকে যান,—তা তিনিই জানেন।

যখন তবু একটু প্রকৃতিস্থ থাকেন,—শচীদেবীর কাছে এসে বলেন,—মা, আমায় এবার ছেড়ে দাও,—'আমি আমার কৃষ্ণকে খুঁজতে যাবো—বনে বনে,—যমুনার কুলে—কুলে। আবার তখনই আত্মহারা হয়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলে ওঠেন,—মা, মা, তুমি কি আমার মা যশোদা?

দেখে শুনে শচীদেবীর প্রাণ অধীর হয়ে ওঠে গভীর দুঃখে, দারুণ-দুশ্চিন্তায়। সমগ্র অন্তর তাঁর হা-হা-কার করে ওঠে সুতীব্র বেদনায়,—হায়, হায়, একি হলো তাঁর? ছেলে তাঁর নদীয়ার গৌরব,—রূপে-গুণে-শীলে বিদ্যায় তার যেন আর তুলনা নেই,—কিন্তু কার অভিশাপে—এমন ছেলের এই দশা ঘটলো। নিমাই তাঁর সত্যিই পাগল হলো না-কি?

নিমাই তাঁর নয়নের মণি। হাজার হাজার তারার মাঝে দীপ্তিমান্ একটি পূর্ণচন্দ্রের মত নিমাই তাঁর একাই একশ' সুপুত্রের চেয়েও গরীয়ান,—মহীয়ান! সেই ছেলেই যদি ভাগ্যদোষে এমনি হয়ে যায়,—তবে কি সুখে আর থাকবেন তিনি সংসারে?—কি বলেই বা প্রবোধ দেবেন কিশোরী বধূ—একান্ত সরল-প্রাণা পতিপ্রেমমুগ্ধা বিষ্ণুপ্রিয়াকে?

নিমাই অন্ততঃ দিনান্তে একবারও আত্মস্থ হয়ে তাঁর সঙ্গে সহজভাবে দুটো কথাবার্ত্তা বলেন,—এ জন্য শচীর কতই না প্রয়াস! প্রতিনিয়ত ঐ কামনায় যেন আকুল হয়ে থাকেন মর্ম্মাহতা জননী! অনেক চেষ্টায় নিমাই হয়ত কদাচিৎ বলেন,—মা, আমার যে কি রোগ হয়েছে বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমার আর কিছুই ভাল লাগে না; কেবলই কাঁদতে ইচ্ছা হয়।

সুযোগ বুঝে শচীদেবী বিপুল আগ্রহে আবার কিছু বলতে যান,—কিন্তু ততক্ষণে নিমাই আর এই একটু আগের নিমাই নেই,—ডুবে গেছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে।

প্রথম প্রথম শচী ব্যাপারটা চেপেই রেখেছিলেন; তাঁর পরম পণ্ডিত ছেলের এই অবস্থা,—একথা লোকের কাছে বলতে দুঃখে বুক ফেটে যেতো তাঁর; দারুণ লজ্জায় কণ্ঠে স্বরই ফুটতে চাইতো না। কিন্তু নিমাইয়ের প্রকৃতিস্থ হবার কোন লক্ষণই যখন আর দেখা গেল না,—তখন পুত্রের অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে তিনি কথাটা তুললেন একদিন পাড়া-পড়শীদের কাছে।

পাড়া-পড়শীরাও নিমাইয়ের সংবাদে বিমর্ষ হয়ে উঠলেন;—দুঃখ হলো সকলেরই মনে। নিমাই পণ্ডিত যে সকলেরই প্রীতির পাত্র! তাঁকে দেখতে দেখতে যে এক অনাস্বাদিত আনন্দের শিহরণ জাগে—অন্তরে অন্তরে! তাঁর প্রতি কারো তো কোন দ্বেষ-হিংসা নেই! তিনি যে নিজের গুণে জয় করেছেন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই হৃদয়।

অনেকে এলেন নিমাই পণ্ডিতকে দেখতে! যাঁরা প্রবীণ অথবা প্রবীণা,—তাঁদের ডেকে আনলেন শচী সমধিক আগ্রহে। যেহেতু তাঁরা অনেক দেখেছেন,—অনেক শুনেছেন। তাঁরাই বিশেষভাবে বলতে পারবেন লক্ষণাদি দেখে, নিমাইয়ের কি হয়েছে।

কিন্তু নিমাইকে কিছুক্ষণ ধরে দেখতে দেখতে তাঁদের চোখ-মুখের ভাব

অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে উঠ্‌লো,—গভীর বিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাসও ফেল্‌লেন তাঁরা। বললেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে,—এ আর দেখছো কি?—জিজ্ঞাসা করবারই বা আর কি আছে? এ-তো বদ্ধ পাগলই হয়ে গেছে!

শচীদেবীর অন্তরে সজোরে কে-যেন হাতুড়ীর ঘা মারলো! মুহূর্তে কি যেন আতঙ্কে চোখ মুখের রক্ত যেন কোথায় সরে গেল তাঁর। ওদিকে তখন আর একজন মন্তব্য করছেন,—আগে ছোট বেলায় বায়ুরোগ ছিল না? সেই বায়ুরোগই এখন সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। এখনও যদি ভাল করতে চাও,—খুব যত্ন নাও,—সর্বদা চোখে চোখে রাখো,—সর্বদা গায়ে মাথায় বিষ্ণুতেল মাখাও। কবরেজ ডেকে ওষুধের ব্যবস্থা কর।

কেউ বা দেখতে এসে বলে যান,—অবস্থা চরমে উঠেছে। হাতে পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ,—নয় কোন সময় ছুটে গিয়ে গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়েই পড়বে। ওর কি আর কোন জ্ঞান-গম্যি আছে। পাগল হতে এখনও বাকী আছে না-কি?

কেউ বা বলেন,—ঘরের ভেতর তালাবন্ধ করে রাখ। কখন যে কি খেয়াল চাপবে মাথায়,—হয়ত তোমাদেরই কোন অনিষ্ট করে বসবে।

নিমাই পণ্ডিতকে নিঃসন্দেহে পাগল সাব্যস্ত করে এই রকম কত মন্তব্যই না করে যান কত জনে। শুন্‌তে শুনতে—নিমাই পণ্ডিতের যাই হোক—নিমাইয়ের মায়ের আর পাগল হবার বাকী থাকে না! ব্যথায় বুকের প্রতিটি পাঁজর যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তাঁর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শূন্য হয়ে যায় তাঁর চোখের সামনে।

বলা বাহুল্য, নিমাই পণ্ডিতের সাক্ষাতেই সকলে মন্তব্য করেন তাঁর সম্বন্ধে। যে পাগল,—তার আর সাক্ষাৎ আর অসাক্ষাৎ কি? তার কি আর কোন দিকে চোখ-কান আছে?—আপন-ভাবে বিভোর, কৃষ্ণনামে পাগল নিমাই পণ্ডিত নিরুত্তরভাবেই শুনে যান সকলের কথা,—মাঝে মাঝে জানি না কেন, করুণ দৃষ্টি তুলে মায়ের অশ্রুসিক্ত মুখখানির দিকে তাকান। আবার কখনো বা পাড়া-প্রতিবেশীদের দিকেও নীরব দৃষ্টিতে চেয়ে স্তব্ধভাবে কি-যেন ভাবছেন মনে হয়। চোখে কিন্তু ধারার বিরাম নেই। দুই গণ্ড প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে সে ধারায়।

পাগলিনীর মতই শচীদেবী এবার ছুটলেন স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু—পরম হিতৈষী শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে। কাঁদতে কাঁদতে বললেন তাঁকে সব কথাই।... বিস্ময় জাগলো শ্রীবাসের মনে,—এও-কি সম্ভব? গয়া থেকে নিমাই পরম বৈষ্ণব হয়ে ফিরেছে,—এইতো জানেন তিনি! হঠাৎ সে পাগল হলো কেমন

ক'রে ?...শচীর ব্যাকুলতা শ্রীবাসকে আরও অধীর করে তুললো,—তিনি সেই দণ্ডেই ছুটে এলেন শচীর সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী।

শ্রীবাস পরম বৈষ্ণব, কৃষ্ণপ্রেমানুরাগী;—কৃষ্ণভক্তকে দেখতেই নিমাই পণ্ডিত প্রগাঢ় ভক্তিতে নুয়ে পড়লেন;—সম্ভ্রমে উঠে প্রণাম করতে গেলেন তাঁকে।...কিন্তু হঠাৎ যেন কিসের আবেশে বিবশ হয়ে ঢলে পড়লেন সেখানে।

শ্রীবাস দেখেন,—নিমাই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু সে অবস্থাতেও তাঁর চোখের জলের বিরাম নেই। ওষ্ঠ ও নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হচ্ছে! ভক্ত শ্রীবাস যেন এই একটু সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারলেন, নিমাই পণ্ডিতের অন্তরের কথা। তিনি তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বারবার বলতে লাগলেন,—কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ!

ভক্তকণ্ঠে উচ্চারিত মধুর সেই কৃষ্ণনাম নিমাইয়ের কানের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করলো তাঁর মর্মে। তিনি সহসা চেতনা ফিরে পেয়ে—এদিক সেদিক চাইতে লাগলেন—যেন কা'কে খুঁজছেন। সহসা প্রবল উচ্ছ্বাসে কেঁদে উঠলেন তিনি, —"কই, কই আমার কৃষ্ণ,—এই যে, এই যে তাকে দেখছিলাম,—এরই মধ্যে কোথায় লুকালো? আহা-হা, কি শ্যামসুন্দর রূপ, কি—ভুবন-ভোলান হাসি,—কেমন ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে দাঁড়িয়ে ছিলেন কদম্বের মূলে। ওগো কোথায় গেল,— কৃষ্ণ আমার কোথায় গেল?—আবার উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদতে লাগলেন শিশুর মত।

শ্রীবাস পণ্ডিত গভীর নিরীক্ষায় চেয়ে থাকলেন নিমাই পণ্ডিতের মুখের পানে, চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ইতিমধ্যে সহসা যেন বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো নিমাই পণ্ডিতের। এবার অনেকটা সহজভাবেই শ্রীবাসকে প্রণাম করে বললেন তিনি প্রগাঢ় কণ্ঠে,—পণ্ডিত, আমার কি হয়েছে বলতে পার? আমার সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে,—অবিরত কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। কখন কি যে করছি,—কি-যে বলছি,—তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মাঝে মাঝে একবার করে আচ্ছন্ন ভাব কেটে যায়,—তখন বুঝতে পারি, —আমার অবস্থা দেখে মা আমার খুবই ভয় পেয়েছেন,—লোকে আমাকে দেখতে এসে—তাঁকে বলে, আমি পাগল হয়ে গেছি,—আমাকে বেঁধে রাখা উচিত!... আমি কিন্তু কিছুই ভাল করে বুঝতে পারি না বলে,—চুপ করেই থাকি। কারো কোন কথার উত্তর দিতে ইচ্ছাও হয় না।

বলতে বলতে তিনি যেন আবার সব ভুলে চোখ বুজে কার ধ্যান করতে লাগলেন। পুত্রকে এমনি সহজভাবে কথা বলতে দেখে শচীর প্রাণে যে তখন কত আশা-ভরসা জেগে উঠ্‌ছে,—তা বর্ণনাতীত! তিনি বিপুল আগ্রহে ব্যগ্র-কণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন,—বাবা নিমাই, চুপ করলে কেন বাবা,—পণ্ডিতের কাছে

সব কথা খুলে বল। উনি আমাদের পরম আত্মীয়। কোন লজ্জা-সংকোচ করো না ও'র কাছে।

অ্যাঁ—সহসা সুপ্তোত্থিতের মতই নিমাই-পণ্ডিত চাইলেন মায়ের ...ক—'ও—হাঁ'—পূর্বকথা বুঝি মনে পড়ে গেল তাঁর,—'দেখ পণ্ডিত,'—শ্রী ...র দিকে দৃষ্টি ফেরালেন তিনি,—'মা আমার ভারী কাতর হয়ে পড়েছেন ..তাঁর দুঃখ যখনই বুঝতে পারি,—তখনই আমার প্রাণ কে'দে ওঠে। তুমি ...ল পণ্ডিত,—সত্যিই কি আমি পাগল হয়েছি?...তা যদি হয়,—এ-প্রাণ তবে আর আমি রাখবো না,—গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে—

বাষ্পের আবেগে তাঁর স্বর আটকে গেল। শ্রীবাস আকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন,—'স্থির হও নিমাই, তোমার কিছু হয়নি। তুমি যদি পাগল হবে,—তবে সত্যিই যারা পাগল,—তাদের চৈতন্য আনবে কে?'—শচীর দিকে ফিরে বললেন,—'আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনার ছেলের যে বায়ু রোগ হয়েছে,—এ বায়ু ব্রহ্মা-শিবও বাঞ্ছা করেন।...আপনার ছেলের ওপর কৃষ্ণের কৃপা হয়েছে। পরম ভাগ্যবান ছাড়া এমন কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বপ্নেরও অতীত। এমন আত্মহারা প্রগাঢ় ভক্তি জীবে কোনদিন সম্ভব বলে আমার ধারণা ছিল না।

পরে আবার নিমাই-পণ্ডিতকে সম্বোধন করে বললেন,—'নিমাই, তোমার ঐ বায়ু যদি তুমি আমাকে একটু ভিক্ষা দাও,—আমি কৃতার্থ হয়ে যাই। যে যাই বলুক,—তুমি কারো কথায় কান দিও না। এখন থেকে আমরা সকলে মিলে—আমার বাড়ীতে সংকীর্তন করবো,—তোমার এই দুর্লভ কৃষ্ণ-প্রেমের স্পর্শে আমাদের মত পাপীতাপীও উদ্ধার হয়ে যাবে।'

আশা-আশ্বাস-স্পন্দিত বুকে শচীদেবী জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীবাসকে,—'তাহলে নিমাইয়ের আমার এ বায়ু-রোগ নয়?—লোকে যে বলছে'—

সহসা বাধা দিলেন শ্রীবাস,—না, না, লোকের কোন কথা শুনবেন না।...নিমাই যে আপনার কি বস্তু,—পরে আপনি সবই বুঝতে পারবেন।...স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ লীলা করছেন—তার অন্তরে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কাল থেকেই আমরা সংকীর্তন আরম্ভ করবো। নিমাইয়ের জন্যে মোটেই ভাববেন না।

এতক্ষণে শচীদেবী তবু যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলেন। ভাবলেন, ঘরের মধ্যে এইভাবে একলা-একলা না থেকে যদি পাঁচজনের সঙ্গে নিমাই সংকীর্তন করে,—সে তবু মন্দেরও ভাল।...কিন্তু পাছে কৃষ্ণ-প্রেমে পাগল হয়ে—নিমাইও একদিন বিশ্বরূপের মত সংসার ছেড়ে চলে যায়,—এই আশঙ্কাও তাঁর মন থেকে দূর হলো না।...

৩৩

প্রাণের মধ্যে নিরুদ্ধ ভাবাবেগ প্রকাশের পথ পেলে—মানুষের মন যেন অনেকটা সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে।...শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহাঙ্গনে হরিনাম-সংকীর্তন সুরু হবার পর থেকে—নিমাই-পণ্ডিত বাহ্যতঃ পূর্বের চেয়ে কিছুটা ধীর ও শান্ত হয়ে উঠলেন। শ্রীবাস নিজে এবং মুকুন্দ দত্ত, মুরারি, সদাশিব ও গদাধর প্রভৃতি কীর্তনে যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে।

অন্তরের প্রগাঢ় কৃষ্ণ-প্রেম প্রকাশের পথ না পেয়েই দিবারাত্রি নিমাইকে প্রায় পাগল করেই তুলেছিল,—কিন্তু নেচে-গেয়ে—'কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণমাহাত্ম্য' কীর্তন করে করে,—এবং প্রাণাধিক কৃষ্ণকে কীর্তনের সুরে প্রাণভরে ডেকে ডেকে—তাঁর মন তবু অনেকটা হালকা হয়ে উঠলো। কীর্তনে তিনি আনন্দও পেলেন প্রচুর।

কিন্তু এতেও কি নিমাই-পণ্ডিতকে নিয়ে চিন্তার অন্ত আছে?

সংকীর্তন—কৃষ্ণানুরাগ এবং কৃষ্ণ-প্রেমের অভিব্যক্তির একটি প্রকৃষ্ট উপায়। ...প্রেম যত প্রগাঢ় হবে,—তার অভিব্যক্তিও হবে তত গভীর,—ততই প্রাণ-উন্মাদনা-কর।...কীর্তন করতে করতেও নিমাই-পণ্ডিত ক্রমে কৃষ্ণগুণগানে এমনি বিভোর—এমনি উন্মত্ত হয়ে উঠলেন যে,—ঠিক আগের মতই তাঁর আত্ম-বিস্মৃতি ঘটতে লাগলো।...কীর্তন গেয়ে নাচতে নাচতে তিনি বারবার আছাড় খেয়ে পড়েন,—অঙ্গে কত আঘাত লাগে,—কিন্তু কোন হুঁস নেই তাঁর।...যারা কাছে থাকে,—তাদের মনে হয়, হায় হায়—নিমাই-পণ্ডিত বুঝি আছাড় খেয়েই মারা পড়বে!

চোখে ঝরে তাঁর তেমনি শ্রাবণের ধারা,— আছাড় খেয়ে—কখনো বা ধূলায় গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করেন;—আবার তখনই উঠে দু-বাহু তুলে নাচতে থাকেন,—হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—বলে।...কখনো বা নাচতে নাচতে মূর্ছিতও হয়ে পড়েন! ব্যগ্র হয়ে ওঠেন সকলে তাঁর চৈতন্য সম্পাদনে।

কীর্তন থামলেও তিনি কিছুক্ষণের জন্যে তন্দ্রাবিষ্টের মত পড়ে থাকেন এক-পাশে।...ধীরে ধীরে তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে।

কীর্তন করার পর বাকী সময়টা তিনি কিছুটা সহজ ও শান্তভাবে থাকলেও—এক মুহূর্তও কৃষ্ণচিন্তা অথবা কৃষ্ণনাম জপ না করে থাকতে পারেন না। অবশ্য তখন ভাবাবেগের উদ্দামতা আর থাকে না। শচীদেবীর পক্ষে এখন সেইটুকুই হয়েছে সান্ত্বনার বিষয়।

কীর্তনের সময় ছাড়া—নির্জনেই থাকতে ভালবাসেন নিমাই-পণ্ডিত।...সে সময় বাইরের কারো সংগে বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎও হয় না তাঁর।...কিন্তু নিত্য-নিয়মিত যখন গংগাস্নানে বার হন,—তখন গদাধর প্রভৃতি দু'একজন অন্তরংগ তাঁর সংগে থাকেন।...তাঁরা একলা কোথাও যেতে দেন না নিমাই-পণ্ডিতকে।

কিন্তু পথ চলেন নিমাই-পণ্ডিত নীরবেই—মুখের ভাব শান্ত-করুণ, যেন কার বিরহে কাতর, চোখ দুটি ছল ছল করছে।...আগে পথে কাউকে দেখলেই সাগ্রহে ছুটে যেতেন তাঁর সংগে শাস্ত্রীয় তর্ক-বিতর্ক করতে;—এখন কিন্তু লোক দেখলেই—পথের একপাশে সংকুচিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন।...বৈষ্ণব বা কৃষ্ণভক্ত দেখলে অবশ্য প্রগাঢ় ভক্তিতে তাঁকে প্রণাম করেন,—জলসিক্ত পদ্ম-পলাশের মত প্রশান্ত নেত্র দুটি তাঁর মুখের ওপর নিবদ্ধ করে বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলেন,—'আমি কৃষ্ণকে পাবো না? কৃষ্ণ কি আমায় কৃপা করবেন না?'

ভক্ত-বৈষ্ণবের হৃদয়ও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নিমাইয়ের কৃষ্ণপ্রেমের গভীরতায়। গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি বলেন,—তুমি মহাভাগ্যবান,—কৃষ্ণ তোমার অন্তরে!

পুলক-আবেশে নিমাই-পণ্ডিতের সর্বদেহে শিহরণ জাগে,—দরদর ধারা গড়িয়ে পড়ে দুই চোখের কোণে। গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেন,—'আপনাদের যখন আমার প্রতি কৃপা আছে,—তখন তাঁর কৃপাও আমি পাব।'

ক্রমে নিমাই-পণ্ডিতকে নিয়ে নানা দিকে নানারূপ আলোচনা সুরু হলো! ...তাঁর এই বিস্ময়কর পরিবর্তন, এই প্রেমমুগ্ধতা,—দীনাতিদীন এই করুণ ভাব—অনেকের মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার করলো।...বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তো তাঁর আলোচনায় আত্মহারা হয়ে মেতে উঠলেন।...তাঁরা বলতে লাগলেন,—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ কৃপা ছাড়া,—এমন প্রেম কি জীবে সম্ভব? ধন্য নিমাই-পণ্ডিত,—ধন্য নবদ্বীপের বৈষ্ণব-সমাজ তাঁকে পেয়ে,—একদিন সারা নবদ্বীপও ধন্য হবে তাঁর প্রেমে।

শাস্ত্রসর্বস্ব পণ্ডিতেরা অবশ্য কেউ কেউ তখনও বিদ্রূপ করতে ছাড়লেন না,—হুঁ, কৃষ্ণকৃপা হয়েছে!...ব্রাহ্মণের কাজ, বিদ্যাচর্চা, শাস্ত্রালাপ ইত্যাদি সব ছেড়ে ধেই ধেই করে নেচে বেড়ালেই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্তিতে এসে হাজির হবেন!

এইসব পণ্ডিতরা কিন্তু যখন নিমাই-পণ্ডিতকে স্বচক্ষে দেখেন,—তখন

তাঁদের কণ্ঠে আর একটিও বিদ্রূপের বাণী ফোটে না,—বরং কেমন যেন অভিভূত হয়ে চেয়ে থাকেন তাঁরা নিমাইয়ের মুখের পানে;—মনে মনে ভাবেন,—সত্যিই কি তাঁরা চিনতে ভুল করছেন নিমাই-পণ্ডিতকে?

নিমাই-পণ্ডিতের কথা ক্রমে উঠলো গিয়ে অদ্বৈতাচার্যের কানে।...মুহূর্তে প্রেমানন্দে তিনি বিভোর হয়ে উঠলেন,—তবে কি, এতদিনে সার্থক হলো তাঁর তপস্যা,—এতদিনে সফল হলো কি তাঁর আকুল-আহ্বান?...এমন আত্মভোলা প্রেম না হলে কি আর অজ্ঞান-তিমিরে পতিত জীব উদ্ধার পেতে পারে? তবে কি জীবোদ্ধারের জন্যেই প্রেমরূপে আবির্ভূত হয়েছেন নিমাই-পণ্ডিতের অন্তরে—সেই প্রেমের সাগর সচ্চিদানন্দ বাসুদেব?—বুঝিবা তাই হবে।

তিনি যে স্বপ্নও দেখেছেন,—কে যেন তাঁকে ডেকে বলছেন,—আচার্য, ওঠ, আর দুঃখ করো না। আমি স্বয়ং এসেছি।...তোমার সাধনা সিদ্ধ হয়েছে। এবার শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন আরম্ভ হবে,—জীব উদ্ধার পাবে। ওঠ।

তবে—তবে—এই নিমাই-পণ্ডিত কি সেই? বাল্যকাল থেকে তাকে দেখতে দেখতে তাই কি আমার অন্তরে এত পুলক-শিহরণ জাগে?—ভাবতে ভাবতে আচার্য ডুবে গেলেন—নিমাই-পণ্ডিতেরই তত্ত্বালোচনায়।

সহসা একদিন গদাধরকে সঙ্গে করে নিমাই-পণ্ডিত এলেন আচার্যের বাড়ী। অদ্বৈতাচার্য তখন তুলসী-মঞ্চের সম্মুখে বসে ইষ্টপূজা করছিলেন।...ললাটে তাঁর এক পুণ্য প্রশান্তি, ভক্তিভারে চোখ দুটি মুদিত,—দুটি যুক্তকর বুকের ওপর নিবদ্ধ।

পরম ভক্ত অদ্বৈতাচার্য,—তার ওপর তাঁর এই প্রেমমুগ্ধ ভক্তিনত ভাব দেখেই নিমাইয়ের অন্তরে কি-ভাব জাগলো, তিনি বিপুল উচ্ছ্বাসে 'কৃষ্ণ—কৃষ্ণ' বলে প্রাঙ্গণেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

প্রাণ-আকুল-করা তাঁর সেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' রবে,—সহসা আচার্যের চোখ দুটি খুলে গেল!...মূর্চ্ছিত নিমাইকে দেখে তিনি ব্যগ্রভাবে তাঁর কাছে এসে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন তাঁর মুখের দিকে।...'কে-এ?...কে-এ? এই প্রেমোজ্জ্বল পুণ্য মুখখানি কার?'—গভীর নিরীক্ষা ফুটে উঠলো আচার্যের দুই চোখে,—'মরি মরি, আধো-নিমীলিত চোখ দুটির কি অপরূপ শোভা,—যেন অশ্রু নয়,—করুণার ধারা ঝরে পড়ছে দুই চোখের কোণ বেয়ে।...স্বেদ, কম্প, পুলক,—প্রেমের প্রতিটি লক্ষণ যেন ফুটে উঠেছে সারা দেহে।...এই নিমাই-পণ্ডিত?—না, আমার সেই একান্ত অন্তরের ধন,—প্রেমরূপী কৃষ্ণ?'

ভাবের আবেগে আচার্য আত্মহারা হয়ে উঠলেন,—তাঁর মনে হলো, নিমাই-পণ্ডিতই স্বয়ং শ্রীভগবান। তিনি তুলসী গঙ্গাজল দিয়ে তাঁর চরণ পূজা করে প্রণাম করলেন তাঁকে:

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

গদাধর কিন্তু চমকে উঠলেন আচার্যের কাণ্ড দেখে,—ও-কি, ও-কি, ঠাকুর?—আপনি করছেন কি?...আপনি বৃদ্ধ—মহাজ্ঞানী পরমভক্ত,—নিমাই-পণ্ডিত আপনার পুত্রের মত, আপনার কি ওঁকে প্রণাম করা সাজে?—এতে যে ওঁর অপরাধ হবে!

আচার্য হাসলেন আপন মনে,—হাঁ-হাঁ, পুত্রের সমানই বটে!...কে কার পুত্র,—কে কার পিতা,—এর পরেই বুঝবে সকলে!

নিমাই-পণ্ডিত কিন্তু চেতনা ফিরে পেয়ে পায়ের কাছে অদ্বৈতাচার্যকে দেখেই ধড়মড় করে উঠে পড়লেন। তারপর আচার্যকে প্রণাম করে বললেন,—'গোঁসাই, আজ আমার মহাভাগ্য,—তাই আপনার চরণ দর্শন করলাম। আপনার চরণেই আমি শরণ নিচ্ছি।...আপনি ভগবানের পরমভক্ত,—পুণ্যবান মহাপুরুষ,—আমি অধম জীব,—সংসার-পঙ্কে ডুবে আছি,—উদ্ধারের পথ পাই না। আপনি আমাকে কৃষ্ণপ্রেম দিয়ে উদ্ধার করুন।

ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরে পড়লো নিমাই-পণ্ডিতের দুই গণ্ড প্লাবিত করে?...আচার্য যেন একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেন। সাশ্চর্যে ভাবলেন,—নিমাই-পণ্ডিত যদি শ্রীভগবান,—তবে তাঁর এই দীন ভাব কেন?—যিনি জীবোদ্ধারের জন্যে এসেছেন—নিজের উদ্ধারের জন্যে কেন তাঁর এত কাতরতা...তবে কি তিনি আত্মপ্রকাশ করতে চাইছেন না?—অথবা ভক্তকে ছলনা করছেন?

মনের দ্বন্দ্ব মনে চেপে রেখে আচার্য বাইরে সহজভাবেই বললেন, নিমাই, তুমি জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে,—বিশ্বরূপের ভাই,—তুমি আমার পরম স্নেহের পাত্র। তোমার কৃষ্ণপ্রেম হয়েছে জেনে আমি বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। আশা-ভরসাও আমার অনেকখানি বেড়েছে।...এবার আমিও কীর্তনে যোগ দেব তোমাদের সঙ্গে।

অদ্বৈত মুখে এইরূপ বললেন বটে,—অন্তরে কিন্তু তাঁর তেমনি দ্বন্দ্ব-দ্বিধা জেগে রইলো।...কখনো ভাবেন,—আকুল প্রাণে যাঁকে তিনি এতদিন ডেকে আসছেন জীবের দুর্গতি দূর করবার জন্যে,—নিমাই-পণ্ডিতই সেই ভগবান,—আবার কখনো বা তাঁর মনে হয়,—হয়ত তা নয়; নিমাই একজন ভক্ত মাত্র।

ভাবতে ভাবতে সহসা একদিন তাঁর মাথায় এক মতলব জেগে উঠলো,—তিনি স্থির করলেন,—তিনি আর এখন নবদ্বীপে থাকবেন না,—চলে যাবেন নিমাই-পণ্ডিতের থেকে দূরে—শান্তিপুরে।...সত্যিই নিমাই যদি তাঁর আরাধ্য

হন, তবে নিজেই তিনি যাবেন তাঁর কাছে।...ভক্তকে কৃপা করতেই হবে ভগবানের।...পরদিনই নবদ্বীপ ছেড়ে তিনি চলে গেলেন শান্তিপুরে।

*　　　*　　　*

এর পর শ্রীবাসের আঙিনায় দিনরাতই কীর্তন চলে।...ফুলের সৌরভে অলি যেমন ছুটে আসে দিগ্-দিগন্ত থেকে,—নিমাই-পণ্ডিতের আকর্ষণে তেমনি অনেকে অধীর আগ্রহে ছুটে এসে যোগ দেয় সংকীর্তনে।...কোন কোন-দিন কীর্তন করতে করতে সারা রাতই কেটে যায় নিমাই-পণ্ডিতের,—কোনদিক দিয়ে কেমন করে সময় কেটে যাচ্ছে,—কীর্তন করতে করতে সে-হুঁসও থাকে না তাঁর। যাঁরা তাঁর সঙ্গে কীর্তন করেন,—তাঁদেরও সেই দশা।...নিমাই-পণ্ডিতের কীর্তনে যেন যাদু আছে,—মন্ত্রমুগ্ধের মতই সকলে তাঁকে ঘিরে মৃদঙ্গের তালে তালে—কীর্তনের আরোহে ও অবরোহে নাচতে থাকেন।

• ক্রমশঃই নানা ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পায় নিমাই-পণ্ডিতের দেহে।...এই হাসছেন এই কাঁদছেন,—তখনই দেহে যেন আগুন জ্বলছে,—আবার তখনই হিমের মত শীতল সে সোনার দেহ,—কখনো বা কলকল করে ঘাম বয়ে যাচ্ছে দেহে,—'মূর্তীমতী গঙ্গা যেন আইল শরীরে,'—কখনো শ্বাসরুদ্ধ,—কখনো যেন নিশ্বাসে ঝড় বইছে। উত্তান দৃষ্টিতে পড়ে আছেন কখনো নিশ্চল হয়ে,—মনে হচ্ছে যেন জীবনের চিহ্নমাত্রও নেই,—কখনও দেহ এত ভারী হয়ে ওঠে, যে কেউ নড়াতে পারে না,—আবার কখনো বা এমনি লঘু যে, যে-কেউ অনায়াসে কাঁধে তুলে নাচতে পারে। শরীর কখনো পাথরের মত শক্ত,—কখনো বা এত নরম যে,—দেহে হাড় আছে কিনা তাও ভাবতে হয়!

একে তো নিমাই-পণ্ডিতের কীর্তন শুনতে শুনতে লোকে ভুলে যায়,—সংসারের তাপ-জ্বালা,—এক অপার্থিব মধুর রসের আস্বাদ লাভ করে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে সকলের;—তারপর তাঁর ভাব-লক্ষণাদি দেখতে দেখতে এক প্রগাঢ় ভক্তিভাবের উদয় হয় সকলের অন্তরে,—ক্রমে ক্রমে নিমাই-পণ্ডিতের ভক্তের সংখ্যা বেড়ে যায়,—তাঁর প্রশান্ত নেত্রের অমিয় দৃষ্টিতে সকলেই দেখে যেন এক দিব্যলোকের ছায়া,—চমকে উঠে ভাবেন ভক্তেরা,—নিমাই-পণ্ডিত কি মানুষ? ...মানুষের এত প্রেম? সাধারণ মানুষের দেহে কি এত সব ভাব-লক্ষণ সম্ভব?

নিমাই নৃত্য করেন কখনো উদ্দণ্ড—কখনো মধুর। ভাবেরও পরিবর্তন ঘটে ক্ষণে ক্ষণেঃ

ক্ষণে হয় বাল্যভাব পরম চঞ্চল।
মুখে বাদ্য করে যেন ছাওয়াল সকল॥

চরণ নাচয়ে ক্ষণে খল খল হাসে।
জানুগতি চলে ক্ষণে বালক-আবেশে ॥

একদিন শচীদেবীর গৃহাঙ্গণেই নৃত্য-গীত আরম্ভ হলো। ভক্তগণ সমভাবে যোগ দিলেন নিমাই-পণ্ডিতের সঙ্গে। গৃহ-বারান্দায় বসে শচীদেবী, দু-চারজন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে কীর্তন শুনতে লাগলেন। ভক্তেরা শ্যামের গুণ-গান করে কীর্তন ধরলেন।

না জানি কতেক মধু—শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ হইল তনু
আঁখি আর পালটিতে নারে ॥

আর কি? সঙ্গে সঙ্গে নিমাই নাচতে লাগলেন আত্মহারা হয়ে।...বৃন্দাবন-বিহারী শ্যামসু[illegible]নি এবং তাঁর মোহন বাঁশরীর সুর যেন আকুল করে তুললো তাঁকে। প্রথমে নাচছিলেন মধুর নৃত্য,—ক্রমে ক্রমে সে-নৃত্য রূপান্তরিত হলো উদ্দণ্ড নৃত্যে।...নিমাই-পণ্ডিতের আর বাহ্যজ্ঞানও যেন থাকলো না, ভুলে গেলেন তিনি জগৎ-সংসার,—ভুলে গেলেন তাঁর নিজেকে. চোখে বইতে লাগলো শ্রাবণের ধারা!

নাচতে নাচতে বারবার আছাড় খেয়ে অচেতন হয়ে পড়েন—প্রাঙ্গণের কঠিন মাটিতে,—কিন্তু কোথায় পড়ছেন,—দেহের কোথাও লাগলো কিনা,—এসব অনুভূতিও তাঁর নেই। এদিকে নিমাই যতবার আছড়ে পড়েন,—শচীদেবীর বুক ততই ধুক ধুক করে ওঠে—অন্তর তাঁর কেঁদে কেঁদে ওঠে,—হায় হায়,—বাছার আমার হাড়গোড় বুঝি ভেঙ্গে গেল! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হয়—বুকখানা পেতে দেবেন তিনি,—যেখানে নিমাই আছাড় খেয়ে পড়ছেন সেখানে। তাহলে হয়ত কঠিন মাটির আঘাত নিমাইয়ের গায়ে লাগবে না। নিমাই আছাড় খেয়ে ব্যথা পাচ্ছেন কি-না তার অনুভূতি অবশ্য তাঁর নেই, হয়ত মায়ের নিবিড় স্নেহের ব্যাকুলতা সেই সেই জায়গায় পুষ্প-কোমল শয্যার সৃষ্টি করছে,—কিন্তু প্রতিটি আছাড় যেন বুক ভেঙ্গে দিচ্ছে শচীদেবীর! অধীর কণ্ঠে কীর্তনীয়াদের ডেকে বলেন তিনি,—'ওগো, ধর ধর, বাছাকে আমার তুলে ধর। আর না—আর না; এবার কীর্তনে ক্ষান্ত দাও তোমরা।'—কিন্তু আছাড় খেয়ে আবার যখন উঠে দাঁড়াচ্ছেন নিমাই,—তখন পুত্রগতপ্রাণা জননী যেন কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করছেন,—না,—তাহলে নিমাইয়ের আমার হাড় ভাঙ্গেনি! কীর্তনীয়াদের লক্ষ্য করে আবার বলেন তখন,—'ওগো,— ওগো, তোমরা সকলে মিলে ঘিরে থাক নিমাইকে,—বাছা যেন আবার ঢলে আছড়ে না পড়ে।'—সঙ্গে সঙ্গে চোখের দুকোণ বেয়ে ঝরঝর জল গড়িয়ে পড়ে তাঁর।

নিমাইয়ের ভাবাধীরতা কিন্তু ক্রমশঃ একটু একটু করে কমে আসতে থাকে,—এবং ভাবগুলিই তাঁর অধীন হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এমন হলো,—নিমাই যাঁকে স্পর্শ করেন,—তাঁরই অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চার হয়,—নিমাইয়ের কীর্তন যে শোনে,—তাঁরই হৃদয়-বীণায় বেজে ওঠে সেই কীর্তনের মর্মগত সুর। পরশমণির স্পর্শে যেমন লোহা সোনা হয়ে যায়,—নিমাইয়ের স্পর্শেও বুঝিবা তেমনি—যে-কেউ বিহ্বল হয়ে ওঠে তাঁর ভাবে। ভাবাকুল ভক্তগণ ভক্তিপ্লুত চিত্তে নিমাইয়ের স্বর্ণ-গৌর অঙ্গের দিকে চেয়ে প্রীতি-গাঢ় কণ্ঠে তাঁকে অভিহিত করেন—'শ্রীগৌরাঙ্গ' বলে।—ভক্তদের দেওয়া এই আদরের নাম—মায়ের দেওয়া 'নিমাই' নামের পরই বুঝিবা সবচেয়ে মধুর! কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে সে-নাম বিপুল উচ্ছ্ব গারাঙ

[illegible] নিমাইয়ে বদ্বীপ ন্ত অনুগত—অ[illegible]ঙ্গ;—ছায়ার মতই ফেরেন নিমাইয়ের পিছুপিছু-ক-হচ্ছে,—ত প্রীতিও তাঁর [illegible]। একদিন নি[illegible] ই-পণ্ডিতের সবিস্ময়ে দেখেন, গদাধ অনেক রকম

'কাঁদছো কেন গদ। একটা আক্রে সা করেন নিমাই,—কণ্ঠে অজস্র স্নেহ,—'কি হলো তোমার?' টিপে ধরে

সখেদে উত্তর দেন গ—"ওদের লেই তোমার কৃপায় ধন্য হলো,—পাষাণেও অমৃতধারা ছুটলো,—কিন্তু খল এটে ার তো কৃষ্ণপ্রেম জাগলো না। আমি কি কৃপা পাবো না?

'তুমি পাবে না?'—নিমাইয়ের চোখে করুণা,—মুখে মৃদু প্রশান্ত হাসি,—যেন অমিয় ঝরছে সে-হাসিতে,—'অবশ্যই পাবে।...কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করবেন।

গদাধরের আনন্দের সীমা থাকে না। পরদিন গঙ্গাস্নানের পরই তাঁর অন্তরে এক বিপুল ভাব-তরঙ্গ জেগে ওঠে,—সে-তরঙ্গে সমগ্র প্রাণ নেচে ওঠে তাঁর,—এত নির্মল আনন্দ,—তিনি যেন আর জীবনেও উপলব্ধি করেননি। হৃদয় তাঁর পূর্ণ হয়ে উঠেছে তখন ভগবৎ প্রেমে! যোগিজনবাঞ্ছিত দুর্লভ সে সাধনার ধন, যে পেয়েছে, তার আর পেতে বাকি আছে কি?...কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে গদাধর নাচতে থাকেন জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড ভুলে।

আর একজন তখন নিমাইয়ের করুণা লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। ইনি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। নিষ্ঠাবান ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। নিমাইকে মনে মনে পুজো করেন বাৎসল্যভাবে। পরম মমতায় ও স্নেহে নিমাইয়ের পরিচর্যাও করেন। একদা তিনি এসে বললেন নিমাইয়ের কাছে,—'আমি তো অনেক ধর্ম-কর্ম করেছি। দ্বারাবতী, মথুরা প্রভৃতি বহু তীর্থ পর্যটন করে পুণ্য-সঞ্চয়ও করেছি। আমায় কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা দাও।'

মনে মনে তাঁর দম্ভ রয়েছে দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ রুষ্ট হলেন,—বললেন রূঢ়

টা নতুন মত চালাতে চায় আর কি? কিন্তু বাবা, এ হলো নবদ্বীপ,—নে শাস্ত্রের বাইরে কোন নতুন মত চালানো সোজা কথা নয়। দিগ্‌গজ গজ পণ্ডিতরা বুঝি কিছু বোঝে না!

"আরে নিমাইও তো একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিল,—দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকেও র্ক হারিয়ে দিয়ে ও নবদ্বীপের মান রেখেছে। কিন্তু—" বক্তা মুখটাকে কুত করে তোলে,—ছিঃ, ছিঃ, ওর যে এমন মতিচ্ছন্ন ঘট্‌বে—কে-জানতো!... ব আমাদের একটা উচিত ব্যবস্থা করতে হয়েছে। চিরকাল যে শাস্ত্র চলে স্‌ছে.—তা অমান্য করে এ সব করলে যে, ভগবানের রোষে দেশে দুর্ভিক্ষ ব,—মহামারী পড়বে,—মানুষের দুর্গতির আর অন্ত থাক্‌বে না! ওদের ?—ওরা নেচে কুঁদেই খালাস!

'অত সোজা নয়!' ভিড়ের মধ্য থেকে একজন গোঁয়ার গোছের লোক গয়ে আসে,—'দেশের রাজা মুসলমান, তার কাছে চালাকি চলবে না! একবার নলে হয়, এই সব কথা,—তখন মজা বুঝবে নিমাই পণ্ডিত আর তার দলের াক! কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করে কাজ কি? চল না, আজই ওদের বাড়ী ভেঙ্গে চুরে গঙ্গার জলে ফেলে দিই! হুঁ, সাধন-ভজন কর্‌ছে!... মরা বুঝি—বোকা! সাধন-ভজন বুঝি কেউ লুকিয়ে করে! ওরা নিশ্চয় না কুকর্ম করছে। দরজা ভেঙ্গে ঢুকতে পার,—দেখবে, ওরা সব মাতাল,— না পেটে পড়লে কি আর হৈ-হল্লা করতে পারে!

'শুধু মদ?'—অপর একজন তাকে সমর্থন করে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে, মদ-মাংস দুই চলছে দেখবে,—তার সঙ্গে নষ্ট মেয়েমানুষও আছে, এ আমি জ রেখে বলতে পারি। যেখানে গোপন,—সেইখানেই জানবে পাপ।—তা' ত চিন্তায় কাজ কি? চল না, আজই কাজীর কাছে,—ওদের নামে আচ্ছা র নালিশ ঠুকে দিয়ে আসি।

অবশেষে তাই সাব্যস্ত হলো। সকলে দল বেঁধে ছুটলো কাজীর কাছে। জীকে লম্বা সেলাম ঠুকে জানালো তাদের অভিযোগ,—'নিমাই পণ্ডিত াণ্ড এক দল গড়ে হিন্দুধর্ম নষ্ট করছে! ওরা খোল-কত্তাল বাজিয়ে গলা ড়ে বেসুরো চীৎকার করে,—কি-যে বলে, কিছুই বোঝা যায় না,—তবে 'হরি হরি' শব্দটা মাঝে মাঝে কানে আসে। কেউ কেউ বলে,—ওরা না-কি 'কেত্তন' রছে। কিন্তু ওদের অনাচারে হিন্দু ধর্ম নষ্ট হচ্ছে,—ভগবান অসন্তুষ্ট চ্ছেন! দেশের অকল্যাণ হলো বলে!—ওদের অপকর্মের ফলে সারা দেশে ভিক্ষ পড়ে যাবে।'

কাজী কি বুঝলেন আর কি না বুঝলেন,—তিনিই জানেন। তবে দলবদ্ধ

অভিযোক্তা দেখে তাদের বললেন,—আচ্ছা, ওরা যাতে আর এ-সব না ক
তার ব্যবস্থা করবো।

ক্ষুর আনন্দে লোকগুলি ফিরে এলো কাজীর কাছ থেকে।...

* * *

শ্রীবাসের আঙিনায় কীর্ত্তন কিন্তু তেমনি চলতে লাগলো। দিনে
পুষ্ট হতে লাগলো নিমাই পণ্ডিতের সংকীর্ত্তনের দল। তাঁর সংকীর্ত্ত
কথাও ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে।

বিদ্বেষীরা এবার অধৈর্য হয়ে উঠ্লো। তারা একটা ঘোর চক্রান্ত ব
মিছেমিছিই রটিয়ে দিলে,—'গৌড়েশ্বর বাদশা হোসেন শা' খুব চটে গে
নবদ্বীপে কীর্তন হচ্ছে শুনে। মুসলমান সৈন্যেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গঙ্গাপ
হয়ে আসছে নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিত এবং তাঁর দলবলকে সায়েস্তা কর
সকলকে ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করবে তারা। তারপর গুরুতর সাজা দেও
হবে,—বিশেষ করে নিমাই পণ্ডিতকে।

গুজবটা এমন জোরে রটালো,—যাতে অনেকেই বিশ্বাস করলে সে কথা
নবদ্বীপের পাড়ায় পাড়ায় রীতিমত আলোচনা সুরু হয়ে গেল। কীর্তনীয়াদে
কেউ কেউ খুব ভয়ও পেলেন। তাঁরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন,—
সংকীর্ত্তন যে-যার ঘরে বসে করাই ভাল,—হৈ—চৈ-এর দরকারই বা কি?—এ
কি শ্রীবাস প্রভৃতি কোন-কোন ভক্তেরও যেন ভয় হলো! কিন্তু নিমাই পণ্ডি
অটল,—তাঁর মনে কোন দুর্বলতা বা শঙ্কা জাগলো না।

ভাবাবেগ তখন কিছুটা কমে এসেছে নিমাই পণ্ডিতের। অনেকটা সহ
ও স্বাভাবিকভাবেই এখন তিনি সঙ্গীদের নিয়ে বিকালে বেড়াতে আ
গঙ্গাতীরে; অথবা সহরের মধ্যে ঘুরে বেড়ান। যৌবনের প্রভাবে—তাঁর প্র
অঙ্গের রূপ-সৌন্দর্য ক্রমশঃই বেড়ে উঠ্ছে। বৈষ্ণব কবির ভাষায়,—যা
বলে "ঢল ঢল রূপের লাবণি"। চোখেমুখে একটি দিব্য আনন্দের সুনিম
প্রভা,—চন্দন-চর্চিত সে বরবপুর দিকে চাইলে মুগ্ধ দৃষ্টি আর ফেরানো
না। কি গঙ্গাতীরে—কি রাজপথে—নিমাই পণ্ডিত কিন্তু বড় বেশি বাক্যা
করেন না কারো সঙ্গে। মনের মত কাউকে পেলে অবশ্য আলাপ-আলো
করেন। তাও বেশি নয়।

'এই যে নিমাই,'— গঙ্গাতীরে একদিন তাঁকে দেখে যেন বিস্ময়ে চমে
উঠলেন এক পণ্ডিত,—তুমি যে বেশ নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছ!'
কণ্ঠেও বিস্ময়ের সুর বেজে উঠলো তাঁর।

কথা কইবার ইচ্ছা ছিল না তাঁর সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের। কিন্তু উ
না দেওয়াও হবে অশিষ্টাচার,—তাই বললেন,— কেন মশায়, ভয়ের কারণটা

অ্যাঁ—চোখ দুটো কপালে উঠলো পণ্ডিতের,—"তুমি কি কিছু শোননি? যারা স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখে এসেছে ,তারাই বলছে,—রাজার সৈন্য আসছে গৌড় থেকে কীর্ত্তনীয়াদের ধরতে। আগে তোমাকেই ধরবে। তা তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয়েও এখনও এভাবে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছ কেন বাপু? তার চেয়ে বরং এখন নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যাও,—কোন দূর জায়গায়। তোমার মা'কে এবং স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। কেন, খামোকা দুর্গতি ভোগ করবে?—

হাসলেন মনে মনে নিমাই পণ্ডিত,—যথেষ্ট বুদ্ধিমান তিনি নিশ্চয়ই,—না হলে এইসব পণ্ডিতদের চিনবেন কি-করে? একটু চুপ করে থেকে—গম্ভীরভাবেই বললেন,—হ্যাঁ, আমিও শুনেছি সে-কথা। কিন্তু কোথায় পালাব বলুন,—এতবড় একজন বাদশাকে ফাঁকি দিয়ে পালালেই কি আর রক্ষা থাকবে? তার চেয়ে রাজা যদি আমাকে ধরে নিয়ে যান,—তাতে আমার মঙ্গলই হবে।

'মঙ্গল হবে?'—পণ্ডিত হাঁ-করে চাইলেন নিমাইয়ের মুখের দিকে। নিমাই উত্তর দিলেন মৃদু হেসে,—দেখুন, আমি যে অল্প বয়সেই এত লেখাপড়া করলুম,—কিন্তু নবদ্বীপে কেউ কি আমাকে তেমন গ্রাহ্য করে? রাজা আমাকে ধরে নিয়ে গেলে আমি তাঁর সভায় আমার বিদ্যার পরিচয় দেব। তখন বরং রাজা আমাকে সম্মান করবেন,—আর রাজসম্মান ভাগ্যে জুটলে,—আপনারাও আমাকে সম্মান করবেন।

কথা শুনে পণ্ডিতের এবার যেন গাত্রদাহ হলো,—"আর বাপু",—মুখখানা বিকৃত করে বললেন তিনি—"সম্মান না লাঞ্ছনা জুটবে,—তা ভেবে দেখেছ? মুসলমান রাজা,—সে তোমার কাব্য-ন্যায়-সাংখ্যের কি জানে?"

নিমাই এবার ভারী বিরক্ত হয়ে উঠলেন,—"তা' সে যখন ধরে নিয়ে যাবে, তখন ভেবে দেখবো। এখন থেকে চিন্তা কেন?—বলেই তিনি গঙ্গার উদার বুকের দিকে চেয়ে থাকলেন।

"আচ্ছা, আচ্ছা, সৈন্যরা যখন এসে পৌঁছবে,—তখনই বাহাদুরী বোঝা যাবে।"—বিড়বিড় করে বকতে বকতে পণ্ডিতটি মনে মনে নিমাই পণ্ডিতের মুণ্ডপাত করতে লাগলেন।

৩৮

—"শ্রীবাস, দরজা খোল',—আমি এসেছি।"

রুদ্ধদ্বার পূজা-কক্ষে বসে আপন আরাধ্য শ্রীনৃসিংহদেবের ধ্যান করছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত। সহসা চমকে উঠলেন তিনি,—কে, কে তুমি?

বাইরে উত্তর হলো গভীর স্বরে,—যাঁকে তুমি ধ্যান করছ,—আমি সেই শীগ্‌গির দ্বার খোল'।

কার কণ্ঠ বুঝতে না পেরে অপার কৌতূহল জাগলো শ্রীবাসের মনে তিনি আর বসে থাকতেও পারলেন না। তাড়াতাড়ি উঠে দ্বার খুলে দেখলেন,- সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং নিমাই পণ্ডিত। সর্বাঙ্গে যেন তাঁর এক অদৃষ্ট-পূ জ্যোতিঃ ফুটে বেরুচ্ছে! প্রশান্ত নেত্রের পুণ্যবিমল দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে,- এক সুদিব্য স্বর্গীয় দীপ্তি! সারা মুখে এক অব্যক্ত মহিমার প্রোজ্জ্ব প্রকাশ! বিদ্যুৎ-স্পর্শে যেন চমকে উঠলেন শ্রীবাস,—এ-কি? এ কা দেখছেন তিনি! স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন কি তবে কোন মহিমময় দেবত —না, না, এ-মূর্ত্তি তো তাঁদের একান্ত আদরের বস্তু নিমাই পণ্ডিতের!

আপাদ-মস্তক তিনি এক সন্ধানী-দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন নিম পণ্ডিতের।—হ্যাঁ, নিমাই পণ্ডিতই তো! দৃষ্টি-বিভ্রম নয়,—স্বপ্ন নয় প্রহেলিকা নয়,—সত্য! দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট—একান্ত বাস্তব।—প বন্ধু জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাই। কিন্তু এ-কার তেজ ফুটে বেরুচ্ছে সারা অঙ্গে?—কার কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে তাঁর কণ্ঠে?

শ্রীবাসের সারা দেহে জাগলো এক প্রবল আলোড়ন। দৃষ্টি গভীর স্থির নেত্রে চাইলেন তিনি নিমাই পণ্ডিতের দিকে।—যেন কোন অপূর্ব সন্ধান করছেন তিনি সেই জ্যোতির্দীপ্ত আননে। বুকের স্পন্দন তাঁর দ্রুত হয়ে উঠেছে!

নিমাই আবার বললেন,—স্বরে সেই গভীরতা,—'শ্রীবাস আমি উ তুমি আমার অভিষেকের আয়োজন কর।'

এক সঙ্গে হৃদয়ের সকল তন্ত্রী নেচে উঠলো শ্রীবাস পণ্ডিতের! তবে কি
তবে কি,—তাঁর জীবনের পরম প্রার্থিত, একান্ত কামনার ধন,—তাঁর সাধনার
বতা শ্রীভগবানই এসেছেন নিমাইয়ের রূপে,—করুণার স্নিগ্ধ ধারায় তাঁর
ীবনের সকল তাপ-জ্বালা জুড়িয়ে দিতে?—কিম্বা নিমাই পণ্ডিতের অন্তরেই
গে উঠ্ছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ?—অথবা—অথবা নিমাই পণ্ডিতই কি—
কে উঠ্লেন শ্রীবাস,— মুহূর্তে কে-যেন তাঁর অন্তর থেকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব
ছু সরিয়ে দিয়ে সেখানে এনে দিলে এক অটল বিশ্বাস; "আমি এসেছি",—
কথার "আমি" যে কে,—এ ভাবতে গিয়েও প্রেম-তরঙ্গে তাঁর প্রাণ নেচে
লো,—তিনি আকুল কণ্ঠে ডাকলেন তাঁর ভাইদের,—বাড়ীর মেয়েদের,—
তামরা ছুটে এসো,—আমাদের বহু পুণ্যফলে এসেছেন শ্রীভগবান আমাদের
ড়ীতে,—তাঁর অভিষেক করতে হবে।"

শ্রীবাসের আকুল আহ্বানে ছুটে এলেন সকলে সেখানে—শ্রীবাস আবার
নি প্রেমাকুল আগ্রহে বললেন,—ভাইদের দিকে চেয়ে,—"যাও, যাও, এক্ষুনি
ম কলসী কিনে আন,—একশত ঘট গঙ্গাজল দিয়ে প্রভুর অভিষেক করতে
।"—সঙ্গে সঙ্গে তিনি চাইলেন বিভাবসুসম তেজোময়-দেহ নিমাই পণ্ডিতের
ক।

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন বসে পড়েছেন,—শ্রীবাসের পূজা-কক্ষে যে বিষ্ণুখট্টা ছিল,—
বারে তারই ওপর! শয্যায় শায়িত শালগ্রাম শিলা খাটের একপাশে সরিয়ে
ছেন তিনি।...আসল কথা,—নিমাই পণ্ডিতের অন্তরে জেগে উঠেছেন
;—সর্বজীবের আত্মারূপী স্বয়ং শ্রীভগবান!...ভগবৎ-আবেশে আত্মহারা
তিনি ভুলে গেছেন তাঁর লৌকিক পরিচয়;—তার স্থলে—"আমি সেই,"—
নিখিল বিশ্বের প্রাণ-স্বরূপ,—এই আত্মানুভূতিই জেগে উঠেছে তাঁর
রে। কোন কথাই তিনি স্ব-বশে বলছেন না,—কোন কাজই তিনি করছেন
-ভাবে!—মানে নিমাই পণ্ডিতের ভাবে।

শ্রীবাসের আত্মীয়-স্বজনও নিমাই পণ্ডিতের অলৌকিক দিব্যপ্রভান্বিত
ত— চন্দ্রকরোজ্জ্বল মুখকান্তি,—এবং আয়ত প্রশান্ত নেত্রের সুধাবর্ষী
র দিকে চেয়ে মুহূর্তে এক অনাস্বাদিত—অপার্থিব উল্লাসে উল্লসিত
কঠলেন। সেই দণ্ডেই ছুটলেন তাঁরা শ্রীবাসের আদেশ-পালনে। ভাবমুগ্ধ
বসন্ত দুই কর সংযুক্ত করে বসলেন—নিমাই পণ্ডিতের সম্মুখে।

তথাবিলম্বেই অভিষেকের আয়োজন সম্পূর্ণ হলো। গৃহ-প্রাঙ্গণের মধ্য-
শ্রীগৌরাঙ্গকে একখানি প্রশস্ত পিঁড়ির ওপর বসিয়ে—শত শত কলস
সেচি গঙ্গাজল ঢালা হলো তাঁর মস্তকে। স্নানের পর শুদ্ধ শুষ্কবস্ত্র পরিধান
তিনি আবার এসে বসলেন বিষ্ণুখট্টারই ওপর। ইতিমধ্যে গদাধর প্রভৃতি

কোন কোন ভক্তও এসে পড়েছেন সেখানে। শ্রীগৌরাঙ্গের পবিত্র ভাস্বর মূর্তি দিকে চেয়ে তাঁদেরও অন্তর বিহ্বল হয়ে উঠেছে ভক্তি ও প্রেমের পুলকে।

"শ্রীবাস!"—খট্টায় বসে ডাকলেন নিমাই,—ঠিক এই স্বরে এবং এইভা এর পূর্বে আর কোনদিন তিনি ডাকেননি পূজনীয় শ্রীবাস পণ্ডিতকে শ্রীবাসও এর পূর্বে আর কোনদিন এমনি দাস্যভাবের দৃষ্টিতে দেখেননি নিম পণ্ডিতকে। আহ্বান শুনে তিনি তটস্থ হয়ে এগিয়ে এলেন,—প্রভু!

"তোমার ঘরে আমার আসন করে দাও।"—নিমাই নেমে পড়লেন বিষ্ণুখ থেকে।

সকলে মিলে তাড়াতাড়ি সে খট্টা নিয়ে গেলেন শ্রীবাসের ঘরে। নিম সেখানে গিয়ে আবার খট্টায় বসতে—গদাধর প্রভৃতি সকলে তাঁকে সাজি দিলেন দেবোপম বেশে। অঙ্গে অগুরু, কুঙ্কুম, চন্দন প্রভৃতি লেপন করলেন প্রেমানন্দে যেন সকলেই তখন বিভোর হয়ে উঠেছেন।

'শ্রীবাস!'—এবার বলতে লাগলেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—আমি কে জান? আ সেই,—যিনি তোমাদের সকলের অন্তরে বিরাজ করেন। জীবের দুঃখ নিবার জন্যেই আমি এসেছি। কোন ঐশ্বর্য নয়,—কোন দণ্ড নয়,—শুধু প্রেম, শ ভক্তি, শুধু প্রীতি দিয়েই এবার আমি সকলের দুঃখ দূর করবো। তে কি বিধর্মী মুসলমান রাজার ভয় কর?

'প্রভু!'—গদ্‌গদ হয়ে উঠলো শ্রীবাসের কণ্ঠ,—আমরা যখন তোমার পেয়েছি,—তখন আর আমাদের কিসের ভয়?—কাকেই বা ভয়?'

'না, ভয় তোমরা করো না।'—শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠে জলদ-গম্ভীর ফুটলো অভয় বাণী,—'রাজা মুসলমান হলেও তিনি তোমাদের কারো ক্ষতি করতে পারবেন না। উপরন্তু আমি প্রেম দিয়ে তাঁর হৃদয় জয় কর আমার ভাবেই সে ভাবিত হয়ে উঠবে। প্রমাণ চাও? বেশ, দেখ।'—বা দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি ডাকলেন উচ্চকণ্ঠে,—"নারায়ণী, নারায়ণী!

নারায়ণী শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী,—বয়স তার মাত্র চার বছর। শ্রীগৌরা আহ্বানে সে চঞ্চল হরিণ শিশুর মত চপল চরণে এ ঘরে এসে উপস্থিত হ শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁকে সস্নেহে স্পর্শ করে বললেন,—শ্রীকৃষ্ণে তোমার মতি হোব

অমনি কি আশ্চর্য,—সেই চার বছরের বালিকার দুচোখ ভরে জল এ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে নাচতে লাগলো সে আত্মহারা হয়ে। মৃদু প্রশান্ত নিমাই বললেন,—আমি রাজার কাছে গেলে,—তাঁরও ঠিক এই দশা হবে। তাঁর সে সৌভাগ্যলাভের এখনও অনেক দেরী।

এই পরম বিস্ময়কর কাণ্ড দেখে কিছুক্ষণের জন্যে কোন কথাই ফ না কারো মুখে। নিমাই পণ্ডিতের করুণা-প্রশান্ত—দিব্য-দ্যুতি-বিজ

।খানির দিকে ভক্তিপ্লুত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলেন সকলে চিন্তিত-পূর্ব কোন্ কল্পলোকের কথা। মন চলে গেছে তাঁদের তখন জগৎ ড় বহু ঊর্ধ্বে—এক পরম শান্তিময় ধামে।

বাড়ীর মেয়েদেরও তখন আনন্দের সীমা ছিল না। পরম কৃষ্ণপ্রেমানুরাগী নিমাই পণ্ডিতের মধ্যে স্বয়ং শ্রীভগবান প্রকট হয়েছেন শুনে,—শ্রীবাসের ধর্মিণী মালিনীদেবীকে পুরোভাগে রেখে,—মহিলারা ধীরে ধীরে এসে ালেন শ্রীগৌরাঙ্গের সম্মুখে। তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়তেই নয়ন যেন সার্থক য় উঠলো সকলের। মাথা আপনা থেকেই নুয়ে পড়লো তাঁদের। মধুর-ভীর স্বরে শুভ আশীর্বাণী ফুটে উঠলো গৌরাঙ্গের কণ্ঠে—সকলকে দেশ করে।

হঠাৎ নিমাই বলে উঠলেন,—"এবার আমি যাই,—আবার সময় হলেই বো।"...পরমুহূর্তেই তিনি ধপ করে পড়ে গেলেন বিষ্ণুখট্টা থেকে—র ওপর।...সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছা। শ্রীবাস ব্যাকুল হয়ে তাঁকে তুলে ধরলেন লে। দেখলেন, জীবনের চিহ্নও যেন তখন নেই।... আরো আশ্চর্য্যের বিষয়, য অলৌকিক পুণ্যজ্যোতিঃ, যে অমানুষিক তেজ এতক্ষণ ফুটে বেরোচ্ছিল র প্রতি অঙ্গ থেকে,—সে তেজও কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে!...এখন নিমাই তের নিজের দেহের উজ্জ্বলতাটুকু মাত্র আছে,—তাও যেন কিছু ম্লান। অবিলম্বে চেতনা ফিরে পেলেন নিমাই। সুপ্তোত্থিতের মতই এদিক-ক চেয়ে—শ্রীবাসকে দেখেই বললেন,—'পণ্ডিত!' কণ্ঠে বিপুল বিস্ময়,— এখানে কেন?... কেমন করে এলাম? কে আমাকে নিয়ে এলো?...আমার এত চন্দন কে মাখালে? কই, কিছুতো আমার মনে পড়ছে না?...তবে তবে কি— আমার কৃষ্ণকে ভাবতে ভাবতে—আমি আচ্ছন্ন হয়ে এখানে এসে ছিলাম?...কিন্তু কোন রকম চঞ্চলতা বা চাপল্য করিনি তো? বল, বল ত!

কণ্ঠ তাঁর উদ্বেগে আকুল হয়ে উঠলো,—শ্রীবাসের আর কিছু বুঝতে তখন ছিল না; তিনি ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন,— না, না, কোন চাপল্য বা তা তুমি করনি।

নমাই তখন ধীরে ধীরে উঠে বিদায় নিলেন শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ী ।...পেছন থেকে সকলেই চেয়ে থাকলেন তাঁর গমন-পথে। কেউ-কেউ যেন একটা ধাঁধাঁয়ই পড়েছে!

* * *

রপর মাঝে মাঝে প্রায়ই নিমাইয়ের দেহে ভগবৎ-আবেশ হতে লাগলো।... ভক্তভাবে থাকেন,—তখন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে কেঁদেই আকুল,—শ্রীমতী রাধা

যেন ব্রজের পথে পথে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর কালোবরণ শ্যামনিধি কানাইকে —আবার যখন সাধারণ ভাবে থাকেন,—তখন পরম বিনয়ী, মধুর সদালাপী দীনাতিদীন নম্র বৈষ্ণবধর্মী সহজ মানুষ। আবার ঐশীভাব প্রকট পেলে। কখনো ভক্তগণকে অভয় দেন,—কখনো উপদেশ অথবা আদেশ দান করেন। আবার কখনো বা এবারের এই মহাবতরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন।

যখন দেহে যে দেবতার আবেশ হয়,—তখন ঠিক তাঁরই ভাবে ভাবান্বিত হয়ে ওঠেন নিমাই পণ্ডিত। যখন ব্রহ্মার আবেশ হয়,—তখন সেই চতুর সৃষ্টিকর্তার মতই মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করেন শ্রীকৃষ্ণকে,—শিবের 'বম্‌বম্‌ বব-বম্‌' করে গালি বাজিয়ে ভূমানন্দে মত্ত হয়ে যান। প্রতি দেবদে অন্যান্য ভাবগুলিও প্রকাশ পেতে থাকে সেই সঙ্গে একে একে তাঁর দেহের মধ্যে। বলরামের আবেশে—শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ বলভদ্রের মতই দর্পিত ভঙ্গিমায় ছুটে যান পাষণ্ডী-দলনে,—বারুণী মদিরাপ্রিয় হলধরের মতই ভক্তদের মদিরা আনতে আদেশ করেন। দশাবতার স্তোত্র শুনতে শুনতে—এক একটি অবতারের প্রকটিত হতে থাকে ঐ সোনার দেহে।

তবে এর মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্যও আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে যখন দেবতার আবেশ হয়, ভক্তদের দৃষ্টিতে তিনি ফুটে ওঠেন ঠিক তাঁরই রূপে। এ রূপান্তর অবশ্য শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে ঘটে না,—ঘটে ভক্তদের প্রেমাঞ্জন-মুগ্ধ দৃষ্টিতে। ভক্তের দৃষ্টি ছাড়া এ-রূপ প্রতিভাত হবার নয়, হয়ও না। ভগবদ্দর্শনের দৃষ্টি ভক্তেরই আছে। অন্যেরা এখানে অন্ধ। আবার এ-ভক্তের চোখেও নয়,—মনে। মনই এখানে প্রকৃত দর্শক,—মনেরই প্রভাব প্রতিফলিত হয় চোখে। ভক্তের মনশ্চক্ষুর ওপর ভগবানেরই কৃপায় তাঁর ভাব উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠলে,—বাহ্য দৃষ্টিও সম্মোহিত হয়ে যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে বিভিন্ন ভগবৎ-আবেশ ভক্তেরা দেখতে পান ভিন্ন রূপে।

একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে ভগবানের বরাহ-অবতারের স্তোত্র শুনতে শুনতে সহসা শ্রীগৌরাঙ্গ তদ্‌ভাবে বিভাবিত হয়ে উঠলেন। মুহূর্তে তাঁর চোখের ভাব উগ্র হয়ে উঠলো। তিনি বিরাট এক হুংকার ছেড়ে ছুটলেন মুরারি গুপ্তের বাড়ির দিকে। মুরারি তখন বাড়িতেই ছিলেন। দেখলেন,—হুংকার ছাড়তে ছাড়তে গৌরাঙ্গ ঢুকলেন তাঁর পূজার শঙ্কিত ব্যাকুল হয়ে মুরারি দ্রুত এসে দাঁড়ালেন পূজা-কক্ষের দ্বারে।

তাঁকে দেখেই 'বরাহ-আবেশিত' শ্রীগৌরাঙ্গ মেঘমন্দ্রস্বরে বললেন,—মুরারি, এবার আমি জীবকে প্রেম ও ভক্তিধর্ম শেখাতে এসেছি। আমার

ৰ্ত্তি দেখে তুমি ভ.
সই রূপেরই বর্ণনা কর
শ্রীগৌরাঙ্গের চোখ-মু
মুখে তাঁর কথাও ফুটছে না।
আসলে ছিলেন ভক্ত, এবং শ্রীগৌ
আবিষ্ট হয়ে উঠলো ভগবৎ-ভাবে
বুঝলেন,—তাঁর দেহে 'বরাহ-আবেশ'
অবতারের স্তব করতে লাগলেন।
দিব্যচক্ষুর ওপর পলকের জন্য ফুটে
গৌরাঙ্গের পরিবর্তে—পৃথিবী-উদ্ধার-রত
বিস্ময়, সম্ভ্রম ও শঙ্কায় মুরারি অভিভূত হয়ে প.

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর আতঙ্কিত ভাব বুঝে প্রথমে
করলেন; পরে আশ্বাস দিয়ে বললেন,—'রাজার সৈন্য
পেয়েছ মুরারি?—না, না, তোমাদের কারো কোন ভয় নেই
একজন অন্ধভক্ত।—কিন্তু বেদ কি আমার তত্ত্ব জানে? বে
ধর্মের শরণ নাও,—তবেই আমাকে পাবে।

মুরারির অন্তরে তখন এক প্রবল আলোড়ন জেগেছে,—নিম
কালের কথাও সহসা মনে পড়ে গেল তাঁর। 'আমার তত্ত্ব' বলতে
বোঝায়,—এ রহস্যও বুঝতে বাকী থাকলো না তাঁর।—এবার তিনি
ভাবাবেগে আকুল হয়ে লুটিয়ে পড়লেন শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে,—'প্রভু, তোমার
আমরা ক্ষুদ্র কি বুঝবো?—বেদই বা সে-তত্ত্ব কোথায় পাবে?

'তা হলে আমি এখন যাই।'—বলতে না বলতেই নিমাই সহসা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন মেঝের ওপর। মুরারি ব্যস্তসমস্তভাবে তাঁকে তুলে ধরলেন কোলে।—সুপণ্ডিত মুরারির তখন কিছুই বুঝতে বাকী ছিল না।

'চৈতন্যলাভের পর নিমাই বললেন,—মুরারি, আমি এখানে কেমন করে এলাম? আমি তো শ্রীবাসের বাড়ীতে বরাহ-অবতারের স্তোত্র শুনছিলাম? মাঝে মাঝে আমার দেখছি এমনিই হচ্ছে! আমি কোথায় কি করে বসছি,—তার ঠিক নেই! যাহোক, তোমার এখানে এসে কোনভাবে তোমাকে বিরক্ত করিনি ত?'

ভাবের আবেশে মুরারির কণ্ঠ তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। তিনি মুখে কিছু বলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে।

৩৬

"শ্রীপাদ! তুমি এখানে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ?"

"আমি খুঁজছি প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণকে।"

—"কিন্তু এখানে তাঁকে খুঁজলে পাবে কোথায়?—তিনি তো এখানে নেই। তাঁকে যদি চাও তো নবদ্বীপে যাও। সেখানে তিনি পরম ভাগ্যবতী শচী-দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন নররূপে। নাম নিমাই পণ্ডিত।"

কথা হচ্ছিল শ্রীধাম বৃন্দাবনে। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর। শ্রীপাদ পুরীর কাছে সংবাদ পেয়ে—শ্রীনিত্যানন্দ তদ্দণ্ডেই যাত্রা করলেন আকুলচিত্তে নবদ্বীপ অভিমুখে। অন্তরের অধীরতা যত বাড়ে,—পদক্ষেপও তত দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে ওঠে।

নিত্যানন্দের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার একচাকা গ্রামে। অল্পবয়সেই তিনি এক সন্ন্যাসীর শিষ্য হয়ে গৃহত্যাগ করেন। সন্ন্যাসী না-কি তাঁকে তাঁর বাপ-মার কাছ থেকে ভিক্ষা চেয়ে নিয়ে যান। তাঁর পূর্বনাম ছিল কুবের। তাঁকে সদানন্দ এবং 'নিত্যের' প্রতি অনুরাগী দেখেই গুরু তাঁর নাম দেন,—নিত্যানন্দ। প্রায় দশ এগারো বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে—বিশ বৎসর যাবৎ নানা তীর্থ ঘুরে ঘুরে—অবশেষে নিত্যানন্দ উপস্থিত হন এসে বৃন্দাবনে।

তখনকার বৃন্দাবন,—প্রকৃতপক্ষে বন-জঙ্গলেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল কৃষ্ণপ্রেমের আকুলতায় নিত্যানন্দ বনে বনে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তাঁর সাধনার ধন নীলমণিকে। হঠাৎ দেখা তাঁর শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে।

এ-দিকে শ্রীগৌরাঙ্গকে নিয়ে তখন নবদ্বীপে মহা হুলস্থূল পড়ে গেছে। একে তো ভক্তরূপে তাঁর আত্মহারা কৃষ্ণপ্রেমানুরাগ এবং কৃষ্ণের জন্য গভীর ব্যাকুলতা অতিবড় পাষণ্ডেরও অন্তর দ্রব করে তোলে,—তার ওপর তাঁর পুণ্য দেহে বার বার ভগবৎ-আবেশ হতে দেখে,—তিনি যে এক বিরাট অলৌকিক সত্তার অধিকারী—এ-বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ হয়ে উঠেছেন। দিনের পর দিন তাঁর ভক্তের সংখ্যাও বাড়ছে,—সাধারণ লোকের অন্তরেও ক্রমেই গড়ে উঠছে

মু ভক্তি-শ্রদ্ধার আসন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে। ভক্তে নিমাইয়ের দেহে অ-রাত্র তাঁর পরিচর্যায় রত। ...র নিত্যানন্দ

ছে বহুদূর পথ অতিক্রম করে অবশেষে শ্রীনিত্যানন্দ এসে পৌঁ? তাকে বীপে। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গ্রীষ্ম,—রৌদ্রের উত্তাপে চারিদিকে যেন অগ্নিবৃ। ভক্ত,—উষ্ণ ঝঞ্ঝায় গা যেন পুড়ে যাচ্ছে,—তবু নিত্যানন্দের ক্লান্তি নেই—সহ াদ নেই; কি-এক পরমানন্দে পথ চলেছেন তিনি আত্মভোলার মত। কেউ দাঁড় হয়ত তাঁকে পাগলই মনে করছে। পেছন থেকে কেউ বলেও উঠ্ছে,—হয়ে, ওই দেখ্—একটা পাগলা সন্ন্যাসী যাচ্ছে।

গন্ কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই নিত্যানন্দের। আকুল হয়ে খুঁজছেন তিনি উ ই পণ্ডিতের বাড়ী।—কিন্তু হঠাৎ তাঁর কি মনে হলো,—নিমাই পণ্ডিতের ী না গিয়ে—উঠলেন এসে নন্দন আচার্যের বাড়ীতে অতিথি রূপে। সাধু-াসী, ভক্ত সজ্জনের বিশেষ আদর করতেন নন্দন আচার্য। জ্যোতির্ময়-দেহ, তে ন্ত সৌম্যমূর্ত্তি এক যুবক সন্ন্যাসীকে দেখে আচার্য মুহূর্তে আকৃষ্ট নতু ন, এবং পরম সমাদরেই অভ্যর্থনা করলেন অভ্যাগত সন্ন্যাসীকে।

হবে এ-দিকে জানি না কিভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ জানতে পেরেছিলেন—শ্রীনিত্যানন্দের মনের কথা। সহসা ভক্তদের ডেকে তিনি বললেন,—আমি স্বপ্ন দেখেছি,—মহাপুরুষ এসেছেন নবদ্বীপে। তাঁকে তোমরা খুঁজে আন।

শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ ও নারায়ণ,—এই চারজন ভক্ত তখনই বেরিয়ে পড়-মহাপুরুষের সন্ধানে। কিন্তু নিত্যানন্দের কোন খোঁজই পেলেন না া। ফিরে এসে শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে নিবেদন করলেন,—কোথাও তো কোন পুরুষকে দেখতে পেলাম না।

'চল আমি দেখি।'—বলেই গৌরাঙ্গ ভক্তদের নিয়ে স্বয়ং বেরিয়ে পড়লেন। র নন্দন আচার্যের বাড়ী এসেই উপস্থিত হলেন তিনি। ভক্তরা পরম য়ে দেখলেন,—দীর্ঘ সমুন্নত দেহ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ,—উদার ললাট এক াসী বসে আছেন সেখানে। পরণে তাঁর নীলাম্বর,—মাথায়ও একখণ্ড নীল র বস্ত্র জড়ানো রয়েছে। পাশে নামিয়ে রেখেছেন দণ্ড-কমণ্ডলু। বয়স কি বত্রিশ।

বলা বাহুল্য,—ইনিই শ্রীনিত্যানন্দ—সদানন্দময় অক্রোধপুরুষ। ইনি মভাবে-বিভাবিত,—তাই নীলবস্ত্র পরিধান করেন, বৈষ্ণব-শাস্ত্রে ইনি পরম য় বলরামের অবতার বলেই অভিহিত হয়েছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দুই মহাপুরুষের চারি চক্ষের ঘট্‌লো। কি পরম পুণ্যময় সে সন্ধিক্ষণ! সম্মিলিত সেই দৃষ্টির দয়ে একে যেন অন্যের অন্তরে প্রবেশ করছেন। দুই মহাপুরুষের মধ্যে কত

র কথা,—কত গত জন্মের আলাপ-আলোচনা—কত গোপন তত্ত্বের যেন হয়ে গেল ঐ দৃষ্টির মধ্যেই।—যেন যুগযুগ ধরে এক নিবিড় পরিচয় আছে দুজনের মধ্যে।

শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গে সুন্দর নাগর বেশ! কি চমৎকারই না—মানিয়েছে তাঁকে সে-মোহন-সজ্জায়! নিত্যানন্দ অভিভুতের মত চেয়ে থাকলেন তাঁর প্রেমে ঢলঢল মুখখানির দিকে নিষ্পলক নেত্রে,—আহা-হা, এ অনুপম-সুন্দর মুখখানি কি সুধা দিয়ে গড়া,—ঐ প্রশান্ত নেত্রের প্রসন্ন দৃষ্টিতে কি ঝরে পড়ছে অমরার অমিয়-ধারা। প্রগাঢ় প্রেমের আবেগে নিত্যনন্দ যেন বাক-শক্তিও হারিয়ে ফেল্লেন,—চোখ দিয়ে ঝরতে লাগলো তাঁর গঙ্গোত্রীর নির্মল ধারা। দেখতে দেখতে তাঁর দেহ নিস্পন্দ হয়ে উঠলো,—বাহ্যজ্ঞানও তাঁর তখন আর নেই।

নিমাই তাঁকে পরম প্রীতিতে বক্ষে আবদ্ধ করলেন। দুই-পবিত্র স্পর্শে দুজনের মধ্যেই—জেগে উঠলো এক অপূর্ব ভাব-হিল্লোল! নিম শুভ্র দুটি গণ্ড দিয়েও তখন অশ্রু গড়াচ্ছে। একটু পরে নিত্যানন্দ প্রকৃতিস্থ ও শান্ত হয়ে উঠলে নিমাই বললেন,—এতদিনে আমার মনে হ প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ দয়া করে আমায় উদ্ধার করবেন,—তাই তোমার মত এ ভক্তের সঙ্গে আজ তিনি আমার মিলন ঘটিয়ে দিলেন। ভগবান শ্রী পূর্ণশক্তি আছে তোমার মধ্যে।—আমি তোমার আশ্রয় নিচ্ছি,—কৃপা করে আমায় পথ দেখাও।

নিমাইয়ের মুখের এই দীনবাক্যে শ্রীবাস প্রভৃতি আশ্চর্য হলেন না। তাঁরা বেশ জানেন,—তিনি যখন ভক্তভাবে থাকেন,—তখন দীনাতিদীন,— গণের দাসানুদাস। কিন্তু নিত্যানন্দ বিশেষ লজ্জা বোধ করলেন নিম কথায়। প্রকৃত ভক্তমাত্রেই নিজের স্তুতি শুনলে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন। নিত্যানন্দ—বৃন্দাবন থেকে নিমাইয়ের স্বরূপ জেনেই ছুটে এসেছেন এ তিনি গদ্‌গদকণ্ঠে বললেন,—আমিও তোমার পরিচয় পেয়ে অনেক আশা ছুটে এসেছি এখানে। তুমি নররূপী নারায়ণ,—কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হয়ে বিতরণ করছো পাপীতাপী সকলকে। এখন আমার ভাগ্য। তোমার কি আমি পাব ?”

নিত্যানন্দ এবার সব ভুলে শ্রীগৌরাঙ্গকেই মনপ্রাণ সমর্পণ করলে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁকে নিয়ে গেলেন শ্রীবাসের বাড়ী। তখন সন্ধ্যা কীর্ত্তনারম্ভের সময়ও হয়েছিল। সুতরাং নিমাই—নিত্যানন্দকে নিয়ে নন্দে সংকীর্তন আরম্ভ করলেন।—ভক্তেরা প্রতিদিনের মত যোগ দিলেন সঙ্গে। আজকার পুণ্য সন্ধ্যায়—‘গৌর-নিতাই’ একত্র মিলে এই প্র ছ

করলেন শ্রীবাসের অঙ্গনে। কীর্ত্তন করতে করতে হঠাৎ নিমাইয়ের দেহে ভগবৎ-আবেশ হলো; তিনি প্রেমানন্দে বলতে লাগলেন,—আমার নিত্যানন্দ এসেছে.—আজ আমার সকল আনন্দ পূর্ণ। কিন্তু আমার 'নাড়া' কই? তাকে না হলে তো চলে না!

শ্রীবাস সাশ্চর্যে জিজ্ঞাসা করলেন,—নাড়া কে প্রভু?

'জানো না?'—নিমাই মৃদু হেসে বললেন,—'তোমাদের অদ্বৈতাচার্যই আমার নাড়া। সেই তো আমাকে এবার টেনে এনেছে।"

সহসা তাঁর আবেশ কেটে গেল। তিনি চমকে উঠলেন,—"এতক্ষণ কি বক্‌ছিলাম আমি?'—শ্রীবাসের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন। শ্রীবাস সমস্ত বুঝেই উত্তর দিলেন,—না, না, কিছু নয়।

এদিকে হরিনাম সংকীর্ত্তন করতে করতে প্রেমরসের আস্বাদ পেয়ে—নিত্যানন্দের মনে হলো,—নীরস সন্ন্যাসধর্মের চিহ্ন দণ্ড-কমণ্ডলুতে আর কি দরকার? ভগবান অনন্ত প্রেমময়,—প্রেমের সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে পূজো করার চেয়ে সন্ন্যাস কি বড়?—মনে হতেই তিনি রাত্রিতে তাঁর দণ্ড কমণ্ডলু ভেঙ্গে ফেললেন। পরদিন নিমাই যখন সে কথা শুনলেন,—তিনি কিছুই বললেন না। ভাঙ্গা দণ্ড-কমণ্ডলু ভাসিয়ে দিলেন গঙ্গার জলে।

আজ পূর্ণিমা। ব্যাস পূজার দিন। নিত্যানন্দ ব্যাসপূজা করতেন। পূজার সব আয়োজন করে দিয়েছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত। পুরোধাও তিনি।

লেন গঙ্গা-স্নানের পর—নিত্যানন্দ বসলেন তাঁর পূজায়। কিন্তু পূজা করবেন তাঁরা কি,—প্রতি মুহূর্ত তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে আছে নিমাইয়ের মুখের ওপর। মহাপবিত্রতন্ত্র' কিছুই মুখে আসছে না। শুধু নিমাইকেই ভাবছেন অন্তরে।

'শ্রীবাস বলেন,—'মন্ত্র বল'। নিত্যানন্দ জবাব দেন,—হুঁ। এমনই করেই পূজা বরাবরাষ হলো।

বিস্ময়ে শেষে শ্রীবাস একগাছি ফুলের মালা তুলে দিলেন শ্রীনিত্যানন্দের হাতে,—সন্ন্যাসীও, ব্যাসদেবের গলায় দাও।'

বর্ণের নিত্যানন্দ চেয়েছিলেন,—অনিমিখ চোখে নিমাইয়ের ভুবন-ভোলান মুখ-ত্রিশ নিনির দিকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ব্যাস,—এমন কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও যেন বখন তাঁর চক্ষে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে,—নিমাইয়েরই মধ্যে। শ্রীবাসের বলরামম্বার তাড়নায় নিত্যানন্দ সহসা উঠে,—সে মালা পরিয়ে দিলেন নিমাইয়ের শ্রদ্ধায়ণ্ঠে। নির্জীব সে ফুলের মালা বুঝিবা প্রাণ পেয়ে হেসে উঠলো সগৌরবে।

শ্রী এ-দিকে মাল্যার্পণ করেই শ্রীনিত্যানন্দের হৃদয়-কন্দরে—এক অ-জাগ্রত-মিলনপূর্ব ভাবতরঙ্গ উথলে উঠেছে সারা মনপ্রাণ প্লাবিত করে। চোখে এসেছে মধ্য এক স্বচ্ছ নির্মল দিব্য দৃষ্টি!—সেই দৃষ্টির সম্মুখে—সহসা নিমাই ফুটে

উঠ্‌লেন যেন—শ্যাম ও গৌরবর্ণের সমাবেশে গঠিত এক অভিনব ষড়ভুজ মূর্ত্তিতে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, হলও মুষল শোভা পাচ্ছে—ছয় হাতে। শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সম্মিলিত আবেশই কি তবে হয়েছিল শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে শ্রীনিত্যানন্দের আত্ম-সমর্পণে?—এবং আত্মহারা ভক্তের ভাব-ঘন দৃষ্টিতে—প্রকট হয়েছে কি—শ্রীভগবানের ভাবাবেশিত সেই অপরূপ রূপ?—সম্মিলিত কৃষ্ণ-বলরামের এই ভাব-মূর্তিতে অভিব্যক্ত হচ্ছে কি শ্রীগৌর-নিতাই দুজনে এক-আত্মা,—অথবা এক আত্মাই ক্রিয়া করছে দুই দেহে?......

নিত্যানন্দের পুলকাবেগ সীমা ছাড়িয়ে গেল,—বিপুল কম্প জাগলো তাঁর দেহে,—নিজেকে আর সামলাতে না পেরে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।... নিমাই তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করে প্রীতি-বিহ্বল কণ্ঠে বললেন,—'নিত্যানন্দ ওঠ, আর তোমার চিন্তা কি? প্রেমানন্দে হরিনাম কীর্ত্তন কর,—আচাণ্ডাল প্রেম বিতরণ কর,—তোমার জীব-উদ্ধারের কামনা পূর্ণ হবে।'

নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নিত্যানন্দের আনন্দ অপার হয়ে উঠলো। সোৎসাহে উঠে—তখনই হরি হরি বলে নাচতে লাগলেন দু'বাহু তুলে।

পরদিন নিমাই নিত্যানন্দকে নিয়ে এলেন নিজেদের বাড়ী। "মা, মা",—পুলকিত কণ্ঠে শচীদেবীকে ডেকে বললেন তিনি,—'এই দেখ আমার দাদা,—এঁকে তোমার বিশ্বরূপ বলেই জানবে। আজ থেকে আমরা দু'ভাই।'

নিত্যানন্দের সরল-শান্ত মুখখানির দিকে চেয়ে স্নেহসিন্ধু উথলে উঠলো শচীদেবীর অন্তরে। ষোল বছরের পরম সুন্দর কিশোর বিশ্বরূপ তাঁর চোখে প্রতিনিয়তই জ্বল জ্বল করছে। নিত্যানন্দের দিকে চেয়ে তাঁর মনে হলো, এতগুলি বছর পরে—তাঁর বিশ্বরূপই যেন ফিরে এসেছে এ বড়টি হয়ে।—নিত্যানন্দের মাথায় হাত রেখে স্নেহ-বিহ্বল স্বরে তিনি বললেন—এসো, বাপ আমার এসো! বাবা, তুমিই কি আমার হারানিধি বিশ্বরূপ।

"হাঁ-মা,—আমিই তোমার বিশ্বরূপ।"—আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠলো নিত্যানন্দের কণ্ঠ। পরম ভক্তিতে তিনি প্রণাম করলেন শচীদেবীকে।

প্রীতি-পুলকার্দ্র কণ্ঠে বললেন শচীদেবী,—আহা বাছা, বেঁচে থাক শতায়ু হয়ে। তুমি আমার নিমাইয়ের দাদা। কিন্তু নিমাই তো বাবা, আমার পাগল ছেলে। তুমি তাকে—একটু চোখে-চোখে রেখো। নিমাইকে তোমার হাতে দিয়ে—আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

—প্রগাঢ় মাতৃ-স্নেহের কি মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি! এর চেয়ে জগতে সুন্দর—মধুর-কাম্য আর কি আছে? কোন্‌-সে বাল্যকালে মাতাপিতার স্নেহের কোল ছেড়ে এসেছেন যে নিত্যানন্দ,—শচীদেবীর স্নেহের অমিয়স্পর্শে—তাঁর সন্ন্যাস-জীবনও এক অমৃতরসে পূর্ণ হয়ে উঠলো!.........

৩৭

'যা, যা, আমি যাবো না। তোরা একটা বালককে নিয়ে মেতে উঠেছিস,—"ঠাকুর, ঠাকুর' করে! আমি তো আর তোদের মত পাগল হইনি! হুঃ, সেদিন-কার ছেলে নিমাই,—একেবারে ভগবানের অবতার হয়ে উঠ্লো! কোন্ শাস্ত্রে এখন তোদের অবতারের কথা লেখা আছে রে?"

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ধমক দিয়ে উঠ্লেন শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাই রামাই পণ্ডিতকে। রামাইকে পাঠিয়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে নিয়ে যেতে শান্তি-পুর থেকে নবদ্বীপে। নবদ্বীপের সকল সংবাদই রাখতেন তিনি। শুনে শুনে প্রেম-পুলকে তাঁর সারা অঙ্গ বিবশ হয়ে উঠতো। তিনি যে দীর্ঘদিন ধরে প্রাণভরে ডেকেছেন ভগবানকে—ধরাধামে অবতরণের জন্য! ভক্তিপ্লুত গণ্ডু তিনি একদিন অর্ঘ্যও দিয়েছেন নিমাইয়ের চরণে। কিন্তু তাঁর মনে বিশ্বাস স্থায়ী হয় না,—কঠোর পরীক্ষা ছাড়া নিমাইকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে স্বীকার করতে তিনি রাজী নন্। তাই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকে তাঁর সন্দেহবাদী মন।

শে আজও অবশ্য যখন তিনি নিমাইয়ের সাদর আহ্বান পেলেন রামাই পণ্ডিতের কাছে,—তখন তাঁর সমগ্র হৃদয়-মন প্রেম-ভক্তি-পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে দুলো। কিন্তু সহজে বিশ্বাস করার পাত্র তিনি নন্। তাই বাইরে ভিন্ন-ই প্রকাশ করলেন। রামাই কিন্তু তাঁর তিরস্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ খালেন না; আনন্দে মধুর হাসি হেসে বললেন,—'ও-সব শাস্ত্রের কথা আপনি তনন!—আমি তো আজ্ঞাবহ। সস্ত্রীক যেতে বলেছেন তিনি আপনাকে। বা্গির চলুন।

ক শ্রীঅদ্বৈতও আর না উঠে পারলেন না,—মন তাঁর দুদিকে টান্ছে,—এক-এ-দিকে, একবার ও-দিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিমাইয়ের দিকের পাল্লাই পকে পড়লো। তিনি তদ্দণ্ডেই প্রস্তুত হয়ে সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়লেন—এবীপের অভিমুখে।

কিন্তু নবদ্বীপে পৌঁছেই আবার কেমন সন্দেহ জাগে—শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের মনে। আচ্ছা, নিমাই পণ্ডিত, সত্যিই কি ভগবানের অবতার? না, তাঁকে নিয়ে—হুজুগে মেতে হৈ—হৈ করছে সকলে? কি বুঝে তিনি বরাবর নিমাই পণ্ডিতের কাছে না গিয়ে নন্দন আচার্যের বাড়িতে লুকিয়ে থাকলেন।—যদি নিমাই পণ্ডিত অবতার-স্বরূপই প্রকট হয়ে থাকেন, তবে অবশ্যই ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে খুঁজে নেবেন তাঁকে। রামাই পণ্ডিতকেও তিনি এ বিষয়ে সাবধান করে দিলেন বিশেষভাবে।

এ-দিকে শ্রীবাসের বাড়িতে তখন শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে ভগবৎ-আবেশ হয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মধ্যে ঐশ্বর্যময় ভগবানের অলৌকিক সত্তা। বিষ্ণুখট্টায় উঠে বসেছেন তিনি। শ্রীবাস, মুকুন্দ, মুরারি, গদাধর—প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ পরিচর্যা করছেন তাঁর!

সহসা গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন,—অদ্বৈতাচার্য আমাকে পরীক্ষা করতে—নবদ্বীপে এসেও লুকিয়ে আছেন নন্দন আচার্যের বাড়িতে। তাঁকে তোমরা কেউ শীগ্‌গির আমার কাছে নিয়ে এসো।

এ-আদেশ তো নিমাই পণ্ডিতের নয়,—তাঁর মধ্যে যার অলৌকিক বিরাট সত্তা রয়েছে,—তাঁরই। অলঙ্ঘনীয় এ-নির্দ্দেশ। তখনই লোক ছুটলো,—অদ্বৈতকে আনতে।

ধরা পড়ে গেছেন অদ্বৈত। এই ধরা পড়ায় তাঁর কি আনন্দ-কত সুখ! এই তো কামনা করছিলেন তিনি! প্রেমের আবেগে ঝরঝর জল ঝরে পড়লো তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে। তখনই সহধর্মিণী সীতাঠাকুরাণীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন এসে শ্রীবাসের বাড়িতে। তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত—যোগিজন-দুর্লভ সাধনার ধনকে আজ দেখবেন তিনি স্বচক্ষে। প্রেমাশ্রুবিগলিত নেত্রে—আবেগের বিবশ হয়ে তিনি ধীরে ধীরে দাঁড়ালেন এসে বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গের সম্মুখে। পেছনে সীতাদেবী।

নিমাইয়ের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তাঁর মনে হলো,—বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট পরমৈশ্বর্যময় প্রদীপ্ত নির্মল-জ্যোতিঃ এক বিরাট পুরুষ।—মণি-মাণিক্য রত্নালঙ্কার-ভূষিত সে বরবপুর মধ্যে যেন জগতের যাবতীয় জ্যোতিঃর সমাবেশ হয়েছে একত্রে!

> জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্য—সুন্দর।
> জ্যোতির্ময় কনক-সুন্দর কলেবর॥
> প্রসন্নবদন কোটি-চন্দ্রের ঠাকুর—

কই নিমাই? এ কোথায় এসেছেন তিনি?...এ-কি তবে বৈকুণ্ঠ?...সম্মুখে উপবিষ্ট ভাস্করসম ভাস্বরপুরুষ কি তবে সেই অব্যক্ত-মহিম অন

ভাবময় শ্রীনারায়ণ!—হর্ষ-প্রেম-পুলকে অভিভূত হয়ে শ্রীঅদ্বৈত সস্ত্রীক যুক্ত-করে নতজানু হয়ে বসে পড়লেন শ্রীগৌরাঙ্গের সম্মুখেঃ গদ্‌গদকণ্ঠে ধ্বনিত হলো তাঁদের,—নমো নারায়ণায় শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

কৃতার্থ দম্পতি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন শ্রীগৌরাঙ্গকে।

সুমধুর গম্ভীর স্বরে বললেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—'অদ্বৈত, তোমার মনোমত বর প্রার্থনা কর।

কি বর চাইবেন অদ্বৈত?...যাঁকে পেলে আর কিছুই পাবার বাকী থাকে না,—কিছু আর চাইবারও থাকে না,—তাঁর করুণালাভের চেয়ে আর কি কাম্য আছে জগতে?...কিন্তু নিজের জন্যে কামনা না থাকতে পারে,—জীবের কল্যাণেও তো আছে? একটু ভেবে অদ্বৈত বললেন,—প্রভু, আমাকে এই বর দাও,—তুমি যে প্রেম-ভক্তি বিতরণ করবে,—তাতে যেন উচ্চ-নীচ কোন ভেদ না থাকে।...পাপী-তাপী ইত্যাদি সকলেই যেন তোমার করুণা লাভ করে সমভাবে।

—'ধন্য, ধন্য অদ্বৈত, তুমিই সার্থক তপস্যা করেছ। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।'—পরম সন্তোষেই বরদান করলেন শ্রীগৌরাঙ্গ।...সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতাচার্যের সর্বাঙ্গে একটা বিপুল শিহরণ জেগে উঠলো! তাঁর মনে হলো,— যেন সুমোহন নাগর বেশে তাঁর অন্তরের সর্বত্র বিরাজ করছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। অদ্বৈত পূর্বে ভগবানের শ্যামসুন্দররূপের ধ্যান করতেন। এখন থেকে শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্তিই অঙ্কিত হয়ে গেল তাঁর হৃদয়-পটে চির-সমুজ্জ্বল হয়ে।

৩৮

'প্রভু, আমাকে একদিন গৌরাঙ্গ প্রভুর কাছে নিয়ে চলুন দয়া করে।...তাঁকে একবার না দেখে আমি স্থির থাকতে পারছি না।

পরম ভক্ত হরিদাস সকাতরে অনুরোধ করলেন শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্যকে।... মৃদু হেসে সানন্দেই বললেন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য,—'অবশ্যই নিয়ে যাবো।...তুমি যে তাঁরই নিতান্ত আপনার জন।'

ভক্ত হরিদাস ব্রাহ্মণের ছেলে,—কিন্তু মুসলমান-অন্নে প্রতিপালিত।—কাজেই তিনি মুসলমান।...কিন্তু হলে কি হবে?...হরিদাস ক্রমেই হরি-ভক্ত হয়ে উঠলেন। দিবারাত্রি হরিনাম জপ করা ছাড়া তাঁর আর কোন কাজই নেই,—এমন কি আহার-নিদ্রার কথাও মনে থাকে না তাঁর।...তিনি উচ্চকণ্ঠেই হরি-নাম করতেন।—যেহেতু তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস,—এ-নাম যে শুনবে, সেই উদ্ধার হয়ে যাবে।...শুধু নিজের মুক্তিতেই তো আনন্দ নয়,—সেই সঙ্গে অপর সকলেও উদ্ধার পাবে,—সেই তো পূর্ণানন্দ!—উচ্চকণ্ঠে নামগান না করলে,—অন্যের কানে সে-ধ্বনি প্রবেশ করবে কিভাবে?—কানের মধ্য দিয়েই [illegible] 'মরমের' মধ্যে। [illegible]গর

হরিদাসের কঠোর সাধন-ভজন দেখে—অনেকে অনেকভাবেই [illegible] করেছে তাঁকে।...একবার তো এক দুর্জন জমিদার এক সুন্দরী [illegible]ষ্ট বেশ্যাকেই পাঠিয়ে দেয়,—তাঁর কাছে তার মনশ্চাঞ্চল্য ঘটাতে।...কি[illegible]ক্য-দাসের একনিষ্ঠ নাম-গানে সেই বেশ্যারও অন্তর পবিত্র হয়ে যায়,—সে [illegible]বেশ হয়ে ক্ষমা চায় হরিদাসের কাছে।

কিন্তু মুসলমানদের সহ্য হলো না হরিদাসের আচরণ। মুসল[illegible]ান হয়ে হিন্দুর দেবতা হরিকে ভজবে,—কোরাণের অপমান করবে।—এত বড় অপরাধ কি ক্ষমার যোগ্য?...তারা হরিদাসকে ধরে নিয়ে গেল কাজী মুলুকপতির কাছে। কাজী বললেন,—'এখনও হরিনাম ছাড়,—কলমা পড়, তোমাকে সসম্মানে ছেড়ে দেব। না হয় প্রাণদণ্ড হবে।'

হরিদাস নির্ভয়ে বললেন মাথা উঁচু করে,—

খণ্ড খণ্ড হয়ে যদি যায় দেহ-প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥

বটে!—ক্রোধে কাজী দপ করে জ্বলে উঠলেন খড়ের আগুনের মত,—'এই কে আছ, এই ধর্মদ্রোহীকে নিয়ে গিয়ে একে একে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করে এর প্রাণ শেষ কর।'

হরিদাস তবু অটল। সব ভুলে হরিনাম করতে লাগলেন।...কিন্তু বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত অতি নির্মম কঠোর দণ্ড!...দু'তিন বাজারে বেত্রাঘাত করতে করতেই অনেক দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণ শেষ হয়ে গেছে।...হরিদাসকে একে একে বাইশ বাজারে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হলো,—কিন্তু হরিদাসের যেন কোন বেদনা নেই,—তিনি আপন মনে নাম জপ করছেন। ভগবান যেন অলক্ষ্যে থেকে তাঁর মঙ্গলময় হস্ত প্রসারিত করে অমিয় স্পর্শে দুঃখ জ্বালা জুড়িয়ে দিচ্ছেন ভক্তের!...অধিকন্তু হরিদাস প্রহারকারীদের পাপের জন্যই ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন ভগবানের কাছে।

অবশেষে নাম জপ করতে করতে হরিদাস ধ্যানানন্দে অচেতন হয়ে পড়লেন। মুসলমানরা তাঁকে মৃত ভেবে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে চলে গেল।...চৈতন্য-লাভের পর হরিদাস তীরে উঠে এলেন;—তারপর পরমভক্ত অদ্বৈতাচার্যের আশ্রয় লাভ করে—দিবারাত্র হরিনাম করতে লাগলেন।...

ভক্ত ব'লে ইতিপূর্বেই হরিদাসের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল নানা দিকে,—কাজেই শ্রীঅদ্বৈতচার্যের সঙ্গে হরিদাস নবদ্বীপে এসে পৌঁছতে গৌরাঙ্গের ভক্তগণ ভারী আনন্দিত হলেন তাঁকে পেয়ে। সকলে মিলে হরিদাসকে নিয়ে গেলেন নিমাইয়ের কাছে।...হরিদাসের সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে নিমাই সাদরে গ্রহণ করলেন তাঁকে—নিজহাতে তাঁকে আসন দিলেন বসতে। হরিদাস সে আসনে না ব'সে,—আসনখানি মাথায় ঠেকিয়ে সযত্নে রেখে দিলেন একপাশে।...তার পর আত্মহারা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন—অনুপম-সুন্দর বাইশ-তেইশ বছরের তরুণ নিমাই-সুন্দরের মুখের দিকে। চোখে যেন তাঁর আর পলকও পড়ছে না!

শ্রীগৌরাঙ্গ পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করালেন ভক্ত হরিদাসকে।—স্বহস্তে তাঁর অঙ্গে চন্দন লেপন করে গলায় পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা।...সে অপূর্ব দৃশ্যে জল এলো সকলেরই চোখে। হরিদাস—চির-জীবনের মত মন-প্রাণ সমর্পণ করলেন,— শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে।...

ইতিমধ্যে ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিও তখন চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন নবদ্বীপে। এই পুণ্ডরীকের নাম নিমাই প্রায়ই করতেন ভক্তদের কাছে। এমন কি তাঁর জন্যে সময়ে সময়ে বিশেষ আকুলও হয়ে উঠতেন। অথচ

আশ্চর্য যে,—বিদ্যানিধির সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। মনে মনে কিন্তু পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন বিশেষভাবে। পুণ্ডরীক বেশ অবস্থাপন্ন লোক,—বাইরে তিনি ঘোর সৌখিন এবং বিলাসী।—থাকেন রীতি-মত বড়মানুষী চালে। ভেতরটি কিন্তু বৈরাগ্যের গৈরিক মাধুর্যে ভরপুর। বাইরের সাজ-পোষাক দেখলে অবশ্য সবাই তাঁকে বুঝতে ভুল করবে। শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে কিন্তু বিদ্যানিধির অন্তরটি ছিল দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট।

নবদ্বীপেও একখানা বাড়ি আছে বিদ্যানিধির। তিনি ছিলেন মনে প্রাণেই গৌরাঙ্গ-ভক্ত। নবদ্বীপে এসে একদিন পরম আগ্রহে দেখা করতে এলেন নিমাইয়ের সঙ্গে। কিন্তু এখানে এলেন অতি দীন বেশে,—এসেই গৌরাঙ্গ-চরণে পড়ে কাঁদতে লাগলেন অঝোরঝরে। দুইগণ্ড প্লাবিত হতে লাগলো প্রেমের ধারায়।

শ্রীগৌরাঙ্গ আকুলভাবে তাঁকে দু'হাত দিয়ে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন,—'পুণ্ডরীক এসেছো, এসো, এসো!'—যেন প্রীতির মন্দাকিনী ছুটলো তাঁর কণ্ঠে,—'তোমার বিরহে আকুল হয়ে উঠেছিলাম,—আজ তোমাকে স্বচক্ষে দেখে প্রাণ শীতল হলো!'—পরস্পর চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও যে—এতবড় প্রেমানুরাগ জাগতে পারে অন্তরে অন্তরে,—এ-যেন ধারণারও অতীত! ভক্তগণ সকলেই এই অপূর্ব-মধুর দৃশ্যে বিস্ময়-পুলকে হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তাঁদের দিকে।

শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ গদাধর, পুণ্ডরীকের বাহ্য-বিলাস দেখে—অন্তরে অন্তরে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁর ওপর। এখন তাঁর ভুল ভাঙ্গতেই তিনি ক্ষমা চাইলেন বিদ্যানিধির কাছে। এমন কি গৌরাঙ্গের অনুমতি নিয়ে তিনি গুরুপদেও বরণ করলেন পুণ্ডরীককে।

* * *

আশ্চর্য যে, নিমাই যখন ভক্তভাবে থাকেন, তখন তাঁকে দেখে বোঝাই যায় না যে,—তাঁরই মধ্যে প্রকাশ পান শ্রীভগবান তাঁর পূর্ণসত্তা নিয়ে। ভক্তরাও তাঁর 'অপ্রকাশ' অবস্থায় ভুলে যান—প্রকাশ অবস্থার কথা। তবে বারবার দেখে দেখে,—আসল তত্ত্ব-সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মেছিল শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তের মনে।—তাই তাঁর অপ্রকাশ অবস্থাতেও তাঁকে তাঁরা ভক্তি করেই চলতেন। অবশ্য প্রকাশ অবস্থার সঙ্গে—তার কিছুটা পার্থক্য থাকতোই। তা'ছাড়া, অপ্রকাশ অবস্থায় যদি কেউ নিমাইকে ভগবানের মত পুজো করতে আসতো,—তবে তিনি লজ্জায় যেন মরেই যেতেন। দারুণ কুণ্ঠায় বলতেন,—দেখ, অচেতন অবস্থায় যদি কোন অপরাধ করেই থাকি; তোমরা আমাকে ক্ষমা ক'রো।

আমার মনে যেন কদাচ অভিমান না জাগে! নইলে আমি কৃষ্ণের কৃপা পাব কি করে?

ভগবৎ-আবেশে নিমাই যা করতেন,— তাও ঠিক মনে থাকতো না, তাঁর। কখনো কখনো স্বপ্নের মত একটা ছায়া থেকে যেতো মনে। নচেৎ তিনি যদি ঘুণাক্ষরেও কোনদিন বুঝতে পারতেন,—তিনি বিষ্ণুখট্টায় বসেছিলেন,— তাহলে হয়ত গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়েই নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে ছুটতেন। এই জন্যে কোন ভক্তই তাঁর কাছে কোনদিন সে কথার লেশমাত্রও উল্লেখ করতেন না। তাছাড়া, ভগবানের বিভূতি-বৈভবের কথা ভুলেও যায় মানুষ—তাঁরই "গুণময়ী দুরত্যয়া"—মায়ার প্রভাবে। নইলে কি আর গোপরাজ নন্দ এবং শ্রীমতী যশোদা শিশু কৃষ্ণের অকল্যাণ-চিন্তায় অধীর হয়ে উঠতেন? অথবা তিনি দুরন্তপনা করলে শাসন করতে পারতেন তাঁকে?

—কিন্তু আগুন ছাই চাপা থাকে না,—নিমাই পণ্ডিতের ভগবৎ-সত্তা নিয়েও বিপুল সাড়া পড়ে গেছে তখন সমগ্র নবদ্বীপে; যেখানে যত ভক্ত ছিলেন,— ছুটে আসছেন নিমাই পণ্ডিতের কাছে। যাঁরা অবিশ্বাসী তাঁদেরও মনে কেমন একটা দ্বন্দ্ব সুরু হয়ে গেছে,— নিমাই পণ্ডিত কি সত্যই তবে কোন বিরাট অলৌকিক সত্তার অধিকারী?—শ্রীগৌরাঙ্গের বহু ভক্তের মধ্যে, তখন শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস, নরহরি, মুকুন্দ, গঙ্গাদাস, আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখর, পুরুষোত্তম আচার্য জগদানন্দ, মাধব, গোবিন্দ, হরিদাস, পুণ্ডরীক, বক্রেশ্বর, সারঙ্গ, বাসুঘোষ, দামোদর প্রভৃতি তাঁর অন্তরঙ্গগণও তাঁর 'স্বরূপ' জেনে তাঁকে প্রচার করছেন ভগবানের অবতার বলে।

ভক্তজন সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হয়ে রাধা-ভাব-বিভাবিত গৌরাঙ্গের দিনগুলি যে কোন্ দিক দিয়ে কেটে যায়,—তা যেন তিনি নিজেই বুঝে উঠতে পারেন না। দৃষ্টি তাঁর যেন এ-সংসারে নেই,—চলে গেছে বহু ঊর্ধ্বে সে কোন্ পুণ্যলোকে। মাঝে মাঝে যখন সহজ অবস্থায় থাকেন,—তখন অবশ্য আর পাঁচজনের মতই হাস্য-পরিহাস করেন অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গে। দু'একটি অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েও তাঁদের আনন্দ বর্ধন করেন। কোন কোন ভক্ত তাঁর অলৌকিক কার্যগুলিকে ইন্দ্রজাল বলেই মনে করেন। ভক্তদের মনের কথা বুঝে—মনে মনে হাসেন শ্রীগৌরাঙ্গ কৌতুকভরে।

কিন্তু তাঁর দেহে যখন ভগবৎ-আবেশ হয়,—তখন তাঁর শক্তি-সম্বন্ধে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বই থাকে না আর ভক্তদের মনে।

৩৯

সেদিন সকাল বেলায় স্নানাহ্নিকের পর নিমাই শ্রীবাসের বাড়িতে বসে—কৃষ্ণ-কথা আলোচনা করছিলেন। ভক্তগণ ঘিরে বসেছিলেন তাঁকে। সহসা তাঁর দেহে ভগবৎ-আবেশ হলো; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখমুখের ভাব পরিবর্তন হয়ে গেল। সর্বাঙ্গে এক অপার্থিব জ্যোতিঃ ফুটে উঠলো,—তিনি উঠে বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশন করলেন,—ভক্তরা তখন তটস্থ হয়ে উঠেছেন,—তাঁদের আর বুঝতে বাকী নেই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবৎ-স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছেন। খট্টায় উঠে শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্তন করতে আদেশ করলেন ভক্তদের। ভক্তদের মনেও তখন এক কল্পলোকের আনন্দ জেগে উঠেছে। তাঁরা আত্মহারা হয়ে কীর্তন সুরু করলেন। 'জয় প্রভু গৌরাঙ্গ, জয় প্রভু গৌরাঙ্গ' রবে শ্রীবাসের বাড়ি মুখরিত হয়ে উঠলো।

এর পর সুরু হলো প্রভুর অভিষেক। ভক্তগণ শত শত কলসী গঙ্গাজলে স্নান করালেন শ্রীগৌরাঙ্গকে। চন্দন-কুঙ্কুম-চর্চিত সেই জ্যোতির্ময় বরবপু দীপ্ত হয়ে উঠলো অপূর্ব শোভায়। গীতে-বাদ্যে, শঙ্খনাদে,—পুরমহিলাগণের হুলুধ্বনিতে সেখানে যেন এক স্বর্গীয় পুণ্যভাব নেমে এলো। দলে দলে লোক ছুটে এলো সে মহৎ অনুষ্ঠান দেখতে।

নদীয়ার লোক যত দেখে আনন্দিত।
ঘনঘন জয় দিয়ে সবে গায় গীত॥

নানাদিক থেকে অসংখ্য লোক ছুটে আসতে লাগলো—মনোমত প্রিয় দ্রব্য-সম্ভার নিয়ে ভগবানের চরণে উপহার দিতে।

কেহ রত্ন সুবর্ণ রজত অলঙ্কার।
পাদ-পদ্মে দিয়া দিয়া করে নমস্কার॥

কতজন ক্ষীর, ছানা, দধি, দুগ্ধ, মাখন, সন্দেশ, আম, রম্ভা প্রভৃতি কত উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যও নিয়ে এলো প্রভুর নৈবেদ্যের জন্যে।

আজকার মত দীর্ঘক্ষণ-স্থায়ী ভগবৎ-আবেশ শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে আর

এর পূর্বে কোনোদিনই হয়নি। আজ যেন তিনি পূর্ণমাত্রায় ভগবৎ-স্বরূপ প্রকাশ হয়েছিলেন! সাতপ্রহর ব্যাপী এই প্রকাশকে তাই 'সাতপহরিয়া প্রকাশ' অথবা 'মহাপ্রকাশ' বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

স্নেহমুগ্ধা জননী শচীদেবীর ধারণা ছিল,—নিমাই তাঁর খুব শান্তশিষ্ট ভাল ছেলে, তবে পাঁচজনে মিলেই তাঁকে পাগল করে তুলেছে। তাই শ্রীবাস ও অদ্বৈত এই সময় পরস্পর যুক্তি করে—শচীদেবীকে এখানে ডেকে আনতে একজন লোক পাঠিয়ে দিলেন নিমাইয়ের বাড়ি। উদ্দেশ্য,—শচী দেখে যান,—তাঁর ছেলে কি বস্তু,—কাকে তিনি ধারণ করেছেন গর্ভে;—আর তাঁকে লোকে পাগল করছে,—না, লোককে তিনিই পাগল করছেন!

শচীমাতা কি হয়েছে, কিছু বুঝতে না পেরে ব্যাকুল চিত্তেই এলেন শ্রীবাসের বাড়ি,—শ্রীবাসের স্ত্রী সখী মালিনীকে সঙ্গে করে—ঢুকলেন পূজা-ঘরে। যেখানে বিষ্ণুখট্টায় তাঁর পরম স্নেহের নিধি—চোখের মণি—নিমাই পূর্ণ ভগবৎ-সত্তায় প্রকাশ পেয়েছেন। নিমাইয়ের দিকে চেয়ে মুহূর্তে তাঁর অন্তরে আত্মহারা আনন্দের বন্যা ছুটলো! দুচোখে তাঁর জল টলটল করে উঠলো। তিনি দেখলেন,—যাঁকে তিনি গর্ভে ধারণ করেছেন,—যাঁর কল্যাণ-চিন্তায় প্রতিনিয়তই তিনি কাতর,—সেই নিমাই ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবৎ-স্বরূপ প্রকাশমান,—চারদিক থেকে ভক্ত ও অন্যান্য সকলে তাঁর বন্দনা-গান করছে। এবং এ তত্ত্বও আজ যেন তাঁর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো,—তাঁর ছেলেকে পাগল করার শক্তি অন্যের নেই,—তাঁর জন্যেই লোকে পাগল! কিছুক্ষণের জন্যে শচীদেবীর অন্তর থেকে বাৎসল্যভাব তিরোহিত হয়ে গেল,—মন ভরে উঠলো তাঁর পরম প্রেমে ও ভক্তি-রসে।

এরপর ভক্তগণের অনুরোধে শচীদেবী মালিনী প্রভৃতি অন্যান্য পুর-মহিলাদের নিয়ে নিমাইয়ের আরতি করলেন।

পঞ্চদীপ জ্বালী তিঁহ আরত্রি করিল।
নির্মঞ্ছন করি শিরে ধানদূর্বা দিল॥

ভক্তগণ কেউ মৃদঙ্গ, কেউ শঙ্খ, কেউ বা মন্দিরা, করতাল ইত্যাদি বাজিয়ে আরতির গান গাইতে লাগলেন। আরতির পর নিমাইয়ের ইঙ্গিতে ভক্তগণ শচীদেবীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

"শ্রীবাস!"—সহসা নিমাই ডাকলেন প্রগাঢ় স্বরে,—'তোমরা কেউ গিয়ে শ্রীধরকে নিয়ে এসো আমার কাছে।'

'শ্রীধর কে প্রভু?'—শ্রীবাসই প্রশ্ন করলেন। নিমাই উত্তর দিলেন,—যে আমাকে কলার পাতা ও খোলার পাত্র যোগায়। বড় দরিদ্র, কিন্তু ভারী সজ্জন লোক।'

শ্রীবাস তদ্দণ্ডেই সে ব্যবস্থা করলেন। কিছুক্ষণ পরেই শ্রীধর অতি সঙ্কুচিতভাবেই সেখানে এসে যুক্তকর বক্ষে তুলে দাঁড়ালেন নিমাইয়ের সম্মুখে। তাঁর জ্যোতির্ময় মূর্তির দিকে শ্রীধর যেন চাইতেও পারছেন না। স্নেহ-গম্ভীর স্বরে শ্রীগৌরাঙ্গ ডাকলেন,—'শ্রীধর, বড় দুঃখেই তোমার দিন যায়, তবু আমি তোমার জিনিষ—জোর করে একদিন কেড়ে নিয়েছি,—আমার স্বভাবই যে ওই! ভক্তের জিনিষ জোর করে নেব না তো নেব কার? আমার উপদ্রবে অস্থির হয়ে তুমি আজও আমাকে কলার পাত্র যোগাচ্ছ। তাই আমি তোমার ওপর বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার দারিদ্র্য আমি রাখবো না,—আজ তোমাকে অষ্টসিদ্ধি দান করবো।

'অষ্টসিদ্ধি নিয়ে আমি কি করবো প্রভু?'—ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন শ্রীধর,—"ও-তুমি আর কাউকে দাও।"

'তবে তুমি কি চাও?'—মৃদু প্রশান্ত হাসি ফুটলো শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে, —রাজ্য, ধন-সম্পদ—

"আমি কিছুই চাই না প্রভু। আমার দরিদ্র থাকাই ভাল।"—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠেই বললেন শ্রীধর,—'তুমি চিরদিন অনুক্ষণ আমার হৃদয় জুড়ে থাক, এই শুধু আমার প্রার্থনা।'

ধন্য ধন্য শ্রীধর!—প্রভু সহর্ষে বলে উঠলেন,—'তুমি প্রকৃত ভক্ত। অনিত্যের মোহ তোমার কেন থাকবে?—কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করবেন।

প্রেমানন্দে শ্রীধরের সর্ব-অঙ্গে শিহরণ জাগলো! ভক্তগণও শ্রীধরের নির্মল অন্তরের পরিচয় পেয়ে তাঁকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। নিমাই এবার ডাক-লেন,—মুরারি!

'প্রভু!'—যুক্তকরে মুরারি এসে দাঁড়ালেন সম্মুখে।

'আমি তোমায় বড় ভালবাসি মুরারি।'—বললেন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রীতকণ্ঠে,—'কিন্তু তুমি অধ্যাত্মচর্চা ছেড়ে দাও,—শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের কাছে প্রেমধর্মে দীক্ষা নাও।'

'কেন প্রভু অধ্যাত্মচর্চা কি ভাল নয়?'—ভয়ে ভয়েই প্রশ্ন তুললেন মুরারি। প্রভু বললেন,—'ভাল মন্দের কথা নয়। তবে সচ্চিদানন্দরূপী প্রেম-ময় বিগ্রহ যিনি,—তাঁকে পেতে হলে—প্রেমের পথই প্রশস্ত।'

মুরারি যেন অন্যমনে কিছু ভাবতে লাগলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ চিন্তিত মুরারিকে ডেকে বললেন,—'আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ তো, মুরারি!—কি দেখছ?

মুরারি ছিলেন ভগবানের শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তির উপাসক। হনুমানের ন্যায় দাস্যভাবের সাধনা তাঁর। সহসা চমকিত হয়ে ফিরে চাইতেই তাঁর মনে হলো,

বিষ্ণুখট্টায় শ্রীগৌরাঙ্গ নন,—বসে আছেন নবদূর্বাদলশ্যাম নয়নাভিরাম শ্রীরামচন্দ্র। রোমাঞ্চ জাগলো—মুরারির সর্বাঙ্গে। তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন বিষ্ণুখট্টার সম্মুখে। ভাবের আবেগে মুখে তাঁর আর কথা ফুটলো না।

'হরিদাস!'—প্রভু ডাকলেন উচ্চকণ্ঠে—'হরিদাস, বর মাগো।'

'আমার আর কোন কামনা নেই প্রভু,'—গদ্‌গদকণ্ঠে বললেন হরিদাস,—'শুধু এই বর দাও যেন আমার মনে কখনো অভিমান স্থান না পায়। আমাকে অতি দীন কর—কিন্তু আমার ভাগ্যে যেন তোমার এবং তোমার ভক্তের করুণা লাভ হয়।'

'ধন্য, ধন্য হরিদাস।'—ভক্তগণ সোচ্ছ্বাসে জয়ধ্বনি করে উঠলেন হরিদাসের,—"তোমার জীবন সার্থক।"

এরপর একে একে আর আর সকলকে ডাকলেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—কিন্তু ডাকলেন না কেবল মুকুন্দকে। শ্রীবাস সাশ্চর্যে জিজ্ঞাসা করলেন,—মুকুন্দর কি অপরাধ প্রভু?

গম্ভীর কণ্ঠে শ্রীগৌরাঙ্গ বললেন,—মুকুন্দ এমনিতে ভাল,—কিন্তু সময়ে সময়ে—পণ্ডিতদের দলে ভিড়ে প্রেম ও ভক্তিধর্মকে ঘৃণা করে। তাই আমার করুণা পেতে তাকে এখনও কোটি জন্ম অপেক্ষা করতে হবে।

—'কোটি জন্ম!'—বাইরে বসেছিলেন মুকুন্দ। শ্রীগৌরাঙ্গের কথা তাঁর কানে যেতেই বলে উঠলেন তিনি আপন মনে, কোটি জন্ম?—বেশ, তাই। কোটি জন্ম পরেও তো পাবো? আমি সেই আশায়—কোটি জন্মই অপেক্ষা করবো। তবু পাবো তো?'

কথাগুলি এসে পেঁছিল শ্রীগৌরাঙ্গের কানে। মুখে ফুটে উঠলো তাঁর বরাভয়ের হাসি! পাঁচজনের দলে পড়ে—ক্বচিৎ তাঁর একটু-আধটু মতিভ্রম ঘটলেও—আসলে মুকুন্দ মনে প্রাণে ভক্ত। তাঁর নিষ্ঠায় পরম প্রীতি লাভ করলেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—'মুকুন্দ, এসো, ভেতরে এসো।'—ডাকলেন তিনি স্নেহার্দ্রকণ্ঠে।

আদেশ মাত্র মুকুন্দ এসে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে।—'তোমার প্রতি কি আমি বিরূপ হতে পারি মুকুন্দ?'—সস্নেহে মুকুন্দর দিকে চেয়ে বললেন গৌরাঙ্গ,—'তোমাকে আমি পরীক্ষা করছিলাম মাত্র।'

আশ্বাস পেয়ে মুকুন্দর দুই চোখ ছাপিয়ে জল এলো প্রেমের আবেগে!

এরপর সমাগত অনেকেও আপন আপন কামনা মত বর প্রার্থনা করলে শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে,—কেউ রোগারোগ্যের,—কেউ সুখ-শান্তির,—কেউ প্রেমভক্তির। প্রভু যেন কল্পতরু,—তাঁর মুখে শুধু একটি কথা,—তথাস্তু।

ক্রমে অনেক রাত্রি হয়ে গেল। ভক্তরা এবার ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা

করযোড়ে বললেন—প্রভু, এবার তেজ সম্বরণ করুন। আমরা ক্ষুদ্র,—এ তেজ আর সহ্য করতে পারছি না। আবার শচী-দুলালরূপে আমাদের প্রীতি বর্ধন করুন।

'হাঁ, এবার আমি যাই।'—বলেই নিমাই বিষ্ণুখট্টা থেকে পড়ে মূর্চ্ছিত হয়ে গেলেন। সকলেই দেখলেন,—এ সাধারণ মূর্চ্ছা নয়,—যেন জীবনেরও শেষ হয়ে গেছে। বিপুল উদ্বেগে ভক্তরা তাঁর চারিদিক ঘিরে বসলেন। মূর্চ্ছা আর ভাঙে না! একঘণ্টা দুঘণ্টা করে—রাত্রি প্রভাত হয়ে পরদিন অনেকটা বেলাও হয়ে গেল,—তবু শ্রীগৌরাঙ্গ সম্পূর্ণ অচেতন! ভক্তদের প্রাণ কেঁদে উঠলো,—হায়, হায়, প্রভু তবে আমাদের ছেড়েই গেলেন বুঝি!

তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য সকলকে নিয়ে প্রভুকে ঘিরে কীর্তন সুরু করলেন,—তাঁরা গাইতে লাগলেন কুঞ্জভঙ্গের গান,—"কত আর ঘুমাইবে, নিশি পোহাইয়া গেল, উঠ, উঠ শ্যাম-রাই!"

গান চলতে চলতে ধীরে ধীরে প্রভু চোখ মিলে সকলের দিকে চাইলেন,—যেন গভীর নিদ্রাভঙ্গের পর। এতক্ষণে ভক্তগণের দেহে প্রাণ ফিরে এলো। তাঁরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

৪০

কান পেতে শুনলো—আ-ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—শ্রীগৌরাঙ্গের ঘোষণা—তাঁর প্রিয় পার্ষদগণের মুখেঃ

কে কোথায় আছ,—ছুটে এসো,—হরিনাম গ্রহণ কর! যে হরিনাম গ্রহণ করবে,—সেই ব্রাহ্মণ। উচ্চ-নীচ, ধনী-দীন-ব্রাহ্মণ-শূদ্র-হাঁড়ি-মুচি-চণ্ডাল-পাপী-তাপী,—ইতর-ভদ্র-কোন বিচার নেই—কোন ভেদ নেই,—ভগবানের কাছে সকলে সমান,—সমান তিনি সকলের কাছে। যে—যে জাতি বা যে বর্ণই হও,—হরিনাম গ্রহণ কর, করলেই উদ্ধার পাবে। যে ভক্ত, সেই প্রণম্য,—সেই ব্রাহ্মণ!

ত্রিদিব থেকে নেমে এসেছে এ-কোন করুণাময় দেবতা,— হৃদয় কি তাঁর আকাশের মতই উদার,—প্রেম কি তাঁর সমুদ্রের মতই গভীর অতলস্পর্শ? এমনই উদাত্ত কণ্ঠে—এত বড় বৈপ্লবিক আহ্বান এমনি দৃঢ় সাম্যের বাণী—আর কবে কা'র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে? সকল মানুষকে একসূত্রে গেঁথে—সম অধিকার দিয়ে একপ্রাণ-এক-আত্মা করে মহাজাতি সৃষ্টির এমন বিরাট প্রচেষ্টা আর কে কবে করেছে? দীক্ষা যেভাবেই হোক,— মন্ত্র তো মহামিলনের!

কুসংস্কারাচ্ছন্ন—সংকীর্ণ, জড় পঙ্গু সমাজ—যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে সবিস্ময়ে মাথা তুলে চাইলো! সমাজে তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই প্রভাব বেশি,—কায়স্থ ও বৈদ্য ছাড়া— ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য জাতি ব্রাহ্মণের দাসরূপেই তাদের পদতলে পড়ে আছে। অন্যান্য শূদ্রের কথা তো দূরে—নবশাখ সম্প্রদায়েরও যে ব্রাহ্মণের সেবা ছাড়া আর কোন কাজ আছে,—এ যেন তখন কল্পনার অতীতই ছিল। সমানাধিকারের আহ্বানে সোৎসাহে তারা দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো নবদ্বীপে—শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে শরণ নিতে। এ আহ্বান তো শুধু ভক্তরূপী ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়নি!—হয়েছে দিগ্বিজয়ী-জয়ী, নবদ্বীপ-পণ্ডিত-সমাজের গৌরব—সামাজিক প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্রাহ্মণকুল-ভূষণ—নিমাই পণ্ডিতের কণ্ঠে। কে একে উপেক্ষা করবে? কে আছে এমন শক্তিমান,—যে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে—শাস্ত্রের শস্ত্র নিয়ে?

সমাজের বুকে সুবিপুল আলোড়ন জাগলো শ্রীগৌরাঙ্গের ঘোষণায়,—মহাপ্রেমিক—নিমাই পণ্ডিত আজ যেন মহাবিপ্লবীর ভূমিকায় দাঁড়িয়েছেন। মহামহাপণ্ডিত-অধ্যুষিত নবদ্বীপের বুকে দাঁড়িয়ে অচেতন জড় সমাজের বুকে এত বড় বিপ্লব আহ্বানের সাহস কত বড় শক্তিধর হলে সম্ভব,—এ যেন কল্পনারও অতীত। শক্তিধরের আহ্বানে শক্তি পেলো উপেক্ষিতের দল,—আশ্বাস জাগলো তাদের আহত বুকে; কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হলো,—

নদের চাঁদের উদয় হয়েছে।
পাপী-তাপী অন্ধ-আতুর দলে দলে আসিছে॥

সকলে দেখলো,—যবন হরিদাসও ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-নির্বিশেষে সকল ভক্তের শ্রদ্ধা-প্রণতি লাভ করছেন। বুক ভরে উঠলো সকলের। চারিদিকে প্রচারিত হলো,—শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন। ইতিমধ্যে শাস্ত্রাধ্যায়ী অনেক পণ্ডিতও নিমাইয়ের ভক্ত হয়েছিলেন। সম্ভ্রান্ত ভদ্র বহুজনও ছুটে এসেছিলেন তাঁর কাছে পরম আগ্রহে। তেইশ বছরের তরুণ ব্রাহ্মণ-কুমার নিমাই আজ সত্যই দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত। আজ তিনি ভক্তজনপ্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু। কৃষ্ণপ্রেমের আকুলতায় চোখের জলে ভাসতে

ভাসতে অতি দীনভাবে বৈষ্ণব-চরণে লুটিয়ে পড়লেও—আজ তাঁর স্থান অসংখ্য জনের শ্রদ্ধা-নত মস্তকে—আজ তিনি ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে বহুজনের প্রভু!

'শ্রীপাদ!'—সহসা শ্রীবাসের বাড়িতে এসে ডাকলেন নিমাই শ্রীনিত্যানন্দকে। সম্ভ্রমে এগিয়ে এলেন নিত্যানন্দ,—প্রভু!

নিমাই বললেন,—তুমি আর হরিদাস দু'জনে এবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে হরি-নাম প্রচার কর। কোন বাদ-বিচার নেই,—ছোট বড় উচ্চ-নীচ পাপী-তাপী—যে যেখানে আছে,—যাবে সকলের কাছে। সূর্যদেব যেমন কিরণ দানে—সর্বত্র উদার,—তোমরাও হরিপ্রেম বিলাবে তেমনি—সর্বত্র—সকলকে সমভাবে। কোন জোর নয়—জবরদস্তি নয়,—শুধু প্রীতিবাক্যে,—শুধু চোখের জলে,—জানাবে তোমাদের আবেদন,—পায়ে ধরলেও যদি কেউ হরিনাম নেয়,—তাতেও কুণ্ঠিত হয়ো না। এ কাজের উপযুক্ত তুমি আর আমার হরিদাস।

নিত্যানন্দ এখন শ্রীবাসের বাড়ীতেই থাকেন। মালিনীই এখন তাঁর জননী। অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ শিশুর মতই সরল—নিষ্কলুষ অপাপবিদ্ধ—আবার শিশুর মতই একটু চঞ্চল।—প্রেমাবেশে তিনি অবিরত যেন আপন ভুলে ভেসে বেড়াচ্ছেন—বাতাসে! মান-অপমান বোধ নেই,—সুখ-দুঃখ গ্রাহ্য নেই,—নিন্দা-স্তুতির অতীত—এক নির্বিকার মহাপুরুষ। ভক্ত হরিদাস কিন্তু বেশ ধীর,—সম্পূর্ণ নিরভিমান,—তৃণের চেয়েও সুনীচ,—ঠোঁট দুটি অবিরাম নড়ছে,—স্বগত কণ্ঠোচ্চারিত হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে।

হরিদাসও তখন ছিলেন সেখানে। মাথা পেতে নিলেন তাঁরা দুজনেই প্রভুর আদেশ। সেইদিন থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হরিনাম প্রচার এবং কৃষ্ণ-প্রেম বিতরণই হলো তাঁদের কাজ।—তাঁদের প্রাণের মর্মস্পর্শী আবেদনে জানি না কি সুধা ছিল,—হৃদয়, দ্রব হতে লাগলো সকলের। যে নবদ্বীপে—হরি-ভজারা ছিল ব্যঙ্গের পাত্র,—পণ্ডিতগণের শাস্ত্রানুসারে শাসিত সেই নবদ্বীপের লোক ছুটে এসে গ্রহণ করতে লাগলো হরিনাম,—মেতে উঠতে লাগলো হরি-প্রেমে।

কিন্তু জগাই-মাধাই দু'ভাই জ্বলে যায় হরিনাম কি কীর্ত্তন শুনলে। এরা দুজনে যথেষ্ট প্রভাবশালী,—রাজকর্মচারী। রাজশক্তির আওতায় থেকে এরা মানে না বড় কাউকে। যখন তখন যথেচ্ছাচার চালায় নবদ্বীপের বুকে,—নরহত্যাতেও এরা কুণ্ঠিত নয়। মদ্যপানে এবং নানাবিধ কুক্রিয়ার অনুষ্ঠানে এরা দিনরাত উন্মত্ত। এদের কুকর্মেরও শেষ নেই,—পাপেরও অন্ত নেই। এ-দুই পাষণ্ডের ভয়ে—নবদ্বীপের লোক যেন তটস্থ হয়েই আছে। অথচ এরা ব্রাহ্মণ। অর্থের প্রভাবে এরা কাজীকে এমন বশ করে রেখেছে যে,—তাঁর কাছে এদের সাতখুন মাপ! এরাই যেন নদীয়ার রাজা!

এ হেন দুর্জন ক্ষমতাপন্ন পাষণ্ডদের কাছে একদিন গিয়ে হাজির হলেন নিত্যানন্দ হরিদাসকে নিয়ে,—হরিনাম বিতরণ করতে। হরিদাস নিরীহ,—তাঁর বুক তখন দুই-দুই করছে ভয়ে। কিন্তু কোন দুর্বলতা বা শঙ্কা নেই নিত্যানন্দের মনে। অটল পদেই এগিয়ে গেলেন তিনি জগাই-মাধাইয়ের কাছে, —"ভাই, ভজ কৃষ্ণ, জপ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।"—বলেই সম্বোধন করলেন তাদের প্রেমভরে।

মুহূর্তে কিন্তু আগুনে ঘি পড়লো। "বটে, আমাদের কাছে বুজরুকী! প্রাণের ভয় নেই।"—ক্রুদ্ধ মূর্তিতে ছুটে এলো মদ্যপানে উন্মত্ত জগাই মাধাই, —"ধর, ধরতো কে আছিস, ভণ্ড বেটাদের।"

সে মূর্তি দেখে—হরিদাসের তো কথাই নেই,—নিত্যানন্দও ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারলেন। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ক'জন লোক ছিল সেখানে,—তারা কৌতুকে হেসে উঠলো,—আচ্ছা, জব্দ হয়েছে বেটারা,—বলে কি-না কৃষ্ণ নাম নাও! হ্যাঁ, গরজ পড়েছে!

খানিকটা দূরে এসে হরিদাস বললেন,—'বাপ্, এই মাতালদের কাছে নাম বিলোতে যায়? এখনি মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল আর কি?

নিত্যানন্দ কিন্তু পালিয়ে এসে স্বস্তি পাননি! নিজের মনের কাছেই তিনি যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন। একটু চিন্তিত স্বরেই তিনি বললেন,—কিন্তু পাপী-পাষণ্ডই যদি উদ্ধার না পায়,— তবে আর এ প্রেম-ধর্ম প্রচারে লাভ কি? তারাই তো উদ্ধারের পাত্র। চল, প্রভুর কাছে যাই,—তিনি কি বলেন শুনি। তাঁর যুক্তি নিয়ে আবার আসবো—এদের কাছে?

'আবার আস্‌বে?'—হরিদাসের চোখ কপালে উঠলো বিস্ময়ে। "এলে আর ফিরে যেতে হবে না!—তবে হ্যাঁ, প্রভুর সাহায্য পেলে অন্য কথা। বেশ, তাই চল। দেখি প্রভু কি অনুমতি করেন।"

দুজনে এলেন শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে। সব কথা শুনে তিনি বললেন,—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, তোমার যখন ইচ্ছা হয়েছে তাদের উদ্ধার করতে, তখন উদ্ধার তাদের করতেই হবে। সত্যই তো, পাপীতাপী যদি উদ্ধার না হলো তবে হলো কি? শোন, তোমরা দুজনে—যেখানে যত ভক্ত আছেন,—যত হরিপ্রেমানুরাগী ব্যক্তি আর কীর্ত্তনীয়া আছেন,—সকলকে ডাক।—তোমরা দুজন, আমি, এবং আর আর সকলে মিলে 'নগর-কীর্ত্তন' করতে করতে যাব তাদের কাছে। ভয় নেই,—আমি তোমাদের পেছনে থাকবো। কালই বার হবো নগর-কীর্ত্তনে। প্রস্তুত হও।.........

এদিকে সন্ধ্যার পর আর এক কাণ্ড ঘটলো। শ্রীবাসের অঙ্গনে নিত্যকার মত কীর্ত্তন হচ্ছিল,—সহসা দু'ভাই জগাই-মাধাই মদ্যপানে মত্ত হয়ে এসে

ধাক্কা দিল—শ্রীবাসের দ্বারে। দ্বার ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, খুললো না। জগাই-মাধাই তখন সেখানে দাঁড়িয়েই কীর্তন শুনতে শুনতে—নেশার ঘোরে ধিন্ ধিন্ করে নাচতে সুরু করে দিলে। সারা রাতটাই তাদের কেটে গেল—মদ খেয়ে,—আর তার নেশায় বেঘোরে নেচে!

সকালে—শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তজন সহ বার হতেই দুভাই তাকে জড়িতকণ্ঠে ডেকে বললে, নেশা তাদের তখনও কাটেনি।—'নিমাই পণ্ডিত! তুমি বুঝি মঙ্গলচণ্ডী গানের সম্প্রদায় করেছ? বেশ গাইলে কিন্তু কাল। আমাদের ওখানে তোমার দলের একদিন বায়না থাকলো।'

ভক্তরা তখন ভয়েই অস্থির! কিন্তু নিমাই ধীরকণ্ঠে বললেন,—আচ্ছা, আজই যাব গাইতে। বলেই তিনি পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। মাতালরা কি বুঝলো,—সন্তুষ্ট হয়েই চলে গেল নিজেদের বাড়ি।

প্রভুর আজ্ঞায় সেইদিন বিকাল বেলায় সংকীর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়ে সমবেত হলেন সকলে তাঁর বাড়ির দ্বারে। বিরাট নগর-কীর্তনের দল গড়ে উঠলো। নবদ্বীপে এই প্রথম নগর-কীর্তন,—এর পূর্বে প্রকাশ্যে আর কোন-দিনই কীর্তন হয়নি। কীর্তনীয়ারা কেউ কেউ খোল কেউ কেউ করতাল, কেউ শঙ্খ, কেউ কেউ ভেরী,—কেউ কেউ বা মন্দিরা নিয়ে পায়ে নূপুর বেঁধে নব উৎসাহে মেতে উঠলেন কীর্তনের জন্য।

শ্রীনিত্যানন্দই সকলের আগে। তারপর শ্রীঅদ্বৈত, হরিদাস-শ্রীবাস শ্রীগদাধর, মুরারি মুকুন্দ নরহরি—এবং পরপর আরো অনেকে—শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হলেন ধীরে—ধীরে। সকলের পেছনে—সুমোহন নাগর-বেশে কন্দর্প-জিনিত-কান্তি প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ। কি মহান সে দৃশ্য! মুহূর্তে বহু মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, ভেরী প্রভৃতির উচ্চ নিনাদে এবং বিরাট হরি-হরি-হুঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হয়ে উঠলো। চকিত হয়ে পুরবাসী ও পুর-বাসিনীগণ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন পথে,—এই অপূর্ব, হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য—নবদ্বীপের লোক আর পূর্বে দেখেনি! স্থির নেত্রে সকলে চেয়ে থাকলো শোভাযাত্রার পানে! প্রেমানন্দে বিভোর কীর্তনীয়াগণের মধুর হরিনাম গানে যেন চারিদিকে ঝরে পড়লো—অমরার পীযূষধারা! পশ্চাদগামী শ্রীগৌরাঙ্গের দুনয়নে—প্রেমাশ্রু টলটল করছে,—

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর যায় নাচিয়া নাচিয়া।
আবেশে অবশ অঙ্গ ঢলিয়া ঢলিয়া॥
চরণে নূপুর বাজে রুনুঝুনু বোলে।
মালতীর মালা বিনোদিয়া গলে দোলে॥

দেখতে দেখতে এসে পড়লেন তাঁরা জগাই-মাধাইয়ের বাড়ীর কাছে। গতরাত্রির মদের নেশা তখনও কাটেনি, তাদের। শুয়ে আছে তারা বিছানায় চোখ বুজে! কীর্তনের রোল কানে বাজতে চকিত হয়ে উঠলো তারা,—"এই, কে আছিস?"—ডাকলো মাধাই প্রহরীদের লক্ষ্য করে,—'দেখ্, কে গোলমাল করছে,—বারণ করে দে। বেটারা এমন আমেজটা নষ্ট করে দিলে!'

—কিন্তু কে শোনে, প্রহরীদের কথা? কীর্তনীয়ারা কেউই গ্রাহ্য করলেন না। পুরোভাগে শ্রীনিত্যানন্দ হরিনাম করতে করতে আরও এগিয়ে এলেন। আর সহ্য হলো না জগাই-মাধাইয়ের। সুরামত্ত ক্রোধান্ধ দুই পাষণ্ড বাড়ির বার হতেই—তাদের সম্মুখে পড়লেন নিত্যানন্দ। চোখে তাঁর শ্রাবণের ধারা। প্রেমাশ্রুসিক্তকণ্ঠে তিনি বললেন,—"ভাই জগাই—ভাই মাধাই, হরিনাম নাও,—চিরদিন তোমাদের কেনা হয়ে থাক্‌বো।"

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মকাহিনী! নিতাইয়ের অশ্রুপ্লাবিত নেত্র অথবা আর্দ্রকণ্ঠ—কিছুই পাষণ্ডদের হৃদয় স্পর্শ করলো না,—বরং ক্রোধ এবং বিরক্তি তাদের বেড়ে গেল। তারা রুখে উঠলো,—'তবেরে বেটা, ভণ্ডামির আর জায়গা পাসনি। দেখবি মজা!'—মাধাই এ-দিক সেদিক যেন কিছু খুঁজতে লাগলো।

নিত্যানন্দ কিন্তু আজ অটল! আবার অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বললেন,—ভাই জগাই,—মাধাই—ভজ হরি,—জপ হরি,—লহ—"

ব্যস, আর বলতে হলো না। সেখানে একটা 'ভাঙ্গা কলসীর কানা' পড়ে-ছিল,—ক্রোধান্ধ মাধাই—আর কিছু না পেয়ে তাই তুলে নিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করলো নিত্যানন্দের মাথা লক্ষ্য করে। নির্ঘাত সে কলসীর কানা লাগলো—এসে নিতাইয়ের মাথায় প্রচণ্ড বেগে,—

ফুটিল মুটকি শিরে—রক্ত পড়ে ঝরে।
'গৌর' বলি নিতাই আনন্দে নৃত্য করে॥

পাষণ্ড মাধাই আবার একখণ্ড কলসী ভাঙ্গা তুললো নিতাইকে মারতে। কিন্তু এবার জগাই সহসা তার হাত চেপে ধরলো,—'ছিঃ, ছিঃ, করিস কি মাধা, বিদেশী সন্নাসীকে মেরে কি ভাল হচ্ছে।'—মার খেয়েও নিতাইকে আনন্দে নাচতে দেখে জগাইয়ের প্রাণ তখন কিছুটা নরম হয়ে গেছে,—তাছাড়া,—মাধাই-য়ের চেয়ে তার প্রাণে যেন একটু দয়ামায়াও ছিল! নিত্যানন্দ কিন্তু তখন আনন্দে নাচতে নাচতে আবার এগিয়ে আস্‌ছেন,—

"মেরেছিস মেরেছিস তাতে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম বল মুখে ভাই॥

পেছন থেকে শ্রীগৌরাঙ্গ তখন সবই লক্ষ্য করছিলেন। নিত্যানন্দের মাথায় দরদর রক্ত ঝরছে,—আর তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে এসে আপন উত্তরীয় দিয়ে সযত্নে মুছিয়ে দিলেন—নিতাইয়ের কপালের রক্ত। কিন্তু সে-রক্তধারা নিমাইয়ের ধমনীর রক্ত উষ্ণ করে তুললো,—ক্ষুব্ধ অথচ-রূঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন, হাঁরে জগাই, মাধাই,—চিরদিন পাপ করে এসে আজও তোদের ক্ষান্তি নেই! শেষে কি-না—হিতকামী নির্দোষ-নিরীহ সরলপ্রাণ সন্ন্যাসীর রক্তপাত করলি! তোদের রক্ত-ক্ষুধা যদি এত বেশি,—তোরা আমাকে মারলি না কেন?—

না, না, তোদের এ গুরুতর অপরাধের আর ক্ষমা নেই। পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে তোদের।...এবার তোদের দণ্ড পেতে হবে—পাপের সমুচিত দণ্ড—

উত্তেজনায় তাঁর দেহে সহসা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবেশ হলো। চোখ-মুখের ভাব 'অধর্মনাশন' শ্রীকৃষ্ণের রুদ্র মূর্তির মত ভীষণ ও গম্ভীর হয়ে উঠলো,—দেহে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হতেই—কণ্ঠেও ধ্বনিত হলো,—চক্র, চক্র, কোথায় আমার সুদর্শন—

'প্রভু, প্রভু!'—ব্যস্ত ও কাতর ভাবে নিজের যন্ত্রণা ভুলে নিত্যানন্দ নত হয়ে পড়লেন শ্রীগৌরাঙ্গের সম্মুখে 'ক্রোধ দমন কর। এ দুই ভাইয়ের অপরাধের জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। বিশেষ—জগাই যতই পাপী হোক, —সেই মাধাইয়ের হাত থেকে আমার প্রাণ রক্ষা করেছে। নইলে মাধাই আমাকে আরও মারতো।'

"জগাই তোমার প্রাণ রক্ষা করেছে?"—প্রভু কিছু শান্তভাবে সবিস্ময়ে চাইলেন, জগাইয়ের মুখের দিকে। দেখলেন,—সে মুখে তখন ব্যথা—অনুতাপ ও বিষাদের চিহ্ন পরিস্ফুট—প্রহৃত নিত্যানন্দের ক্ষমা তখন তাকে বিচলিত করেছে আরও বেশি! দয়ার্দ্র কণ্ঠে নিমাই বললেন,—"জগাই, তুই পাষণ্ড হলেও তোর মধ্যে প্রাণ আছে। তুই আমার নিতাইয়ের প্রাণ রক্ষা করেছিস,—আয়, আয় আমার বুকে আয়।"

গাঢ়ভাবে তিনি আলিঙ্গন করলেন জগাইকে। মূর্খ জগাই, পাপী জগাই পাষণ্ড জগাই,—করুণাময়ের করুণার অমিয়স্পর্শে অভিভূত আত্মহারা হয়ে পড়েছে,—বুকে তার হাজার কথা গুমরে উঠলেও—একটিও ফুটলো না তার মুখে। জানি না কোন্ কল্পলোক থেকে নেমে এসেছে এই বিশ্বপ্লাবী প্রেমের ধারা,—যার আবেগে পরমপুরুষ নিমাই পণ্ডিত সাগ্রহে জড়িয়ে ধরেন—একজন পাষণ্ড পাপীকে বক্ষে? জগাইয়ের কি ততটুকু ভাববার শক্তিও আছে? ঝরঝর করে জল ঝরে পড়লো তার দুই চোখে,—থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ঢলে পড়লো সে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে।

মাধাইয়ের অন্তরে তখন তুমুল আলোড়ন চলছে। স্থানুর মত দাঁড়িয়ে —সে একবার চাইছে—শ্রীগৌরাঙ্গের অভয়মূর্তির দিকে,—একবার নিত্যানন্দের ক্ষমাসুন্দর মুখের পানে,—আবার তখনই সমপাপ ও কুকর্মের ভাগী জগাই-য়ের আশাতীত সৌভাগ্যের দিকে। নিষ্ঠুর—দুর্দান্ত—দুর্ধর্ষ শক্তিসম্পন্ন মাধাই,—পশ্চাতে তার বহুতর অস্ত্রধারী সিপাই-সান্ত্রী, ইচ্ছা করলে সে কীর্ত্তনীয়াদের মেরে শেষ করে দিতে পারতো,—কিন্তু তেইশ বছরের ব্রাহ্মণ-কুমারের সে কি—অলৌকিক শক্তি—কি অনতিক্রম্য প্রভাব,—তাঁর তিরস্কারের সম্মুখে—মাধাই যেন নিতান্ত নিরীহ মেষ-শাবকের মত দাঁড়িয়ে রইলো। কথামাত্র উচ্চারণেরও শক্তি নেই তার। কর্কশ-কঠিন মুখে ফুটে উঠেছে এক অসীম কাতরতা,—এক পরম দীনতা,—হৃদয়ে জ্বলছে এক দুর্বিষহ অনুতাপের জ্বালা। তার সামনেই জগাই উদ্ধার পেয়ে গেল! আর সে? আর পারলো না মাধাই,—আচম্বিতে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লো প্রভুর চরণে,—প্রভু, প্রভু, রক্ষা কর। আমি মহাপাপী।

"না, না, না,"—গৌরাঙ্গ ব্যস্তভাবে দু'পা পিছিয়ে এলেন,—"তোমার পাপের ক্ষমা নেই। তোমার মত নৃশংস অত্যাচারী ভগবানের করুণার যোগ্য নয়।

মাধাই যুক্ত করে বললে,—"প্রভু, আমার পাপের ক্ষমা সত্যিই নেই। করুণাও আমি প্রার্থনা করছি না। তুমি বলে দাও,—কি করলে, আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

তার কাতরতায় প্রভুর প্রাণ দ্রব হলো। তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন,—মাধাই, তুমি নিত্যানন্দের কাছে ক্ষমা চাও,—তাঁর কাছেই তুমি অপরাধী,—তিনি ক্ষমা করলেই তুমি উদ্ধার পাবে।

তখন মাধাই নিত্যানন্দের পায়ে পড়লো,—প্রভু, তোমার অঙ্গে আঘাত করে আমি ঘোর পাপ করেছি,—তুমি দয়াল,—আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

নিত্যানন্দ বুঝলেন,—তাঁর গৌরববৃদ্ধির জন্যেই প্রভুর এই চাতুর্যের অভি-নয়! নইলে তিনি যাকে করুণা করেন,—তার কি নিতাইয়ের ক্ষমার অপেক্ষা থাকে? তবু প্রভুর মন বুঝে সর্বান্তঃকরণে নিত্যানন্দ বললেন,—'প্রভু, আমার যদি কোন জন্মের সুকৃতি থাকে,—আমি তার সবই মাধাইকে দিচ্ছি; তার যত অপরাধ আমার! তুমি তাকে ক্ষমা কর।

পরে দুহাত দিয়ে মাধাইকে ধরে বুকে তুলে বললেন,—মাধাই, আয় বুকে আয়,—আর তোর চিন্তা কি?...এবার প্রাণ খুলে হরিনাম কর।...

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দের মহত্ত্বে তখন শ্রীগৌরাঙ্গের চোখেও জল এসেছে,—তিনি অগ্রসর হয়ে অঞ্জলি প্রসারিত করলেন,—'জগাই, মাধাই,—করুণার আবেগে তাঁর কণ্ঠ গাঢ় হয়ে উঠলো,—'এখনও যদি তোদের মনে কোন

কিন্তু থাকে,—দে তোদের যত পাপ, যত তাপ, যত দুষ্কার্যের ফল সব আমাকে দে। এই আমি অঞ্জলি পাতলাম। তোরা এখন নিষ্পাপ চিত্তে সুখে হরিনাম কর।'

মাধাইয়ের মন থেকে কিন্তু কোন মতেই গ্লানি দূর হয় না। তার ভাবনা, —নিত্যানন্দ না হয় তাকে ক্ষমা করলেন,—প্রভুর ক্ষমাও তার ভাগ্যে জুটেছে;—কিন্তু সে যে কতলোকের ওপর অত্যাচার করেছে,—কতজনের সর্বনাশ করেছে, —তার প্রায়শ্চিত্ত কি?...তাদের অন্তরের তাপ দূর হবে কিসে?...অন্তরের কথা খুলে বলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাইল নিত্যানন্দের কাছে।

নিত্যানন্দ বহু প্রবোধ দিয়েও শান্ত করতে পারলেন না মাধাইকেঃ তার মন যেন পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে।...তখন নিত্যানন্দ বললেন,—'তাহলে মাধাই তুমি এক কাজ কর।'

'আদেশ কর প্রভু!"—মাধাই উদগ্রীব হয়ে উঠলো।

নিত্যানন্দ তখন মাধাইকে গঙ্গার তীরে নদীয়ার ঘাটের কাছে বসে—অবিরাম হরিনাম জপ করতে উপদেশ দিলেন। তা ছাড়া, স্নানার্থী যারাই আসবে,—নির্বিচারে তাদের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে বললেন,—যেহেতু বিষয়-মদে মত্ত হয়ে সে নদীয়ার বহুলোককে বহু দুঃখই দিয়েছে।

সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলে মাধাই নিত্যানন্দের নির্দেশ। পাপ-ক্ষালনের পথ পেয়ে তার চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো! সেই দণ্ডেই সাংসারিক সকল মোহ দূরে ঠেলে দিয়ে দীন-মলিন বেশে সে বসলো গিয়ে গঙ্গাতীরে একটি সামান্য কুটির বেঁধে। সেই থেকে প্রত্যহ দুইলক্ষ হরিনাম জপ এবং স্নানার্থীদের সেবাই হলো তার জীবনের ব্রত। জগাইও আর বাড়ি গেলো না। ভক্তগণের আশ্রয়ে থেকে দিবারাত্র হরিনাম জপ করতে লাগলো।

'এমনি হরির অপার করুণা, এমনি তাঁহার যাদু,
কয়লা-হৃদয় গলে হীরা হয়,—তস্করও হয় সাধু।'

আজও গঙ্গার সেই ঘাট—'মাধাইয়ের ঘাট' বলে—তার স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে!

৪১

এর পর নবদ্বীপে যে বিরাট নগর-কীর্তন সুরু হলো,—সে এক ঐতিহাসিক ব্যাপার।...নিমাইয়ের এই সংকীর্তনের মূলে ছিল একটি সুচিন্তিত তত্ত্বের প্রভাব। জপ-তপ-ধ্যান-ধারণা,—এ-সব মানুষের নিজেরই মুক্তির পথ। কিন্তু উচ্চকণ্ঠে সংকীর্তন অপরকেও ভগবৎ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে নিয়ে যায় উদ্ধারের পথে। মার্গসংগীত হিসাবে কীর্তনের স্থান তাই অনেক উচ্চে। প্রেম, হর্ষ, পুলক, কম্প, ভাব,, বিভাব, অনুভাব,—রাগ অনুরাগ—বিরাগ বিষাদ-করুণা সবই আছে এই পদাবলী কীর্তনে। সংকীর্তন যাত্রার পূর্বে গদাধর সাজিয়ে দিতেন তাঁর প্রাণ-প্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগরবেশে,—সর্বাঙ্গ পুষ্পমাল্য ও কুঙ্কুম-চন্দনে চর্চিত করে।...তুরী ভেরীর তুমুল নিনাদ তাঁদের এই জয়যাত্রার শুভবার্তা ঘোষণা করতো দিকে দিকে।

শ্রীগৌরাঙ্গের শিরে ছত্রধারণ করতেন স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ। একসঙ্গে বেজে উঠতো 'চতুর্দশ মাদল,'—এবং আটাশ করতাল। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণ মধুর-কণ্ঠে ধরতেন—বৈষ্ণব মহাজন-বিরচিত অমৃতনির্ঝর পদাবলীর গান.—ভাবে, রসে সে এক অপূর্ব বস্তু!...যে পথ দিয়ে যেতেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—তার প্রতি গৃহের দ্বারে কদলীকাণ্ড, আম্রপল্লব, পূর্ণকুম্ভ, দীপমালা প্রভৃতি সুসজ্জিত থাকতো। পুরমহিলারা শঙ্খ-হস্তে অপেক্ষা করতেন অধীর বক্ষে দ্বারে দ্বারে। ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত শ্রীগৌরাঙ্গ যখন এগিয়ে আসতেন,—চক্ষে পূত প্রেমের ধারা,—প্রতি ধীর পদক্ষেপে মধুর নূপুর-শিঞ্জন, বাষ্পাকুল কণ্ঠে 'হরের্নামৈব কেবলম্'—তখন তাঁর দিকে চেয়ে অতি পাষণ্ডেরও হৃদয় দ্রব হয়ে যেতো! এক সঙ্গে বেজে উঠতো শত শত শঙ্খ পুরমহিলাগণের অধরে,—

লাজাঞ্জলি ও পুষ্পরাশি বর্ষিত হতো শ্রীগৌরাঙ্গ ও ভক্তগণের পুণ্য-শিরে! মধুর হুলুধ্বনির আরাবে যেন এক স্বর্গীয় মধুর আনন্দের উৎস ছুটে যেতো—প্রাণে-প্রাণে!

ক্রমে নিমাইয়ের আহ্বানে—নবদ্বীপের পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে সংকীর্তন

আরম্ভ হলো,—শ্রীবাসের আঙিনা থেকে তা ছড়িয়ে পড়লো নবদ্বীপের আঙিনায়—আঙিনায়।...চারিদিকেই মৃদঙ্গ ও করতালের বাদ্য,—আর দিগন্তব্যাপী 'হরি হরি' ধ্বনি। মেতে উঠলো নবদ্বীপ—হরিনামে,—হরিপ্রেমে,—শ্রীহরির জয়গানে!—বিস্ময়কর অনতিক্রম্য প্রভাব ওই একটি মানুষের! যার দিকে প্রেমের দৃষ্টিতে চেয়েছেন,—সেই মত্ত হয় হরিনামে,—যাকে প্রেমভরে স্পর্শ করেন, সেই নাচতে সুরু করে দু-বাহু তুলে 'হরি হরি' বলে! প্রেমাশ্রু-বিগলিত চক্ষে—কণ্ঠে অধীর আবেগ—যে পাষণ্ডকে বলেছেন,—'ভাই হরিনাম নাও,—কৃষ্ণ ভজ,'—অমনি তার নয়নে ঝরেছে প্রেমের শতধারা।...

কিন্তু এতে তো শচীদেবীর মন ভরে না।...নবদ্বীপে চাঁদ উঠেছে,—ঘরে ঘরে জ্যোৎস্নার আলো। কিন্তু শচীর নিজের গৃহই যেন বিষাদের আঁধারে মুহ্যমান!...শচীর ঐকান্তিক কামনা,—তাঁর নিমাই বধূ বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করে সংসার করুক,—কাজ নেই তার 'ভগবান' হয়ে;—ভগবান যিনি, তিনি স্বর্গে অথবা বৈকুণ্ঠে যেখানে ইচ্ছা থাকুন; তাঁর নিমাই একান্ত তাঁরই হয়ে তাঁর কোল জুড়ে থাক!...বিষ্ণুপ্রিয়ার বিষণ্ণ মুখখানির দিকে যে আর চাওয়াও যায় না! আহা,—সরলা কিশোরী—তার সাধ-আহ্লাদের বয়স,—কিন্তু বাছাকে যেন যৌবনে যোগিনী সাজিয়েছে নিমাই,—সারারাত কাটে শ্রীবাসের আঙিনায় কীর্তনে মত্ত হয়ে—সারাদিন কাটে,—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে পাগল হয়ে,—বিষ্ণুপ্রিয়াকে মনে পড়বে কখন?...

'বাছা নিমাই,—একদিন আর স্থির থাকতে না পেরে শচীদেবী বলেন নিমাইকে,—ঘর-সংসার, মা-বৌ সবই কি ভুলে গেলে বাপ!...আমার কথা না হয় বাদ দাও,—কিন্তু ওই যে একরত্তি মেয়ে—দিনান্তেও তোর একবার দেখা পায় না,—ওর কথা একবার ভাবতেও তো হয়!...তুমি এতবড় জ্ঞানী, পণ্ডিত,—কত লোককে জ্ঞান দিচ্ছ,—ওর মনের দিকটা কেন একবার ভেবে দেখছো না বাছা!'

কৃষ্ণপ্রেমাকুল নিমাই,—নইলে মায়ের প্রাণে ব্যথা-বেদনা কোথায়,—তা তিনি বুঝতেন গভীরভাবেই। কিন্তু কি করবেন তিনি, সবই তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। সেই যমুনা-পুলিন-বিহারী, মোহন বংশীবয়ান—শ্যামসুন্দর দেবতা—বসেছেন তাঁর সমগ্র হৃদয় জুড়ে।...হৃদয়ের পরতে পরতে অঙ্কিত হয়ে গেছে তাঁরই ছবি!...ভক্ত ও ভগবান দুয়ে মিলে-মিশে এক হয়ে গিয়ে—এখন কোন ভেদ আর নেই, আরাধ্য এবং আরাধকের মধ্যে,—ভগবানই ভক্ত,—না ভক্তই ভগবান,—সে যেন এখন এক দুর্বোধ রহস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে!

—যা'হোক, তবু মায়ের কথায় নিমাইয়ের অন্তরে জাগে পার্থিব অনুভূতি;—যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে মায়ের প্রাণে আনন্দ আনবার চেষ্টা করেন

তিনি। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে হাস্য-পরিহাস করেন,—বিরলে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ যাপন করে,—তাঁর কোমল-মধুর কিশোর চিত্তটিকে রসায়িত করে তোলেন। অভিমানের কোন কথা ফোটে না বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে—বরং যেটুকু সময় তিনি স্বামীকে পান নিজের কাছে,—আপন সুকুমার অন্তরটিকে উজাড় করে দেন তার মধ্যে,—সেই তাঁর পরম তৃপ্তি—অপার সান্ত্বনা!—তবু ক্বচিৎ কখনো সামান্য সময়ের জন্যও যে স্বামীর সেবা করার সুযোগ পান,—এতেই তিনি ধন্য কৃতার্থ মনে করেন নিজেকে।........

বৈষ্ণবগণের দেবতা ভক্তির কাঙ্গাল নন,—প্রেমের কাঙ্গাল। সে দেবতা পরম আদরের একান্ত আপনার জন। তাঁর স্থান মাথায় নয়,—বুকে। প্রাণের যাবতীয় মাধুরী দিয়ে গড়েছেন তাঁরা মনের মত করে তাঁদের দেবতাকে। সে-দেবতার বেশ তাই রুদ্র নয়,—কোমল—মধুর—সরস—চিত্ত-বিমোহন!...সে-দেবতার হাতে তাই অস্ত্র নেই,—আছে মোহন মুরলী,—গলায় ফুলের মালা,—মাথায় শোভার আকর শিখিপুচ্ছ।...সে-দেবতা স্নেহের দাবীতে উদুখলে বাঁধা দেন যশোদার হাতে,—ব্রজগোপীদের চোর, কপট, লম্পট ইত্যাদি গালিও সহ্য করেন হাসি মুখে! রাধার পায়ে ধরে অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করেন,—তাঁর ভার বয়ে নিয়ে যান পথে পথে।

ভক্তদের কাছে নিমাই-ও তাঁদের সেই দেবতা,—তাঁর স্থান তাঁদের প্রাণের গভীরে, প্রেমের মণি-কোঠায়।...ভক্তরা তাঁকে পূজাও করেন,—আবার ভক্তদের পায়ে ধরে তিনি বিহ্বলচিত্তে কৃষ্ণপ্রেমও ভিক্ষা করেন।...মান-অভিমান, হাস্য-পরিহাসও চলে তাঁর ভক্তদের সঙ্গে।...ভক্তদের নিয়ে দল বেঁধে কৃষ্ণলীলাও অভিনয় করেন পরম আনন্দে। নিজে সাজেন কৃষ্ণপ্রিয়া রুক্মিণী, গদাধরকে সাজান গোপী,—আর অদ্বৈতকে শ্রীকৃষ্ণ। ভক্ত-প্রাণের ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত সে-অভিনয়ে—সত্যই যেন দ্বাপরের কৃষ্ণলীলার রস উপভোগ করেন দর্শকগণ। ...মুরলীধর কৃষ্ণের মতই ভক্তরা তাঁদের নিমাইকে সাজান মোহন বেশে। ঐশ্বর্য-জ্ঞান-বিবর্জিত এই প্রেম। কিন্তু সাধনার দিক থেকে এরই নাম—রাগানুরাগা ভক্তি!

শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে নিমাইয়ের কিন্তু মাঝে মাঝে মনান্তর ঘটে যায়। পরম-ভক্ত অদ্বৈত তাঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যান,—ঐখানেই বাধে যত গণ্ডগোল। আপনভাবে থাকেন যখন নিমাই,—তখন যদি কেউ তাঁকে প্রণাম করে,—অথবা তাঁকে শ্রীভগবান বলে উল্লেখ করে,—তাহলে কেঁদেই আকুল হন নিমাই.—হায়, হায়, হায়, কৃষ্ণের একবিন্দু প্রেমের জন্যে তিনি ব্যাকুল,—আর এরা কি-না তাঁকেই কৃষ্ণ করে তুলছে!...তাঁর এতবড় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে?

অদ্বৈত পায়ের ধুলো নিতে ছাড়বেন না,—নিমাই কিছুতেই নিতে দেবেন নাঃ এই নিয়ে একথার পর ও-কথা। শেষে অভিমান জাগলো অদ্বৈতের মনে, —তিনি নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গেলেন শান্তিপুরে।...অদ্বৈত পরমভক্ত,—আবার বিরাট জ্ঞানী,—অভিমান হলেই এখনও তাঁর চিত্তে জ্ঞানের মোহ আসে,—সন্দেহ জাগে তাঁর—নিমাই কি সত্যই ভগবান?—ভগবানই যদি,—তবে পা ছুঁতে দিতে এত ভয় কেন? গীতবাদ্যকীর্তন করে দল বেঁধে আবার ভগবানের আরাধনা কি?—অন্তরাত্মারূপী ভগবান আছেন অন্তরে,—অন্তরে-অন্তরে তাঁর সাধনাই তো ঠিক। আমি তো সর্বশাস্ত্রই পড়লাম, এখন কোন অবতারের কথা তো কোন শাস্ত্রে লেখা নেই!...অভিমানের তীব্রতায় অদ্বৈতের মত ভক্তও বুঝতে ভুল করেন যে,—ভগবান সকল শাস্ত্রের—সকল ধ্যান-ধারণার অতীত। শাস্ত্রকাররা সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত পুরুষের তত্ত্ব কতটুকুই বা অনুধাবন করতে পারেন? মানুষের দৃষ্টির সীমা সীমাবদ্ধ,—কিন্তু ভগবান অসীম—অনন্ত—বিরাট,—দৃষ্টির অগম্য!

তবে নিমাইয়ের ভগবৎ-সত্তার ওপর অদ্বৈতের সন্দেহ জাগা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কি-না, সে-বিষয়ে ব্রহ্মারও সন্দেহ জেগেছিল। জেগেছিল দেবরাজ ইন্দ্রের। কিন্তু ভক্তমনের এই সন্দেহ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়েই ভগবান ফুটে ওঠেন আরো উজ্জ্বলরূপে। অদ্বৈতাচার্যের ন্যায় ভক্তের মন, ভগবানরূপ সোনার কষ্ঠি-পাথর। দুই-একদিন পরে অদ্বৈতের জন্য মন খারাপ হতেই নিমাই বেরিয়ে পড়লেন নিত্যানন্দকে সঙ্গে করে শান্তিপুরের উদ্দেশে। পথের মাঝে নিত্যানন্দ নিয়ে গেলেন তাঁকে এক গৃহস্থ সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে।—নিমাইয়েরও কৌতূহল হলো, গৃহস্থ-সন্ন্যাসী, কি বস্তু দেখতে হবে। সন্ন্যাসী অবশ্য পরম আদরেই অভ্যর্থনা-আপ্যায়ন করলেন তাঁদের। তাঁর স্ত্রীও অতিথি-পরিচর্যার ত্রুটি করলেন না। স্বামী-স্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁদের সেখানে কিছু জলযোগও করতে হলো। অবশেষে নিমাইয়ের দিকে চেয়ে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন,—'একটু 'আনন্দ' দেব কি?'

'আনন্দ' কি?—বিস্ময়ে তাকালেন নিমাই নিতাইয়ের দিকে।

'মদ'—অর্ধোচ্চারিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন নিত্যানন্দ।

হরি, হরি, হরি!—সেই মুহূর্তে উঠে পড়লেন নিমাই সেখান থেকে। নিতাইয়ের মুখে শুনেছিলেন,—সন্ন্যাসী মহাজ্ঞানী। বহু শাস্ত্রাদি পাঠ করেছেন।. কেমন একটা উত্তেজনা জেগে উঠলো নিমাইয়ের মনে,—এর নাম শাস্ত্র-পাঠ?—এর নাম জ্ঞান?—'নাড়া' আবার জ্ঞানের অহঙ্কার করে!—ভাবতে ভাবতেই দেহে ভগবৎ-আবেশ হলো তাঁর। সেই আবেশেই নিত্যানন্দকে একরূপ টেনে নিয়েই নৌকায় এসে উঠলেন; এবং গঙ্গাপার হয়ে পৌঁছলেন শান্তিপুর—

অদ্বৈতাচার্যের বাড়ি। কোন কথা নেই, বার্তা নেই—অদ্বৈতকে জোর করে চেপে ধরলেন,—'বল নাড়া, আর 'জ্ঞান, জ্ঞান' করে স্পর্ধা করবি ?...বল, এখনও জ্ঞানের চেয়ে ভক্তি বড় ?...বল, কৃষ্ণপ্রেম পুরুষার্থশিরোমণি !'

অভিমানাহত অদ্বৈতও অন্তরে অন্তরে গৌরাঙ্গ-বিরহে কাতর হয়ে উঠেছিলেন। নিমাইয়ের মূর্তি দেখে,—আর তাঁর মুখে 'নাড়া' সম্বোধন শুনে অদ্বৈতের বুঝতে বাকী থাকলো না,–তাঁর দেহে ভগবানের আবেশ হয়েছে। যেহেতু আবেশ না হলে তিনি 'নাড়া' বলে সম্বোধন করতেন না পরমপূজ্য অদ্বৈতকে।...অদ্বৈত দেখলেন,—আর পরাজয় স্বীকার না করে উপায় নেই,—তা'ছাড়া, আসলে তিনি ছিলেন মহাভক্ত,—ভক্তির মহিমা তিনিও বোঝেন।...তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন—ভক্তিকে বড় বলে।

সহসা আবেশ কেটে যেতেই নিমাই অদ্বৈতের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলেন।...অদ্বৈতের মনেও তখন আর কোন গ্লানি নেই। সকল ভুলে তিনি তখন নিমাইকে আদর-আপ্যায়ন করতেই ব্যস্ত। এর পর আচার্যের বাড়ীতে মহানন্দে ভোজন করে হরিনদী গ্রামের ঘাটে আবার নৌকা চড়লেন শ্রীগৌরাঙ্গ। ...নিত্যানন্দ আর তাঁর সঙ্গে এলেন না।

নিজেই বৈঠা বেয়ে নদী পার হয়ে নিমাই এসে উপস্থিত হলেন শান্তিপুরের ও-পারে অম্বিকা-কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের বাড়ী।...জানা নেই, পরিচয় নেই,—তিনি গৌরীদাসকে বললেন,—এই বৈঠাখানি তুমি রাখ, তাপিত জনকে এর সাহায্যে ভবনদী পার করবে।—বৈঠাখানি তুলে দিলেন তিনি গৌরীদাসের হাতে।

জ্যোতির্ময় দেহ, প্রেমোজ্জ্বল স্নিগ্ধ-শান্ত নেত্র নিমাইকে দেখে গৌরীদাস তখন অভিভূত হয়েছেন,—ইনি কে ?—মানুষ না দেবতা ?—না ইনিই স্বয়ং ভবনদীর কাণ্ডারী !—এই বৈঠার কথায় কোন বৈঠার কথা বলছেন ইনি ?...এত সৌভাগ্য আমার,—সেই বৈঠার অধিকারী হবো ?

নিমাই তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন,—'আমি নদীয়ার নিমাই-পণ্ডিত।'—যেই শোনা, অমনি গৌরীদাস লুটিয়ে পড়তে গেলেন গৌরাঙ্গের চরণে।...কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ দুই ব্যগ্রবাহু দিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ...পরম ভক্ত ছিলেন গৌরীদাস, নিমাইয়ের স্পর্শে তাঁর অন্তরে এক অপার্থিব শক্তি জেগে উঠলো।—যুগযুগ-সঞ্চিত তপস্যার এই সৌভাগ্যে ধন্য মনে করলেন তিনি নিজেকে।...আজিও আছে সে বৈঠা কালনায় গৌরীদাসের বাড়ী,—বংশপরম্পরায়।

৪২

গঙ্গাতীরে বসেছিল চাপাল গোপাল। নবদ্বীপেই বাড়ী। নিমাই-পণ্ডিত স্নান করে তীরে উঠতেই সে বললে,—নিমাই, তুমি নাকি আজ কাল মহাসাধু হয়েছ!—তোমার কথায় কত লোকের কত রোগব্যাধি ভাল হয়ে যাচ্ছে! তা আমার রোগটাও ভাল করে দাও না?

ঘোর বৈষ্ণব-বিদ্বেষী এই চাপাল গোপাল।...পরম বৈষ্ণব শ্রীবাসের ওপরই যেন তার আক্রোশ বেশি। শ্রীবাসকে সমাজে হেয় করতে এবং তাঁর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করতে,—চাপাল একদিন তাঁর সদর দরজায় মদের ভাঁড়, মাংস ইত্যাদি রেখে চলে যায়।—কাজটা যে চাপালের, এ বুঝতে কারুরই বাকী থাকে না; শ্রীবাসের তো কথাই নেই। শুধু শ্রীবাসই নয়,—অন্যান্য বৈষ্ণবগণও মর্মে দারুণ আঘাত পান চাপালের এই অপকর্মে। কিছুদিন পরে চাপালের সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ-ব্যাধি দেখা দেয়।...বৈষ্ণবদের ধারণা, শ্রীবাসের মত পরম বৈষ্ণবকে অপমান করার ফলেই তার এই মহাব্যাধি হয়েছে। কে একজন তাকে বলে,—'নিমাই-পণ্ডিতের কাছে যাও, তাঁর দয়া হলে তুমি আরোগ্য লাভ করবে।'—কিন্তু নিমাইয়ের বাড়ী যেতে সাহস হয় না চাপালের। তাই গঙ্গাতীরে এসে বসে থাকে—তাঁর স্নানের সময়।

নিমাই এ-সময় ছিলেন ভগবৎ-আবেশে। অন্য সময় হলে হয়ত অতি দীনভাবে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতেন। এখন কিন্তু গর্জে উঠলেন রুদ্ধ-রোষে,—'তুমি দুর্জন, অপরের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করে তুমি ধর্মদ্রোহিতা করেছ,—দীর্ঘকাল ধরে পাপের ফল ভোগ করতে হবে।...এখনও তোমার মনের দম্ভ যায়নি,—তা তোমার কথার ভাবেই বুঝতে পারছি। কিন্তু অনু-তাপের আগুনে পুড়ে খাক না হলে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।...পাপের ক্ষয় হলে তুমি আরোগ্য লাভ করবে।

নিমাই আর দাঁড়ালেন না সেখানে।...চাপাল আর কি করে?—সেই দিনই বারাণসী চলে গেল। সেখানে গিয়ে হত্যা দিলে ভগবান শ্রীবিশ্বেশ্বরের মন্দির-

চত্বরে। কিছুদিন পরে স্বপ্ন দেখলো, যেন আশুতোষ বলছেন,—নবদ্বীপে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে,—তুমি তাঁরই শরণ নাও!

চাপালের চোখ ফুটলো। ফিরে এলো সে নবদ্বীপে।—কিন্তু আর নিমাই-পণ্ডিতের কাছে যাবার সাহস হলো না তার। তবে এবার প্রায়শ্চিত্ত সুরু হলো। অনুতাপের আগুন জ্বলে উঠলো তার অন্তরে!

*   *   *

—'মুরারি!'

'প্রভু!'—মুরারি এসে যুক্ত করে দাঁড়ালেন নিমাইয়ের সম্মুখে।

নিমাই বললেন,—তুমি আমার পরমভক্ত,—কিন্তু তুমি ভগবানের শ্রীরাম-মূর্তির ধ্যান কর। রাম-কৃষ্ণে ভেদ অবশ্য কিছু নেই,—তবু কৃষ্ণ-লীলা আরও মধুর—আরও রসঘন,—তুমি শ্রীকৃষ্ণমূর্তির ভজনা কর।

মুরারি সহসা কোন উত্তর দিতে পারলেন না।...এমন কি সেদিনই তিনি কোন উত্তর দিলেন না।...সারারাত ধরে ভেবে পরদিন আবার প্রভুর কাছে এসে বললেন,—প্রভু, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার দাস,—কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে অন্তর থেকে বিদায় দিতে পারি না।

'সাধু মুরারি!'—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন নিমাই,—তুমি তোমার রাম-চন্দ্রকে কেন ছাড়বে?...হনুমানভাবে সাধনা তোমার,—এর তুলনা কোথায়? ভক্ত যদি ভগবানকে ছাড়ে,—তবে আর ভগবানের থাকে কি?—নব-দূর্বাদল-শ্যাম—করুণাঘন মূর্তি শ্রীরামচন্দ্র—আর সজলজলদাঙ্গ ব্রজবিহারী শ্যাম—দুই তো এক!.. তবে কিনা, অনন্তভাবময় শ্রীভগবানের অনন্তলীলা।...ব্রজলীলায় তিনি যে রস উপভোগ করেছিলেন,—আমার ইচ্ছা, তুমি সে রস-ও আস্বাদন কর।...যা হোক, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তোমার ঐকান্তিক ভক্তির ফলস্বরূপ আমার বরে তোমার অন্তরে ব্রজলীলারসও স্ফূর্ত হবে।

মুরারির আনন্দের সীমা থাকলো না। প্রেমের ঠাকুর ব্রজরমণ,—আর ভক্ত বৎসল শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি একই সঙ্গে পাশাপাশি ফুটে উঠলো তাঁর মানস-চক্ষে।

ক্রমেই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি মুরারির অন্তরে জাগলো আত্মহারা অনুরাগ। একদণ্ড যেন তিনি প্রভুকে না দেখে থাকতে পারেন না।—গৌরাঙ্গও তাঁর খুব অন্তরঙ্গ হয়ে উঠ্‌লেন। প্রভুর কথা ভাবতে ভাবতে একদিন এক উদ্ভট খেয়াল চাপলো মুরারির মাথায়। আচ্ছা, আজ তো তিনি যখন ইচ্ছা, যতবার ইচ্ছা, যতক্ষণ ইচ্ছা—শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখছেন দুই চোখ ভরে,—অনুক্ষণ এক অপার্থিব আনন্দলাভ করছেন—তাঁর পুণ্য সাহচর্যে;—কিন্তু প্রভু যদি তাঁর আগেই পৃথিবীর লীলা সংবরণ করে চলে যান,—তবে কেমন করে সংসারে বেঁচে

থাকবেন তিনি?—তাঁর বিচ্ছেদ তো একটি মুহূর্তও তিনি সহ্য করতে পারবেন না।—

বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মুরারি যেন পাগল হয়ে গেলেন। স্থির করলেন,—প্রভুর আগেই তিনি চলে যাবেন সংসার থেকে। ভেবে-চিন্তে একখানি ধারাল ছুরি গড়িয়ে এনে তিনি বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন এক জায়গায়। উদ্দেশ্য,—এরপর একদিন প্রকারান্তরে প্রভুর চরণে বিদায় নিয়ে তিনি ঐ ছুরি গলায় বসিয়ে—শেষ করে দেবেন তাঁর পার্থিব জীবন। যুক্তি স্থির করে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে উঠলেন মুরারি।

দু'তিন দিন পরে সহসা শ্রীগৌরাঙ্গ এসে উপস্থিত হলেন মুরারির গৃহে। আনন্দে আপ্লুত হয়ে মুরারি আপ্যায়ন-অভ্যর্থনা করলেন প্রভুকে। প্রভু বললেন,—মুরারি, আমাকে একটা জিনিষ দেবে ভাই?

'সে—কি?'—বিস্ময়ে কুণ্ঠায় চাইলেন মুরারি নিমাইয়ের পানে,—আপনাকে আমার অদেয় কি আছে? আমার দেহমন-জীবন সবই তো আপনার। তুচ্ছ জিনিষের কথা কি!

"তাহ'লে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ,—যা চাইবো, তাই দেবে?"—ভ্রূকুটি করে আবার প্রশ্ন করলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। মুরারি বললেন,—বারবার সে কথা বলে অধমকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন? বলুন, কি চাই, আমার অনায়ত্ত না হলে এক্ষুনি—এই দণ্ডেই দেব।

'বেশ'—শ্রীগৌরাঙ্গ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন,—'তাহলে আত্মহত্যা করার জন্যে যে ছুরিখানি লুকিয়ে রেখেছ,—সেখানি আমায় দাও।'

মুরারি নিস্তব্ধ—নির্বাক। কিন্তু নিঃসন্দেহে ধরা পড়ে গেছেন! তবু কৃত্রিম বিস্ময়ে বলে উঠলেন, "সে-কি প্রভু, ছুরি কি? আত্মহত্যা কি? এ-সব আপনি কি বলছেন? কোন ছুরি আমি লুকিয়ে রাখিনি?"

—রাখোনি?

"না প্রভু।"

'বেশ',—শ্রীগৌরাঙ্গ তখন নিজেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গুপ্তস্থান থেকে ছুরিটি বের করে নিয়ে এলেন,—"তোমার এই কাজ মুরারি। ছিঃ, মুরারি, আত্ম-হত্যার প্রবৃত্তি জাগে তোমার?—কেন, মুরারি, আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি,—গাঢ় হয়ে আসে তাঁর স্বর,—'যার জন্যে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? আমার ওপর এ শাস্তি কেন দিতে চাও মুরারি?'—দুই চোখ এবার তাঁর ভরে এলো জলে।

লজ্জায় তখন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে মুরারির। নিমাই-য়ের পায়ের কাছে বসে তিনি বললেন,—প্রভু, প্রভু, আপনি সর্বান্তর্যামী,—

এ দাসকে ক্ষমা করুন। পাছে, আপনার বিচ্ছেদ সহ্য করতে হয়,—সেই আশঙ্কায় আমার মাথায় এ দুর্বুদ্ধি জেগেছিল।

—আর কোনদিন জাগবে না তো?

'না, প্রভু!'—মুরারি শ্রীগৌরাঙ্গের পায়ে হাত দিলেন,—'এই তোমার চরণ ছুঁয়ে বলছি।'—শ্রীগৌরাঙ্গ তখন প্রেমভরে মুরারিকে আলিঙ্গন করলেন।

একদিন মুরারি—শ্রীরামচন্দ্রের মহিমাসূচক আটটি শ্লোক রচনা করে—উপহার দেন প্রভুকে। পরম সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বহস্তে তাঁর কপালে লিখে দেন,—রামদাস।

৪৩

'শচীর বেটা শেষ পর্যন্ত যে ঠাকুর হয়ে বসলো হে?—একেবারে কি-না 'কেষ্ট-ঠাকুর।' শ্রীকৃষ্ণ তো দুনিয়ায় জন্ম নেবার জায়গা পেলেন না,—তাই সশরীরে ঢুকলেন এসে জগন্নাথের ঘরে! যত সব বুজরুকী!'

'যা বলেছ!'—সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলে একজন,—ছিল ভাত-কাপড়ের কাঙ্গাল,—এখন ঘি খেয়ে দুধে আঁচাচ্ছে! কত লোক কত জিনিষ ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে—কাঁধে বয়ে এনে জগন্নাথের ঘরে; আর 'প্রভু' সেজে দিব্যি আরামে আছে নিমাই পণ্ডিত।—দেখেছো, আজকাল নিমাই পণ্ডিতের চেহারাখানা?—চাঁচর চুলে—গলায় ফুলের মালা দুলিয়ে,—সর্বাঙ্গে কুঙ্কুম-চন্দন মেখে,—কোঁচান ধুতি পরে—পান খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন নাগরটি।

'কেন বেড়াবে না বল?'—অন্য একজন এগিয়ে আসে হাত নেড়ে,—'পাঁচ-ভূত জুটে তোমাকে যদি 'ঠাকুর' বানিয়ে দেয়,—তুমি কি আরাম করতে ছেড়ে দেবে? নিমাই পণ্ডিত নিজে লোক তো আগে ভালই ছিল। দিব্যি লেখা-পড়ার চর্চ্চা নিয়ে থাকতো। পাঁচ ভূতেই ওকে নষ্ট করলে। ওর মাথায় আর কিছু নেই।'

বলা বাহুল্য, আলোচনা হচ্ছিল নিমাইয়ের প্রতি ঘোরবিদ্বেষী লোকদের মধ্যেই। 'জগন্নাথের বেটা' নিমাইয়ের অভাবনীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি, জনপ্রিয়তা ও লোকপূজ্যতা তাদের যেন আর সহ্য হচ্ছিল না। অথচ কিছু করবারও পাচ্ছিল না তারা। শেষ পর্যন্ত বেশ করে ভেবে চিন্তে,—একজন বললে,—'তা এই যে দেখতে দেখতে গোটা নবদ্বীপটাই 'হরিভজা' হয়ে উঠলো,—এর ব্যবস্থা কি করছো? ধর্মকর্ম, শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদি সবই রসাতলে যেতে বসেছে যে। তা' চল না একদিন চাঁদ কাজীর কাছে। প্রজার ধর্ম তো রাজাকেও রক্ষা করতে হবে? কথায় বলে,—প্রজার পাপে রাজা নষ্ট। ধর্মের এই অনাচার,—লোককে ভুল বোঝানো, এ-সব কি রাজা সহ্য করবেন? হোক না মুসলমান রাজা,—তবু রাজ্যটা তো তাঁরই। চল, চাঁদ কাজীর কাছে। এর একটা বিহিত করে আসি।'

'ঠিক, ঠিক বলেছ!'—সমস্বরে সকলে চীৎকার করে উঠলো,—'সেই ভাল!' একজন বললে,—'দল বেঁধেই যেতে হবে কিন্তু। একবার তো নালিশ করাও হয়েছিল,—কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। এবার তা হতে দিচ্ছি না।'—ক্রূর আনন্দে তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।.........

ইতিমধ্যে সহসা একটি শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল। নিমাই গঙ্গাস্নান করে তীরে উঠে এসেছেন,—ভক্তরাও আছেন সঙ্গে,—সহসা এক ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়ালেন তাঁর পথরোধ করে।—"শোন নিমাই পণ্ডিত", থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে উগ্রকণ্ঠেই বললেন তিনি,—"আমি তোমার কীর্তন শুনতে দু'দিন গিয়েছিলাম,—শ্রীবাস পণ্ডিতের দরজায়। দুদিনই আমাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এতে আমাকে রীতিমত অসম্মান করা হয়েছে। কিন্তু আমিও নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ,—আমারও শক্তি আছে, তপস্যার বল আছে,—আমি যেমন হতমান হয়েছি,—তেমনি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি,—তোমার যাবতীয় সংসার সুখ, নষ্ট হোক—নষ্ট হোক।"

ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ কথা শেষ করেই তাঁর উপরীত খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন সেখানে। ভক্তরা হাহাকার করে উঠলেন সকলে। কিন্তু নিমাই সেই ছিন্ন উপবীত মাথায় তুলে—ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন,—"ব্রাহ্মণ, আপনাকে প্রণাম করি,—আপনার অভিশাপ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।"

ভক্তগণের অন্তর আবার কেঁদে উঠলো,— হায়, হায়, হায়।

* * *

নদীয়ার চাঁদ কাজী—গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের দৌহিত্র। লোক ভালোই। ধর্মে কর্মেও মতি আছে। সহসা কারো ওপর পীড়ন অত্যাচার করাও তাঁর

রীতি নয়। কিন্তু পাঁচজন বারবার এসে সেই এক পুরাতন অভিযোগ ক'রে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করে তাঁকে নিমাই পণ্ডিতের বিরুদ্ধে। বলা বাহুল্য, নিমাই-বিদ্বেষী কতকগুলি লোকেরই প্ররোচনায় একবার তিনি কীর্তন বন্ধ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন; সেই সময়ই নবদ্বীপে একটা গুজবও রটেছিল —গৌড় থেকে মুসলমান সৈন্য আসছে—নিমাই পণ্ডিত আর তাঁর দলকে ধরতে। কিন্তু কার্যতঃ কিছুই হয়নি। তাই এই সব বিদ্বেষীদের বিদ্বেষ এখন একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

চাঁদ কাজী সকলের অভিযোগ শুনে বললেন,—'দেখ, নিমাই পণ্ডিত ছেলে-মানুষ, যা করছে করুক। তোমরা আমাকে আর তার মধ্যে টেনো না।"

'ধর্মাবতার!'—কুর্নিশ করে বিরোধীদল বললে,—'আপনি সে কথা বললে হিন্দুর ধর্মকর্ম সবই তো নষ্ট হয়! যা আমাদের শাস্ত্রে নেই,—তাই করছে নিমাই পণ্ডিত কতকগুলি লোককে হাত করে।—আপনাকে তো সবই বলেছি এর আগে।'

দলের মধ্যে দু একজন পণ্ডিতও ছিলেন,—তাঁরা দু'চারটে শাস্ত্রবচনও আওড়ালেন কাজীর কাছে,—এবং নিঃসন্দেহে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে,—এই অনাচারের বিহিত না করলে,—প্রজার পাপে রাজারও অকল্যাণ হবে। কয়েক-জন মুসলমানও এই সময় পণ্ডিতদের সমর্থন করে কীর্তনের বিরুদ্ধে কাজীকে উত্তেজিত করলেন।

চাঁদ কাজী শেষ পর্যন্ত আর উত্তেজিত না হয়ে পারলেন না। এবং এক-দিন সিপাইসান্ত্রী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নগরে। তখন সন্ধ্যাবেলা, পাড়ায়-পাড়ায় সংকীর্তন সুরু হয়েছিল,—চারিদিকেই মৃদঙ্গের বোল,—করতালের বাদ্য,—নুপুর-শিঞ্জন,—আর হরি হরি 'হুঙ্কার'! চাঁদ কাজী বুঝলেন,—এ এক-তাজ্জব কাণ্ড করে তুলেছেন নিমাই পণ্ডিত। ওই একটি মানুষের প্রভাব এত?—কিন্তু নিমাই-বিদ্বেষীদল তাঁকে বেশিক্ষণ ভাবতে দিলে না। বরং কথায় কথায় আরও উত্তেজিত করে দিলে।

সুযোগ বুঝে কাজীর সিপাই-সান্ত্রীরা দু'এক জায়গায় ঢুকে—কীর্তনীয়া-দের মৃদঙ্গ ভেঙে চুরমার করে দিলে,—যাকে সামনে পেলে তাকেই ধরে বেদম প্রহার করলে,—এবং আরও নানারকম অত্যাচার করতেও ছাড়লো না তারা। নাগরিকগণ যে-যেদিকে পারলো, দারুণ আতঙ্কে ছুটে পালালো। অতঃপর বজ্রকণ্ঠে কাজী আদেশ জারী করলেন,—এর পর আবার যদি কাউকে আমি কীর্তন করতে দেখি,—তাহ'লে গুরুতর দণ্ড তো হবেই,—তাছাড়া তার জাত পর্যন্ত নষ্ট করা হবে।"

কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে উঠলো নবদ্বীপের কয়েকটি পল্লী। থেমে

গেল—'হরি-হরি-ধ্বনি।—মৃদঙ্গের মধুর বোল।—দারুণ বিভীষিকা জাগলো সকলের মনে। কীর্তনানুরাগী ব্যক্তিগণ প্রমাদ গণলেন। আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত, হরিনামোৎসবে মত্ত নগরীর—বহু স্থান এক গভীর বিষাদ-ভারে মুহ্যমান হয়ে উঠলো!, সংবাদটা যে শুনলো, আতঙ্কে তারই মুখ গেল শুকিয়ে।

—নগরের লোক ছুটে এলো শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে শ্রীহট্টপাড়ায়,—উপদ্রবটা এ-পাড়ায় হয়নি। তাই গৌরাঙ্গ তখনও এর কিছু বুঝতে পারেন নি।—"প্রভু, প্রভু, সর্বনাশ হলো"—হাঁপাতে হাঁপাতে নাগরিকগণ বললে,—"আর তো কীর্তন করা চলে না।"

"কেন,—কেন,"—উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন নিমাই।

সকলে তখন কাজীর উপদ্রব ও নিষেধাজ্ঞা জারীর কথা বললে সবিস্তারে। 'কোন চিন্তা নেই।'—শ্রীগৌরাঙ্গ সকলকে আশ্বাস দিলেন—"যেমন কীর্তন করছিলে,—তেমনিই চলুক। কীর্তন বন্ধ হবে না।"

কিন্তু কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে যে, আরও কীর্তন করতে সাহস পায়! কাজী রোজ সন্ধ্যায় সিপাই-সান্ত্রী নিয়ে নগরের পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যেখানে দেখলেন—কীর্তন হচ্ছে,—সেইখানেই করলেন উপদ্রব। সেখানেই দিলেন প্রবল বাধা। শেষ পর্যন্ত ভক্তগণও আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। যাঁদের প্রাণের চেয়েও 'নাম গান' অধিক আদরের,—তাঁরাও এবার ছুটে এলেন প্রভুর কাছে—"প্রভু, নবদ্বীপে থেকে যদি হরিনাম করবার উপায় না থাকে,—তবে অনুমতি করুন, আমরা নবদ্বীপ ছেড়ে—অন্য কোথাও যাই,—হরি-সংকীর্তন না করে তো বাঁচতে পারবো না।"

'কি, আমার নাম-সংকীর্তন বন্ধ করবে?'—মূর্তি ভীষণ ও গম্ভীর হয়ে উঠলো নিমাইয়ের,—'কার এত বড় ক্ষমতা, আমার কীর্তনে বাধা দেয়! তোমরা যাও, সর্বত্র নাম-কীর্তনের আয়োজন কর,—পাড়ায় পাড়ায়,—এমন কি ঘরে ঘরেও কীর্তন করতে বল সকলকে। আর যেখানে যত ভক্ত, কীর্তনীয়া, অনুরাগী ব্যক্তি আছে,—সকলকে একত্র কর। যেখানে যত মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরা, শঙ্খ ইত্যাদি আছে,—সব নিয়ে এসো। আজই সন্ধ্যাবেলায় আমি নিজে সকলকে নিয়ে নগর কীর্তনে যাত্রা করবো। সকলকে বলে দিও, প্রত্যেকে যেন একটা করে মশাল সঙ্গে নিয়ে আসে। আর শ্রীপাদ!

তিনি নিত্যানন্দের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন, "'তুমিও যাও, সকলকে সাহস দাও, উৎসাহিত কর! সকলকেই বিকাল বেলায় আমার এখানে আসতে বলবে। নগরের প্রতি রাস্তায় আমি আজ কীর্তন করে কাজীর বাড়ী পর্যন্ত যাবো। ...আজ সকলে দেখবে,—আমার হরিনাম বড় কি কাজী বড়!'—বলতে বলতে

বিশ্বম্ভর যেন সত্যই বিশ্বম্ভর মূর্তি ধারণ করলেন। তাঁর চোখে এক অপূর্ব দীপ্তি ফুটে উঠলো,—সর্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত হতে লাগলো এক দিব্য জ্যোতিঃ! ...উদার প্রশস্ত ললাটে ফুটে উঠলো বরাভয়ের ছায়াঃ সে-ছায়া সকলকে ডেকে বলছে যেন—মাভৈঃ!

প্রবল উৎসাহে জয়ধ্বনি করে উঠলেন সকলে,—'জয় গৌরাঙ্গ প্রভুর জয়!' —নূতন শক্তি জেগে উঠলো তাঁদের প্রাণে!—নিমাইয়ের উদ্দীপনায় কি সঞ্জীবনী ছিল,—কারো চিত্তে আর কাজী বা সিপাই-সান্ত্রীর কোন ভয় থাকলো না,—দুর্বলতা সরে গিয়ে তাঁদের অন্তরে ফিরে এলো সবলতা চতুর্গুণ হয়ে। ...বিরাট কোলাহল করতে করতে সকলে বেরিয়ে পড়লেন পথে।...সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বিরাট 'হরি-হরি' হুঙ্কারে সুদূর আকাশ পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো!

অবিলম্বে নবদ্বীপের সর্বত্র প্রচার হয়ে গেল,—নিমাই-পণ্ডিত আজ স্বয়ং নগরের পথে পথে কীর্তন ও নৃত্য করবেন। যেখানে যত বৈষ্ণব আছেন,—সকলেই যোগ দেবেন আজ প্রভুর সঙ্গে।

কাজীর কঠোর নিষেধাজ্ঞায় কীর্তন বন্ধ হবার পর এই ঘোষণা নগরের লোক শুনলো বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে।...যে-কারণেই হোক,—সকলের প্রাণ উৎসাহে-উল্লাসে নেচে উঠলো।...কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ কোন্ কোন্ পথ দিয়ে যাত্রা করবেন, —তার কোন ঠিক নেই। তাই প্রতি পল্লীর লোক তাদের আপন আপন গৃহ-দ্বার এবং পথ সুসজ্জিত করতে সুরু করলে।—দ্বারে দ্বারে কদলীবৃক্ষ, আম্র-পল্লবশোভিত পূর্ণ কুম্ভ প্রভৃতি স্থাপন করা হলো,—দীপান্বিতার রাত্রির মত সকলে আপন-আপন বাড়ীর চতুর্দিক দীপমালায় আলোকিত করার ব্যবস্থা করলেন। পুরমহিলাগণ স্নান করে শুদ্ধ হয়ে যেন দেবতা-বরণের জন্যই সুসজ্জিতবেশে, পুষ্প, লাজ ও শঙ্খ এবং অন্যান্য বরণ-দ্রব্য নিয়ে দাঁড়ালেন এসে দ্বারে দ্বারে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র নবদ্বীপ পুষ্পে-পল্লবে, আলোক-মালায় বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিতা সুন্দরী তরুণীর মত এক বিচিত্র অনির্বচনীয় শোভায় হেসে উঠলো।...নগরের সর্বত্র পড়ে গেল মহোৎসবের মহা সমরোহ।

এদিকে তখন প্রভুর কীর্তনের সম্প্রদায় তুমুল আনন্দে কীর্তন করতে করতে ক্রমশঃই অগ্রসর হয়ে আসছে।...কত দল, কত সম্প্রদায়, কত লোক কে গণনা করবে? প্রধান প্রধান দলের অধিনায়ক শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীহরিদাস, শ্রীবাস আর স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ। তাঁর দক্ষিণে নিত্যানন্দ—বামে গদাধর। অঙ্গে তাঁর সুমোহন বেশ।...মাথায় চূড়া, তাতে একগাছি সরু মালতীর মালা জড়ানো, ললাটে অলকা-তিলকা, চক্ষে কাজল,—সর্বাঙ্গ কুঙ্কুম চন্দনে চর্চিত। একগাছি সুবৃহৎ শ্বেত পুষ্পমাল্য তাঁর গলা বেষ্টন করে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে।

...পরণে পট্টবস্ত্র—স্কন্ধেও উত্তরীয়। অঙ্গে দু-একখানি স্বর্ণাভরণ—পায়ে নূপুর।..কি ভুবন-ভোলান সে রূপ,—কি চিত্ত-বিমোহন সে সজ্জা!

জ্যোতির্ময় কনক-বিগ্রহ দেব সার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥
আজানুলম্বিত মালা সর্ব অঙ্গে দোলে।
সর্ব অঙ্গ তিতে পদ্মনয়নের জলে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে তখন শ্রীভগবানের আবেশ হয়েছে।...অলৌকিক দিব্য-জ্যোতিঃ ফুটে বেরুচ্ছে তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে। আকর্ণবিস্তৃত দুই কমলাক্ষি দিয়ে অবিরাম ঝরছে অজস্র ধারা দুই গণ্ড প্লাবিত করে। আজানুলম্বী স্বর্ণবলয়ভূষিত দুই-বিশাল ভুজ উত্তোলন করে 'হরি হরি' বলতে বলতে তিনি নেচে চলছেন তালে তালে। কি অপূর্ব সে ভাব-নৃত্য। যে দেখেছে সেই প্রেমানন্দে আত্মহারা হয়ে উঠছে। ভাবের আবেগে হেলে-দুলে ঢলে পড়ছেন শ্রীগৌরাঙ্গ—কখনো গদাধরের গায়ে—কখনো বা নিত্যানন্দের। যেন,—'সোনার কমল, করে টলমল প্রেম-সরোবর মাঝে।'

রাস্তার দু পাশে অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির নেত্রে চেয়ে আছে—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের দিকে। চারিদিক থেকে রাশি রাশি পুষ্প এবং অঞ্জলি অঞ্জলি শুভ্রলাজ বর্ষিত হচ্ছে নিমাইয়ের শিরে।...সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠছে অসংখ্য শঙ্খ উচ্চ গম্ভীর রোলে,—হুলুধ্বনি উঠছে মহিলাগণের কণ্ঠে কণ্ঠে।

শ্রীবাস, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীহরিদাস প্রভৃতি সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর। বিশ্ব-সংসার ভুলে তাঁরাও দু-বাহু তুলে নাচতে নাচতে কীর্তন করছেন!...কীর্তনের সুরে লয়ে মানে তালে ঠমকে গমকে যেন চারিদিকে ঝরে পড়ছে—কোন সে কল্পলোক থেকে—এক চিত্ত-সন্তাপহারী অমিয় মধুর রসধারা। দেখতে দেখতে কীর্তনের দল বিরাট বিপুল হয়ে উঠলো! নানা দিক থেকে শত শত হাজার হাজার লোক এসে তখনও যোগ দিচ্ছে সেই নগর-কীর্তনে।...লোকের সংখ্যা আর গণনা করা যায় না—বিশাল জনতার এদিক থেকে ও-দিক পর্যন্ত দৃষ্টিও চলে না। এ যেন জনতা নয়, জন-সমুদ্র! মুহুর্মুহু 'হরি হরি' হুঙ্কারে—অসংখ্য মৃদঙ্গ-করতালের শব্দে মঞ্জীর-ঝঙ্কারে—তুরী-ভেরীর নিনাদে এবং তার সঙ্গে আকাশভেদী শঙ্খনাদ ও অগণিত নারীকণ্ঠের হুলুধ্বনি মিশে—দিগ-দিগন্ত কেঁপে উঠতে লাগলো এক প্রচণ্ড মধুর-গভীর আরাবে।—সন্ধ্যার আঁধারের বুকে—সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের হাতে হাতে মশাল জ্বলে উঠে সে দৃশ্য করে তুললো আরো রমণীয়—আরও চমকপ্রদ!

ক্রমে সেই বিপুল জন-সমুদ্র এসে পড়লো কাজী-পাড়ায়।...কীর্তন করতে

করতে সকলে তখন যেন পাগলই হয়ে উঠেছে! কীর্তনের বোল ছেড়ে উচ্চ-কণ্ঠে শুধু বলছে—'হরি, হরি! হরি, হরি!'...কাজীর বাড়ীর সন্নিকট হতেই সেই ক্ষিপ্ত জনতা রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করে উঠলো,—'মার কাজী, মার কাজী!'

চাঁদ কাজী দূর থেকে বহু লোকের কোলাহল শুনে প্রহরীদের আদেশ করলেন,—'দেখ তো কিসের গোলমাল। যেন খোল-করতালের আওয়াজ পাচ্ছি—দেখ, আবার কীর্তন সুরু করেছে কি-না।'

কিন্তু প্রহরীরা কিছুটা এগিয়েই যে রোমাঞ্চকর বিপুল দৃশ্য দেখলো,—তাতে তাদের রাজ-প্রতাপ আর থাকলো না। বিরাট জন-সমুদ্র মার কাজী, মার কাজী করে এগিয়ে আসছে,—তাদের হাতে হাতে জ্বলন্ত দেউটি,—চোখে-মুখে দারুণ উত্তেজনা,—দেখেই প্রহরীরা যে যেদিকে পারলো ছুটে লুকিয়ে পড়লো যেখানে সেখানে।...কেউ কেউ পালাবার পথও পেলো না; হিন্দু-মুসলমান যেন একাকার হয়ে উঠলো।—এদিকে তখনও দলে দলে লোক এসে যোগ দিচ্ছে—কীর্তন-অভিযানে।...কার এ অদম্য প্রভাব? কার অমানুষিক আকর্ষণী-শক্তি এমনভাবে লোককে টেনে আনছে আত্মহারা করে।...ভাবতেও মাথা নুয়ে পড়ে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে।

একটু পরেই কাজীর দৃষ্টি পড়লো সেই বিপুল উন্মত্ত জন-সমুদ্রের দিকে। ...যেন কোন মহা-সিন্ধুর মহাতরঙ্গ ফেনিল উচ্ছ্বাসে—প্রচণ্ড গর্জনে ছুটে আসছে।...'মার কাজী মার কাজী' শব্দও ঢুকলো সুস্পষ্টভাবে কাজীর কানে। কাজী দেখলেন, তাঁর সিপাই-সান্ত্রীরা এই বিপুল জনতার কাছে মুষ্টিমেয়ও নয়।...তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন কীর্তনের রোল। তবে কি কীর্তনীয়ারা বিরাট দল গড়ে তাঁকে মারতে আসছে! দারুণ আশঙ্কায় কাজীসাহেব একে-বারে প্রাসাদের নিভৃতে গিয়ে লুকিয়ে পড়লেন।...সিপাই-সান্ত্রীরাও তখন কে কোথায় লুকিয়ে পড়েছে।

ভাব-সম্বরণ করে শ্রীগৌরাঙ্গ ঢুকে পড়লেন কাজীর বাড়ীর মধ্যে। তাঁর পিছু পিছু অনেকেই ঢুকে পড়লো। তখন আর ভয় বলে কোন জিনিসই নেই কারো মনে।...বাড়ীর মধ্যে গিয়েও তারা 'মার কাজী, মার কাজী' বলে গর্জন করতে লাগলো।—শ্রীগৌরাঙ্গ ইঙ্গিতে শান্ত করলেন তাদের।

প্রাঙ্গণে বাইরের লোকের বসবার জন্যে একখানা প্রশস্ত ঘর।...নিমাই সেই ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখলেন,—একজন লোক এক কোণে বসে ভয়ে যেন কাঁপছে! ...'কাজী সাহেব কোথায়?'—জিজ্ঞাসা করলেন নিমাই লোকটিকে।...লোকটি ভয়ার্তকণ্ঠেই উত্তর দিল,—'বাড়ীর মধ্যে চলে গেছেন।'

নিমাই নিজের দলের কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে ডেকে বললেন,—আপনারা যান, কোন ভয় নেই। আমার নাম করে কাজী সাহেবকে ডেকে আনুন।

গোলমাল তখন একেবারে থেমে গেছে নিমাইয়ের নির্দেশে।...আহ্বানমাত্র চাঁদ কাজী ধীরে ধীরে এসে নতশিরে দাঁড়ালেন নিমাইয়ের সম্মুখে। দুই কর তাঁর বক্ষে সংযুক্ত।

'আপনার এ কিরকম ভদ্রতা ?'—শ্রীগৌরাঙ্গ কৌতুকের সুরেই মৃদু হেসে বললেন,—আমি এলাম আপনার বাড়ী, আপনি কোথায় অতিথিকে আদর-আপ্যায়ন করবেন,—তা না বাড়ীর মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে পড়লেন ?

'গৌরহরি।'—শ্রীগৌরাঙ্গের মুখের দিকে একবার চাইলেন কাজী। কিন্তু না, কোথাও ক্রোধ বা বিদ্বেষের চিহ্নও নেই। মুখখানি যেন করুণায় ঢল ঢল করছে। ভরসা পেয়েই কাজী বললেন,—'তোমাকে সকলে 'গৌরহরি' বলে, তাই আমিও বলছি। আমি তোমার কীর্তন বন্ধ করেছিলাম, তোমার লোকদের ওপর অনেক অত্যাচারও করেছি।...আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমাকে অপরাধের শাস্তি দিতে এসেছ। তাই ভয় পেয়ে পালিয়েছিলাম। অপরাধ আমার সত্যিই হয়েছে,—সে কথা আমি পরে নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছি।...কীর্তন বন্ধ করতে গিয়ে আমার বা আমার লোকের অমঙ্গলই হয়েছে। তা দেখ গৌরহরি'—

শ্রীগৌরাঙ্গ সহসা ব্যস্তভাবে বললেন,—'তা আপনি দাঁড়িয়ে কেন,—বসুন।' —হাত ধরে পরম আদরে তিনি কাজীসাহেবকে বসালেন তাঁর পাশে। কাজী আবার বলতে লাগলেন,—তুমি নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র,—আর তিনি গ্রাম-সম্পর্কে আমার 'চাচা'—সে সম্পর্কে আমি তোমার নানা (মামা)। মামা যদি একটা দোষ করেই ফেলে,—ভাগনের তা নেওয়া উচিত নয়।

'তা আপনি আমার কীর্তন বন্ধ করলেন কেন?' মুখে মৃদু হাসি,—চোখে তীক্ষ্ন দৃষ্টি, শ্রীগৌরাঙ্গ জিজ্ঞাসা করলেন কাজীকে। কাজী উত্তর দিলেন,—আমি চাইনি বন্ধ করতে—কিন্তু তোমাদেরই হিন্দুরা বারবার আমার কাছে এসে ধর্মের দোহাই দিয়ে—তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগলো। আমার লোকেরাও আমাকে উত্তেজিত করলে। তোমাদের ধর্মের তো আমি বিশেষ কিছু জানি না,—ভাবলাম, তাহলে এদের অভিযোগই ঠিক।'

কাজী বিস্তৃতভাবেই বললেন হিন্দুরা এসে কি বলেছিল তাঁকে।... শ্রীগৌরাঙ্গ কৌতুকে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। কাজী আবার বললেন,—কিন্তু দেখ গৌরহরি,—তাঁর দৃষ্টি গভীরভাবেই নিবদ্ধ হলো নিমাইয়ের প্রেমোজ্জ্বল করুণাস্নিগ্ধ শান্ত মুখখানির দিকে,—আমার মনে হয়,—হিন্দুদের যিনি ঈশ্বর—কৃষ্ণ বা নারায়ণ—তুমি স্বয়ং সেই নারায়ণ।'—বলতে বলতে কাজীর কণ্ঠ গাঢ় হয়ে এলো,—চোখের কোণে জল টলটল করে উঠলো।

সোল্লাসে তাঁকে আলিঙ্গন করে শ্রীগৌরাঙ্গ বললেন,—আপনার মুখে,—হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ,—এই তিনটি নামই বেরিয়েছে,—এবার একবার বলুন,—হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।

নিমাইয়ের পুণ্যস্পর্শের প্রভাবে কাজীর অন্তরে তখন কৃষ্ণপ্রেম জেগে উঠেছে,—তিনি গদ্‌গদকণ্ঠে বললেন, 'হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।'—সঙ্গে সঙ্গে নিমাইকেই প্রণাম করলেন তিনিঃ—প্রভু, আমার ওপর তোমার কৃপা যেন চিরদিন থাকে।

সাদরে কাজীকে বুকে তুলে শ্রীগৌরাঙ্গ বললেন,—আপনার কাছে আমার কিন্তু একটি ভিক্ষা আছে, আপনি স্বীকার করুন,—আর আমার কীর্তনে কোনদিন বাধা দেবেন না।

'না, না, না।'—কাজী ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন,—বাপ, আবার।...আমি তো দেবোই না,—এমন কি আমার বংশেও তালাক দেব,—কেউ যেন কোন কালে কীর্তনে বাধা না দেয়। তোমরা স্বেচ্ছামত কীর্তন কর।

পরম তুষ্ট হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রীতি-সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় নিলেন কাজীসাহেবের কাছে।

এর পর কাজী পরমভক্ত হয়ে উঠলেন শ্রীগৌরাঙ্গের। তাঁর এবং তাঁর সমগ্র পরিবারের এমন কি বংশেরও আচার-ব্যবহার হয়ে উঠেছিল সমস্তই হিন্দুর মত। পুণ্যাত্মা চাঁদ কাজীর কবর এখনো আছে নবদ্বীপে। বৈষ্ণবগণ সেই কবর-স্থানে আজিও প্রণাম করেন ভক্তিভরে।

৪৪

শ্রীবাসের আঙিনা। শ্রীবাস নিজে এবং অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে ঘিরে কীর্তন করছেন মহানন্দে।...ওদিকে বাড়ীর মধ্যে শ্রীবাসের বালকপুত্র গুরুতর পীড়ায় মরণোন্মুখ। শ্রীবাস জানেন সে-কথা।...মেয়েদের হাতে রুগ্ণ পুত্রের সেবা-শুশ্রূষার ভার দিয়ে তিনি মেতে উঠেছেন সংকীর্তনে।...তাঁর সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ,—তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে পুত্রের অকল্যাণের কথা মনেও আসে না শ্রীবাসের।...তাঁর একান্ত বিশ্বাস,—গৌরাঙ্গরূপে স্বয়ং কল্যাণময় ভগবান নৃত্য করছেন তাঁর আঙিনায়, তাঁর পুণ্যপ্রভাবে বাড়ির চতুর্দিক কল্যাণময় হয়ে উঠেছে,—এ-সময় কি কোন বিপদ-আপদ ঘটতে পারে তাঁর গৃহে ?

শ্রীবাস কীর্তন করছেন পরম নিশ্চিন্ত মনে। প্রেমানন্দে প্রফুল্ল—কীর্তন-রস-মুগ্ধ আত্মহারা শ্রীবাসের মুখের দিকে চেয়ে কারো বোঝবারও ক্ষমতা নেই যে,তাঁর একমাত্র পুত্র মৃত্যু-শয্যায়।

ও-দিকে এক মর্মান্তিক মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। একজন দাসী এসে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে গেল শ্রীবাসকে বাড়ীর মধ্যে। শ্রীবাস দেখলেন, তাঁর পুত্রের অন্তিমকাল উপস্থিত। বাড়ীর সকলে রুদ্ধ আবেগে কাঁদতে সুরু করেছেন। যেহেতু বাইরে কীর্তন হচ্ছে,—সশব্দে কাঁদলে ভক্তগণের কীর্তনে বাধা পড়বে। ...এত বড় বিপদেও কি অটল ধৈর্য—কি অপূর্ব সংযম!

শ্রীবাস পুত্রের কানের কাছে মুখ নিয়ে তারক ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করলেন।...শুধু ওইটুকুর জন্যেই বুঝিবা অপেক্ষা করছিল বালক। ধীরে ধীরে তার চোখ-দুটি মুদে গেল চিরতরে।...পুত্রের জননী মালিনীদেবীর রুদ্ধ আবেগ আর যেন বাধা মানে না, শ্রীবাস ব্যগ্রভাবে তাঁকে বাধা দিলেন,—না, না, এখন গোলমাল করো না,—বাইরে প্রভু ও ভক্তগণ কীর্তনানন্দে মত্ত। কান্নার শব্দ শুনলে সকলের—বিশেষ প্রভু গৌরাঙ্গের রসভঙ্গ হবে। আমাদের কপালে যা ছিল,

তাই ঘটেছে,—আনন্দের সময় অন্যকে দুঃখ দিয়ে কি লাভ? তুমি নারী—মাতৃ-জাতি,—তবু তোমার ধৈর্যের সীমা নেই। আর কিছুকাল ধৈর্য ধর।

স্বামীর সুযোগ্যা সহধর্মিণী। বিপুল সংযমে মালিনীদেবী নিজেকে সংহত করে তুললেনঃ অন্যান্য মেয়েদেরও সামলে নিলেন।...রুদ্ধ শোকোচ্ছাস গুমরে গুমরে ফিরতে লাগলো সকলের অন্তরেই।...এদিকে শ্রীবাসও তদ্দণ্ডেই আঙিনায় ফিরে এসে আবার পূর্বের মতই দু-বাহু তুলে নাচতে লাগলেন 'হরি হরি' বলে।...কেউ বুঝতেও পারলেন না,—স্নেহবান পিতৃ-অন্তরে কি দারুণ যন্ত্রণাদায়ক শেল বিদ্ধ হয়েছে!

কিন্তু এত বড় দুঃসংবাদ কতক্ষণ গুপ্ত থাকে!...সকলের বিপুল সংযম সত্ত্বেও দু-একজন ভক্ত কোনরূপে বুঝতে পারলেন—শ্রীবাসের পুত্র-বিয়োগের কথা।...কিন্তু তাঁরাও প্রভু ও অন্যান্যের কীর্তনোন্মত্ততার দিকে চেয়ে চেপে রাখলেন সে-কথা।...হঠাৎ কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তনাবেশ কেটে গেল,—তিনি চমকে উঠলেন,—'এ-কি, আমি কীর্তনে আর আনন্দ পাচ্ছি না কেন? আমার অন্তর থেকে থেকে কেঁদে উঠছে কেন?...শ্রীবাস, শ্রীবাস!'—তাঁর কণ্ঠ ব্যাকুল হয়ে উঠলো,—তোমার বাড়ীতে কি কোন বিপদ হয়েছে?

'প্রভু!'—শ্রীবাস উত্তর দিলেন গাঢ়কণ্ঠে,—তুমি আমার বাড়ীতে। এ সময় কি এখানে কোন বিপদ সম্ভব? তুমি যা কর সবই তো মঙ্গলের জন্য।

হেঁয়ালীর মত কথা! শ্রীগৌরাঙ্গ স্থির হতে না পেরে চাইলেন ভক্তদের পানে,—তোমরা জান? বল, বল। শ্রীবাস যেন কিছু চেপে যাচ্ছে।

একজন ভক্ত তখন বললেন ক্ষুব্ধকণ্ঠে,—প্রভু, শ্রীবাসের ছেলেটি মারা গেছে!

'কি—কি?'—কিছুক্ষণের জন্য বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন শ্রীগৌরাঙ্গ।—পরে তাকালেন শ্রীবাসের দিকে,—ছলছল চোখে,—'শ্রীবাস, শ্রীবাস। তবু তুমি ধীর—তবু শান্ত-অবিচল।...তুমিই প্রকৃত ভক্ত। ভগবান তোমার অন্তরে। তাই এই প্রচণ্ড শোকেও এতখানি অনুদ্বিগ্ন মনে থাকা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।—কিন্তু শ্রীবাস,—'তাঁর চোখ দিয়ে এবার ঝরঝর জল ঝরে পড়লো শ্রীবাসের পুত্রের শোকে,'—তোমার ছেলে যে আমারও বিশেষ প্রিয় ছিল!...তার বিচ্ছেদ-আঘাত যে আমাকেও কাতর করে তুলছে!—

শ্রীবাস এবার সিক্তকণ্ঠেই বললেন,—প্রভু, আপনি কাঁদবেন না।...যা হবার তা হয়েছে। কিন্তু আপনার চোখে জল দেখলে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে!

এমন সময় শ্রীবাসের মৃতপুত্রকে বাইরে এনে শোয়ান হলো একখানি খাটের ওপর। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন খাটের কাছে এসে মৃতদেহকেই সম্বোধন করে বললেন,—বৎস, তুমি এই অকালে—অল্পবয়সে কেন আমাদের ত্যাগ করলে?

তোমার মাতা-পিতা তোমার শোকে কাতর। আমরাও তোমার এ-বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারছি না। এ-সময়ে তুমি সে-কথা বললে, তবু আমরা কিছু সান্ত্বনা পাব। দিব্যপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গের সে আহ্বানের কি অলৌকিক শক্তি,—মুহূর্তে মৃত বালকের কণ্ঠে কথা ফুটলো,—'প্রভু, আমার জন্য আপনারা দুঃখ করবেন না,—জগতের কার্য আমার শেষ হয়েছে। তাই আমি অন্য কোন পুণ্যস্থানে যাচ্ছি। প্রভু, কৃপা করুন,—যেন আপনার চরণে আমার জন্ম জন্ম মতি থাকে।"

বিপুল বিস্ময়ে উৎকর্ণ হয়ে সকলেই শুনলেন সেই বিগতদেহ আত্মার বিদায়-বাণী,—বিস্ফারিত চক্ষে চাইলেন সকলে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবাবিষ্ট মুখের দিকে। একটু পরে যেন বাহ্য-অনুভূতি ফিরে এলো শ্রীগৌরাঙ্গের। বললেন শ্রীবাসকে,—'পণ্ডিত, তুমি আমার একান্ত আপনার জন। তোমাকে আর কি সান্ত্বনা দেব?—প্রেমময় কৃষ্ণ তোমাকে শান্তি দেবেন। আর আজ থেকে—তোমার এক পুত্র স্থলে,—আমি আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার দুই পুত্র জানবে।'

ভক্তগণের আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ধ্বনিত হলো,—জয় শ্রীগৌরাঙ্গ, জয় শ্রীগৌরাঙ্গ।

*　　　*　　　*

চাঁদ কাজীকে স্বমতে আনার পর অনেক বিরুদ্ধবাদীও শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠেছিল নিমাইয়ের ওপর।...যে-সব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শাস্ত্রচর্চাদি ছেড়ে সংকীর্তনে মেতে ওঠবার জন্য নিমাইকে 'হরিভজা', ধর্মদ্রোহী প্রভৃতি বলে বিদ্রূপ করতেন,—তাঁরাও অনেকে সেদিন থেকে তাঁকে স্বীকার করেছিলেন ভক্ত ও মহাপুরুষ বলে।...মোট কথা,নিমাইয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রকৃত উপলব্ধি ক্রমেই জেগে উঠেছিল বিদ্বেষীদের মনে।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য কিন্তু সেই একই ভাবে সন্ধিহান হয়ে পড়েন শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা সম্বন্ধে। পরীক্ষারও তাঁর অবধি ছিল না।...প্রতিবারেই কিন্তু নিজের অমূলক সন্দেহের জন্যে ধিক্কার জন্মাতো তাঁর নিজেরই ওপর।...আর আর ভক্তেরা সকলেই মনে-প্রাণে আত্মসমর্পণ করেছেন শ্রীগৌরাঙ্গকে সেই পরম-পুরুষের ভাবেই। তিলমাত্রও সন্দেহ আর নেই কারো মনে। কিন্তু তাঁর এ-কি হলো!..তিনি যে আত্মসমর্পণ করেও আবার আস্থা হারিয়ে ফেলছেন! এ জন্য গভীর দুঃখে এবং দারুণ অনুশোচনায় তাঁর দুই চোখ ভরে জল আসতো.—তবুও থেকে থেকে তিনি বিচলিত না হয়ে পারতেন না।

একদিন আচার্য ধরে বসলেন গৌরাঙ্গকে,—প্রভু, দয়া করে তোমার কিছু 'ভগবৎ-বৈভব' আমাকে দেখাও।

'ভগবৎ-বৈভব?'—ভ্রূকুটি ফুটে উঠলো গৌরাঙ্গের ললাটে,—'সে-কি কথা?'

—তারপর মৃদু হেসেই বললেন,—আমি শ্রীভগবানের এক কণা করুণার জন্যে ব্যাকুল,—আমি কি বৈভব দেখবো তোমায় ?

অদ্বৈতের সন্দেহ আবার ঘনীভূত হয়ে ওঠে,—ভগবানই যদি, তবে এ-দীনতা কেন ?—তবু বলেন,—'আমাকে ছলনা করো না প্রভু! তোমার বিশ্ব-রূপ আমাকে দেখাতেই হবে।'

'আচার্য !'—সহসা শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠ ভাবাবেগে গম্ভীর হয়ে ওঠে,—তুমি ভগবানের পরমভক্ত। তোমার অন্তরে—তোমার ধ্যান-দৃষ্টিতে ভগবান সর্ব-রূপেই বিরাজ করছেন। তুমি ধ্যানস্থ হও,—গীতায় উক্ত সে বিরাট রূপ চিন্তা কর। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

অদ্বৈতের কি হলো, আর কোন প্রতিবাদের কথা ফুটলো না তাঁর কণ্ঠে। স্তিমিত নেত্রে—গভীর নিষ্ঠায় সেই অব্দয় বিশ্বময় বিশ্বরূপের ধ্যান করতে লাগলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দেহেও ভগবৎ-আবেশ হয়েছে। সহসা অদ্বৈতের চারদিক থেকে যেন জড়জগৎ সরে গেল,—কল্পনেত্রে ভেসে উঠলো,—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে বিরাট রূপ দেখেছিলেন মহা জিজ্ঞাসু ভক্ত ধনঞ্জয়,—যেন সেই প্রচণ্ড-ভীষণ সৌম্য-সুন্দর, রুদ্র শান্ত নির্মম-করুণ, জলস্থল-আকাশ-পরি-ব্যাপ্ত বিরাট বিপুল মূর্তি। জলদ-গম্ভীর স্বরে গৌরাঙ্গ ডাক্‌লেন,—দেখছো অদ্বৈত ?

অদ্বৈতের মুখে আর কথা নেই। চক্ষু দুইটিও তেমনি স্তিমিত।... আপনাকে হারিয়ে ফেলেছেন যেন ধ্যানলোক-বিভাসিত সেই মূর্তির বিপুলত্বে। ...সহসা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

আচার্য! আচার্য! আবার উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন গৌরাঙ্গ।—সে আহ্বানে মূর্চ্ছা ভেঙ্গে গেল অদ্বৈতের,—দেখলেন,—তাঁর সম্মুখে পরম সুন্দর নবীন পুরুষ নিমাই শান্ত-মধুর ভুবন-ভোলান বরফ রূপে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন।...

কোন দিক দিয়ে কি-যে হলো, অদ্বৈত তার কিছুই বুঝলেন না। কিন্তু অন্তর তাঁর ভরে উঠলো এক অপার্থিব অপার আনন্দে।

৪৫

বর্ষার উদ্দাম বন্যার পর ভাদ্রের ভরানদীর বক্ষ যেমন অনেকটা স্থির-গম্ভীর ও শান্ত হয়ে ওঠে,—নিমাইয়ের ভাব-স্রোতের উদ্দামতা এখন তেমনি কমে গিয়ে তাঁর অন্তর অনেকটা ধীর, স্থির এবং শান্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সহসা যেন প্রচণ্ড ঝটিকার তাড়নে আবার তাঁর ভাবাকুলতা উদ্দাম হয়ে উঠলো। ...ক্রমে এমন হলো যে,—দিন-রাত প্রতি মুহূর্ত তিনি ভাবের আবেশেই থাকেন। বাহ্যজ্ঞান যেন একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে তাঁর!

কখনো থাকেন শ্রীকৃষ্ণের আবেশে,—তখন রাধার প্রেমের জন্য আকুল হয়ে ওঠেন! কত আর্তি, কত ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে কণ্ঠে রাধার বিরহ-ব্যথায়, কখনো কখনো বা কথায় কথায় অভিমানিনী শ্রীমতীর মানভঞ্জন করেন। কোন-দিন হয়ত শ্রীকৃষ্ণের আবেশ কেটে যায়;—অধীর হয়ে ওঠেন রাধার আবেশে। ...ব্যাকুল হয়ে পড়েন শ্রীকৃষ্ণের জন্যে। অথবা তাঁর আকুল-করা বাঁশীর তানে ছুটে যান 'যমুনা-পুলিনে' কুলমানলাজ বিসর্জন দিয়ে।...কখনো তাঁকে না জানিয়ে কপট কানাই কখন কুঞ্জ ছেড়ে চলে গেছেন,—সেই দুঃখে কেঁদেই আকুল হন। কোন সময় অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলেন,—কালোবরণ আর হেরবো না। নিঠুর কালার বাঁশী আর শুনবো না।...কখনো বা—'ঘরে বৈরী ননদিনী, পথে বৈরী মহাদানী,—দেহে বৈরী নহলী যৌবনের' জন্য অভিসারে যাওয়া প্রমাদ বলে নীরবে কাঁদতে থাকেন,—বিরহ-সন্তাপিতা নিরুপায়া কিশোরী রাধার মত। আবার কখনও বা ক্ষণে ক্ষণে ভাবের পরিবর্তন ঘটে,—তখনই কৃষ্ণ তখনই রাধা।—'হরি হরি তাণ্ডব হুঙ্কারে তখনই পুরুষের মতই নৃত্য করেন,—আবার পরক্ষণেই নেত্র-বিগলিত অশ্রুধারায় কোমল-স্বভাবা প্রকৃতির ভাবই ফুটে ওঠে তাঁর ব্যথা-কাতর সুন্দর মুখে। মুখে তখনই রাধা, রাধা,—তখনই কৃষ্ণ কৃষ্ণ।...কখনও বা রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত আবেশে—বৃন্দাবনের জন্য অধীর হয়ে ওঠেন। রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রতিটি অঙ্গ প্রতিফলিত হয় তাঁর দেহে, তাঁর দিব্যোন্মাদে—তাঁর প্রতিটি প্রেমাকুল বাক্যে,—দৃষ্টিতে, গমনে-

উপবেশনে। শেষে কিন্তু একমাত্র বিরহিনী শ্রীমতীর আবেশেই আপনাকে হারিয়ে ফেলেন—বিচিত্র লীলা-রস-সমুদ্রে।

দেখে শুনে শচীদেবীর তো আর দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না। পাগলিনী হতেই তাঁর বাকী। হায়, হায়, এ আবার কি হলো?—তবু এতদিন ভক্তদের সঙ্গে বেশ কীর্তন করছিল,—সাংসারিক কোন কোন বিষয়েও কথাবার্তা বলতো,—বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে সময়ে সময়ে দু-একটা রঙ্গ-কৌতুকও করতো;—কিন্তু এ-যে আবার সব ওলট-পালট হয়ে গেল!...ভক্তদেরও মনের অবস্থা শচীর মত। প্রভু যতটা সহজভাবে আলাপ-আলোচনাদি করেন,—তাঁদের ততই আনন্দ। তাঁরাও চেষ্টা করেন প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে আনতে; কিন্তু বিফল। সর্ব-চেষ্টায় নিরাশই হতে হয় তাঁদের।

এমন সময় একদিন হঠাৎ সন্ন্যাসী কেশব ভারতী এসে উপস্থিত নিমাইয়ের বাড়ী। ভারতী থাকেন কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে এক বটবৃক্ষ তলে কুটির বেঁধে। ভাবের আবেশেই তখন ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ, ভারতীকে দেখে বলেন, 'অক্রুর, এসেছ? কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যাবে?...না, না, নিয়ে যেও না,—আমার প্রাণ-ধনকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারবো না।—কথার সঙ্গে ঢুলুঢুলু দুটি আয়তনেত্র ভরে আসে অশ্রু-ভারে!—কেশব ভারতীর দিকে চেয়ে থাকেন—এক গভীর বিষাদাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে।

ভারতীর অন্তরেও তখন আলোড়ন জেগেছে,—এ কাকে দেখছি, কি দেখছি? এই জ্যোতির্ময় সোনার দেহ কি এ-জগতের? ঐ চোখ,—ঐ দর-বিগলিত অশ্রুধারা কি সাধারণ মানুষের! এই আত্মহারা ভাব কি পার্থিব? এ-শুক না প্রহ্লাদ?...অথবা শুক-প্রহ্লাদ যাঁর প্রেমে পাগল,—তিনিই এই!... এ-দিকে তখন কেশব ভারতীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সহসা নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এসেছে,—তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন,—আসুন, আসুন। আমার আজ সুপ্রভাত।

ভারতী আশীর্বাদ করেন,—কৃষ্ণে মতি হোক।

কৃষ্ণনাম শুনে আবার নিমাইয়ের গণ্ড প্লাবিত হয়ে যায় অশ্রুধারায়। যা হোক বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে তিনি ভারতীকে অতি যত্নে ও সমাদরে 'ভিক্ষা' করালেন তাঁর বাড়ীতে।...গোপনে পরস্পর কি দু-একটা কথাও হলো তাঁদের।...কিন্তু তাঁরা ছাড়া, অন্য লোকের সে-কথা জানার কোন উপায়ই থাকলো না।

সন্ন্যাসী দেখলেই কিন্তু শচীদেবীর প্রাণ উড়ে যায়। বিশ্বরূপ তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছে,—আবার নিমাইও পাছে বঞ্চনা করে,! এই আতঙ্কেই তিনি অধীর!...সন্ন্যাসী কেশব ভারতী বাড়ি ঢুকতেই তো শচীর

চোখমুখ শুকিয়ে গিয়েছিল,—আবার তাঁর প্রতি নিমাইয়ের আদর-যত্ন দেখে,—তাঁর আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল। হায়, হায়, হায়, ভারতী এবার বুঝি আমার সর্বনাশই করে!

ভারতী বিদায় নেবার পর নিমাই আবার তেমনি রাধাভাবে বিভাবিত হয়ে পড়লেন।...এই কৃষ্ণের বিরহে আকুল রাধাভাবই তাঁর জীবনে অতঃপর অধিকাংশ সময় স্থায়ী হয়ে যায়। কৃষ্ণের চিন্তা করতে করতে—সহসা একদিন তাঁর নিঠুর কানাই-এর ওপর ভারী অভিমান জাগলো,—'না, না, মন-প্রাণ কেড়ে নিয়ে শেষে যে পরিত্যক্ত বাসি ফুলের মালার মতই ধুলায় ফেলে দিয়ে চলে যায়,—সে নির্দয় কৃষ্ণকে তিনি আর ভজনা করবেন না।...তাঁর চেয়ে গোপীরা অনেক—অনেক ভাল,—তাদের কোন স্বার্থই নেই,—অথচ কানুর সঙ্গে রাইয়ের মিলনের জন্যে তারা কি ব্যাকুল। কৃষ্ণকে কুঞ্জে আনবার জন্যে অহরহ কি আত্মভোলা প্রাণপণ চেষ্টা তাদের! তাদের নাম জপায় বরং কিছু সুখ আছে, আনন্দ আছে।" রাধার আবেশে নিমাই দারুণ অভিমানে কৃষ্ণকে ছেড়ে জপতে থাকেন গোপী-নাম।

এমন সময় তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এলেন নিমাইয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে। আগমবাগীশ এবং নিমাই পড়েছেন একই টোলে। কৃষ্ণানন্দ শুনেছেন, নিমাই পণ্ডিত খুব বড় ভক্ত হয়ে উঠেছেন,—লক্ষ লক্ষ লোক তাঁকে সম্মান-শ্রদ্ধা-ভক্তি করছে,—তাই এসেছেন যেন মনে জিগীষা নিয়ে। কিন্তু এসেই নিমাইয়ের রাধা-ভাব-বিভাবিত প্রেম-ঢল-ঢল মুখখানি দেখে,—তাঁর সে জিগীষা প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হয়ে গেল। কিন্তু নিমাইকে এক মনে গোপীনাম জপতে দেখে যেন সন্তুষ্ট হতে পারলেন না।

অদ্বিতীয় পণ্ডিত তিনি,—পাণ্ডিত্যের অভিমানও আছে মনে। তাই নিমাইকে দু'একটি উপদেশ দেওয়া উচিত মনে করলেন। বল্‌লেন,—না, না. গোপীনাম জপ করো না। কোন শাস্ত্রেই গোপীনাম-জপের বিধান নেই,—বরং কৃষ্ণনাম-জপের বিধান আছে। তুমি কৃষ্ণ নাম জপ কর।'

বাহ্যজ্ঞান-লুপ্ত—রাধা-আবেশিত নিমাই তখন আগমবাগীশের আগমন পর্যন্ত টের পাননি,—তাঁর কথা শোনা তো অনেক দূরের কথা। কিন্তু আগম-বাগীশ উপদেশ না দিয়ে যাবেন না। তিনি বারবার নিমাইকে গোপীনাম ছেড়ে কৃষ্ণনাম জপ করতে বলেন। এতক্ষণে নিমাইয়ের দৃষ্টি পড়ে তাঁর ওপর। কিন্তু চোখে তাঁর তখন রাধার প্রেমাকুল দৃষ্টি,—আগমবাগীশকে তিনি চিন্‌তেই পারলেন না,—উপরন্তু ভাবের ঘোরে মনে করলেন,—এ লোকটি কৃষ্ণের দূত। কৃষ্ণের হয়ে তাঁকে ভোলাতে এসেছে। চরম নিঠুরালী করে এখন আবার দূত পাঠিয়েছেন! ও-নিঠুর-কপটের প্রেমে আর মজে!

আগমবাগীশের দিকে চেয়ে বললেন,—যাও যাও, আমি সব বুঝি। —চাতুরীতে আমি আর ভুলছি না। আমার গোপীরাই ভাল। কৃষ্ণ নিঠুর,—কপট—শঠ—নারীঘাতী—ওর নাম আমি আর মুখেও আন্‌বো না।

"সে-কি? কৃষ্ণকে ছেড়ে গোপী ভজবে! না, না, অশাস্ত্রীয় কাজ করো না! কৃষ্ণকে ভজনা কর।"—ব্যগ্রকণ্ঠে বলে ওঠেন আগমবাগীশ।

নিমাই তখন 'নিমাই' নন,—রাধা। আরক্ত নেত্রে আগমবাগীশের দিকে চেয়ে উষ্ণকণ্ঠে বললেন,—'তুমি যাবে না? যাও, বলছি,—তোমার কৃষ্ণকে আমি চাই না। সে আমাকে অনেক দাগা দিয়েছে!'

আগমবাগীশ ভাবলেন,—নিমাই পণ্ডিত তো আচ্ছা গোঁয়ার হয়ে উঠেছে! কৃষ্ণের নিন্দা করে! কৃষ্ণকথায় বিরক্ত হয়! এ তবে কেমন ভক্ত? তিনি আপনভাবেই আবার বলে ওঠেন,—'কৃষ্ণনাম'—

"তবে, দেখবি মজা! বার বার সেই কৃষ্ণের কথা!"—সহসা সামনে একটা বাঁশের লাঠি দেখতে পেয়ে নিমাই তাই তুলে নিয়ে—তাড়া করলেন আগমবাগীশকে।

দীর্ঘ সবল-সমুন্নত দেহ যুবক নিমাই,—তাঁকে প্রকাণ্ড এক লাঠি তুলে তাড়া করতে দেখেই,—আগমবাগীশ—বাবারে, মারলে রে—বলে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারলেন সেখান থেকে। নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ,—বলিষ্ঠ তরুণকে লাঠি নিয়ে তাড়া করতে দেখলে ভয় পাবারই কথা। এদিকে তখন ভক্তরা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে নিমাইকে ধরে ফেলেছেন।—আর আগমবাগীশকে ছুটে পালাতে দেখে নিমাইয়েরও রসভঙ্গ হয়ে সেই মুহূর্তেই সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হয়েছে। আজ ক'দিন ধরেই তিনি ভাবসাগরে ডুবে ছিলেন। কেউ কোনরকমেই তাঁর বাহ্য-অনুভূতি ফিরিয়ে আনতে পারেননি। আগমবাগীশের আগমনে—সেদিক দিয়ে একটা আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া ঘটলো বটে; কিন্তু অন্যদিক দিয়ে নিমাই সম্বন্ধে একটা মিথ্যা বিরুদ্ধ ধারণাই জেগে উঠলো আগমবাগীশের মনে।

আগমবাগীশ যদি সমান রসের রসিক হতেন,—অথবা নিমাইয়ের ভাবের ভাবুক হতেন—তাহলে নিমাইয়ের আন্তর ভাব উপলব্ধি করতে পারতেন,—এবং কথাও বলতেন সেইভাবের। ফলে এমনি অপ্রিয় পরিণতি না হয়ে বেশ একটু রঙ্গ-রসেরই সৃষ্টি হতো। কিন্তু তিনি তন্ত্রের পণ্ডিত,—এই আত্মবিস্মৃত প্রেমাবেশ তাঁর ধারণার বাইরে। তিনি ছুটে পালিয়ে গিয়ে লোকের কাছে প্রচার করলেন,—নিমাই পণ্ডিত প্রকাণ্ড এক লাঠি নিয়ে তাঁকে মারতে এসেছিল। আজ নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতের হাতে একটা ব্রহ্মহত্যাই হয়ে যেতো। বহুভাগ্যে তিনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছেন।

এদিকে বাহ্যজ্ঞান ফিরতেই শ্রীগৌরাঙ্গ হাতের লাঠি ফেলে দিলেন,—কাতর

দৃষ্টিতে ভক্তদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ক্ষুব্ধকণ্ঠেই,—আমি কি অন্যায় করলাম ?

'না, না, কিছু করনি!'—ভক্তরা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বললেন। কিন্তু বহির্চৈতন্য জাগতেই একটু দূরে আগমবাগীশকে পালাতে দেখে, এবং নিজের হাতের লাঠির ওপর দৃষ্টি পড়তেই স্বীয় কৃতকর্ম সম্বন্ধে নিমাইয়ের যেন কিছুটা ধারণা হয়েছিল। কাজেই ভক্তরা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেও—তাঁর স্বর্ণোজ্জ্বল মুখখানি নিমেষে অঙ্গারের মতই মলিন হয়ে উঠলো নিবিড় বিষাদে,—একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন,—'হায়, হায়, কফ নিবারণের জন্যে পিপ্পলী চূর্ণ সেবন করলাম,—কিন্তু কফ না কমে বৃদ্ধিই পেয়ে গেল।' আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো তাঁর নাক দিয়ে। অনুতাপে তাঁর অন্তর তখন জ্বলে যাচ্ছে। প্রভুর ম্লানমুখ দেখে ভক্তদের মুখগুলিও বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো!.........

এদিকে তখন নিমাই পণ্ডিত আগমবাগীশকে লাঠি নিয়ে মারতে এসেছেন শুনে,—আগমবাগীশের অনুরাগী কয়েকজন ষণ্ডষণ্ডা লোক রাগে ফুলে ফুলে উঠছে—শচীর বেটা আবার অবতার সেজে বসেছে! অকালকুষ্মাণ্ড কতকগুলো ভক্ত জুটেছে, তারা নানা জিনিষ এনে পুরে দিচ্ছে ঘরে,—পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে,—আর গায়ে জোর করছে।—কত জোর হয়েছে, এবার দেখে নেবো। মারের চোটে ভূত ভাগিয়ে দেব একেবারে,—ফলে যাবে অবতার-গিরি। ইস! যেন উনিই নদীয়ার মালিক হয়ে গেছেন আর কি!

সত্য-সত্যই তাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গকে মারবার যুক্তি করতে লাগলো। ঐ দীর্ঘকায়, বিশাল বাহু,—সরল মানুষটির মধ্যে ফুলের মত কোমল একটি মন—এবং সেই মন সর্বদা কিসের তরঙ্গে হাবুডবু খাচ্ছে,—একথা কেই-বা বুঝে দেখে?—যারা তাঁর সোনার অঙ্গে প্রহারের কল্পনা করতে পারে,—তাদের কাছে তো কোন বোধশক্তির আশা করাই ভুল! যেখানে আগমবাগীশের মত লোক ভুল করে বসেন,—সেখানে ঐ সব মূর্খের দল আর কি বুঝবে?

কথাটা এসে পেঁছিল শ্রীগৌরাঙ্গের কানে। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে কি যেন ভেবে তিনি গাঢ় স্বরে ডাকলেন নিত্যানন্দকে,—শ্রীপাদ!

প্রভু!—নিত্যানন্দ এসে দাঁড়ালেন গৌরহরির সম্মুখে। শ্রীগৌরাঙ্গ বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন,—শুনেছ?—একদল লোক আমাকে মারবার ষড়যন্ত্র করছে?

নিত্যানন্দও শুনেছিলেন—সে কথা। তিনি কোন উত্তর না দিয়ে নত মুখে দাঁড়িয়ে থাকলেন চুপ করে।—"শোন, শ্রীপাদ," শ্রীগৌরাঙ্গ বললেন—কণ্ঠে বাষ্পের আবেগ,—আমি তোমাদের নিয়ে সংসারে থেকে হরিনাম করে—সুখে এবং আনন্দেই দিন কাটাছিলাম।—এবং তোমরাও আমাকে নিয়ে তৃপ্ত

পেয়েছিলে। মনে করেছিলাম,—এইভাবে আমি সংসারে থাকলে,—সকলে আনন্দে থাক্‌বে,—জীবও হরিনাম গ্রহণ করে উদ্ধার পাবে। কিন্তু এখন বুঝছি,—আমার ভুল হয়েছে। আমার এ সুখ-আনন্দ জীবের কাম্য নয়,—আমার চোখে দুঃখের অশ্রু না ঝরলে,—কেউ হরিনাম গ্রহণ করবে না। তাই যদি হলো,—তবে কেন, আমার এ সংসার-সুখ? কেন, আমার এ বাহ্য-বিলাস? আমি তো আমার জন্যে আসিনি,—এসেছি জীবের জন্যে। তাদেরই কল্যাণে।

—ব্যাকুলকণ্ঠে বলে উঠলেন নিত্যানন্দ,—'প্রভু, কি বলছো, ঠিক বুঝতে পারছি না। যা বলবে একটু খুলে বল।

'ঠিকই বলছি শ্রীপাদ!'—শ্রীগৌরাঙ্গ বিমর্ষকণ্ঠে বললেন—"আমাকে এ সংসার-সুখ বিসর্জন দিতে হবে। আমাকে যারা মারবার ষড়যন্ত্র করছে,—তাদের আমি জানি। আমি নিঃস্ব-নিঃসম্বল হয়ে কৌপীন পরে—হাতে করোয়া নিয়ে তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা চাইবো,—আমার সুখ তাদের সহ্য হলো না,—কিন্তু আমার দুঃখ দেখে—তাদের দয়া হবে। তখন তারা হরিনাম গ্রহণ করবে।—

"প্রভু, প্রভু, তবে কি তুমি সন্ন্যাস নেবে?"

"তাই তো বলছি শ্রীপাদ।"—গৌরাঙ্গ উত্তর দিলেন—'যদিও শুষ্ক সন্ন্যাস-ধর্মের প্রতি আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই;—আমার প্রেমময় ঠাকুর রসের নিধি, রসের সাগর,—তাঁকে পেতে হলে নীরস সন্ন্যাসেরও কোন দরকার নেই,—তবু জীবের তৃপ্তির জন্যে—তাদের কণ্ঠে—হরিনাম দেবার জন্যে—আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে।—তোমরা তো জান শ্রীপাদ,—সংসারে থেকেও আমি সংসারে নেই,—সর্বদা মেতে আছি তোমাদের সঙ্গে সংকীর্তনে। মা আমার সঙ্গে দুটো কথা বলে-ও সান্ত্বনা পান না,—বিষ্ণুপ্রিয়া ক্বচিৎ আমার দেখা পায়,—কিন্তু মানুষ আমার বা'রটা দেখলে, ভেতরের সন্ধান করলে না।...দুঃখে দীনতায় আমার চোখে জল পড়বে,—আমার জন্যে আমার মা কাঁদবেন,—বিষ্ণু-প্রিয়া কাঁদবে,—তোমরা আমার 'একান্ত আপনার জন'—তোমরাও কাঁদবে;—তবেই না—আমাদের সকলের চোখে জল দেখে—জীবের চোখেও জল আস্‌বে,—

আবেগে কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।—নিত্যানন্দের চোখেও তখন জল টলটল করছে। গৌরাঙ্গ নিজেকে সংযত করে আবার বললেন,—নিজে না কাঁদলে,—অন্যে কাঁদে না শ্রীপাদ। আমার এ—মোহন বেশ, এ বাহ্য-বিলাস ভক্তের ভাল লাগতে পারে,—কিন্তু সাধারণ জীব তো এ চায় না! আমাকে ছেড়ে তোমাদের খুবই কষ্ট হবে,—জানি,—কিন্তু আমাকে জীব-উদ্ধারে সাহায্য করতে—তোমাদের সে কষ্ট সহ্য করতেই হবে ভাই। তোমরাই তো আমার শক্তি। শোন, তুমি সাক্ষী থাকলে,—সাক্ষী থাকলেন—মাথার ওপর ঐ চন্দ্র-

সূর্য;—জীবের জন্যই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করবো। জীবের তৃপ্তিতেই আমার তৃপ্তি।

'প্রভু, প্রভু!'—হু হু করে কেঁদে ফেললেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ।—'কেন কাতর হচ্ছ শ্রীপাদ,"—গৌরাঙ্গ সংযত অথচ ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বললেন,—'তুমি স্থির না থাকলে যে কিছুই হবে না। তুমি আছ, শ্রীঅদ্বৈত আছেন, শ্রীবাস আছেন, হরিদাস আছেন,—তাই তো আমি এ গুরুভার বহনে শক্তি পাচ্ছি। আমাদের পরস্পর অন্তরে অন্তরে—থাকবে অবিচ্ছেদ্য মিলন,—বিচ্ছেদ শুধু লৌকিক,—এবং লোক-কল্যাণেই।'

'কিন্তু প্রভু,'—বৃদ্ধা জননী, কিশোরী 'বধূমাতা'—এদের মর্মান্তিক দুঃখের কথাও তো ভাবতে হয়!' গভীর দুঃখেই বললেন নিত্যানন্দ।—গৌরাঙ্গ বললেন,—'তাই তো, নির্লিপ্ত থেকেও সংসারে ছিলাম ভাই! তাঁদের যে আমি একদণ্ডও অন্তর থেকে দূরে ঠেলতে পারি না। আহা, বৃদ্ধা মা আমার,—এ-বয়সে আমিই তাঁর অবলম্বন,—শুধু অবলম্বন, নয়—আমিই তাঁর জীবন! কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়া,—কণ্ঠ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো তাঁর,—"না, আর ও'দের কথা তুলবো না,—সে কথা ভাবতে গেলে,—জীবের দশা কি-হবে? ও'রা আমার অন্তরেই থাকুন।—আর আমার স্থলে তোমরাই হবে তাঁদের সান্ত্বনার স্থল। আমার এ-জীব-উদ্ধার-যাত্রায় দুঃখের আগুনে পুড়ে—তাঁদেরও যে আমাকে শক্তি যোগাতে হবে শ্রীপাদ! নইলে কি আমি পারবো? চেয়ে দেখ শ্রীপাদ, মানুষে মানুষে কত ভেদ। এক হরিনাম মন্ত্রেই ভেদাভেদ ভুলে যাবে সকলে! মানুষ মানুষকে চিনবে শুধু মানুষ বলে। মহান একত্বের মাঝেই নেমে আসবেন ভগবান তাঁর অনন্ত শক্তি নিয়ে। মানুষ পাবে মুক্তির পথ।'

হঠাৎ কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে এলো তাঁর।—'কোনরূপে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বললেন,—কিন্তু ব্যস্ত হয়ো না, নিত্যানন্দ, আমি কিছু এক্ষুনি সংসার ত্যাগ করছি না। সকলের মন স্থির শান্ত না করে—আমি কোথাও যাবো না। আমিই কি সহজে তোমাদের ছেড়ে যেতে পারি ভাই?

নিত্যানন্দ এবার যেন কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। ভাবলেন, তাহলে প্রভুর মনের গতি-পরিবর্তনের এখনও সময় আছে। তাছাড়া, এ-ও ভাবলেন,—তিনি স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র পুরুষ। ধর্ম-স্থাপনের জন্যেই তাঁর এ-অবতরণ। যদি নিজের কার্যোদ্ধারের জন্য তিনি সংসার ত্যাগ আবশ্যক মনে করেন,—তবে তাঁকে বাধা দেবে,—এত বড় শক্তি জগতে কার আছে? না, কারো নেই!

৪৬

'বাছা নিমাই?'—ধীরে ধীরে শচীদেবী এসে বসলেন ছেলের পাশে। মুখখানি কি যেন চিন্তায় মলিন,—কণ্ঠেও বেজে উঠলো বিষণ্ণতার সুর। নিমাই ছিলেন তখন সহজভাবেই,— সাগ্রহে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, —কি বলছো, মা!

'সেদিন ভারতীঠাকুর কি জন্যে এসেছিলেন বাবা?'—দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো শচীদেবীর,—'তাঁকে অত খাতির-যত্নই বা করলে কেন?'—কেমন যেন একটা সন্দেহের ছায়াও ফুটে উঠলো তাঁর দৃষ্টির মধ্যে। মৃদু হাসলেন নিমাই। মায়ের দুর্বলতা কোথায়,—বুঝতে দেরী হয়নি তাঁর।—বললেন সান্ত্বনার সুরেই. —"ভারতীঠাকুর পরমভক্ত মা, তাই তাঁর সম্মান করেছি। কিন্তু কেন মা,—কি দোষ হয়েছে তাতে?"

দোষ যে কি-হোয়েছে,—তা শচী কিভাবে বোঝাবেন ছেলেকে—তবে যেদিন তিনি ভারতীকে বাড়িতে আসতে দেখেছেন,—সেদিন থেকেই তাঁর মনে আর শান্তি নেই। এমনিতেই তো নিমাইয়ের সংসার-বিমুখ মন—শচীর পরিপূর্ণ সংসারের মধ্যেও—তাঁর প্রাণে বিরাট শূন্যতা জাগিয়ে তুলেছে,—তবু নিমাই সংসারেই আছেন,—এই তাঁর পরম শান্তি—চরম সান্ত্বনা! কিন্তু সে-ও যদি কোন দিন বিশ্বরূপের মত—না, না, কথাটা আর ভাবতেও পারেন না শচী। জোর করে বাধা দেন সে অশুভ চিন্তা স্রোতের মুখে।

নিমাইকে সংসার-বন্ধনে বেঁধে রাখতে শচীদেবীর কি—প্রাণ-ঢালা প্রয়াস! —তাঁর সংসারে আজ আর কোনদিকে কোন অভাব নেই। ঐশ্বর্য যেন উথলে উঠছে চারিদিকে। কতদিক থেকে কতলোক যে—তাঁর ছেলের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার আকর্ষণে—কত দ্রব্যই ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে তাঁর ঘরে,—কে তাঁর হিসাব রাখে?—পুত্রের চতুর্দ্দিকেই বিলাসের উপকরণ ছড়িয়ে রেখেছেন শচী। তাঁর শয়ন-কক্ষ সাজিয়ে দিয়েছেন,—নানাবিধ মনোহর বিলাস দ্রব্যে। পালঙ্কের ওপর পুষ্পকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা রচনা করে দিয়েছেন—ছেলের জন্যে

স্বহস্তে। পাড়ার মেয়েদের—ডেকে এনে,—তাঁদের সাহায্যে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দিনান্তে দশবার তিনি—কত সুন্দর বেশভূষায়ই না সাজিয়ে দেন। নানা কাজে—ছল করে পাঠিয়ে দেন তিনি পুত্রবধূকে পুত্রের কাছে! তা' ছাড়া, আরও কতভাবে—কত কৌশলে বাৎসল্যপ্রেম-মুগ্ধা শঙ্কিতা জননী পুত্রকে বেঁধে রাখতে চান সংসারে,—সে কথা তাঁর অন্তরাত্মাই জানে। এমনি প্রয়াসই বুঝি একদিন করেছিলেন—কপিলবাস্তুর রাজা শুদ্ধোদন—তাঁর সংসার-বিমুখ পুত্র সিদ্ধার্থকে সংসার-বন্ধনে বেঁধে রাখতে। কিন্তু যেমন সিদ্ধার্থ-তেমনি নিমাই। দৃষ্টি তাঁর কোন দিকেই নেই! পালঙ্ক ছেড়ে গড়াগড়ি যান, তিনি মেঝের ওপর—চোখে অবিরাম-ধারা।

—কীর্তনের প্রতি শচীর আদৌ অনুরাগ নেই,—তার চেয়ে ঐ সময়টা নিমাই যদি বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে গল্প-গুজব করেন,—তাতে তিনি ঢের সুখী।—তবে—নিমাই কীর্তন ভালবাসেন,—তাই মুখ ফুটে তিনি বলতে পারেন না কিছু। নিমাইকে আজকাল নর-নারী-নির্বিশেষে অসংখ্য লোক দর্শন করতে আসে, দেবদর্শনের মত—সকালে ও সন্ধ্যায়। মূর্তিমান জীবন্ত দেব-বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-ঢলঢল করুণা-সুন্দর মুখখানির দিকে ক্ষণেকের জন্য চেয়েই—ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে ওঠে সকলে। ভক্তবা প্রভুর জয়নাদে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলেন। কণ্ঠে কণ্ঠে—প্রচারিত হয়—শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমাব কথা,—নদীয়া-অবতারের প্রেমের বাণী। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই ছুটে আসে প্রেমের ঠাকুরের কাছে,—সকলেই পেয়েছে সমান অধিকার,—পূত হরি-নাম প্রবল স্রোতের মত সবল বাঁধ ভেঙ্গে একাকার কবে দিয়েছে সকলকে।

শচীব মনে হয়,—এরা সকলেই যেন কেড়ে নিতে চায় তাঁর ছেলেকে তাঁব কোল থেকে। তাঁর একান্ত নিজস্ব অমূল্য ধন বুঝি হারিয়ে যায় সকলের মাঝে! অধিকতর ব্যাকুলতায় তিনি বুকে আঁকড়ে ধরতে চান—তাঁব জীবনেব জীবন নিমাইকে। ভারতীর আকস্মিক আগমন তাঁর সেই ব্যাকুলতাকে আরও আকুল করে তুলেছে,—তাঁর প্রাণের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে বিপুল উদ্বেগ। তবু পুত্রের কথার যে তিনি কি উত্তর দেবেন,—তা যেন ভেবেই পান না। শেষে বিভ্রান্তের মত বলে ওঠেন,—'বাছা, দোষগুণের কথা আমি কিছু জানি না,—কিন্তু দেখিস বাবা, আমাকে যেন ফাঁকি দিস না। তাহলে এই বুড়ো বয়সে—'

সহসা কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যায় তাঁর প্রবল বাষ্পের আবেগে,—ব্যগ্রভাবে নিমাই সান্ত্বনা দেন জননীকে,—'সে কি মা? তোমাকে ফাঁকি দেব কি?' পরক্ষণেই তাঁর কণ্ঠ ভারী হয়ে ওঠে কিসের বেদনায়,—'তবে কি জানো মা,—আমি ঠিক স্ববশে নেই—আমার কিছু করা না করা আমারই ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। বৃন্দাবনের সেই শ্যামসুন্দর দেবতার বাঁশী অবিরাম আমাকে আকুল করে

তুলছে। তবে এ-কথা ঠিক,—আমি যখন যা করি,—তোমার অনুমতি নিয়েই করবো,—তোমাকে না বলে আমি কোথাও যাবো না।

আগুনে জল পড়লো! নিমাইয়ের এত বড় আশা এবং আশ্বাসের পর আর যেন কোন চিন্তাই থাকলো না শচীর মনে। নিমাই মায়ের অনুমতি ছাড়া কিছু করবেন না,—কোথাও যাবেন না। তবে আর ভয় কি?—নিমাই নিজের ফাঁদে নিজেই পড়ছে।—আশ্বস্তচিত্তে শচী ভাবতে লাগলেন,—তিনি কি আর জীবন থাকতে কোনদিনই দেবেন,—নিমাইকে নবদ্বীপ ছেড়ে আর কোথাও একটি পা-ও যাবার অনুমতি? তাছাড়া, এমন অন্তরঙ্গ ভক্ত,—এমন কীর্তনের আনন্দ আর কোথায় মিলবে নিমাইয়ের? এ আকর্ষণও তো বড় কম নয় নিমাইয়ের পক্ষে?

মন আরও একটু শান্ত হলে শচী বললেন,—বাবা নিমাই,—আমি তোর কাছে একটা বিষয়ে বড় অপরাধী হয়ে আছি।

'তুমি অপরাধী?'—চমকে উঠলেন গৌরাঙ্গ,—'কি বললে মা,—আমি তোমার ছেলে,—তুমি আমার মা, আমার কাছে তোমার অপরাধ? না, না, মা, এমন কথা বলো না। আমিই তোমার কাছে চিরঋণী,—সহস্র অপরাধে অপরাধী। তুমি যাই কর,—যা মনে করেই কর,—আমার পক্ষে সবই তোমার আশীর্বাদ। যা হোক, এখন সে বিষয়টা কি বলো তো মা?

'বাবা.'—শচী তবুও কুণ্ঠিত কণ্ঠেই বললেন,—'তোমার দাদা সংসারত্যাগের আগে আমার হাতে একটি পুঁথি দিয়ে বলে,—নিমাই বড় হলে—তাকে দেবে। হায়, আমি কি তখন জানতুম—'

"কই—কই মা সে পুঁথি?"—ব্যাকুল হয়ে উঠলেন নিমাই সে পুঁথিখানির জন্যে,—মায়ের কথায় বাধা দিয়েই বললেন,—'আনো মা, এক্ষুনি, সে পুঁথি আমি দেখবো। আমার দাদার দান, মাথায় তুলে রাখবো।'

'কিন্তু বাছা',—শচীর কণ্ঠ কুণ্ঠার ভারে রুদ্ধ হয়ে আসে,—বহু চেষ্টাতেও সে কথা তিনি মুখে আনতে পারেন না,—এদিকে দাদার পুঁথির জন্যে নিমাই-য়ের ব্যগ্রতা বেড়ে যায়। উপায়ান্তর না দেখে শচী বলেন অপরাধিনীর মতই দারুণ কুণ্ঠায়,—বাবা নিমাই, বিশ্বরূপ আমাকে ফাঁকি দিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছে,—পাছে ঐ পুঁথির কালির আখরের মধ্যে সন্ন্যাসের কিছু লেখা থাকে,—আর তাই পড়ে তুইও আমাকে ফাঁকি দিস—এই ভয়ে—সে পুঁথিখানি আমি নষ্ট করে ফেলেছি বাবা। এখন যা অপরাধ হয়েছে—

আর বলতে পারলেন না তিনি। হু-হু করে কেঁদে ফেললেন; দুই শীর্ণ গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়লো তাঁর অজস্র বারিধারা।

'দাদার স্নেহের দান' পুঁথিখানি নষ্ট হয়েছে শুনে যদিও নিমাই মনে

[illegible] হয়েছিলেন,—তবু মায়ের কাতরতা এবং চোখের জল দেখে, তিনি মুহূর্তে সে ভাব সংবরণ করে ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন,—মা, মা, তুমি কেঁদো না! তুমি যা' করেছ,—তা' বাৎসল্যপ্রেমে অভিভূত হয়েই করেছ। তোমার এ মাতৃ-স্নেহের তুলনা নেই,—আমি ধন্য যে, এমন স্নেহময়ী মায়ের গর্ভে জন্মেছি। তুমি শান্ত হও। আমি সে পুঁথির জন্যে আর কোন দুঃখ করবো না।

পুত্রের আশ্বাসে এবার অনেকটা স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলেন শচীদেবী। কিন্তু আবার এক সন্দেহ পেয়ে বসলো তাঁকে। "আচ্ছা নিমাই,"—জিজ্ঞাসু ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি পুত্রের দিকে,—'তুই যে বললি,—তোমাকে না বলে কোথাও যাবো না',—তাহলে কি তুই কোথাও যাবি, বাবা?'

'হাঁ-মা'—নিমাই উত্তর দিলেন ধীর কণ্ঠেই,—'একবার কিছুদিনের জন্যে তীর্থভ্রমণে যাবো মনে করেছি।'

'সে-কি নিমাই!'—শচী যেন আতঙ্কিত হয়েই উঠলেন,—'এক পলক তোকে না দেখলে যে, থাকতে পারি না! কে জানে, সে কতদিন তুই তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবি! না, না, বাবা, আমি তোকে কোথাও যেতে দেবো না।'

'এখন থেকে অত অধৈর্য হয়ো না মা!'—মৃদু হেসে বললেন নিমাই,—'আমি যাবো, আমার এবং তোমাদের সকলের মঙ্গলের জন্যেই। তোমার চিন্তা কি মা?—শ্রীকৃষ্ণ তোমার অন্তরে। তিনিই আমার অনুপস্থিতির সময় তোমার মনে শান্তি দেবেন। তাঁর কৃপা পেলে কি কোন দুঃখ থাকে মা?

নিমাই যে প্রকারান্তরে তাঁর গৃহ-ত্যাগেরই পূর্বাভাষ দিচ্ছেন,—সরলপ্রাণা জননী তা আদৌ বুঝতে পারলেন না। আপন মনের কথাই তিনি প্রাণ খুলে বললেন পুত্রের কাছে,—নিমাই, তুমি বল কৃষ্ণ আমার অন্তরে আছেন। কিন্তু কই, বাবা, আমি তো অন্তরে-বাইরে, ধারে পাশে,—শয়নে স্বপনে—আমার চারি-দিকে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাইনে। বাছা, তুমিই আমার নিমাই,—তুমিই আমার কৃষ্ণ—তুমিই আমার সব। যাই কর বাবা, আমাকে আর দুঃখ দিয়ো না।

অদম্য অশ্রু আর বাধা না মেনে শচীর দুই গণ্ড প্লাবিত করে তুললো। নিমাইয়ের চোখ দুটিও তখন ছলছল করছে। বুকে তাঁর গভীর আলোড়ন,—মনে তাঁর দুরপনেয় চিন্তা,—'এই মায়ের কাছে তাঁকে বিদায় নিতে হবে! উঃ, সে-কি মর্মান্তিক!

৪৭

কিন্তু আসল কথা বড় বেশি দিন চাপা থাকলো না। এর আগে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের কথা বলেছিলেন একমাত্র নিত্যানন্দের কাছে। ক্রমে ভক্তেরাও প্রায় সকলেই শুনলেন সে কথা। আচম্বিতে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো তাঁদের। ব্যাকুলচিত্তে ছুটে এসে—সকলে আর্তকণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীগৌরাঙ্গকে,—প্রভু, এ কি শুনছি?

ভক্তদের মনের অধীরতা বুঝে তাঁদের আশ্বস্ত করবার জন্যে বললেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—তোমরা এত অধৈর্য হচ্ছো কেন? জানোই তো আমার প্রাণ কৃষ্ণের জন্যে ব্যাকুল হয়েছে! তাই বৃন্দাবনে যাবো তাঁকেই খুঁজতে। আমি যে তাঁর বিরহ আর সহ্য করতে পারছি না ভাই!

দরদর জল ঝরে পড়লো দুটি পদ্মপলাশ চোখের কোণ বেয়ে।—ভক্তরা কিন্তু সমস্বরে—আকুলভাবে বলে উঠলেন,—তুমি যাকেই খুঁজতে যাও, আমাদের গতি কি হবে?—তোমাকে ছেড়ে আমরা কেউ বাঁচতে পারবো না। তোমার সেই কৃষ্ণকে যে আমরা তোমার মধ্যেই পেয়েছি!—প্রবল বাষ্পের আবেগে তাঁদের স্বর ভারী হয়ে উঠলো!

শ্রীগৌরাঙ্গ দেখলেন,—এ-ও এক দুশ্ছেদ্য বন্ধন!—এই 'মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ'—ভক্তগণের প্রাণের কাতর আবেদন অগ্রাহ্য করে,—তাঁদের চোখে অশ্রুর বন্যা বহিয়ে—সংসার ত্যাগ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়।—অথচ যেতেই হবে তাঁকে। প্রগাঢ়কণ্ঠে তিনি ভক্তদের সম্বোধন করে বললেন,—তোমরা কেন, ভুল বুঝছো? আমি যাচ্ছি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম অর্জন করতে। আমার অর্জিত রত্নের তোমরাও তো সমান অংশীদার। আমি ফিরে এসে সেই রত্ন তোমাদেরই সকলকে দেব।

কথা হচ্ছিল শ্রীবাসের বাড়িতে। অতি দুঃখে বলে উঠলেন শ্রীবাস অশ্রুজড়িত কণ্ঠে,—প্রভু, তুমি ফিরে এসে যাকে জীবন্ত দেখবে,—তোমার সেই

অর্জিত দ্রব্যের অংশ তাকেই দিও। আমাদের কাছে তুমি আর তোমার কৃষ্ণে কোন ভেদ নেই,—এর বেশি আর কিছুর দরকারও নেই আমাদের।

মুরারি বললেন,—'প্রভু, আজ যদি আমাদের বুকে এমনি দারুণ শেল হানারই ইচ্ছা ছিল তোমার,—তবে সেদিন আমার হাতের ছুরি কেন কেড়ে নিয়েছিল? এ আঘাতের চেয়ে, সে যে ঢের ভাল ছিল। প্রভু, নবদ্বীপ ছেড়ে কোথাও যেও না,—তোমার কৃষ্ণ সতত তোমার অন্তরেই আছেন,—ছলনা করে আমাদের আর ভোলাতে চেও না। তোমার অদর্শনে আমরা কেউই বাঁচতে পারবো না।

উদ্গত অশ্রু মুরারি আর কোন রকমেই রোধ করতে পারলেন না। উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠলেন তিনি শিশুর মত। "মুরারি, মুরারি",—দুই ব্যগ্র বাহু দিয়ে মুরারিকে বুকে জড়িয়ে প্রভু বললেন,—"তুমিও এমনি অধৈর্য হবে? আমার স্থলে তুমি শ্রীঅদ্বৈতকে অবলম্বন করো মুরারি,—তাঁর মধ্যে আছে আমারই সত্তা,—আমার বিরহ তুমি সহ্য করতে পারবে অদ্বৈতকে আশ্রয় করে।"—তারপর যেন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, এইভাবে বললেন,—মুরারি, তুমি তো পরম পণ্ডিত মানুষ,—আমার একটা প্রশ্নের সমাধান করে দেবে ভাই?

"প্রভু, কি সে প্রশ্ন,—যার সমাধান তুমি করতে পারছো না?"

'শোনো মুরারি'—গৌরাঙ্গ সহসা কেমন যেন অধীর হয়ে উঠলেন,—আমি স্বপ্ন দেখেছি—কে যেন আমাকে বলছে,—"তুমিই তিনি!" মুরারি সেই থেকে আমার মনের সকল শান্তি—সকল আনন্দ যেন কোথায় চলে গেছে। 'আমিই যদি তিনি হব',—গাঢ় হয়ে উঠলো তাঁর স্বর,—'তাহলে কেমন করে সেই অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমসুধার স্বাদ পাবো মুরারি? আমি যে তাঁর বিরহেই আকুল! কালিন্দীর কূলে কূলে তাঁকে খুজবো আমি। আমার সেই কৃষ্ণ,—আমার সেই বংশীবয়ান শ্যামসুন্দর,—আমার মন-প্রাণ-দেহ,—আমার চিন্তা-ধ্যান-ধারণা,—আমার সর্বস্ব,—তিনিই যদি আমি' হবো,—তবে আর জীবনে আমার কি সুখ মুরারি?—'আমি যে-সেই—'

আর বলতে পারলেন না। উচ্ছ্বসিতভাবেই কেঁদে উঠলেন কৃষ্ণ-বিরহে সন্তাপিতা রাধার মতই। মুরারি বললেন ব্যগ্রকণ্ঠে,—প্রভু, কাঁদবেন না,—আপনার চোখে জল দেখতে পারছি না। আপনি ওই স্বপ্নের 'তিনি' শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তি করে নিন। তবেই দেখবেন,—যা আপনি চান,—

'ঠিক, ঠিক, বলেছ মুরারি!'—সহসা আত্মহারা আনন্দে বিহ্বল হয়ে বলে উঠলেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—'আমি তাঁর, আমি তাঁর, আমি তাঁরই।'

ও-দিকে অভিমানে দু'চোখ জলে ভরে উঠেছিল নিত্যানন্দের। আহত

কণ্ঠে তিনি বললেন,—'আর চতুরালী কেন প্রভু? তোমার ও-সব চাতুরী বেশ বোঝা আছে আমার। তুমি স্বেচ্ছাময়, স্বেচ্ছাগতি,—তোমাকে বাধা দেবে কে? আমাদের প্রাণের বেদনা কবে বেজেছে তোমার নিষ্ঠুর প্রাণে?

'শ্রীপাদ!'—কাতর নয়নে চাইলেন শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের পানে,—'তুমিও না বুঝে আমাকে আঘাত দেবে? তোমায় তো সবই বলেছি শ্রীপাদ! আমার প্রাণ কাঁদছে জীবের দুঃখে,—প্রেমময় হরি আমাকে ডাকছেন আকুল-করা স্বরে, —আমি কি স্থির থাকতে পারি শ্রীপাদ!"

দুঃখের আবেগে নিত্যানন্দ আর কিছু বলতে পারলেন না। কিন্তু একে একে ভক্ত হরিদাস, মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতি সকলেই নিজের নিজের প্রাণের বেদনা প্রভুর চরণে নিবেদন করে,—দৃঢ় সংকল্প থেকে বিচ্যুত করবার চেষ্টা করলেন তাঁকে। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাণের আবেগে ডেকে বললেন সকলকে,—'আমার কাছে তোমাদের এত আকুতির তো কোন দরকার নেই। আমি তো সাধ করে তোমাদের অন্তরে ব্যথা দিচ্ছি না! আমার এ দেহ—এ প্রাণ তোমাদের। প্রেমের মূল্যে তোমরা সকলেই আমাকে কিনে নিয়েছ। আমাকে নিয়ে তোমরা তোমাদের যা সাধ যায়,—করতে পার। আমারও সাধ্য নেই,—তাতে বাধা দিই। কিন্তু তোমরা যদি আমাকে ছেড়ে না দাও,—তাহলে আমার দেহে আর প্রাণ থাকবে না। যদি আমার মঙ্গল চাও, আমার দেহে প্রাণ থাক,—এই যদি তোমাদের কাম্য হয়,—তবে আমাকে অনুমতি দাও,—আমি আমার কৃষ্ণ-অন্বেষণে যাত্রা করি। আমি তো তোমাদের কাউকে ছেড়ে যাচ্ছি না,—সর্বদা তোমাদেরই কাছে কাছে থাকবো। যে কৃষ্ণকে মনে প্রাণে ভজনা করবে,—সেই প্রতি মুহূর্ত আমার সান্নিধ্য লাভ করবে। যখন তোমরা সংকীর্তন করবে,—তখনও দেখবে —আমি তোমাদের মধ্যে আছি। তাছাড়া, আমি নিরুদ্দিষ্ট হয়ে এমন কোথাও চলে যাবো না,—যেখানে তোমরা যেতে পারবে না। ইচ্ছে হলেই তোমরা আমার কাছে যেতে পারবে—আমিও আসবো তোমাদের কাছে। আমাদের মধ্যে কি কোনদিন বিচ্ছেদ আছে?—জীব কাঁদছে,—আমার কৃষ্ণ আমাকে মুহুর্মুহু ডাকছেন,—আমি আর এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারছি না। তোমরা আমাকে এত ভালবাস',—তবু কি তোমরা আমাকে ধরে রাখবে ভাই?"

বলতে বলতে তাঁর স্বর যেন ভেঙ্গে পড়লো গভীর বেদনায়। কি ছিল সেই স্বরে,—ভক্তেরা আর কেউ না বলতে পারলেন না। শ্রীবাস বললেন,— প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তুমি যদি আনন্দ পাও,—আমরা তোমার জন্য দুর্বিষহ বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করবো। প্রতি কার্যে পালন করবো তোমার নির্দেশ প্রাণপণ নিষ্ঠায়। কিন্তু প্রভু, শুধু এই কৃপাটুকু করো,—যেন আমা-

দের ইচ্ছা হলেই তোমার ঐ প্রেম-সুন্দর মুখখানি দেখতে পাই। তা'ছাড়া, আরও একটি প্রার্থনা আছে।

'বল, বল পণ্ডিত!'—শ্রীগৌরাঙ্গ বিহ্বলকণ্ঠে বললেন,—'আর কি চাও তোমরা।'

'প্রভু'—করযোড়ে বললেন শ্রীবাস,—'এখন আরও কিছুদিন নবদ্বীপে থেকে তুমি আমাদের সকলের,—শচীমাতার এবং বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের সাধ পূর্ণ কর।'

'তাই হবে, তাই হবে পণ্ডিত।'—শ্রীগৌরাঙ্গ আবার বললেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে,—"আমি তোমাদের সকলের সাধ পূর্ণ করেই নবদ্বীপ ত্যাগ করবো।"

৪৮

নিমাইয়ের চিন্তায় এক পলক-ও কিন্তু শান্তি ছিল না শচীর মনে। নিমাই তাঁকে যত আশা-আশ্বাসই দিন,—তাঁর সংসার-বিমুখতার কথা ভাবলেই শচী অস্থির হয়ে ওঠেন। এদিকে নিমাইয়ের গৃহত্যাগের কথা ভক্তদের কাছে প্রচার হওয়ায় সাধারণ দু'চার জনের কানেও এলো তার আভাষ। কথাটা নিয়ে এখানে-ওখানে গুঞ্জন উঠতেই ব্যাকুলচিত্তে ছুটে এলেন শচী ছেলের কাছে,—'নিমাই, তবে যে কি শুনছি?'—

চমকে উঠে নিমাই চাইলেন মায়ের দিকে। মায়ের জিজ্ঞাস্য কি, বুঝতে বাকী থাকলো না তাঁর! ছেষট্টি-সাতষট্টি বৎসরের বৃদ্ধা—অশ্রুনেত্রা, শীর্ণা-দেহা জননীর কাতর মুখখানির ওপর দৃষ্টি পড়তেই নিমাই মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়লেন শিশুর মত। যে শক্তিতে তিনি একদিন বলেছিলেন,—'তোমার অনুমতি ছাড়া কিছু করবো না মা',—মায়ের দিকে চাইতেই সে-শক্তি যেন কোথায় তিরোহিত হয়ে গেল। তাঁর মনে হলো, এই মা-ই তাঁর গতি—মুক্তি!—এই মা-ই তাঁর জীবধাত্রী-জগজ্জননী শক্তি। এই মাকে ছেড়ে কোথাও একটি পা-ও যাবার কল্পনাও বুঝি তাঁর মূঢ়তা!

—কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর চোখের ওপর ভেসে উঠলো,—বাঁশরী হাতে সেই

শ্যামলবরণ পীতাম্বর-পরিহিত শিশুমূর্তি! অমনি তাঁর বুকে আবার যেন কিছু শক্তির সঞ্চার হলো। যথাসম্ভব দৃঢ় করে তুললেন তিনি নিজেকে। যেতেই যখন হবে তাঁকে,—তখন আর মা-কে দ্বন্দ্ব-দ্বিধার মধ্যে ফেলে রেখে লাভ কি? মায়ের অনুমতি নেবার এই তো সুযোগ! 'মা',—কাতর দৃষ্টি মায়ের মুখের ওপর নিবদ্ধ করে,—ক্ষুব্ধ গভীর স্বরে বললেন নিমাই,—"আমার অপরাধ ক্ষমা কর। মা, তুমি বৃদ্ধ, শোক-সন্তপ্ত,—একমাত্র আমার মুখের দিকে চেয়েই বেঁচে আছ। কি নিবিড় অফুরন্ত স্নেহে তুমি আমায় পালন করেছ,—কত প্রগাঢ় মমতায় সর্বদাই ঘিরে আছ আমাকে,—তা আমি মর্মে মর্মেই বুঝি! কিন্তু মা,—'তাঁর স্বর আরও গাঢ় হয়ে উঠ্‌লো,—সত্যই আমি তোমার অধম পুত্র। তোমার সেবা করি, এভাগ্য নিয়ে আমি জন্মিনি মা! তবে অনেকেরই তো অক্ষম—অকর্মণ্য পুত্র জন্মে,—আমিও মা, তোমার তেমনি—

'ওরে—ওরে নিমাই',—শচী সহসা অধৈর্য হয়ে কেঁদে উঠলেন উচ্ছ্বসিত-ভাবে,—'ও-সব কি বলছিস্ তুই? তুই আমার নবদ্বীপ আলো করা ছেলে,—তুই আমার লক্ষ তারার এক চাঁদ,—নিতান্তই কি মা-কে মারবার ইচ্ছা হয়েছে তোর?'

'শান্ত হও মা, শান্ত হও।'—প্রাণঢালা মমতায় মায়ের চোখ দুটি মুছে দিয়ে বললেন নিমাই,—'তোমার এই বয়সে আমি যখন তোমার কোন কাজেই লাগলাম না,—তোমার একটি ফোঁটা স্তন্যেরও ঋণ শোধ করতে পারলাম না,—তখন আমি তোমার বৃথা পুত্র ছাড়া আর কি? কিন্তু মা, কি করবো আমি?—আমি তো আর আমার নিজের নেই,—আমার মন-প্রাণ সবই কেড়ে নিয়েছে আমার কৃষ্ণ—আমার সেই ব্রজরমণ! কোন মতেই ঘরে আর টিকতে পারছি না। আমাকে মুহুর্মুহু সব ভুলিয়ে দিচ্ছে তাঁরই বাঁশরীর তান। তাঁকে খুঁজতে আমি সর্বস্বত্যাগ করে—সন্ন্যাস নিয়ে বৃন্দাবনে যাবো,—তুমি স্বচ্ছন্দে অনুমতি দাও মা,—এতে আমার মঙ্গলই হবে।

বৃন্দাবনের নামে দুই চোখে যেন বান ডাকলো শ্রীগৌরাঙ্গের। শচীর মুখে কিন্তু কোন কথা ফুটলো না। স্থানুর মত নিশ্চল বিমূঢ় ভাবে উদ্‌ভ্রান্ত নেত্রে চেয়ে থাকলেন তিনি—গৌর-সুন্দরের অশ্রু-লাঞ্ছিত বেদনা-মধুর মুখ-খানির দিকে। শ্রীগৌরাঙ্গ আবার বললেন,—মা, এ জন্ম আমি কাঁদতে—এবং সকলকে কাঁদাতেই এসেছি! আমি কাঁদবো,—আমার দুঃখে তোমরা কাঁদবে,—আমাদের সেই চোখের জলে পাষাণ গলবে। তবেই আমি বৃন্দাবন-চন্দ্রের প্রেম লাভ করবো।—তখন জীবও আমার কাছে হরিনাম নিয়ে উদ্ধার পাবে। এতবড় কাজে—তোমরাও আমাকে শক্তি না দিলে,—কোথায় আমি শক্তি পাবো মা!

ভাবের আবেগে এমনি কত কথাই বলে গেলেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

কিন্তু তবু শচী তেমনি স্তম্ভিতের মত চেয়ে আছেন ছেলের মুখের দিকে। যেন দেহ থেকে প্রাণ চলে গেছে তাঁর! অথবা বাহ্যজ্ঞান তাঁর একেবারে নেই। নিমাইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে ডুবে গেছেন তিনি নিমাইয়ের মধ্যেই। শ্রীগৌরাঙ্গ আবার তাঁর একখানি হাত ধরে বললেন,—মা, কথা কও, তুমি তো আমার মঙ্গলেই জীবন পাত করেছ,—আমার কল্যাণ-চেষ্টাই তো তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তবে যদি আমি এ-পথে সুখ ও আনন্দ পাই,—যদি এতে আমার কল্যাণ হয়,—জীবের কল্যাণ হয়, তবে কেন মা তোমার অনুমতি আমি পাবো না। তুমি তো আমার সে-মা নও মা!

কি আবেগ সে স্বরে! কার আকুল আবেদন প্রবেশ করলো শচীদেবীর অন্তঃকর্ণে? তাঁর মর্ম যেন আলোড়িত হয়ে উঠলো! সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠে চাইলেন তিনি নিমাইয়ের মুখের দিকে।—সে মুখখানি ভরে তখন কি-এক অলৌকিক দীপ্তি ফুটে উঠেছে! শচী বললেন,—আচ্ছন্নের মত,—'নিমাই',—স্বরে বাষ্পের আবেগ,—'তুমি সন্ন্যাস নিয়ে কৃষ্ণ-অন্বেষণে যাত্রা করলে তোমার মঙ্গল হবে? জীব উদ্ধার পাবে?—সেই তোমার জীবনের সুখ—সেই তোমার আনন্দ?

'মা, মা, সত্যিই তাই!'—আগ্রহ-চঞ্চল কণ্ঠে বলে উঠলেন নিমাই,—'কিন্তু জোর করে আমাকে ঘরে আটকে রাখলে, আমার এ-দেহে বুঝি আর জীবনও থাকবে না।

"কি, কি বললি নিমাই?"—শচীর দৃষ্টি যেন শঙ্কায় আকুল হয়ে উঠলো! নিমাই তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন,—'ঠিক কথাই বলেছি, মা'। তাতে তুমি আমাকেও হারাবে,—আর কৃষ্ণকেও হারাবে। কিন্তু আমায় সন্ন্যাস নেবার অনুমতি দিলে—আমাকেও পাবে—কৃষ্ণকেও পাবে। উপকৃত জীবও তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

—"তবে—তবে নিমাই",—শচী সহসা ক্ষণেকের জন্য বিচলিত হয়ে উঠলেন; কিন্তু পরক্ষণেই আবার বাৎসল্যে অভিভূত হয়ে বললেন,—'কিন্তু হাঁ, নিমাই, সন্ন্যাসী হলে তো তোকে মাথা মুড়িয়ে কৌপীন পরতে হবে। হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু নিতে হবে? হায়, হায়, কেমন করে সে বেশ তোর দেখবো আমি?"—ঝরঝর জল গড়িয়ে পড়লো তাঁর দুই চোখে,—ওই চাঁচর কেশ,—ঐ সোনার অঙ্গ,—ওরে না, না, অত নিষ্ঠুর হোস না,—লোকের দোরে দোরে কেমন করে তুই ভিক্ষা চাইবি!—কি করে হাঁটবি নিমাই—পথে পথে? তোর পা দুটি যে ফুলের চেয়েও নরম!" সহসা আর এক চিন্তা এসে গেল তাঁর মাথায়—'আচ্ছা, হাঁ নিমাই—ভিক্ষা করে না হয় কিছু পেলি, কিন্তু কে তোকে রেঁধে দেবে?

কে তোকে বসে বসে খাওয়াবে?—খেতে খেতে কতবার যে তুই অচৈতন্য হয়ে পড়িস! হাঁ-রে,—কোথাও 'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ' বলে পথে-ঘাটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবি না তো?

আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না শচী।—হু-হু করে নিতান্ত শিশুর মতই কেঁদে ফেললেন উচ্ছ্বসিতভাবে। ও-দিকে নিমাইও যেন আর পারছিলেন না। তাঁরও বুকে যেন অশ্রু-সাগর উথলে উঠছিল। মায়ের কথার প্রতিটি শব্দে যে অসীম স্নেহ ঝরে পড়ছিল,—তার স্পর্শে অন্তরের অন্তঃতম স্থল পর্যন্ত আলোড়িত হয়ে উঠছিল তাঁর।

একটু সামলে নিয়ে শচীদেবী আবার বললেন,—কিন্তু নিমাই, তোর সুখের জন্যে—তুই যদি আনন্দ পাস, আমি না হয় দিবানিশি বুকের মাঝে তুষের আগুন জ্বালিয়ে রাখবো। ক'দিনই বা আর বাঁচবো আমি? কিন্তু বাছা. বৌমার কি হবে? সে বালিকা, তাকে কি বলে বোঝাবো বল দেখি? কেমন করে বাছা আমার এত বড় আঘাত সহ্য করবে? আহা, এখনও সে সংসারের কোন স্বাদই পায়নি। না, না, নিমাই, আমার দিন তো ফুরিয়েই এসেছে, কিন্তু তার ওপর এ-অবিচার করিস না বাবা!

"মা, মা, কেন তুমি তার জন্যে এত কাতর হচ্ছো?"—নিমাই ব্যাকুলভাবে অথচ সান্ত্বনার সুরেই বললেন,—তাঁকে কৃষ্ণভক্তি শেখাবে মা, কৃষ্ণ জগতের পতি,—তাঁর ভজনা করলে আমার বিচ্ছেদের ব্যথা তোমাদেব কারো বুকে বাজবে না মা! তোমরা দুজনে আমার কথা স্মরণ করে কৃষ্ণের সেবা করবে। আর তোমার বউমা আমার হয়ে তোমার সেবা করবে। এমনি করে আমাকে তোমরা দুজনেই অন্তবের মধ্যে পাবে,—আর তোমাদের প্রাণের আকর্ষণ আমার বুকেও তোমাদেব কথা জাগিয়ে রাখবে। এতো বিচ্ছেদ নয় মা.—এ যে অনন্ত মিলন! আর আমি তো তাকে আত্মসুখের জন্য ত্যাগ করছি না মা,—তাহলে হয়তো তার দুঃখের কারণ থাকতো। জীবের কল্যাণে—তুমি, আমি তোমার বৌমা,—তিনজনে একই যোগে একই কাজ যে করছি মা!

শচী কিন্তু কিছুতেই নিজের মনকে আয়ত্তে আনতে পারছেন না। বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্বন্ধে নিমাই যা বললেন,—তাও তাঁর মাথায় ঢুকলো না। বরং আগুনে যেন ঘৃতাহুতিই পড়লো। বিষ্ণুপ্রিয়ার কি এখন কৃষ্ণ-ভজনার বয়স? —না, তাকে প্রাণ ধরে যোগিনী সাজাতে পারেন শচী? উদ্গত অশ্রু বহুকষ্টে দমন করেই তিনি বললেন,—বাছা নিমাই, জীবের ওপর তোমার দয়ার যেন অন্ত নেই। কিন্তু আমি, বউমা, তোমার ভক্তরা,—এরা কি জীব নয় বাছা? এদের ওপর কি এতখানি নিষ্ঠুর না হলে তোমার কৃষ্ণ তোমার প্রতি সদয় হবেন না? জানি না বাবা, এ তোমার কেমন ধর্ম? বুড়ী মায়ের বুক ভেঙে

দিয়ে,—বৌকে অকূলে ভাসিয়ে ভক্তদের বুকে শেল হেনে,—তুমি যে কি পুণ্য অর্জন করবে, বাবা,—তা তুমিই জান!

একদিকে মর্মান্তিক দুঃখ,—অন্যদিকে প্রচণ্ড অভিমান যুগপৎ শচীকে অধীর করে তুললো! কিছুক্ষণ তিনি আর একটি কথাও বলতে পারলেন না। নিমাইও তখন যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর ভগবৎ-সত্তা তখন যেন দীন ভিক্ষুকের মত—জননীর অপার স্নেহের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ছে। তাঁর মনে হচ্ছে,—কাজ নেই আর সন্ন্যাস নিয়ে,—এমন মহীয়সী মমতাময়ী জননীর পবিত্র স্নেহের মধ্যে যদি ভগবান না থাকেন,—তবে তিনি আর থাকবেন কোথায়? জীবের দুঃখ কি—ঐ তপ্ত অশ্রুর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে না? এদিকে সহসা শচীর একটা কথা মনে পড়ে গেল। তিনি একেবারে ধৈর্যহারা হয়ে উঠলেন,—নিমাই, নিমাই, শুনেছি, সন্ন্যাসীদের মা-কে মা, বাবাকে বাবা বলতে নেই। তাহলে কি—তাহলে কি,—তুই আর আমাকে 'মা' বলবি না?—আমি কি তোকে ছেলে বলতে পাবো না। বল, বল বাছা,—সত্যি করে। লোকে তোকে 'ভগবান' বলে। কিন্তু বাছা, আমি তো তোকে "আমার নিমাই" ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। আমার কি সে সান্ত্বনা-টুকুও আর থাকবে না নিমাই?"—অন্তরের প্রতিটি অস্থি ভেঙে চুরমার করে—শচীর দুই চোখে এবার অশ্রু ঝরলো দর-বিগলিত-ধারে।

'মা, মা'—একান্ত অধীর হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলেন,—'এসব কি বলছো তুমি? তুমি আমার জন্ম-জন্মান্তরের—সর্বযুগের—সর্ব-কালের—সর্বমঙ্গলময়ী মা৷ 'তোমার নিমাই' চিরকালই তোমার নিমাই! চিরদিন তোমার কোলের সেই অসহায় শিশু! শচী-দুলালই—তার সর্বোত্তম পরিচয়! যে সন্ন্যাস তোমাকে 'মা' বলতে দেবে না—ধিক আমার সে সন্ন্যাসে! তুমি সর্বদাই আমার অন্তরে থাক্‌বে মা! তুমি যখন যা বলবে, তাই আমি করবো,—যেখানে থাকতে বলবে—সেইখানেই থাকবো।—শুধু কৃষ্ণ-ভজনার জন্যেই আমি একটু দূরে সরে যাচ্ছি! কি কর্‌বো মা,—আমি যে কিছুতেই মন স্থির করতে পারছি না,—নইলে কি ভুলেও তোমাকে তোমার এই বার্ধক্যে—এ দুঃখ দেবার কল্পনাও করতুম?

সহসা প্রবল বাষ্পাবেগে তাঁর স্বর প্রায় রুদ্ধ হয়ে এলো। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি আবার বললেন,—'আমি মাঝে মাঝে তোমাকে দেখতে আসবো মা,—এমন জায়গায় থাকবো,—যেখানে ভক্তরাও যেতে পারবেন,—প্রায়ই তুমি আমার সংবাদ পাবে। তাছাড়া মা,—তোমার যখনি আমাকে দেখতে সাধ যাবে,—তুমি দেখবে,—আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। জীবের কল্যাণে সন্ন্যাস নিচ্ছি বলে কি তোমার চরণেও আমাকে অপরাধী হতে

হবে মা? মা, তুমিই তো আমার শক্তি। এই যে আজ কৃষ্ণ-প্রেমের জন্য আকুল হয়েছি—এই যে আজ জীবের কল্যাণে তোমার থেকেও দূরে সরে যেতে পারছি, এই কল্যাণময়ী প্রেরণা,—এই সর্বাত্মিকা শক্তি কোথায় পেয়েছি মা?—সে তো তোমারই অসীম স্নেহের দান!

'কিন্তু বাবা,'—শচীর চিত্ত তখনও স্থির হয়নি,—এক-একবার মন আশ্বস্ত হয়ে আসছে,—আবার তখনই ব্যাকুল হয়ে উঠ্ছেন; বাষ্পাকুল স্বরেই তিনি বললেন,—আমার একটা কথা একবার বুঝে দেখ তো?

'কি কথা মা?'—সাগ্রহে চাইলেন নিমাই মায়ের মুখের দিকে।

শচী বললেন,—'তোমার যখন কল্যাণ হবে বলছো,—তখন আমি কি তোমাকে সে পথে বাধা দিতে পারি? কিন্তু বয়স তোমার নিতান্ত অল্প,—এ তো সন্ন্যাসের বয়স নয় বাবা। আর দু'চার বছর পরে,—কিম্বা আমি মরলে,—আমারও তো আর বেশি দিন নেই বাবা,—সন্ন্যাস নিলে কি তোমার কোন অনিষ্ট হবে? আমি ঘরের মধ্যে 'আরামে' থাকবো, আর তুই ডোর-কৌপীন পরে পথে পথে ভিক্ষা চেয়ে বেড়াবি,—এ যে আমি ভাবতেও পারছি না বাবা!

আবার তাঁর দুই গণ্ড প্লাবিত করে অশ্রু ঝরে পড়লো দরদর করে। নিমাই আর্তকণ্ঠে বললেন,—মা, মা, কেঁদো না! আমি যদি স্ব-বশে থাকতাম,—তা'হলে কি আর এখনও এমনি বসে বসে তোমার এই মর্মান্তিক দুঃখ সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু তবু থাক মা, আমার যত কষ্টই হোক,—আমি নিজেকে প্রাণপণে দমন করবো,—যে-কোন অকল্যাণই আমার আসুক,—তা' আমি বরণ করে নেব,—তবু তোমাকে এমনি করে কাঁদিয়ে আর আমি কোথাও এক-পা-ও যাবো না। আমার সন্ন্যাসে আর কাজ নেই!

'না, না, নিমাই,'—দীর্ণকণ্ঠে অন্তরের সমগ্র শক্তি সঞ্চয় করে বলে উঠলেন শচী,—তোর কষ্ট, তোর অকল্যাণ আমি হতে দেবো না। সে আমি জীবন থাকতে পারবো না। আমি স্বচ্ছন্দে অনুমতি দিচ্ছি,—তোর যদি সন্ন্যাসেই সুখ,—সন্ন্যাসেই আনন্দ,—তবে তুই সন্ন্যাস নে।—কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন একেবারে শক্তিহীন হয়ে এলিয়ে পড়লো,—"নিমাই, নিমাই" আবার ডাকলেন তিনি নির্জীব আচ্ছন্নের মত!—'মা, মা!' 'নিমাইয়ের মুখ ঝুঁকে পড়লো মায়ের মুখের ওপর।—"কি করলুম আমি?—হায়, কি করলুম! নিজের হাতে তোকে কৌপীন তুলে দিলাম নিমাই!"—শচী কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লেন! নিমাই মায়ের গলা আঁকড়ে ধরে বললেন,—"মা, স্থির হও, তুমি নয়, তোমার মুখ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণই এ অনুমতি দিয়েছেন। এতে আমার মঙ্গল,—তোমার মঙ্গল—জগতেরও মঙ্গল হবে মা।"

'কিন্তু নিমাই',—শচীর যেন একটা দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটেছে,—"আমার

একটা কথা রাখবি বাবা?"—আকুল নেত্রে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বললেন স্নেহাতুরা জননী,—"অন্ততঃ কিছুদিনও ঘরকন্না করে আমার সাধ মেটাবি? বিষ্ণুপ্রিয়ার যে কোন সাধই পুরেনি বাছা!"

—'তাই হবে মা, তাই হবে!'—মাকে প্রণাম করে নিমাই বললেন,—'তোমার আদেশই আমি পালন করবো। তুমি ভেবো না।"

শচী দুইব্যগ্র বাহু দিয়ে ছেলেকে বুকে চেপে ধরলেন। যেন আর জীবনেও তাঁকে বুক ছাড়া করবেন না।.........

৪৯

—কয়েকদিন হলো, বিষ্ণুপ্রিয়া এসেছেন পিত্রালয়ে। স্বামীর সম্বন্ধে নানা কথা তাঁরও কানে এসে পেঁছিল। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না সেখানে। আপনা থেকেই—বাপের বাড়ির লোক সঙ্গে করে ফিরে এলেন স্বামীগৃহে।

রাত্রে শয়ন-কক্ষে এসে তিনি দেখলেন, স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন শীত পড়েছে,—সর্বাঙ্গ লেপে ঢেকেই শুয়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। শুধু মুখখানি লেপের বাইরে আছে তাঁর। শিয়রের একটু দূরে উঁচু দীপদানের ওপর জ্বলছে মাটির প্রদীপ। তার মৃদু আলোক পড়েছে গৌরাঙ্গের মুখে। যেন সোনার ওপর পড়েছে আলোর ছটা। বিষ্ণুপ্রিয়া স্থির বিমুগ্ধ নেত্রে কিছুক্ষণের জন্যে চেয়ে থাকলেন সে অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানির দিকে। মহতের জন্য যে বেদনা তার একটি অনুপম মাধুর্য আছে। কৃষ্ণ-বিরহের-তাপে মলিন নিমাইয়ের মুখখানিও সেই মাধুর্যে পূর্ণ!

সহসা বিষ্ণুপ্রিয়ার চমক ভাঙ্গলো! এতক্ষণ ডুবেছিলেন তিনি যেন কোন্ সুধা-সমুদ্রে! স্বামীর ঘুম না ভাঙিয়ে তিনি ধীরে ধীরে পালঙ্কের ওপর উঠে বসলেন—তাঁর পদপ্রান্তে। অতি সন্তর্পণে লেপের মধ্যে হাত দুটি ঢুকিয়ে পদসেবা করতে লাগলেন জীবন-দেবতার! প্রগাঢ় প্রেম-পূত পুণ্য-মধুর করস্পর্শে একটু পরেই ঘুম ভাঙ্গলো শ্রীগৌরাঙ্গের। চকিতে চাইলেন

পদপ্রান্তে সেবারতা বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের দিকে। শুভ্রগণ্ডে দুটি পবিত্র অশ্রু-ধারা তখন দীপালোকের স্পর্শে চিকচিক করছে তাঁর।

'প্রিয়া, প্রিয়া!'—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যস্তভাবে উঠে বিষ্ণুপ্রিয়াকে টেনে নিলেন বুকে,—ও-কি,—কাঁদছো কেন তুমি? কতক্ষণ এসেছ? কেন আমার ঘুম ভাঙ্গাওনি?—সস্নেহে গণ্ডদুটি মুছে দিলেন তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার। বললেন আবেগেপূর্ণ স্বরে মৃদু হেসে,—ছি. এতদিন পরে কাছে এসে কি কাঁদতে আছে প্রিয়া? আমি যে তোমার হাসি মুখখানি দেখবার জন্যে আকুল হয়ে আছি।

স্বামীর এই সপ্রেম আদর-সোহাগ বিষ্ণুপ্রিয়ার পক্ষে একরূপ দুর্লভই বটে! তাই প্রেমের তাপে অন্তর গলে গেল তাঁর! দুটি ধারাব পরিবর্তে শতধারা বইতে লাগলো চোখে।—বড় মধুর—বড় সুখের এ-কান্না.—গৌরাঙ্গ যত নিষেধ করেন,—বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্নাব বেগ যেন ততই বেড়ে যায়! বহু অশ্রু-বিসর্জনের পর কমে এলো তাঁর প্রাণের আবেগ। তখন কোনরূপে মুখে কথা ফুটলো,—বললেন অশ্রু-জড়িত কণ্ঠেই.—"হাঁ-গো. কি সব শুনছি? তুমি না-কি—এই—এই—তোমার দাদা যা করেছেন,—তাই করবে? আমাদের ছেড়ে চলে যাবে তুমি?"

বুক ঠেলে আবার কান্না এলো তাঁর,—সন্ন্যাস কথাটা উচ্চারণ করতেও যেন কেমন শঙ্কা জাগলো, অন্তর কেঁদে উঠলো নিবিড় বেদনা-ভারে। বহু-কষ্টে মুখে একটু হাসি এনে বললেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—'কে তোমায় এসব কথা বললে প্রিয়া! ও মিছে কথা! এতদিন পরে এসেছ,—এখন কি ঐ সব কথা বলবার সময়? দেখ দেখি, আমি তোমাকে নিয়ে কত আনন্দ করবো ভেবে আকুল হয়ে আছি,—আর তুমি এসে শুধু শুধু কাঁদতে লাগলে?

তবে কি তিনি ভুল শুনেছেন? শ্রীগৌরাঙ্গের ছলনায় বিষ্ণুপ্রিয়ার মন যেন আশায় একবার দুলে উঠলো। কিন্তু কত মর্মান্তিক বেদনা বুকে চেপে স্বামী যে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, সরলা কিশোরী—সেই মিলন-মধুর মুহূর্তে তা উপলব্ধি করতে পারলেন না। তবু বললেন,—আমার দিব্যি, সত্যি কথা বল।

'সত্যিই তো বলছি প্রিয়া!'—শ্রীগৌরাঙ্গ পত্নীকে আরও একটু আদর করে বললেন.—তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী, অবিরত আছ আমার অন্তরে। তোমার সঙ্গে কি কখনো আমার বিচ্ছেদ হতে পারে?

এ-ও কোন ভাবের কথা,—বাক্যের ছলে স্বামী যে কি ইঙ্গিত করছেন,—তাও বুঝতে পারলেন না বিষ্ণুপ্রিয়া। স্বামীর আদরে গলে গিয়ে—একান্ত-ভাবে ঢলে পড়লেন তাঁর প্রশস্ত বুকের মধ্যে।.........

রাত্রি তখন তৃতীয় যাম অতিক্রম করেছে। সহসা ঘুম ভেঙে বিষ্ণুপ্রিয়া দেখলেন.—স্বামী বিছানায় বসে কাঁদছেন অঝোর ঝোরে। 'এ-কি? এ-কি?' —আকুলভাবে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন দীর্ণকণ্ঠে,—তুমি কাঁদ্‌ছো?—হাঁ-গো, বল বল, কেন কাঁদছো।

'কই কাঁদছি?'—তাড়াতাড়ি চোখ মুছে—মুখে কৃত্রিম হাসি এনে বললেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—'এই তো দিব্যি হাসছি!'

"ও-গো. আর আমায় ফাঁকি দিয়ো না!"—দুটি মৃণাল ভুজে আকুলভাবে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করে কেঁদে উঠলেন বিষ্ণুপ্রিয়া,—তোমার অন্তরের কথা আমায় খুলে বল।

'তাই তো বলবো প্রিয়া,'—শ্রীগৌরাঙ্গও নিবিড় আলিঙ্গনে কিশোরী পত্নীকে আবদ্ধ করে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,—'তুমি আমার জীবন,—তোমাকে ফাঁকি দিলে যে নিজেই ফাঁকে পড়বো। প্রিয়া, প্রিয়া, তুমি ঠিকই শুনেছ। আমি—

অ্যাঁ-অ্যাঁ.—সহসা বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথায় যেন বাজ খসে পড়লো,—'ঠিকই শুনেছি! তুমি—তুমি স-ন্ন্যা-স নে-বে.—শেষ কথাটা আর স্পষ্ট উচ্চারিত হলো না তাঁর কণ্ঠে,—দুটি স্থির চক্ষু স্বামীর মুখের ওপর রেখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন শ্রীগৌরাঙ্গের কোলে।

'প্রিয়া, প্রিয়া!'—উদ্বেগে আকুল হয়ে উঠলো শ্রীগৌরাঙ্গের স্বর,—"হায়, হায়, এ-কি করলাম!—না বুঝে সহসা যে শেলের আঘাত হেনে বসলাম বিষ্ণু-প্রিয়ার বুকে। 'প্রিয়া, প্রিয়া'—মূর্চ্ছিতা প্রিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলেন নিমাই,—'ওঠো, ওগো ওঠো,—আমাকে কি এমনি করে প্রাণে মেরে চলে যাবে তুমি? ওঠো,—আগে ভাল করে ধৈর্য ধরে সব শোন! প্রিয়া প্রিয়া!'

সে স্বরে বুঝিবা মৃতসঞ্জীবনী ছিল! বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরে ধীরে চোখ খুলে চাইলেন এদিক-সেদিক,—হ্যাঁগো কোথায়, ওগো কোথায় তুমি?"—তখনো মূর্চ্ছার ঘোর ঠিক কাটেনি। ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন গৌরাঙ্গ,—এইযে-এইযে আমি,—তুমি তো আমারই কোলে!...ভয় কি তোমার?

ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঠে বসলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। সস্নেহে প্রিয়ার চিবুক ধরে গৌরাঙ্গ বললেন,—'আমার কথা শেষ পর্য্যন্ত না শুনেই তুমি কেন অধীর হচ্ছো। আমার এ সন্ন্যাস তো শুধু আমার জন্যেই নয়। তোমারও এতে মঙ্গল আছে। আমার প্রাণ কৃষ্ণের জন্যে আকুল, সে তো তুমি জান।...সেই কৃষ্ণকে খুঁজতে আমি বৃন্দাবনে যাবো?—প্রিয়া, প্রিয়া, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী,

—তুমি আমার শক্তি,—আমার কাজে তুমি যদি সহায় না হও,—প্রেরণা না দাও,—আমি কি করে স্থির থাকবো প্রিয়া?

অভিমানে ক্ষোভে ঠোঁট দুটি ফুলে উঠলো বিষ্ণুপ্রিয়ার,—তোমার কৃষ্ণ আছেন,—কিন্তু আমার কে আছে?

'কেন?—তোমারও কৃষ্ণ আছেন।'—আশ্বাসের সুরে বললেন নিমাই,—'তিনি জগতের পতি, তাঁকে ভজনা কর, তবেই তুমি মনে শান্তি পাবে।'

'ওগো না, না,'—উদ্বেল হয়ে উঠ্‌লো বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠ,—'আমি কৃষ্ণকে জানি না, চিনি না। জানি তোমাকে।—যে কৃষ্ণ তোমার এত আদরের,—তাকে কতবার চিন্তা করতে গিয়ে দেখেছি,—তুমিই এসে দাঁড়িয়েছ আমার চোখের সামনে।'

'সে-কি প্রিয়া?'—দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে কিশোরী বধূকে যেন একটু প্রীত করবার জন্যে বললেন গৌরাঙ্গ,—'তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া',—মানে বিষ্ণুর প্রিয়া। তোমার নাম তুমি সার্থক করে তুলবে না?'

'আমার কাছে বিষ্ণু যে তোমার সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে প্রভু!' বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠে প্রগাঢ় প্রেমের সুগভীর ব্যঞ্জনা,—অখণ্ড বিশ্বাসের মর্মস্পর্শী সুর,—"দ্বিতীয় বিষ্ণুতো আমার আর কেউ নেই! তোমার সেবা করলেই আমার নাম সার্থক হবে।'

শ্রীগৌরাঙ্গ দেখলেন,—এ বড় কঠিন ঠাঁই। বৃদ্ধা জননী স্নেহের দুর্বলতায় অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু নিতান্ত সরলা এই কিশোরী বধূর প্রেমের নিকট বুঝিবা তাঁকে পরাজয়ই স্বীকার করতে হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ঐশ্বর্যের সাহায্য গ্রহণ করলেন। সহসা বিষ্ণুপ্রিয়া দেখলেন,—সেখানে তাঁর স্বামী নেই,—তার পরিবর্তে রয়েছেন শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণু।

মুহূর্তের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া বিভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সেই মূর্তিরই চরণে প্রণাম করে আকুলকণ্ঠে বললেন,—প্রভু, প্রভু, তুমি কি আমার স্বামী?—তা যদি হয়, তোমার এরূপ সংবরণ কর। আমার অন্তরে যে গৌরাঙ্গ-মূর্তি অঙ্কিত আছে,—তুমি সেই মূর্তি ধারণ কর।

ঐশ্বর্য প্রেমের নিকট পরাজিত হলো। বিষ্ণুপ্রিয়া দেখলেন সেখানে তাঁর স্বামী শ্রীগৌরাঙ্গই বসে আছেন। গদ্‌গদকণ্ঠে গৌরাঙ্গ বললেন,—প্রিয়ে, তুমি আমার জন্যে বিষ্ণুকেও উপেক্ষা করেছ,—আমি কি তোমায় ছেড়ে যেতে পারি? কিন্তু তুমি তো পতিপ্রাণা,—পতির কল্যাণই তো তোমার কাম্য। পতির অভিলাষ সিদ্ধ হোক,—এ ছাড়া অন্য কোন কামনা তো তোমার হতে পারে না। আমি চলে গেলে তুমি মায়ের সেবা করবে,—তাঁর স্নেহে তুমিও সান্ত্বনা পাবে। দেখ, কৃষ্ণকে না পেলে আমি প্রাণে বাঁচবো না,—আর আমি সর্বস্বত্যাগ

করে সন্ন্যাসী না হলে জীব আমার কাছে হরিনামও নেবে না। কিন্তু হরিনাম না নিলে যে তাদের উদ্ধার নেই প্রিয়া! আমার জীব-উদ্ধারের কাজে তুমিও যদি অংশ গ্রহণ না কর,—তাহলে কেমন করে শক্তি জাগবে আমার বুকে?' —তুমি কি মনে কর, আমি শুধু তোমাকেই দুঃখ দিচ্ছি?—নিজে কোন দুঃখ পাচ্ছি না। না, না, তা নয় প্রিয়া! যে দুঃখ তোমাকে দিচ্ছি,—সেই একই দুঃখ আমিও ভোগ করবো তোমার বিরহে। অন্তরে অন্তরে আমরা দুজনে যে চিরদিন অবিচ্ছিন্ন প্রিয়া। কিন্তু তবু আমি আর ঘরে টিকতে পারছি না,— তুমি আমায় অনুমতি দাও।

'কিন্তু তুমি ঘর ছেড়ে গেলে মা কি বাঁচবেন?'—অসীম স্নেহময়ী বৃদ্ধা শাশুড়ীর দুঃখও আলোড়িত করে তুলছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর। তাছাড়া,— এ-ও তিনি ভাবলেন,—মায়ের কথা তুললে স্বামী হয়ত সন্ন্যাস গ্রহণে নিরস্ত হবেন। গভীর সমবেদনার সুরেই তিনি বললেন,—মা যে একমাত্র তোমার মুখের দিকে চেয়েই বেঁচে আছেন! তার ওপর তাঁর এই বৃদ্ধ বয়স!

'মা যে সকল কল্যাণের কথা ভেবে অনুমতি দিয়েছেন প্রিয়া!'

'বলো কি?'—বিপুল আশ্চর্য ফুটে উঠলো বিষ্ণুপ্রিয়ার দুটি আয়ত নেত্রে, —মা অনুমতি দিয়েছেন! না, না, তা তিনি দিতে পারেন না। তোমার পীড়াপীড়িতে কিছু একটা বলে ফেলেছেন। আর তিনি বাঁচবেনই বা ক'দিন? এ সময় তাঁকে ছেড়ে গেলে তোমার অধর্ম হবে,—লোকে তোমার নিন্দা করবে! তোমার বিচ্ছেদ সইতে না পেরে,—হঠাৎ তাঁর যদি কিছু হয়ে যায়,—আমিই বা থাকবো কার কাছে? আর তুমিই বা কি করে সন্ন্যাসের দুঃখ সহ্য করবে বলো ত? তোমার কোমল শরীর,—দু'পা হাঁটতেও কষ্ট হয়। তুমি কেমন করে পথের পর পথ হাঁটবে? কি খাবে?—কোথায় শোবে। সেখানে তো মা নেই,—কে তোমার যত্ন করবে? না, না, তুমি যেও না,—আমার মাথা খাও—

প্রবল বাষ্পাবেগে এবার কণ্ঠরোধ হয়ে এলো বিষ্ণুপ্রিয়ার। চোখে বইতে লাগলো শ্রাবণের ধারা! গৌরাঙ্গ যে কি উত্তর দেবেন,—কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না! বুকের কথা মুখে আর ফুটছে না তাঁর। বিষ্ণুপ্রিয়া একটু সামলে নিয়ে আবার বললেন,—তা হাঁ-গো, সন্ন্যাস নেওয়া মানে তো স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখা?—তাকে ত্যাগ করা? তা' বেশ তো, আমি তোমার থেকে দূরে দূরেই থাকবো,—কোন সম্পর্ক রাখবো না তোমার সঙ্গে। দূর থেকে শুধু একবার করে দেখবো। এই যে তুমি শুধু কীর্তনে মেতে ছিলে,—আমার দিকে একদিন ভুলেও চাওনি, আমি কি তার জন্যে কিছু বলেছি তোমাকে?...

গৌরাঙ্গের বুকের মধ্যে তখন অশ্রুসাগর উথলে উঠছে। তাঁর কিশোরী বধূর তাঁকে ঘরে রাখবার আকুল প্রয়াস,—তাঁর মনের মধ্যে এক গভীর আলোড়ন

জাগিয়ে তুলছে। কিন্তু তিনি মৌন—মূক,—স্থাণুর মত শুধু চেয়ে আছেন বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে।

'তাতে হবে না?'—স্বামীকে নীরব দেখে বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন উদ্বেলিত কণ্ঠে,—'বেশ তো, আমি না হয় তোমার ত্রিসীমানা ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যাবো? আমার জন্যে তুমি কেন নবদ্বীপ ছাড়বে?—কেন, মাকে ছেড়ে গিয়ে লোকনিন্দার ভাগী হবে। সে যে আমি সহ্য করতে পারবো না।'

—গৌরাঙ্গ তবু নিরুত্তর। বিষ্ণুপ্রিয়া এবার অধৈর্য হয়ে উঠলেন,—'কি, কথা কইছো না যে?—আমি বাপের বাড়ি গেলেও হবে না?'—বেশ, আমি না হয় গঙ্গার বুকে ঝাঁপ দিয়ে—না হয় বিষ খেয়ে মরবো,—তাহলে তো তুমি নবদ্বীপে থাকবে?

আর পারলেন না শ্রীগৌরাঙ্গ।—'প্রিয়া, প্রিয়া',—দু'হাত দিয়ে আকুল স্নেহে পত্নীর মুখখানি তুলে ধরে বললেন তিনি,—তুমি কি আমাকে পাগল করে তুলবে? আমার জন্যে তুমি আত্মবিলোপেও কুণ্ঠিত নও,—তোমার এ প্রেম কি অবহেলার? কিন্তু যখন আমার সুখেই তোমার সুখ,—আমার জীবনেই তোমার জীবন,—তখন আমাকে বৃন্দাবন যাবার অনুমতি দাও। নইলে আমার অকল্যাণ ছাড়া কল্যাণ হবে না। তুমি কি আমাকে আটকে রেখে আমার অনিষ্টের কারণ হবে?

—'তোমাকে আটকালে তোমার অকল্যাণ হবে,—তোমার অনিষ্ট হবে?'—বিষ্ণুপ্রিয়ার মন একটা অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠলো! তাঁর জীবনের জীবন স্বামীর যদি অকল্যাণ হয়,—তবে কি তাঁর কল্যাণে তিনি নিজে স্বামীর দুঃখের অংশ নিতে পারবেন না? উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি চাইলেন স্বামীর দিকে,—তাঁর দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো আকুল প্রশ্ন,—'হাঁ গো, সত্যি বলছ? না, আমার মন বুঝে দেখছো?'

"এ-সময় কি তোমার সঙ্গে ছলনা করতে পারি প্রিয়া?"—আর্দ্রকণ্ঠে উত্তর দিলেন নিমাই,—"আমার সঙ্গে আমার একান্ত আপনজন না কাঁদলে যে জীবের প্রাণ গলবে না লক্ষ্মী! তোমার এই মহান ত্যাগ তো অনিত্যের জন্য নয় প্রিয়া,—এ ত্যাগ নিত্যের জন্য। তাই এর সুখ নিত্য—আনন্দ নিত্য। তুমি যে আমার সহধর্মিণী,—আমাদের পরস্পরের ধর্ম কি ভিন্ন হতে পারে? যদি কিছুই না বোঝ, তবু শুধু আমার মঙ্গলের দিকে চেয়ে—তুমি অনুমতি দাও।

'তোমার—মঙ্গল—হবে!'—চিন্তিত স্বরে এবার বললেন বিষ্ণুপ্রিয়া,—"তবে—তবে—সহসা মুখের কথা আটকে গেল তাঁর। কি-যেন শঙ্কায় আবার চমকে উঠে বললেন,—'কিন্তু হাঁ-গো, তুমি যে আমাকে ত্যাগ করে যাবে,—তাতে

লোকে আমাকে তোমার স্ত্রী বলবে তো? তোমার পত্নী হওয়ার গৌরবটুকু তো আমার থাকবে?—তোমায় পেয়ে আমি পরম ভাগ্যবতী হয়েছি,—তুমি চলে গেলে লোকে আমায় অভাগিনী বলবে না তো?'—তিনি আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন,—"ওগো, দাও, দাও, উত্তর দাও। লোকে যখন বলবে,—এই মেয়েটা কালসাপিনী,—নইলে এত কম বয়সে—স্বামী কি সোনার সংসার ছেড়ে চলে যায়?—তখন কি করে সে গঞ্জনা সইবো আমি?—আমি কি তোমার কোনদিন কোন দুঃখের—কোন অশান্তির কারণ হয়েছি?"—

'ছিঃ ছিঃ, এসব তুমি কি বলছো প্রিয়া!'—প্রগাঢ় প্রেমে প্রিয়ার চোখ দুটি মুছিয়ে দিয়ে গৌরাঙ্গ বললেন গাঢ়কণ্ঠে,—তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া,—চিরদিন গৌরাঙ্গ-প্রিয়া হয়ে থাকবে। তোমার গৌরবে জগতের নারীকুল ধন্য হবে। তোমার পতি-প্রেম অক্ষয়-অমর-অবিনশ্বর হয়ে—সেই পরমপ্রেমময়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেবে লোককে। আমি তো তোমায় ত্যাগ করছিনা প্রিয়া.—যখনই তুমি আমার বিরহে কাতর হবে,—তখনই আমার স্পর্শ অনুভব করবে তোমার হৃদয়ে। বিরহই যে মিলনকে গভীর করে তোলে প্রিয়া!

কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়া।...অসাধারণ শক্তিমান শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব আর কত অতিক্রম করতে পারেন? শক্তি যেন এবার ফুরিয়ে গেছে তাঁর!... ধীরে ধীরে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো,—'তবে তাই হোক,—তোমার মঙ্গলেই আমার মঙ্গল! জীবের মঙ্গলে তুমি এসেছ,—আমি নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থে তোমাকে আটকে রাখবো কেন?...কিন্তু দেখো,—তোমার অন্তরে দাসীর যেন চিরকাল স্থান থাকে।—'আর আমার চিত্ত যেন ডুবে থাকে—প্রতিক্ষণ শুধু তোমারই ধ্যানে।

"প্রিয়া, আমার প্রিয়া! তুমি আজ আমায় কিনে রাখলে!" প্রগাঢ় প্রেমে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহুপাশে আবদ্ধ করলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে!...

৫০

এরপর শ্রীগৌরাঙ্গের সুরু হলো এক অভূতপূর্ব নূতন সাংসারিক জীবন। প্রতি কাজেই কতই না শৃঙ্খলা! শচীদেবীর প্রত্যেকটি কথাই মেনে চলেন সানন্দে। আহারে বসে মা আদর করে যে-টি খেতে বলেন,—সানন্দে নিমাই বেশি করেই সে-টি খান। মায়ের রান্নার প্রশংসা করেন শতমুখে। এমন দিন তো শচীদেবী অনেকদিনই পাননি,—ছেলেকে খাওয়াবার জন্যে তিনি সাধ করে কত রকমের ব্যঞ্জনই না রান্না করেন! তবু যেন নিমাইকে খাইয়ে সাধ মেটে না তাঁর।

খানিকটা সময় তাঁর যায় সংকীর্তনে,—খানিকটা বা অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণকথার আলাপনে। বৈকালিক ভ্রমণে বার হয়ে যার সঙ্গে দেখা হয়,—তারই সঙ্গে কথাবার্তা বলেন পরম হৃদ্যতায়। যখন যেখানে যান,—চার পাশ থেকে অসংখ্য অনুরাগী বৈষ্ণবের কণ্ঠে সম্ভ্রমসূচক গুঞ্জন ওঠে,—'প্রভু আসছেন,—প্রভু আসছেন!' যে পথ দিয়ে যান,—পুরমহিলারা বরণ করেন তাঁকে শঙ্খ-ধ্বনি করে। কত লোক পথে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন তাঁর! সন্ধ্যার প্রাক-কালে চলে যান গঙ্গার তীরে—ভক্তজন সঙ্গে। ফিরে আসার সময় শোনেন,—ঘরে ঘরে খোল করতালের শব্দ—উচ্চ হরিহরি ধ্বনি। শুনতে শুনতে প্রাণ তাঁর নেচে ওঠে পরম পুলকে। চোখে বইতে থাকে প্রেমের অজস্রধারা। তাঁকে দেখে ভগবদ্দর্শনেরই আনন্দ লাভ করে সকলে! সন্ধ্যার পর কিছুটা সময় তিনি ভক্তদের সঙ্গে—কিছুটা সময় বা শচীর সঙ্গে নানা কথায় কাটিয়ে আহারাদি করে—চলে যান শয়ন-কক্ষে। প্রতি নিশি স্বামীসেবার সুযোগ পেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া কৃতার্থ মনে করেন নিজেকে,—সমগ্র হৃদয় তাঁর নেচে ওঠে এক স্বর্গীয় প্রেম-তরঙ্গে।

ঈশান ও গোবিন্দ নামে শ্রীগৌরাঙ্গের পরম অনুরাগী দুই কর্মচারী তখন বাড়ির যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পন্ন করেন। তাঁদের ওপরে আছেন তত্ত্বাবধায়ক রূপে মনে প্রাণে গৌরভক্ত শ্রীদামোদর পণ্ডিত। তাঁর তত্ত্বাবধানে কোনদিকে

কোন বিশৃংখলা নেই। কতলোক নিত্য আসছে শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে,—কত অতিথি-অভ্যাগত পরিতোষের সহিত আহার করছেন,—কত ভক্ত নিত্য প্রসাদ পাচ্ছেন প্রভুর বাড়িতে,—তার হিসাব করে কে?—আগমও যত,—নিগমও তত। শচীদেবীর আজ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার,—সর্বদাই যেন উথলে উঠছে!

এমনই করে—প্রায় দেড়-দুই মাস চলে গেল,—পৌষ পার হয়ে মাঘ মাস এসে পড়লো,—ভুলে গেলেন সকলে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের কথা। কি শচী—কি বিষ্ণুপ্রিয়া—কি ভক্ত,—কি পাড়াপড়শীর—কারো মনে থাকলো না—নিমাই কোনদিন বলেছেন তাঁর গৃহত্যাগের কথা। কে যেন কোন্ মায়ামন্ত্রে ভুলিয়ে রেখেছে সকলকে। শচীর আজ সুখের অন্ত নেই—আহ্লাদের সীমা নেই! শ্রীপাদ নিত্যানন্দ একযোগে পরমভক্ত এবং অভিন্নহৃদয় জ্যেষ্ঠের মত শ্রীগৌরাঙ্গ-পরিবারের আনন্দ বর্ধন করছেন।

সেদিন শ্রীগৌরাঙ্গকে অন্যান্য দিনের চেয়েও প্রফুল্ল মনে হলো। সকাল থেকেই তিনি নানা কাজে ব্যস্ত। ভক্তদের নিয়ে প্রাত্যহিক সংকীর্তন করলেন পরমানন্দে। অনেকের বাড়ি বাড়ি গিয়েও নানা হাস্য-কৌতুকে তাঁদের প্রীত করলেন। প্রভুর আনন্দে ভক্তদেরও মহানন্দ। শচী তো নিমাইকে খাওয়াবার জন্যে নিত্য কতরকমই না রান্না করেন,—আজ আবার নিমাই নিজে—"মা এটা রাঁধো, মা ওটা রাঁধো"—'করে কত আবদারও করলেন। স্বর্গ যেন নেমে এলো শচীদেবীর হাতে! মাঝে মাঝে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গেও নানা রঙ্গ-রহস্য করেন নিমাই; আদরে সোহাগে যেন গলে যান বিষ্ণুপ্রিয়া।—

শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছাশক্তি প্রভাবেই কি-না জানি না, আজ অসংখ্য অনুরাগী জনের মন সহসা চঞ্চল হয়ে ওঠে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। অথচ কেন, তাও কেউ ভেবে দেখে না,—সাগ্রহে সকলে ছুটে আসে প্রভুর বাড়ি। হাতে ফুলের মালা, চন্দন এবং আরও নানাবিধ উপাদেয় উপহার দ্রব্য। পরম সমাদরে গৌরাঙ্গ আপ্যায়ন করেন সকলকে,—তৃপ্ত করেন প্রীতির সম্বর্ধনায়। অনেকে তাঁকে প্রণাম করতে আসে,—তিনি সঙ্কুচিত হয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে বলেন,—'শ্রীকৃষ্ণের ভজনা কর। তবেই আমার সন্তোষ।' বিকালে গদাধর শ্রীগৌরাঙ্গের কেশচর্চা করে—তাঁকে প্রতিদিনের মত সাজিয়ে দেন—সুমোহন নাগর-বেশে। গদাধরের সাধনা 'রাধাভাবে,'—তাঁর কাছে শ্রীগৌরাঙ্গই স্বয়ং কৃষ্ণ। গৌরাঙ্গ তাঁর কাছে ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান নন,—প্রেমের দেবতা—জীবনের পতি।

শ্রীগৌরাঙ্গ বেশভূষা করে ভক্তজন সঙ্গে বা'র হন নগর-ভ্রমণে। নবদ্বীপের পথে পথে ঘোরেন,—প্রতিটি বৃক্ষ-লতা-গুল্ম প্রতিটি, গৃহ, প্রতি দেবস্থান, দেখেন দুই চোখ ভরে,—পথচারী প্রত্যেকের সঙ্গে প্রগাঢ় প্রীতিভরে করেন মধুর আলাপ। মাঝে মাঝে চোখ দুটি ভরে আসে জলে। সকলের অলক্ষ্যে

মুছে ফেলেন সে উদ্গত অশ্রু। সেই পথেই নিত্যকার মত চলে যান—জাহ্নবীর তটে। কিছুক্ষণ সেখানে বসে মনে মনে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীকে প্রণাম করে ফিরে আসেন গৃহে।

হঠাৎ ভক্ত শ্রীধর আসেন। একটি লাউ হাতে করে। কাঁচ লাউ,—কিন্তু আকারে বড়—তাঁর গাছে হয়েছিল। প্রভুকে প্রণাম করে লাউটি নামিয়ে রাখেন তাঁর সম্মুখে,—'প্রভুর সেবার জন্যে এনেছি।'—বলেন গদ্‌গদ কণ্ঠে। শ্রীগৌরাঙ্গ পরম স্নেহে আপ্যায়ন করেন তাঁকে; মাকে ডেকে বলেন,—"মা, শ্রীধরের লাউটি দিয়ে আজই রাত্রে পায়স রান্না কর,—আজই রাত্রে ভক্তগণও প্রসাদ পাবেন ঠাকুরের।"—শ্রীধরের দিকে চেয়ে বলেন,—"তুমিও বসো। প্রসাদ পেয়ে বাড়ি যাবে।"

নিমাই খেতে চেয়েছে,—ব্যস, শচীর আর দিনরাত্রির প্রশ্ন মনে আসে না,—একবারও মনে হয় না,—আজই রাত্রে এত তাড়া কেন?— সানন্দেই চলে যান তিনি রান্না ঘরে লাউটি নিয়ে। এরপর ভক্তজন সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ মগ্ন হন কৃষ্ণ-কথায়।

আহারাদি করতে আজ একটু রাতই হয়ে যায় তাঁর। পরম তৃপ্তিতে মায়ের হাতের নানা উপাদেয় খাদ্য ভোজন করেন নিমাই। ভক্তরাও প্রসাদ পান মহানন্দে। তাঁদের জনে জনে আলিঙ্গন করে, বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে নিমাই আসেন শয়ন-কক্ষে। একটু পরেই বিষ্ণুপ্রিয়া সুসজ্জিত বেশে আসেন স্বামীর কাছে। হাতে তাঁর নানাবিধ প্রসাধন-দ্রব্য—চন্দন, কুঙ্কুম এবং আর ও কত কি? কি জানি, কেন, আজ তাঁর সাধ জেগেছে,—স্বামীকে তিনি নিজের হাতে সাজাবেন। এ সাধ আজই বিশেষ করে জাগিয়েছে তাঁর অন্তরে,—কে সে অজ্ঞাত ব্যক্তি?—কোন্ অলক্ষ্যে থেকে?—কক্ষে ঢুকেই বিষ্ণুপ্রিয়া বলেন হাসি মুখে,—আজ আমি তোমাকে মনোসাধে সাজাবো। বাধা দিতে পাবে না কিন্তু।

'তোমার জিনিষ,'—রঙ্গের হাসি হেসে গৌরাঙ্গ উত্তর দেন,—তুমি যেমন খুশী সাজাবে,—আমি বাধা দেবার কে? কিন্তু একটা সর্ত?

'কি?'—কৌতুকে নেচে ওঠে বিষ্ণুপ্রিয়ার দুটি চোখ,—দৃষ্টির মধ্যে প্রগাঢ় প্রেমের ছায়া।

গৌরাঙ্গ বলেন,—"তোমার সাজানো হলে আমিও তোমাকে সাজাবো আমার মনোমত করে। তখন লজ্জা করলে চলবে না।"

'হুঁ,—পুরুষমানুষ আবার সাজাতে জানে!'—বিষ্ণুপ্রিয়া রঙ্গভরে হেসে ওঠেন,—আচ্ছা, দেখবো, কেমন সাজাতে পারো!

এরপর দুজন দুজনকে সাজান মনের মত করে। কি সে গভীর প্রেমের-

মধুর দৃশ্য! কত সুখ—কত আনন্দ—কত তৃপ্তি!—প্রাণে প্রাণে সে-কি অফুরন্ত আলাপন! কিন্তু তার অভ্যন্তরে আবার কি মর্মদ্রাবী কারুণ্যই না নিহিত রয়েছে! কত চোখের জল এই মাধুর্যের মধ্যে জমাট বেঁধে আছে,—কে জানে?........

রাত্রি তখন তৃতীয় যাম পার হয়ে চতুর্থ যামে পড়েছে! স্বামীর বক্ষ-সংলগ্না বিষ্ণুপ্রিয়া পরম সুখে গভীর নিদ্রায় অচেতন। শ্রীগৌরাঙ্গের চক্ষে কিন্তু ঘুম নেই। ধীরে ধীরে সহসা তিনি উঠে পড়লেন। যেখানে নিজে শুয়েছিলেন—সেখানে বিষ্ণুপ্রিয়ার বক্ষসংলগ্ন করে রাখলেন একটি পাশ-বালিশ। বিষ্ণুপ্রিয়ার একটি পা ছিল স্বামীর পায়ের ওপর,—পা'টিও অতি যত্নে ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলেন একটি ছোট বালিশের ওপর। তারপর প্রগাঢ় প্রেমাবেগে একবার প্রিয়ার মুখখানি চুম্বন করে—অতি সন্তর্পণে নেমে পড়লেন পালঙ্ক থেকে।

বুকের স্পন্দন তাঁর তখন দ্রুত হয়ে উঠেছে—নিঃশ্বাস ফেলছেন খুব সাবধানে। তার পর পা-টিপে-টিপে এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে—নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে এলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। নিস্তব্ধ—নিঝুম রজনীর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে যেন তখন বেজে উঠছে কার আকুল-করা বাঁশী,—সেই বাঁশীর তান আত্মহারা করে তুলছে তাঁকে! বাইরে এসে—বসনভূষণ সব ছেড়ে পরলেন একখানি সামান্য কাপড়। গা খালি,—আবরণের নামমাত্র নেই। ভক্তিভরে প্রণাম করলেন স্বর্গত পিতার চরণে,—মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন জননী শচীদেবীর উদ্দেশে,—প্রণাম জানালেন, অগ্রজ বিশ্বরূপের চরণে। মনে মনে বললেন,—'বিদায়', হে আমার সাধের নবদ্বীপ, হে আমার বাল্যের-কৈশোরের, তরুণ যৌবনের লীলাস্থল, আমার সংকীর্তন-ক্ষেত্র—আমার জননী, জন্মভূমি, বিদায়!

ধীরে ধীরে মাথা নুয়ে এলো তাঁর নবদ্বীপের উদ্দেশে। চোখ ছেপে এল অজস্র জল! মাথার ওপর অনন্ত আকাশ যেন ব্যথায় মূহ্যমান হয়ে শুনলো সে বিদায়-বাণী। তারপর সেই দারুণ শীতের রাত্রে—মুক্ত গাত্রে—একবস্ত্র প্রেমাকুল শ্রীগৌরাঙ্গ—দ্রুতপদে এলেন গঙ্গার তীরে।—"আমার কৃষ্ণ, আমার কৃষ্ণ, 'তুমি কোথায়?'—বলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন—সেই হিমশীতল গঙ্গার জলে। জাহ্নবীর পবিত্র বক্ষও যেন বিচ্ছেদ-বেদনায় ছল্‌ছল কলকল্ করে উঠলো! সাঁতার কেটে গঙ্গা পার হয়ে—আর পেছনের দিকে না চেয়ে ঊর্ধশ্বাসে ছুটলেন শ্রীগৌরাঙ্গ কাটোয়া-অভিমুখে,—যেন আর কিছু মনে নেই,—চোখের ওপর ভাসছে শুধু সেই মুরলী হাতে শ্যামসুন্দরের মূর্তি—

আর কানে বাজছে তাঁরই পাগল-করা বাঁশরীর তান! অন্তরে শুধু একটি কথা,—বৃন্দাবন! বৃন্দাবন!

৫১

ওগো, কোথায় তুমি? ওগো!'—হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই বিছানা হাতড়ে স্বামীকে না পেয়ে, ধড়মড় করে উঠে পড়লেন বিষ্ণুপ্রিয়া,—স্পন্দিত বুকে পালঙ্ক থেকে নামলেন নীচে—সম্মুখে দরজা খোলা রয়েছে। "ওগো, তুমি কি বাইরে গেছ?"—খোলা দরজা দিয়ে স্বামীকে ডাকতে ডাকতে বারন্দায় এসে দাঁড়ালেন,— এদিক সেদিক তন্নতন্ন করে দেখলেন,—কিন্তু কই,—কোথাও তো স্বামী নেই—চারিদিকে যেন একটা বিরাট শূন্যতা খাঁ-খাঁ করে গ্রাস করতে আসছে তাঁকে।

কি যেন আশঙ্কায় প্রাণ কেঁপে উঠলো তাঁর! অস্থির পদে শাশুড়ীর কক্ষের দ্বারে এসে—কপাটে করাঘাত করে দীর্ণ কণ্ঠে ডাকলেন,—মা, মা! মা!

শচীর ঘুম বেশ ধরেনি। তাঁর অবচেতন মনে নিমাইয়ের জন্যে বুঝিবা একটা চিন্তা থেকেই গিয়েছিল। তাই রাত্রে অনেক সময় তিনি ঘুমুতে পারতেন না। বধূর আর্তকণ্ঠ শুনেই তিনি বিছানা ছেড়ে আলুথালু বেশেই এসে দরজা খুললেন,—"কি, কি হলো বৌমা,"—স্বরে ঝরে পড়লো তাঁর অনন্ত ব্যাকুলতা, অসীম - উদ্বেগ!

'তোমার ছেলে কোথায় গেলেন মা?'—উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠলেন বিষ্ণুপ্রিয়া,—"কই, ঘরে তো তাঁকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।"

অ্যাঁ-অ্যাঁ—আর্তনাদ করে উঠলেন শচী,—কি, কি বললে বৌমা? নিমাই—নিমাই ঘরে নেই!"

বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠ তখন অশ্রুভারে রুদ্ধ হয়ে আসছে। কোনরূপে বললেন,—"আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মা,—হঠাৎ ঘুম ভাঙতে দেখি,—তিনি বিছানায় নেই।"

শচী তাড়াতাড়ি প্রদীপ জেলে ফেললেন,—হাত কাঁপছে,—সর্বাঙ্গ টলছে,

পা দুটিও যেন আর মাটির ওপর স্থির থাকছে না! প্রদীপ নিয়ে আগে বাড়ির সর্বত্র খুঁজে দেখলেন, কিন্তু—না, নিমাই কোথাও নেই। তাঁর রাত্রের বসনভূষণ শুধু পড়ে রয়েছে বারান্দার এক পাশে। "হায়, হায়, সর্বনাশ হয়েছে বুঝি তবে!" শচীর সমগ্র হৃদয় জুড়ে কান্নার রোল উঠলো। "বৌমা, বৌমা," —আকুলকণ্ঠে ডাকলেন তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে,—চল, চল, বাইরে গিয়ে দেখি।

প্রদীপ হাতে দুশ্চিন্তায় কাতর শঙ্কাকুলা বৃদ্ধা জননী,—পশ্চাতে তাঁর শোকাকুলা কিশোরীবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া,—দুজনে এসে নামলেন জনহীন রাজপথে। 'নিমাই, নিমাই!'—দীর্ণ কণ্ঠে ডাকলেন শচী,—নিমাই, নিমাই, নিমাই!

মায়ের সে বুককাটা আর্তস্বরে আকাশ-বাতাস আলোড়িত হয়ে উঠলো! কিন্তু কোথায় নিমাই?—মর্মাহতা জননীর অশ্রু-সমাকুল কণ্ঠ শেষ রজনীর স্তব্ধতার বুকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো,—নাই, নাই, নাই!

শচী যত বার ডাকেন,—নিমাই, নিমাই! প্রতিধ্বনি ততবারই যেন বলে—নাই, নাই!

শীতকালের শেষরাত্রি,—কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে,—হিমেল বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে শচীর আর্ত-আকুল কণ্ঠ। অসাড় নিদ্রিত নগরীর কেউ-কেউ চমকে উঠছে সেই স্বরে যেন কোন্ বিষাদ-স্বপ্ন দেখে। ভয়-লজ্জা-সংকোচ-সম্ভ্রম-বোধ সব চলে গেছে শচীদেবীর অন্তর থেকে। বাহ্য-অনুভূতি যেন লুপ্ত হয়ে গেছে তাঁর। চিত্তের সমগ্র একাগ্রতা, যাবতীয় উপলব্ধি কেন্দ্রীভূত হয়েছে এসে কণ্ঠে,—শুধু 'নিমাই নিমাই' আহ্বানে। এক-পা, এক-পা করে শীর্ণ দুর্বল দেহে যথাসম্ভব দ্রুত এগিয়ে চলেছেন সাতষট্টি বৎসরের বৃদ্ধা জননী—যেন দেহ-চ্যুত স্বীয় প্রাণেরই সন্ধানে। চোখে বইছে শ্রাবণের ধারা,—হৃদয়-তন্ত্রীতেও বেজে উঠছে শুধু—নিমাই, নিমাই।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠে তখন আর ভাষা নেই। বুকের যত ভাষা ঝরে পড়ছে বুঝি অশ্রুরূপে।—বধূ যে পেছনে আস্‌ছে,—এ-জ্ঞানও যেন নেই শচীদেবীর। সহসা চমকে উঠে পেছন ফিরে চেয়ে বলেন,—বৌমা, বৌমা, তুমি-ও ডাক মা।

শোক-বিমূঢ়া বিষ্ণুপ্রিয়া পড়েন এক মহাসমস্যায়। কি-বলে ডাকবেন তিনি তাঁর জীবন-দেবতাকে। অন্তরের ভাষায় যাঁকে সহস্র নামে ডেকেও নামের শেষ হয় না,—কণ্ঠের ভাষায় যে একটি নামও আসে না তাঁর। অবশেষে সরলপ্রাণা বিচ্ছেদ-বিধুরা কিশোরী শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করেন,—আমি কি বলে ডাকবো মা, তোমার ছেলেকে?

এ-দিকে শচীমাতার আর্তনাদে কর্মচারী ঈশানেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল

তখন।—তাড়াতাড়ি পথে বেরিয়ে এসে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে তদবস্থায় দেখে উদ্বেগ-ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে ঈশান,—মা, মা, কি হয়েছে মা ?

'নিমাই, নিমাই।'—'মা' ডাক শুনে শচীদেবী চমকে উঠে থমকে দাঁড়ান,—তাঁর নিমাই কি তবে ডাকছে তাঁকে ? ঈশান ব্যগ্রপদে এসে তাঁর পথ আটকে দাঁড়ায়।—'আমার নিমাই, আমার,—ঈশানকে দেখেই কান্নায় ভেঙে পড়েন শচী,—আমার নিমাই কোথায় গেল ঈশান ?—এই যে শুয়েছিল ঘরে। তোমরা কেউ দেখেছো তাকে ?—

শচীদেবী যেন এরই মধ্যে পাগলিনী হয়ে পড়েছেন। প্রভুর সন্ন্যাসের কথা ঈশানেরও কিছু কিছু শোনা ছিল। ব্যাপারটা সম্যক বুঝে উঠতে না পারলেও কতকটা অনুমান করা তার পক্ষে কঠিন হলো না। —"ব্যাকুল হয়ো না মা",—সান্ত্বনা দিয়েই সে বললে,—"চল ঘরে চল, বৌমা রয়েছেন সঙ্গে।—আমরা খুঁজে দেখছি। তোমার দাসরা থাকতে তুমি কেন মা ?"—এমন সময় অদূরে হরি হরি ধ্বনি উঠলো। সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হরিধ্বনি শুনে শচী বুঝলেন,—অদূরে অনেক লোক আসছে। তিনি ঈশানের অনুরোধে বাড়ির দরজায় ফিরে এসে,—ঠায় সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে বললেন,—"বৌমা, তুমি একটু আড়ালে দাঁড়াও। কারা যেন আসছে এইদিকে।"

হরিধ্বনি যাঁরা করেছিলেন,—তাঁরা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গেরই ভক্ত,—শ্রীবাস, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, বাসুঘোষ প্রভৃতি। তখন রাত ভোর হয়ে এসেছে। তাঁরা বেরিয়েছিলেন গঙ্গাস্নানে। রোজ প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করে—প্রভুকে দর্শন করে—তবে তাঁরা বাড়ি যান। কিন্তু শচীদেবীর আকুল স্বর—তাঁদের কানেও পৌঁছেছিল,—তাই তাঁরা গঙ্গার দিকে না গিয়ে—তাড়াতাড়ি চলে এলেন প্রভুর বাড়ির দিকে।

তাঁরা কাছে আসতেই উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠলেন শচী,—"আমার নিমাই, নিমাই."—দুটি গণ্ড ভেসে গেলো তাঁর চোখের জলে,—'শ্রীবাস, নিত্যানন্দ,—সে তো তোমাদের ছাড়া থাকে না,—কোথায় সে বল, বল। আমার প্রাণ বাঁচাও। হায়, হায়, সে আমার সব ফেলে চলে গেছে দীন বেশে—ভিখারীর মত—

'অঙ্গুরী অঙ্গদবালা গোরাচাঁদের কণ্ঠমালা
খাটপাট সোনার দুলিচা।
সে সব রয়েছে পড়ি নিমাই গিয়াছে ছাড়ি
মুঞি প্রাণ ধরিয়াছি মিছা॥'

ভক্তদের মাথায় যেন আচম্বিতে বজ্রপাত হলো ! প্রভু কি সত্যই তবে ছেড়ে চলে গেছেন তাঁদের ?—দরদর অশ্রু ঝরে পড়লো সকলের চোখে। দেড়-দুই-

মাস আগে নিমাই যে চন্দ্র সূর্য সাক্ষী রেখে—সন্ন্যাস গ্রহণের অঙ্গীকার করেছিলেন—শ্রীপাদ নিত্যানন্দের কাছে; ভক্তদের কাছেও যে তিনি জনেজনে বিদায় নিয়েছিলেন—আজ সে সব কথা অন্তর মথিত করেই জেগে উঠলো সকলের স্মৃতিতে। এতদিন নিমাই যেন কোন কুহকমন্ত্রে—কোন অমানুষিক শক্তির প্রভাবে ভুলিয়ে রেখেছিলেন সকলকে।

—কিন্তু তবু প্রভু সহসা এত নিষ্ঠুর হতে পারলেন কিরূপে? এই বৃদ্ধা জননী, এই কিশোরী পত্নী,—এই প্রভুগত-প্রাণ ভক্তের দল,—লক্ষ লক্ষ অনুরাগী—সকলের বুকে এতবড় নির্মম আঘাত হানতে প্রাণে কি একটুও বাজলো না তাঁর। যুগপৎ ব্যথায়, ক্ষোভে, অভিমানে ভক্তরা ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন। এদিকে মালিনী প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিবেশিনীও তখন এসে পড়েছিলেন সেখানে। তাঁরা শচীদেবীকে সামলাতেই ব্যস্ত। ঘনঘন মূর্চ্ছা হচ্ছে তাঁর। অল্পবয়সী দু'একটি মেয়ে—বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা দিচ্ছে নানা কথায়। বিষ্ণুপ্রিয়া তখন একগাছি বাসি ফুলের মালার মতই ধূলায় পড়ে আছেন। পরিম্লান—বিপর্যস্ত!

মুকুন্দ সহসা বলে উঠলেন,—'প্রভু কি সত্যই আমাদের ফেলে চলে গেছেন?' —এই মর্মান্তিক অশুভ ঘটনা যেন বিশ্বাস করতেও প্রাণ চাইছে না তাঁর। শ্রীবাস বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন,"—মনকে মিথ্যে প্রবোধ দিয়ে কি লাভ? ইদানীং প্রভুর প্রত্যেকটি কাজের আলোচনা করলে এখন মনে হচ্ছে,—যেন আমাদের ছেড়ে চলে যাবার জন্যেই তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

"প্রভুহীন নবদ্বীপে আমরাও থাকতে পারবো না।" বাসুঘোষ প্রভৃতি বললেন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে,—প্রভুকে না পেলে আমরা গঙ্গার বুকে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণের জ্বালা জুড়াবো।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অনেক করে নিজেকে সংযত করে বললেন শচীদেবীকে, —মা, শান্ত হও, আমি যেখান থেকে পারি, যেমন করে পারি,—তোমার ছেলেকে ফিরিয়ে এনে—তোমার সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটাবো। নয়, প্রতিজ্ঞা করছি, এ জীবন আর রাখবো না।" শ্রীবাসকে লক্ষ্য করে বললেন,—"পণ্ডিত, তুমি প্রভুর বাড়িতেই থাক,—মাকে এবং বধূমাতাকে সান্ত্বনা দাও, রক্ষণাবেক্ষণ কর। নয়, —তাঁদের যা মনের অবস্থা,—সহসা হয়ত কোন বিপদই ঘটিয়ে বসবেন। আমি নিজে আর তিন'চারজনকে নিয়ে কাটোয়ায় যাচ্ছি। আমি একবার শুনেছিলাম, —প্রভু কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নেবেন।—সেখানে না পাই—ভারতের অন্যান্য সন্ন্যাস-আশ্রমও পরে খুঁজে দেখবো।

'সেই ঠিক, সেই ঠিক!'—সকলেই সমস্বরে সমর্থন করলেন নিত্যানন্দকে। অতঃপর নিত্যানন্দ,—আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর, দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণকে

সঙ্গে করে তন্দণ্ডেই যাত্রা করলেন—কাটোয়ার কাঞ্চননগরের উদ্দেশে। এই কাঞ্চননগরেই দণ্ডী কেশব ভারতীর আশ্রম।

৫২

'নারায়ণ, নারায়ণ! কে তুমি বাপু?'—স্বর্ণ-জিনিত অপরূপ কান্তি—দীর্ঘকায় সুবলিত-সুঠাম-অঙ্গ এক তরুণকে সহসা এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে দেখে কেশব ভারতী চমকে উঠলেন—"কোত্থেকে আসছো তুমি?"

ধীরে ধীরে মুখ তুললেন শ্রীগৌরাঙ্গ। দুটি চোখ জলে পরিপূর্ণ। যেন দুটি পদ্ম পলাশের ওপর জলের ঢেউ উছলে পড়ছে!—"প্রভু, আমি আপনার চরণের দাস,"—বললেন অশ্রুজড়িত কণ্ঠে. "ভব-তরঙ্গে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। দয়া করে আমাকে সন্ন্যাস দিয়ে উদ্ধার করুন। আমার নাম নিমাই, আসছি নবদ্বীপ থেকে।"

"নবদ্বীপের নিমাই?—তুমিই তাহলে নিমাই পণ্ডিত?"—সম্ভ্রমের সুর বেজে উঠলো ভারতীর কণ্ঠে।—নিমাই অতি দীন কণ্ঠে বললেন,—প্রভু, আমি পণ্ডিত নই, ঘোর মূর্খ! আমাকে উদ্ধার করুন,—আমি আমার কৃষ্ণকে খুঁজতে বৃন্দাবন যাবো। আমার কৃষ্ণ—আমার সেই ব্রজরমণ—

কৃষ্ণ ও বৃন্দাবনের কথা মনে আসতেই হু-হু করে কেঁদে উঠলেন নিমাই। অশ্রু যেন উছলে উছলে পড়তে লাগলো—গণ্ড বেয়ে বক্ষ প্লাবিত করে। স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকলেন ভারতী,—এত প্রেম, এই আকুল কৃষ্ণানুরাগ এ-কি সামান্য জীবে সম্ভব? মনে পড়লো তাঁর,—এই নিমাইয়ের বাড়ি নবদ্বীপে গিয়েছিলেন তিনি—দেখেছিলেন তাঁর মধ্যে এক অলৌকিক সত্তা,—এক অপূর্ব অপার্থিব বস্তু।—ভারতী স্থির মুগ্ধ নেত্রে কিছুক্ষণ শ্রীগৌরাঙ্গের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন গাঢ় কণ্ঠে,—নিমাই, আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিতে পারবো না,—তুমি বাড়ি ফিরে যাও।

'কেন, কেন প্রভু?'—অধীর হয়ে উঠলেন গৌরাঙ্গ,—'দাসের অপরাধ?'

তুমি নিতান্ত তরুণ,—এ সন্ন্যাসের বয়স নয়। আমি জানি, তোমার ঘরে

বৃদ্ধা জননী আছেন, কিশোরী পত্নী আছে, তুমি ছাড়া তাঁদের আর কেউ নেই।"—ভারতী যেন কিসের আবেগেই বলে যেতে লাগলেন,—তাছাড়া, তোমার সন্তান-সন্ততিও হয়নি,—আর তোমার এই কোমল দেহ সন্ন্যাসের দুঃসহ কষ্ট সহ্য করতেও পারবে না—পঞ্চাশের নীচে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দেবার বিধিও নেই।

"তাহলে প্রভু, যাদের পরমায়ু কম,—তারা কি পুণ্যকর্মের অধিকার পাবে না?"—নিমাই আকুল দৃষ্টিতে চাইলেন ভারতীর দিকে,—'কৃষ্ণ-আরাধনার সুযোগ কি তাদের মিলবে না?'

ভারতী দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—তোমার অনেক বাধা,—আর সন্ন্যাস না নিয়েও কৃষ্ণসাধনা চলে। তাছাড়া, আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিতে অক্ষম—তুমি অন্যত্র যাও।

'প্রভু, স্মরণ করুন,'—কাতরকণ্ঠে বললেন নিমাই,—'আমাব বাড়িতে আপনি দাসকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?'

"রসাতলে যাক আমার প্রতিশ্রুতি!"—আবেগপূর্ণ স্ববে উত্তর দিলেন ভারতী,—'তার জন্যে আমাকে অনন্ত নরকে যেতে হয়,—তাও শ্রেয়ঃ। তবু তোমার এই সোনার অঙ্গে—আমি কৌপীন তুলে দিতে পারবো না। না না, অসম্ভব!—তোমার বৃদ্ধা জননী এবং বালিকা পত্নীবধের ভাগীও আমি হতে চাই না।"—সহসা ভারতীর চোখে ফুটে উঠলো গভীর নিরীক্ষা,— দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো নিমাইয়ের মুখে; কি দেখলেন তিনি,—তা তিনিই জানেন,—মুহূর্তে ভাবাবেগে অধিকতর চঞ্চল হয়ে উঠলেন,—'নিমাই, নিমাই, আমাকে অপরাধী করো না, তোমাকে সন্ন্যাস দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।'—গলায় যেন তাঁর কতকটা বাষ্প এসে জমলো।

শ্রীগৌরাঙ্গ আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন;—সহসা নিত্যানন্দ প্রভৃতি অন্বেষী ভক্তগণ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে পৌঁছলেন সেখানে,—"এই যে প্রভু, এই যে প্রভু,"—বলতে বলতে তাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গের সম্মুখে একেবারে ধূলায় লুটিয়ে পড়লেন। গভীর দুঃখের পর প্রভুকে দেখতে পেয়ে—আনন্দে যেন তখন উথলে উঠছে সকলের বুক।—প্রভু সকলকে সাদরে বুকে তুলে আলিঙ্গন করে বললেন, —"তোমবা এসেছ? ভালোই হয়েছে। একবার সকলে মিলে হরি-হরি বল,—আমি তোমাদের সম্মুখে সন্ন্যাস নিয়ে আমার কৃষ্ণকে খুঁজতে বৃন্দাবন চলে যাই।

বলে তিনি নিজেই "হরি হরি" বলে দুবাহু তুলে নাচতে সুরু করলেন। প্রেমানন্দে ভুলে গেলেন কোথায় এসেছেন,—কিজন্যে এসেছেন। ভক্তরা আর করেন কি?—প্রভুকে নাচতে দেখে তাঁরাও স্থানকাল ভুলে দুবাহু তুলে নাচতে লাগলেন। ওদিকে শ্রীগৌরাঙ্গকে নাচতে দেখে ভারতীর বুকেও দোলা

লাগলো,—ভাবের তরঙ্গে তিনিও বুঝি ভেসে যান।...এ-কি আকর্ষণ?—কার এ আকর্ষণ?—কে এই নিমাই পণ্ডিত?—ভাবতে লাগলেন তিনি মনে মনে?... এর এই বাহ্যজ্ঞান-শূন্য নৃত্যের ছন্দে—প্রাণ নেচে ওঠে কেন এক মধুর ছন্দে?

সহসা নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো। তিনি আবার এসে বসলেন নতজানু হয়ে ভারতীর পাদমূলে,—প্রভু, এঁরা সকলেই এসেছে,—সকলেই আমার নিজজন। এবার আমায় উদ্ধার করুন।

"নিমাই, আমি তো বলেছি আমি পারবো না।"—ভারতী তেমনি দৃঢ়তায় উত্তর দিলেন—"তবে তোমার জননী এবং পত্নী যদি তোমাকে অনুমতি দেন,—আমি বিবেচনা করে দেখতে পারি।" ভারতীর ধারণা,— নিমাই কোন মতে তাঁদের অনুমতি পাবেন না!

"তাঁদের অনুমতি আমি পেয়েছি প্রভু!"—নিমাই বললেন সানন্দে। "পেয়েছ?—আশ্চর্য!"—স্তব্ধপ্রায় স্বরে ভারতী বললেন,—"কিন্তু তাঁরা বোধহয়, সন্ন্যাসাশ্রমের কঠোর দুঃখ জানেন না। তুমি আর একবাব তাঁদের কাছে যাও—সব বুঝে পুনরায় যদি তাঁরা তোমায় অনুমতি দেন—

'আমি এক্ষুনি যাচ্ছি প্রভু,'—উন্মত্তের মত প্রভু ছুটলেন নবদ্বীপের উদ্দেশে। কতদূরে নবদ্বীপ,—কত সময় লাগবে, এ সব জ্ঞান নেই! ব্যাপার দেখে ভারতীর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। উচ্চ কণ্ঠে তিনি ডাকলেন,—নিমাই, নিমাই, ফিরে এসো। আমি বুঝেছি,—একবার নয়,—শতবার তুমি অনুমতি আনতে পারবে। তোমার এই আকুলতায় সকলের সব কিছুই বাধা-বন্ধ বুঝি ভেসেই যাবে! হায় নিমাই, এ-কি উভয় সংকটে আমায় ফেললে তুমি!

নিমাই ফিরে এসে আবার দাঁড়ালেন কেশব ভারতীর সম্মুখে। চন্দ্রশেখর দাঁড়িয়েছিলেন অদূরে। নিমাই তাঁকে বাবা বলেই সম্বোধন করতেন। ভারতীর পুনরাহ্বানে আশান্বিত হয়ে চন্দ্রশেখরের দিকে চেয়ে বললেন নিমাই, —"বাবা, তুমি এসেছ, ভালোই হয়েছে। এ কাজের যেটুকু সাহায্য করতে হয় পিতার প্রতিনিধিরূপে তুমিই কর।

হায়, হায়, হায়—প্রাণের ভেতরটা প্রচণ্ড ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো চন্দ্রশেখরের,—কোথায় শচীদেবীর জীবনের জীবন নিমাইকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন,—আর কোথায় নিমাই তাঁকেই ডাকছেন,—তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণে সাহায্য করতে! তিনি কি নবদ্বীপে ফিরে গিয়ে বলবেন শচীকে,—তাঁর নিমাইকে নিজের হাতে 'বাপ' হয়ে কৌপীন পরিয়ে এলাম? না, না, পারবেন না তিনি। তার চেয়ে আর নবদ্বীপেই ফিরবেন না। এই—এখানেই গঙ্গায় ডুবে প্রাণ বিসর্জন দেবেন।—কিন্তু মুখ ফুটে তিনি কিছু বলতে পারলেন না। অন্তর সহস্রবার না, না, করে উঠলেও দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি, স্থানুর মত-নিশ্চল-

নির্বাক।—অন্তর্নিহিত ব্যথা তাঁর ঝরে পড়লো অশ্রুরূপে। ভারতীর দিকে চেয়ে তিনি বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললেন,—ঠাকুর, এই হতভাগ্য নিমাইয়ের মেসো। কিন্তু আমি যে-কি করি!—কণ্ঠ সহসা আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেলো তাঁর!

এদিকে কিন্তু তখন ভারতী নিজেও তাঁর মনকে আয়ত্তে আনতে পারেননি, —তিনি আবার গাঢ়কণ্ঠেই বললেন,—"শোন নিমাই, ওদের তুমি বৃথা চঞ্চল করছো। একান্তই সন্ন্যাস নিতে চাও,—আরও কয়েক বছর পরে—আমার কাছে এসো,—বেঁচে থাকি,—আমার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করবো। আর যদি এক্ষুনি সন্ন্যাস নিতে চাও,—তবে অন্যত্র যাও। আমি শুষ্কপ্রাণ কঠোর সন্ন্যাসী, —প্রাণের দয়ামায়া সবই শুকিয়ে ফেলেছি,—তবু তোমার এই বর-অঙ্গে কৌপীন তুলে দিতে আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে,—এমন তো আর কখনো হয়নি!" —তাঁর চোখ দুটি সহসা জলে ভরে এলো,—"তাহলেই বোঝ, তোমার জননী এবং বধূর কি-দশা হবে? না, না, আমি পারবো না। নিমাই, নিমাই, আমাকে বধ করো না, ফিরে যাও,—আমি চিনেছি,—তুমি কে?—যার জন্যে তুমি পাগল হয়েছো,—আমার মনে হয়—আমার মনে হয়—তুমি—তুমি—তুমিই সেই!

ব্যাকুলভাবে নিমাই পায়ে ধরলেন ভারতীর,— ছিঃ, ছিঃ, ও-সব কি বলছেন আপনি? আমি আপনার দাস, কৃষ্ণের জন্যে আমার প্রাণ চঞ্চল হয়েছে।— আপনি দয়া করে আমাকে উদ্ধার করুন।

না, আর পারি না,—এই আকুতি—এই আর্তি অবহেলা কবা আমার সাধ্যাতীত! হে ন্যারায়ণ, কেশব ভারতীর অদৃষ্টে কি শেষে এই ছিল!—ভাবতী যেন ক্ষোভের আবেগে মুহ্যমান হয়ে উঠলেন।

এদিকে তখন বহু নর-নারী সেখানে এসে জমেছে। তার মধ্যে নানা বয়সেরই লোক আছে। সকলেই শুনেছে,—দেবোপম সুন্দব স্বর্ণকান্তি এই নবীন যুবকটি সন্ন্যাস নিতে চাইছেন,—বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধা জননী,—বালিকা পত্নী,—তাঁদের মুখের দিকে চাইবার আর কেউ নেই। আবাব উনিই নাকি,— নদীয়ায় যে অবতার হয়েছেন,—সেই গৌরাঙ্গ!—সকলকে কাঁদিয়ে বৃন্দাবনে যাবেন উনি শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজতে!

দু'চারজন বয়স্ক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললেন নিমাইকে লক্ষ্য করে,—"বাপু, তুমি যেই হও,—আমরা তোমার বাপের বয়সী। তাই বলছি। তুমি ভারতী ঠাকুরের কথা শোন্। তুমি মাথা মুড়িয়ে কৌপীন পরলে,—মানুষ তো দূরের কথা,—গাছ-পাথরের যে প্রাণ নেই,—তারাও বুঝি কাঁদবে! কি দুঃখে তুমি এমন কবে সকলকে কাঁদাবে বাপু? তুমি নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত,— দেশ-যোড়া তোমাব নাম। যথেষ্ট ধনমান-যশ-প্রভাব-প্রতিপত্তি! তোমার কত ভক্ত—কত

আপন জন; সব ছেড়ে এ-ব্যক্তিক কেন? বুড়ো মা, ছেলেমানুষ বৌটার কথাও তো ভাবতে হয় বাপু!

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন বর্ষীয়সী নারীও এগিয়ে এলেন নিমাইয়ের দিকে, —'বাছা, আমরাও সকলে মা। তোমার মত ছেলেকে ছেড়ে তোমার মায়ের দশা যে কি হবে,—তা আমরা বেশ বুঝতে পারছি। আমাদের কথা শোন বাছা, মায়ের ছেলে ফিরে যাও মায়ের কাছে। আহা-হা, তোমার মত সোনার চাঁদ মাথা মুড়িয়ে কৌপীন পরলে দেশের লোক যে পাগল হয়ে যাবে বাছা! ফুলের মত ঐ শরীরে দুঃখ কষ্ট কি তুমি সইতেও পারবে? বৌমা'কে যদি এই বয়সে এমন করে ফেলেই যাবে—তবে বিয়ে করেছিলে কেন বাছা।

সকলের দিকে ফিরে নিমাই দাঁড়ালেন করযোড়ে,—'বাবা মা',—কণ্ঠ অশ্রুতে উদ্বেল হয়ে উঠলো তাঁর,—"আমি আপনাদের সকলেরই ছেলে। আপনারা আমার বাপ-মা! আপনারা যদি আমাকে স্নেহ করেন,—তবে অনুমতি দিন,—আমি সন্ন্যাস নিয়ে আমার কৃষ্ণকে খুঁজতে বৃন্দাবনে যাই। আমি তাঁর বিরহ আর সহ্য করতে পারছি না। আপনারা বরং আশীর্বাদ করুন,—আমি যেন আমার কৃষ্ণকে পাই,—আহা, আমার কৃষ্ণ, আমার সেই মুরলীধর শ্যাম,—আমার সেই বৃন্দাবনচন্দ্র—যমুনাবিহারী,—বলতে বলতে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন নিমাই,—চোখ দিয়ে ঝরতে লাগলো গোমুখী-নির্ঝরের মত অজস্র ধারা।—সেই আর্তি, সেই ভাব-বিহ্বলতা দেখে—সকলের প্রাণে জেগে উঠলো গভীর আলোড়ন। যেন নিতান্ত নিরুপায়ের মতই বলে উঠলেন সকলে,—না, না, একে বাধা দেওয়া আমাদের সাধ্য নয়। বাপ, ঐ চোখের জল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কে দেখবে বাপু? নিষেধ করতে গিয়ে শেষে কি উলটো করে বসবো!

'হে নারায়ণ,—আমিও যে ঠিক ঐ সংকটেই পড়েছি!'—ভারতী কতকটা আত্মগতভাবেই বলে উঠলেন,—"এঁকে নিবারণ করবে কে?—আমি যে এঁর হাতের পুতুল,—এ-বুঝি সেই স্বেচ্ছাময়েরই ইচ্ছা,—আমি বাধ্য—আমি নিরুপায়!

'কি—কি?'—কয়েকজন গোঁয়ার-গোবিন্দ গোছের যুবক অতশত না বুঝেই এগিয়ে এলো ভারতীর দিকে,"—কি বললে ঠাকুর?—ঐ ছেলেটিকে তুমি সন্ন্যাসমন্ত্র দেবে? কই দাও দেখি,—তাহলে তোমাকে আর কাটোয়ায় বাস করতে হবে না!

'আমাকে বধ কর, তোমরা আমাকে বধ কর।'—ভারতীর কণ্ঠ অনুনয়ে আকুল হয়ে উঠলো,—আমি কাকে কাঙ্গালের বেশ সাজাচ্ছি,—তা বেশ বুঝতে পারছি,—কিন্তু আমি নিরুপায়! তোমরা আমাকে মেরে ফেললে—জীবনে আমার একলঙ্ক থাক্‌বে না। আমার মহাযন্ত্রণার অবসান হবে।...বাপু, ঐ

দেখ, এই যুবকের মেসো বসে রয়েছেন,—'তিনি চন্দ্রশেখরের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করলেন,'—উনি এ'র পিতার মত। উনি কেন নিষেধ করতে পারছেন না,—তা ও'কেই জিজ্ঞাসা কর। তারপরে আমাকে যে দণ্ড দেবে,—আমি মাথা পেতে নেবো।

ভারতীর চোখে জল এলো। উত্তেজিত যুবকরা বুঝলো,—ভারতী ঠাকুর সম্পূর্ণ নির্দোষ।—তাদের মনে হলো, তারা একবার বুঝিয়ে দেখবে,—কিন্তু নিমাইয়ের দিকে এগিয়ে যেতে পা-ই উঠলো না তাদের। তখন তারাও বুঝলো,—ঐ ছেলেটি সামান্য নয়,—ওর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অসাধারণ শক্তি আছে। যার কাছে সকলকে নত হতে হবে।

নিত্যানন্দ প্রভৃতির মুখেও তখন আর কথা ফুটছে না। মূকের মত মৌন-স্তব্ধভাবে চেয়ে আছেন তাঁরা প্রভুর দিকে। বুকের ভাষা যেন প্রচণ্ড দুঃখের আবেগে আত্ম-প্রকাশের শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে তাঁদের। নিষেধ কে করবে?—গৌরাঙ্গের মনঃশক্তির প্রভাব তখন অজেয়-অনতিক্রম্য!...এবপর ভারতীর নির্দেশে—সন্ন্যাস গ্রহণের উপকরণ ফুল, চন্দন, দধি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্রব্য সংগৃহীত হলো সেখানে। যারা সে সব আনলো,—তাদের চোখে জল গড়াচ্ছে,—কিন্তু কোন আপত্তির ভাষা নেই কারো মুখে। এমনকি চন্দ্রশেখরও—নীবর যন্ত্রচালিতের মতই স্নান করে এসে বসলেন কৃষ্ণপূজায়। শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছাক্রমে খোল-করতাল প্রভৃতিও অবিলম্বে সংগৃহীত হলো সংকীর্তনের জন্য।

এবার এলো নাপিত। সন্ন্যাস নিতে হলে মস্তক মুণ্ডন একান্ত অপরিহার্য,—সুতরাং নাপিতকেও চাই অপরিহার্যভাবে। কাটোয়ার পরমাণিক-সমাজে এই নাপিতেরই সম্মান ছিল বেশি। নাপিত কিন্তু জানতো না,—তাকে কি করতে হবে। ডাক পেয়েছে,—এসেছে। সকলকে ছেড়ে একেবারে শ্রীগৌরাঙ্গের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো সে,—কি আদেশ ঠাকুর?

শ্রীগৌরাঙ্গ চাইলেন মুখ তুলে নাপিতের দিকে,—'আমাকে মুক্ত করে দাও ভাই,—আমি সন্ন্যাস নেবো। কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করবেন।'

নাপিত তখন বুঝলো,—কাজটা কি? আর আজ তাকে কার কেশ মুড়িয়ে ফেলতে হবে। স্থির দৃষ্টিতে আত্মহারাভাবে কিছুক্ষণ নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে সহসা নাপিত বলে উঠলো,—যেন কি আচ্ছন্নতার পর হুঁস হয়েছে তার,—'ঠাকুর, আমার কৃষ্ণকৃপার দরকার' নেই। এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। কাটোয়ায় ঢের নাপিত আছে,—তাদের কাউকে ডাক।

'নাপিত, নাপিত, তুমি শ্রীহরির দাস।'—আকুল কণ্ঠে বললেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—আমি কৃষ্ণকে খুঁজতে বৃন্দাবনে যাবো। কৃষ্ণের বিরহে প্রাণ আমার আকুল,

—তুমি যদি আমাকে সাহায্য না কর,—তবে আমার উপায় কি ভাই? তুমি আমাকে মুক্ত করে দাও,—আমি আশীর্বাদ করছি,—তুমি সর্বসুখে সুখী হবে,—তুমি অন্তিমে বৈকুণ্ঠলাভ করবে।

'আমি সুখ চাই না।'—নাপিত দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলো,—বৈকুণ্ঠও চাই না। আমাকে ঘোর নরকে যেতে হয়,—তোমার কাজ না করে যদি আমার সর্বাঙ্গ কুষ্ঠ ব্যাধিতে গলে যায়,—তবু আমি তোমার ঐ সুন্দর চুলের ওপর হাত দিতে পারবোনা।...না, না, না— আমার কর্ম্ম নয়।

নিমাই বড় মুস্কিলেই পড়লেন। এদিকে মনে মনে সকলেই নাপিতকে সাধুবাদ করছে। কামনা করছে,—নাপিত যেন গৌরাঙ্গের কেশ-মুণ্ডনে রাজী না হয়। কাতর দৃষ্টিতে নাপিতের দিকে চেয়ে গৌরাঙ্গ এবার—মর্মদ্রাবী স্বরে বললেন —"হায়, হায়, হরিদাস, তবে কি তুমি আমাকে ভববন্ধন হতে মুক্তি দেবে না? আমি কি তোমার কাছে এতই অপরাধী? ভাই, আমার দুঃখ আর বাড়িয়ো না,—আমাকে দয়া কর। আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।

নাপিত ঝাঁঝাল সুরেই বলে উঠলো,—'বলি, ঠাকুর, তুমি কি আর নাপিত পেলে না? আমিই বা তোমার চরণে কি অপরাধ করেছি যে,—আর সবাইকে ছেড়ে আমাকেই এই দুঃখ দিতে চাও? সন্ন্যাসী হবে হও,—কিন্তু ক্ষৌরী করো না। আমি অনেক দিনের নাপিত,—কিন্তু অমন সুন্দর চুল আমি বাপের জন্মেও দেখিনি। তোমার মাথায় হাত দিলেই আমার হাত কাঁপবে। না, না, আমি পারবো না। তুমি এমনি সন্ন্যাসী হও।

'তা হয় না ভাই।'—দুঃখের হাসি ফুটলো গৌরাঙ্গের মুখে,—'সন্ন্যাস নিতে হলে মস্তক মুণ্ডন করতেই হবে। আমার মিনতি রাখ। তুমি নিজে কৃষ্ণভক্ত। আমিও সেই কৃষ্ণকে খুঁজতে যাব। আমাকে আর বাধা দিও না।—তাহলে আমার দেহে আর জীবন থাকবে না।

এবার তাঁর দুচোখ দিয়ে ঝরঝর জল গড়ালো,—মুখে ফুটতে লাগলো—কৃষ্ণ-বিরহের মর্মভেদী অনুতাপ। আবিষ্টভাবে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থেকে নাপিত এবার চমকে উঠে বলে উঠলো,—বুঝেছি,—বুঝেছি!—তোমার কাজ না করে আমার উপায় নেই। কিন্তু ঠাকুর, তোমার মাথায় হাত দিলে—এ হাত তো আর আমি অন্যের মাথায় কিম্বা পায়ে দিতে পারবো না। আমার ব্যবসা চলবে কি করে? তোমার নাপিত কি—আবার আর কারো নাপিতের কাজ করতে পারে প্রভু?—নাপিতও এবার আকুল ভাবে কেঁদে উঠলো।

গৌরাঙ্গ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—"না, তোমাকে আর নাপিতের কাজ

এরপর আর কি? নাপিত কাঁদতে-কাঁদতেই সুরু করলো তার কাজ। যারাই সেখানে ছিল, সকলেই অশ্রু চোখে—রুদ্ধ নিশ্বাসে দেখতে লাগলো সেই করুণ দৃশ্য!—সেই রেশম-কোমল ভ্রমর কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশদাম যখন গুচ্ছ-গুচ্ছ করে ক্ষুরের মুখে মাটিতে পড়তে লাগলো, তখন সকলেরই মনে হলো যেন তাদেরই বুকের পাঁজরা এক-একটি করে খসে পড়ছে। মুণ্ডন শেষ হলে নাপিত তার 'ক্ষুর-ভাঁড়টা' নিয়ে হরি বলে নাচতে নাচতে—ছুটলো গঙ্গার দিকে। চোখের জলে তার বুক-ও তখন ভেসে যাচ্ছে! চিরজীবনের মত সে তার ক্ষুর-কাঁচি ইত্যাদি বিসর্জন দিলে গঙ্গা-গর্ভে!

এ-দিকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহানন্দে গঙ্গাস্নান করে আর্দ্রবস্ত্রে দাঁড়ালেন এসে ভারতীর সম্মুখে। সকলে সমস্বরে চারিদিক থেকে উচ্চ হরিধ্বনি করে উঠলো। কীর্তনীয়াগণ খোল-করতাল সহযোগে কীর্তন সুরু করলেন। দুই একটি অন্যান্য অনুষ্ঠানের পর কেশব ভারতী তিনখণ্ড গৈরিক বস্ত্র নিয়ে এলেন,—একখানি কৌপীন,—আর দুখানি বহির্বাস। শ্রীগৌরাঙ্গ অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করলেন বৈরাগ্যের সে গৈরিক বাস। সমাগত জনগণের দিকে চেয়ে বললেন অশ্রু সজলকণ্ঠে,—বাবা, মা, তোমরা সকলে আশীর্বাদ কর,—আমি যেন ব্রজধামে গিয়ে আমার প্রাণধন কৃষ্ণকে পাই।

কারো কণ্ঠে দুঃখের আবেগে কোন কথাই ফুটলো না। কি বলবে তারা? —সকলেই তখন উদ্‌গত অশ্রু-দমন করতেই ব্যস্ত। কৌপীন-বহির্বাস-পরিহিত, মুণ্ডিত মস্তক, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, আজানুলম্বী বাহু,—দীর্ঘকায় তরুণ সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে অন্তরে অন্তরে তখন এক প্রবল আলোড়ন চলছে। কিন্তু কিসের?—সে উপলব্ধি শক্তি তখন যেন কারো নেই। সন্ন্যাসী-বেশী শ্রীগৌরাঙ্গের বর-অঙ্গে ফুটছে তখন এক অলৌকিক দিব্য জ্যোতিঃ,—চোখ-মুখ ভরে উঠেছে এক অপার্থিব আলোকে।

ভারতীর বাম পার্শ্বে বসলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। সহসা তাঁর একটা কথা মনে পড়ে গেল। মৃদু স্বরে বললেন তিনি ভারতীকে,—প্রভু, শুনুন, স্বপ্নে এক-ব্রাহ্মণ আমাকে একটি মন্ত্র দিয়েছিলেন। আপনি সে মন্ত্রটি শুনে বিবেচনা করে দেখুন, আমাকে অন্য মন্ত্র দেবেন কি সেই মন্ত্রই দেবেন।'—ভারতীর কানে কানে তিনি সে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন।

'এই মন্ত্রই ঠিক!'—ভারতীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনিও যেন এতক্ষণ তাঁকে কি মন্ত্র দেবেন ঠিক খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বললেন

প্রফুল্ল কণ্ঠে,—'তোমার আর দ্বিতীয় মন্ত্র কি? তোমার মন্ত্রই তুমি গ্রহণ কর।'—ভারতী সেই মন্ত্রই দান করলেন শ্রীগৌরাঙ্গকে।

মন্ত্র-দীক্ষার পর সন্ন্যাসের বিধি-মতে নিমাইয়ের পুনর্জন্ম হলো। পূর্ব আশ্রমের সমস্ত পরিচয়ও হোল লুপ্ত। এখন তাঁর সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম দরকার। এই নামেই এবং গুরুর পরিচয়েই এখন তাঁর পরিচয়। ভারতী ভাবতে লাগলেন,—কি নাম রাখবেন তিনি—তাঁর এই অসাধারণ নূতন শিষ্যের। তাঁর মন্ত্র তিনি তাঁকেই দান করছেন,—গঙ্গাজলেই গঙ্গার পুজো হয়েছে। জগৎ-গুরু যদি শিষ্যের ভূমিকায় এসে দাঁড়ান,—কোন মন্ত্রে তাঁকে দীক্ষিত করবেন—গুরু? কি করে পরিমাপ করবেন তাঁর সৌভাগ্যের? এই নূতন শিষ্যের নাম রাখতে হবে,—যা তাঁর স্বরূপকে ব্যক্ত করে তাঁর অন্তর্নিহিত ভাবটিকেও মূর্ত করে তোলে!

অনেক ভেবে শ্রীগৌরাঙ্গকে ডেকে বললেন তিনি গভীর কণ্ঠে,—'নিমাই, —তুমি জীবমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চৈতন্য এনেছ,—তোমার সমগ্র চৈতন্য-জুড়েও বিরাজ করছেন শ্রীকৃষ্ণ,—তাই আজ থেকে আমি তোমার নাম দিলাম—'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।'

—চারিদিকে একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠলো,—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।'... 'নিমাইও হরি হরি বলে আনন্দে নাচতে লাগলেন দু'বাহু তুলে। আজ থেকে তিনি কেশর ভারতীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আজ বিশ্ব তাঁর ভবন,—বৃক্ষতল তাঁর আশ্রয়। জগতের যত পুরুষ তাঁর পিতা,—যত নারী তাঁর মা! আজ তিনি কেশব ভারতীর মন্ত্র-সন্তান,—আত্মীয়-স্বজন-পরিচয়-হীন—কপর্দকশূন্য নিঃসম্বল সন্ন্যাসী! সম্বলের মধ্যে দণ্ডকমণ্ডলু,—আর কৌপীন! —জীবিকার উপায়,—'ভিক্ষা!'.........

বয়স তখন তাঁর চব্বিশ বৎসর।

৫৩

—"প্রভু, প্রভু, নিমাই, নিমাই!"

মন্ত্রণালয়ের পরই শ্রীগৌরাঙ্গ ছুটেছেন শ্রীধাম বৃন্দাবনের উদ্দেশে,—হাতে দণ্ড, কটিতটের ডোরে বাঁধা করোয়া—পরণে কৌপীণ—পাগলের মত উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ছেন;—মন থেকে সরে গেছে নবদ্বীপ—শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া, ভক্তগণ—কাটোয়া, কেশব ভারতী—ইত্যাদি সব। কানের মধ্যে শুধু সেই শ্যামসুন্দরের বাঁশরীর তান,—চোখে তারই আঁখি-বিমোহন ভুবন-ভোলান রূপ;—মুখে 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ'.—অন্তরে শুধু বৃন্দাবন—বৃন্দাবন!

যেমন করে হোক—যত শীগগির হোক,—পেঁছিতে হবে বৃন্দাবনে—মুকুন্দ ভজনা করবেন সেখানে গিয়ে,—এই চিন্তায় ভুলেই গেছেন—কতদূরে বৃন্দাবন,—কতদিন যেতে সময় লাগবে,—কত দুঃখকষ্টেই বা পেঁছিতে হবে সেখানে। যেন আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করবার সময় নেই,—এক-একটি পদক্ষেপে যদি এক-এক ক্রোশ এমন কি—এক-এক যোজন পথ হাঁটতে পারতেন,—তবেই বুঝি মনের সাধ পূর্ণ হতো তাঁর!

পেছনে পেছনে ছুটে ছুটে আসছেন—নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, গদাধর ইত্যাদি ভক্তগণ—এবং তাঁদেরও পেছনে অসংখ্য নর-নারী। আকুল উচ্চকণ্ঠে ডাকছেন তাঁরা,—কিন্তু কেই-বা শোনে—কারই বা কান আছে পেছনে? পশ্চাতের সব কিছু ফেলেই ছুটেছেন যিনি সম্মুখে একটি মাত্র লক্ষ্য স্থির করে—পেছনের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কে? তাছাড়া,.প্রভুর দীর্ঘ সবল দেহ—দীর্ঘ পদক্ষেপ,—মনে প্রবল আবেগ,—অন্তরে দুর্বার আকুলতা,—ছুটে ছুটে কেউই আর তাঁর নাগাল পান না।

অবশেষে প্রাণপণে ছুটে এক জায়গায় চন্দ্রশেখর, নিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রভুর পথ আটকে ফেললেন। চন্দ্রশেখরকে দেখতেই চমকে উঠলেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—মনে পড়লো তাঁর—নবদ্বীপ,·মনে পড়লো স্নেহময়ী জননী শচীকে,—মনে পড়লো,—সরলা কিশোরী পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে,—মনে পড়লো আর আর প্রিয়-

জনদের,—ভগবৎ-আবেশ কেটে গেল তাঁর,—মায়া-মুগ্ধ জীবের মত—তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠলো প্রগাঢ়-সুন্দর মায়া-মমতার ছায়া,—'বাবা, বাবা,'—চন্দ্রশেখরের দু'হাত ধরে তাঁকে সেখানে বসিয়ে—নিজেও বসে বললেন,—তুমি বাবার মৃত্যুর পর থেকেই আমাকে পিতার মতই স্নেহ করেছ।—আজ আমার বন্ধন-মোচনেও সহায়তা করে কৃতার্থ করেছ আমাকে। এখন আর আমার পিছুপিছু না এসে—ফিরে যাও নবদ্বীপে,—মা'কে সান্ত্বনা দাও,—আমার বিচ্ছেদে যাঁরা কাতর,—তাঁদের শান্ত কর। মা যেন আমার দুঃখে কেঁদে কেঁদে মারা না পড়েন! আমি এ জন্মে সকলকে দুঃখ দিতেই জন্মেছিলাম। যেদিন গয়ায়—ওই যে, ওই যে-ওই আমার শ্যামসুন্দর—ওই-ওই আমার কৃষ্ণ—আমায় ডাকছে। যাই, যাই, হে প্রাণবল্লভ, এই যাচ্ছি আমি।—

বলতে বলতেই শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যুৎ-গতিতে উঠেই—দিক-বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটলেন—পুনরায় প্রান্তরের পথে।—কোথায় পড়ে থাকলেন চন্দ্রশেখর—কোথায় নিত্যানন্দ!—এতক্ষণ কি কথা হচ্ছিল,—সে সকল যেন আর মনেই থাকলো না তাঁর। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভৃতিও পিছু হটবার নন,—তাঁরাও সমান বেগে দৌড়লেন প্রভুকে অনুসরণ করে।

এরপর কখনো তাঁরা প্রভু থেকে বহুদূরে পড়ে যান, কখনো বা পথের বাঁকে তাঁর কাছাকাছিই এসে পড়েন, তাঁদের নিজের কোন গতিবিধি নেই,—প্রভু যেদিকে যান,—তাঁরাও ছোটেন সেই দিকে। কোন কোন সময়—প্রভু একেবারে তাঁদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যান। অনেকক্ষণ ভক্তরা তাঁর উদ্দেশই পান না; চিন্তায় অধীর হয়ে ওঠেন।.........

এ-দিকে নবদ্বীপের সর্বত্র উঠছে তখন হাহাকার! শচী তো সেই ভোর থেকে কাঁদছেন ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে,—তাঁর আর্তকণ্ঠে 'নিমাই নিমাই' ধ্বনি —যেন পশুপক্ষীরও প্রাণ অধীর করে তুলছে! বিষ্ণুপ্রিয়া কখনো অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন,—আবার একটু পরেই 'প্রভু, প্রভু' বলে হাহাকার করছেন! কারো মুখে সেই থেকে আর এক বিন্দু জলও পড়েনি। গৌরাঙ্গের ভক্তগণ কাঁদছেন অঝোরঝোরে,—'প্রভু, ফিরে এসো, হে নবদ্বীপের প্রাণ, ফিরে এসো তোমার লীলাস্থল নবদ্বীপে!'—ঘরে ঘরে নর-নারী অশ্রুসজল কণ্ঠে ডাকছে,—'হে গৌরাঙ্গ, ফিরে এসো!' এমনকি,—যাঁরা ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন নিমাইয়ের,—তাঁদেরও আজ মনের মোহ কেটেছে,—তাঁদেরও অন্তর আকুলভাবে আহ্বান করছে,—নিমাই, নিমাই, ক্ষমা কর আমাদের। আমাদের ওপর অভিমানেই কি চলে গেলে তুমি?—ফিরে এসো নিমাই,—ফিরে এসো,—হে নবদ্বীপের আলো, ফিরে এসে আমাদের পথ দেখাও।'

শ্রীবাসের তো কথাই নেই,—শ্রীবাসের আঙিনাও আজ যেন কাঁদছে,—

শ্রীবাসের আঙিনায় নাচে গোরা রায়।”—কিন্তু আর কে নাচবে? বাহ্যজ্ঞান-লুপ্ত হয়ে দুই দীর্ঘবাহু উত্তোলন করে 'হরি হরি' বলে—কে আর আছাড় খেয়ে পড়বে সেখানে? শ্রীবাসের আঙিনার প্রতি ধূলিকনা যে পূত হয়ে আছে—সেই গৌরাঙ্গ-সুন্দরের পুণ্য অঙ্গ-স্পর্শে;—প্রতি ধূলিকনাও বুঝি কাঁদছে আজ সেই বিরহে!—পুণ্যতোয়া জাহ্নবীও যেন কলকণ্ঠে ডাকছে—'ফিরে এসো, হে দেবতা, ফিরে এসো,—আবার আমার বুকে তেমনি করে খেলা কর।' নবদ্বীপের প্রতি বৃক্ষ-লতা-গুল্মও যেন কি গভীর বেদনায় মুহ্যমান হয়ে উঠেছে—বাকশক্তি নেই—কিন্তু প্রাণ তো আছে তাদের? তাদের প্রাণের বাণীও যেন গুমরে উঠছে শাখায় শাখায়, পত্রে পত্রে—হে গৌরাঙ্গ, ফিরে এসো!

অসংখ্য প্রাণের এই আকর্ষণ, এই আকুল আহ্বান অগ্রাহ্য করে চলে যাবার শক্তি বুঝিবা ভগবানেরও নেই। শ্রীচৈতন্য চলছেন,—ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে উঠছেন,—শীতকাল; তবু সর্বাঙ্গে ঘাম ছুটছে; কিন্তু বৃন্দাবনের দিকে একটি পা-ও অগ্রসর হতে পারছেন না। কি যে হচ্ছে তাঁর—ঘুরে ঘুরে তিনি এক পথই হাঁটছেন সাতবার করে। অথচ তাঁর মনে দৃঢ় ধারণা—তিনি ক্রমশঃই অগ্রসর হচ্ছেন বৃন্দাবনের দিকে। মাঝে মাঝে মন উচাটন হয়ে উঠছে,—একসঙ্গে সহস্র কাতর কণ্ঠ বেজে উঠছে যেন কানে,—একবার করে থমকে দাঁড়াচ্ছেন,—আবার চলছেন,—মুখে—“আমার কৃষ্ণ, আমার কৃষ্ণ,”—অন্তরে—বৃন্দাবন, বৃন্দাবন!

এমনি করে কোথা দিয়ে কেমন করে যে দুটি দিন দুটি রাত চলে গেল,—তা আর বর্ণনার নয়! মুখে একবিন্দু জলও পড়েনি এর মধ্যে। তৃতীয় দিন সকাল বেলায়,—এক জায়গায় এসে দেখলেন,—কয়েকটি রাখাল বালক গরু চরাচ্ছে।—রাখাল বালকেরা তাঁকে দেখেই মহানন্দে আপনভাবেই বলে উঠলো 'হরি-হরি'!—প্রভুর তখন বাহ্যজ্ঞান একেবারে নেই,—মনে শুধু একটি কথা,—বৃন্দাবন। অন্তরেও জেগে উঠলো,—দ্বাপরের সেই বৃন্দাবনের কথা,—সেই রাখালগণের ধেনু-চারণ! ভাবলেন,—তবে তিনি বৃন্দাবনের কাছাকাছিই এসে পড়েছেন। প্রেমানন্দে মন ভরে উঠলো তাঁর,—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রাখাল বালক-দের ডেকে বললেন,—'বাবা, তোমরা আজ আমার পরম উপকার করলে,—আমি আজ তিনদিন হরিনাম শুনিনি। বল আবার বল,—শ্রীহরি-শ্রীহরি।'

'শ্রীহরি-শ্রীহরি।'—করতালি দিয়ে নেচে উঠলো রাখালেরা। দীপ্ত কাঞ্চন-বর্ণ—পরম সুন্দর এমন তরুণ সন্ন্যাসী তারা আর তাদের বালক বয়সে দেখেনি। যতই তারা প্রভুর দিকে চায়,—ততই তাদের মনে উল্লাস জেগে ওঠে,—আর মুখে সমস্বরে বলে,—হরি-হরি!

পরম তুষ্ট হয়ে প্রভু তখন বললেন,—বাবা, বৃন্দাবন আর কতদূর বলতে পার? পথটা আমাকে একটু দেখিয়ে দাও তো।

এ-দিকে নিত্যানন্দ ও চন্দ্রশেখর প্রাণের সমস্ত মমতা বিসর্জন দিয়েও প্রভুর একান্ত অজ্ঞাতে তাঁকে অনুসরণ করতে করতে—ঠিক এই সময়েই তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাহ্যজ্ঞানহারা প্রভুর কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। সুযোগ বুঝে—নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরকে চুপিচুপি বললেন,—"আপনি যান —যত শীগ্‌গির পারেন শান্তিপুরে,—গঙ্গার ঘাটে শ্রীঅদ্বৈতকে নৌকা প্রস্তুত রাখতে বলবেন। প্রভু এখন বাহ্যজ্ঞানহারা,—আমি কোন রকমে তাঁকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবো সেখানে।

চন্দ্রশেখর আর পলক-ও দেরী করলেন না। তদ্দণ্ডেই ছুটলেন শান্তি-পুরের দিকে। এদিকে প্রভু যেমনি রাখাল বালকদের বৃন্দাবনের পথের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন,—অমনি একান্ত সন্তর্পণে—নিত্যানন্দ বালকদের ইঙ্গিত করলেন—শান্তিপুরের পথটা দেখিয়ে দিতে। রাখাল বালকরা যন্ত্রচালিতের মতই হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে—শান্তিপুরের পথ।

আর কি? তবে তো বৃন্দাবন পেঁছিলাম বলে! মহানন্দে প্রভু ছুটলেন—বৃন্দাবন ভ্রমে শান্তিপুরের দিকে। নিত্যানন্দও ছুটলেন পেছনে পেছনে।—খানিকটা এগিয়েই তিনি সহসা ধরে ফেললেন প্রভুকে।—একেবারে গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর সম্মুখে,—'প্রভু, প্রভু!'—কণ্ঠ তাঁর আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল। দুইগণ্ড বেয়ে ঝরতে লাগলো অশ্রুধারা।

চমকে উঠলেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—কে, কে?—চোখে যেন গভীর নিদ্রার ঘোর লেগে রয়েছে।

'প্রভু'—নিত্যানন্দের-কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো,—'আমাকে চিন্‌তে পারছেন না?'

'চেনা-চেনাই যেন মনে হচ্ছে!'—গভীর নিরীক্ষায় প্রভু চাইলেন নিত্যানন্দের মুখের পানে—তখনও যেন ঠিক চিনতে পারছেন না! কিছুক্ষণ পরে যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়েই বললেন,—তুমি শ্রীপাদ না?

'অধম সেই বটে!'—নিত্যানন্দ প্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। প্রভু ব্যস্ত-সমস্তভাবে তাঁকে বুকে তুলে বললেন,—"এসো, এসো, ভারী আনন্দ পেলাম তোমাকে দেখে। তা তুমি এতদূরে এসে পড়লে কেমন করে?"

শ্রীগৌরাঙ্গের ধারণা, তিনি বৃন্দাবনের কাছাকাছি এসে পড়েছেন।—নিতাই তাঁর সে ধারণা ভাঙতে চাইলেন না,—কেন না, বাহ্যজ্ঞান কোনরকমে ফিরে এলে—তিনি আর প্রভুকে নিয়ে যেতে পারবেন না শান্তিপুরে। তিনি কণ্ঠে সহজ আনন্দ এনে বললেন,—"আমিও যে আপনার সঙ্গে বৃন্দাবন যাব।"

'তুমিও যাবে?—বেশ, বেশ!'—পুলকিত হয়ে ওঠেন গৌরাঙ্গ,—'সেই ভাল হবে। দুজনে গিয়ে মুকুন্দ ভজনা করবো। খুব ভাল কাজ করেছ তুমি। তা শ্রীপাদ, বৃন্দাবন আর কতদূর?...শোন শ্রীপাদ, বৃন্দাবনে গিয়ে আমরা মাধুকরী করবো.—ব্রজের ধুলোয় গড়াগড়ি দেব।—

নিত্যানন্দ দেখলেন, কথায় কথায় প্রভুর যদি আবার ভাবাকুলতা জেগে ওঠে,—তবে হয়ত তাঁকে আর আয়ত্তে রাখা কঠিন হয়ে উঠবে। ব্যাপারটাকে হালকা করবার জন্যে তিনি একটু কৌতুক করেই বললেন,—'প্রভু, আজ দু'তিন-দিন কিছু খাইনি,—ক্ষিদে তেষ্টায় প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে!—তোমার কি? 'হরিনাম পান' করলে তোমার আর কিছু চাই না।—কিন্তু তোমার নিতাই তো পেটুক জানোই? আগে চল, বৃন্দাবনে পেঁৗছি,—মুখে কিছু দিই তবে সে সব যুক্তি করবো।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি নিত্যানন্দের ভাব ছিল—কখনো দাস্য,—কখনো সখ্য,—তাই প্রভু তাঁর কথায় কোনরূপ অসন্তুষ্ট না হয়েই বললেন,—"সেই ঠিক, সেই ঠিক, চল। কিন্তু বৃন্দাবন আর কতদূর তা তো বললে না।"

অদূরে সুরধুনীর তীর এবং একটি বিশাল বটবৃক্ষও দেখা যাচ্ছিল,—নিত্যানন্দ অঙ্গুলি-সংকেত করে বললেন,—"ঐ যে দেখছেন বটগাছ—"

'হ্যাঁ-হ্যাঁ'—আকুল হয়েই বাধা দিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—"ঐ বুঝি বৃন্দাবনের অক্ষয় বট?"

নিতাই বুঝলেন,—প্রভুর বর্হিচেতনা বলতে তখন কিছু নেই,—তাই সুযোগ বুঝে তিনিও সায় দিলেন.—'হাঁ প্রভু,—আর ঐ-যে নদীর তীর দেখছেন,—ঐ যমুনা।'—অক্ষয় বট এবং যমুনার নামে প্রভুর চোখে জল এলো,—"চল,—চল, তাহলে তো এসেই পড়েছি!

'হাঁ-প্রভু,—জেনে শুনেও তিনি প্রভুকে ছলনা করছেন। শচীদেবীকে তিনি কথা দিয়ে এসেছেন'—যেমন্ করেই হোক তাঁর ছেলেকে ফিরিয়ে এনে—মিলন ঘটাবেন তাঁর সঙ্গে। শোকাকুলা বৃদ্ধা জননীর সেই অশ্রুপূর্ণ আঁখি দুটি ঘনঘন মনে পড়ছে তাঁর।—তাঁর প্রাণের বেদনা বুঝেই নিত্যানন্দ নিয়েছেন,—এই ঘোর ছলনার দায়িত্ব। তাঁর আশা আছে,—তাঁর এই অপরাধ যত গুরুই হোক,—এর একটা মহান কল্যাণের দিকও আছে,—প্রভুর ক্ষমা তাঁর ভাগ্যে দুর্লভ হবে না।

এর পর বৃন্দাবনের ভাবে আত্মহারা শ্রীগৌরাঙ্গ পরম সুখে বিশ্রাম করলেন—অক্ষয়বট-ভ্রমে.—সেই নাম-না-জানা বটবৃক্ষের তলায়,—যমুনা-ভ্রমে স্নান করলেন—"হরে কৃষ্ণ" নাম জপ করতে করতে—গঙ্গার জলে। স্নানের পর উঠে এলেন তিনি আবার সেই বটবৃক্ষের পাদমূলে।—শীতকাল,—সর্বাঙ্গে

এক কৌপীন ছাড়া আর কিছু নেই,—গা-মোছা তো দূরের কথা,—সিক্ত কৌপীন ছেড়ে—শুষ্ক কৌপীন পরেন,—এমন দ্বিতীয় কৌপীনও নেই সঙ্গে। কৌপীন-খানি যে বদলাতে হবে—সে জ্ঞানও নেই,—সর্বাঙ্গে জল ঝরছে—সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই।

এমন সময় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য এসে পৌঁছলেন সেখানে। প্রভুর সেই অবস্থা দেখে তাঁর বুক যেন ফেটে গেল,—হায়, হায়, এই মানুষটিরই চলার পথে নবদ্বীপের লোক ফুল ছড়াতো,—এঁরই একটি মুখের কথা শুনবার জন্যে—শতলোক অপেক্ষা করতো সাগ্রহে। আজ তিনি নিঃসহায়—নিঃসম্বল—পথের ভিখারী।—ওঃ কি মর্মান্তিক!

এ-দিকে প্রভুর দুই চোখে তখন কেমন যেন সন্দেহ এবং বিস্ময় ঘনীভূত হয়ে এসেছে,—সেই দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করছেন তিনি অদ্বৈতাচার্যের আপাদ-মস্তক,—একটু পরে বললেন,—কণ্ঠে যেন দ্বিধা জড়িয়ে রয়েছে,—ও-কে?—অদ্বৈতাচার্য না?—জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলেন তিনি নিত্যানন্দের দিকে।—নিত্যানন্দের বুকের স্পন্দন তখন দ্রুত হয়ে উঠেছে,—এই রে, এইবার বুঝি ধরা পড়তে হয়! প্রভুর দৃষ্টি তখন ঘুরে ফিরে পড়ছে,—একবার নিতাইয়ের মুখে—একবার অদ্বৈতের মুখে।—যেন ধাঁধায় পড়ে গেছেন!

অদ্বৈতাচার্য তখন প্রভুকে প্রণাম করলেন,—'হাঁ, প্রভু, আমি।' এর আগে হলে শ্রীগৌরাঙ্গ হয় অদ্বৈতকে প্রণাম করতে দিতেন না,—নয় ঘুরে নিজেও তাঁর পায়ের ধুলো তুলতেন মাথায়। কিন্তু আজ তিনি সন্ন্যাসী,—সন্ন্যাসীর প্রণাম গ্রহণের অধিকার শাস্ত্রবিধি,—কিন্তু সন্ন্যাসী ব্যতীত অপর কাউকে প্রণাম করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সন্দিগ্ধ স্বরে তিনি প্রশ্ন করলেন,—তা' তুমি এখানে এলে কেমন করে?—তুমিও কি বৃন্দাবন যাবে না-কি?

তীক্ষ্নবুদ্ধি অদ্বৈতের তখন বুঝতে বাকী থাকলো না,—নিতাই প্রভুকে বৃন্দাবন বলে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছেন এখানে। কাজেই তখন কথাটা না—ভেঙ্গে শুধু বললেন,—"হ্যাঁ, আমরা সবাই বৃন্দাবন যাবো। তুমি এখন এই শুষ্ক কৌপীন, আর বহির্বাস পর।"—চন্দ্রশেখরের মুখে সব সংবাদ পেয়ে—তিনি বুদ্ধি করে—কৌপীন আর বহির্বাস এনেছিলেন সঙ্গে। প্রভুর সন্দেহ তখন ক্রমেই বেড়ে উঠছে,—চারিদিকে চাইছেন তিনি—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। এদিকে অদ্বৈতাচার্য আর প্রাণের আবেগ চেপে রাখতে পারলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের সেই সুমোহন নাগর-বেশ ঘনঘন মনে পড়ে তাঁর অন্তর যেন অধীর হয়ে উঠলো ব্যথার তাড়নায়! মুণ্ডিত-মস্তক, কৌপীন-পরিহিত প্রভুর দিকে চাইতে চাইতে আত্ম-সংযম হারিয়ে অবশেষে হু-হু করেই কেঁদে ফেললেন তিনি।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো,—আবেশ কেটে যেতেই চমকে উঠলেন তিনি,—এ-কি,—এ যে তাঁর বহু পরিচিত জাহ্নবী,—তিনি দাঁড়িয়ে আছেন শান্তিপুরের ঘাটে। ঐ বটবৃক্ষ তো অক্ষয় বট নয়! কিন্তু—কিন্তু কেমন করে সম্ভব হলো এই অকল্পিত অসম্ভব ব্যাপার?—তিনি যাচ্ছিলেন বৃন্দাবন, অথচ—তীব্র দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের দিকে,—তবে কি নিত্যানন্দ তাঁর বাহ্যজ্ঞান-হারা অবস্থার সুযোগে তাঁকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছেন এখানে?—"শ্রীপাদ শ্রীপাদ," কণ্ঠে আকুলতা ফুটে উঠলো তাঁর,—'তুমি আমাকে ছলনা করেছ? কোথায় বৃন্দাবন?—কোথায় যমুনা,—এ-তো জাহ্নবী,—হায়, হায় তবে তো আর আমার মুকুন্দ-ভজনা হলো না?'—একেবারে কেঁদে ফেললেন প্রভু!

নিত্যানন্দের মুখে তখন আর কথা নেই। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি নতশিরে।—অদ্বৈতাচার্য বললেন,—প্রভু, নিত্যানন্দকে ক্ষমা কর। তুমি এমনই নিঠুরালী করে চলে যাবে,—আমরা প্রাণে বাঁচবো কি করে? যারা তোমাকে শুধু একবার দেখবার জন্যেই প্রাণে বেঁচে আছে,—তাদের দুঃখে বিচলিত হয়েই নিত্যানন্দ তোমাকে নিয়ে এসেছেন শান্তিপুরে। প্রভু সদয় হও, জীবের কল্যাণে তুমি সন্ন্যাস নিয়েছ,—আমরাও তোমার জীব। এখন চল,—নৌকা প্রস্তুত,—দাসের বাড়ি পায়ের ধুলো দাও। আজ তিনদিন মুখে জলও পড়েনি,—দুটো অন্ন আজ মুখে দিতে হবে।'

'শ্রীপাদ আমাকে নিয়ে যেন পুতুল খেলা খেলেছেন!'—প্রভুর বুক তখনও ফুলে উঠছে অভিমানে। অদ্বৈতাচার্য ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন,—'না, না, সে-কি,—তুমি যে ভক্ত-বৎসল! তোমার কৃপা ছাড়া কি তোমাকে পাওয়া যায়? ভক্তের প্রাণের টানেই তুমি এসেছ! এখন আর কথা নয়,—চল, নৌকায় ওঠ!'

অদ্বৈতাচার্যের কথা আর ঠেলতে পারলেন না প্রভু। ধীরে ধীরে গিয়ে নৌকায় উঠলেন। প্রভুর মৃদু তিরস্কারের কথা ভুলে নিত্যানন্দের বুকে তখন আনন্দের তুফান ছুটছে।

বাড়িতে এনে প্রভুর যথোচিত পরিচর্যা করলেন অদ্বৈতাচার্য। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে তাঁর আহারের আয়োজন করলেন। "না, না, না, এ সব কেন?"—ঘনঘন হাত নেড়ে বললেন প্রভু,—'আমাকে শুধু শাক আর ভাত দাও,—বাকী সব তুলে নাও।'—শাক অবশ্য বড়ই ভালবাসতেন প্রভু।

'শাকই তো দিয়েছি।'—অদ্বৈত প্রভুর কথায় কান না দিয়ে বললেন,—'আর দিয়েছি কি? সবই খেতে হবে তোমাকে। ওর একটি ফেলে রাখলেও আমি

মাথা খ‌ুঁড়ে মরবো।

উঃ, কি নিষ্ঠুর তুমি প্রভু!—

অদ্বৈতের চোখ দ‌ুটি ছলছল করে উঠলো। তাঁর সস্নেহ আবদার অগ্র প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না শ্রীগৌরাঙ্গ। দীর্ঘ উপবাসের পর আহার করলেন পরম তৃপ্তিতে। আহারের পর অদ্বৈত তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন স্বহস্তে শয্যা রচনা করে।

পরদিন সকালে প্রভুর অন‌ুমতি নিয়ে নিত্যানন্দ ছ‌ুটলেন নবদ্বীপে—শচীদেবীর কাছে। এদিকে তখন শ্রীগৌরাঙ্গের যাবতীয় সংবাদ বায়‌ু-বেগে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে,—সারবন্দী অসংখ্য লোক আসছে নানাদিক থেকে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দেখতে। অদ্বৈতাচার্যের সদর দরজায় ঠেলাঠেলি হ‌ুড়া-হ‌ুড়ি পড়ে গেছে সকাল থেকে। দশবিশজন পাহারাদার দিয়েও অদ্বৈত লোক-দের আটকে রাখতে পারছেন না। আকুল হয়ে উঠেছে সকলে প্রভুর দর্শনের আশায়।.........

গঙ্গাপার হয়ে প্রায় ছ‌ুটতে ছ‌ুটতেই নিত্যানন্দ এসে পেঁাছলেন নবদ্বীপে। কোথাও এক ম‌ুহ‌ূর্ত না দাঁড়িয়ে কারো কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একেবারে এসে দাঁড়ালেন শচীদেবীর গ‌ৃহদ্বারে,—'মা, মা, মা!'—ব‌ুকে হাঁপ ধরছে,—তব‌ু ডাকলেন আকুল উচ্চকণ্ঠে,—মা, মা!

তেমনি ধ‌ুলায় ল‌ুটিয়ে কাঁদছিলেন শচীদেবী। প্রাণারাম 'মা-মা' ডাকে ধড়মড় করে উঠেই ছ‌ুটে এলেন বাইরে—এদিকে তখন নিতাই-ও ঢ‌ুকে পড়েছেন গ‌ৃহাঙ্গনে;—"আমার নিমাই, আমার নিমাই."—নিতাইকে দেখতেই—কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন শচীদেবী,—নিতাই, নিতাই, কই?—কই আমার নিমাই?'—সে কি এলো না? তাকে কি পেলে না?—কণ্ঠ তাঁর উদ্বেগে কেঁপে কেঁপে উঠলো!

'শান্ত হও মা',—নিত্যানন্দ ধীর কণ্ঠে বললেন,—'তোমার নিমাইকে নিয়েই আমি ফিরেছি। তা না হলে নিতাইও আর ফিরতো না মা!—কিন্তু মা. তুমি তো জানো, প্রভুর সন্ন্যাস নেবার সংকল্প ছিল,—তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন, —তাই তাঁর আর নবদ্বীপে আসতে নেই মা। তিনি আছেন শান্তিপ‌ুরে—অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে। তুমি চল মা সেখানে।

"এই তিনদিনেই নবদ্বীপ ভুলে গেল নিমাই!"—ব‌ুকের ভেতরটা যেন ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো শচীর,—'হাঁ নিতাই, আমাকে তার মনে আছে তো?'

'সে-কি মা?'—নিতাই যেন চমকে উঠেই বললেন,—প্রভু, আমার মা, মা করে

অস্থির। কতই না দুঃখ করছেন তোমার জন্যে। তিনিই তো তোমাকে নিতে পাঠালেন মা। চল মা, শীগ্‌গির। সেইখানেই সব শুনবে।

আজ তিনদিন—ওঃ, সে কত দীর্ঘকাল,—নিমাইয়ের চাঁদ মুখখানি দেখেননি,—তা যেন ভাবতেও পারছেন না শচীদেবী!—সেই মুখখানি আজ গিয়ে দেখবেন,—কিন্তু এখনও কল্পনা করতেও পারছেন না,—কি বিরাট পরিবর্তনই না হয়ে গেছে এই তিন দিনের মধ্যে।—তিনি অধীর হয়েই বললেন,—"তবে নিতাই, আর এক পলকও দেরী নয়,—চল চল,—আমার নিমাই ডাকছে,—

'মা'—নিতাই বললেন—"তুমি একটু অপেক্ষা কর, ঈশানকে আমি একটা দোলা ঠিক করতে বলি। তোমার তো এমনি যাওয়া চলে না মা! তুমি যে আমাদের প্রভুর মা!

নিত্যানন্দ বাইরে আসতেই প্রভুর কথা কণ্ঠে কণ্ঠে প্রচারিত হয়ে পড়লো সারা নবদ্বীপে। নিতাই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করলেন,—যার ইচ্ছা হয়,—সেই প্রভুকে দেখতে যেতে পার। গোটা নবদ্বীপ ভেংগে পড়লো তাঁর পুণ্যদর্শনের জন্যে। শচীর নিমাই, নদীয়ার গোরাচাঁদ,—আজ জীবের মংগলে সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পরম স্নেহময়ী জননী,—অলোক-সামান্যা রূপীয়সী প্রেমময়ী তরুণী ভার্যা.—অসংখ্য ভক্তজনের প্রাণের পূজা-উপচার,—প্রচুর ঐশ্বর্য,—অপ্রমেয় মান-সম্মান,—প্রভাব-প্রতিপত্তি, যশখ্যাতি ইত্যাদি সবই ত্যাগ করেছেন তিনি অকাতরে—কৃষ্ণপ্রেমের আকুলতায়—জীবের কল্যাণে।—আজ তিনি শুধু ভক্তজনের প্রভু নন,—সর্বহৃদয়ের—সকল জনের প্রভু!—তাঁকে দর্শনের কামনা আকুল হয়ে না উঠবে কার হৃদয়ে ?.........

দোলা ঠিক হতে নিত্যানন্দ ফিরে এলেন আবার শচীর কাছে। তখন মালিনী প্রভৃতি মহিলারাও শান্তিপুর যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।... ও-পাশে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। 'প্রস্তুত' বলতে তিনি বেশভূষা কিছুই করেননি?—আবার তাঁর বেশভূষা কেন? যাঁর জন্যে বেশভূষা,—তিনি যখন সন্ন্যাসী,—তখন তিনিও তো সন্ন্যাসিনী! তাঁর প্রভু জীবের কল্যাণে—কাঙ্গাল হয়েছেন,—তিনি তো তবে কাংগালিনী! দুটি আয়ত নয়ন তাঁর সিক্ত ফুটন্ত দুটি ফুলের মতই ছলছল করছে! আজ তিনদিন ধরে তাঁর আহার নিদ্রা নেই,—প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে শুধু তাঁর জীবন-দেবতার চিন্তায়।

যদবধি গোরা ছাড়িল নদীয়া।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥

তবু স্বামীকে একবার চোখের দেখাও দেখবেন,—আকুল হয়ে উঠেছেন এই মধুর আশায়। সহসা নিত্যানন্দের কণ্ঠে যেন বজ্রই খসে পড়লো! অনেকক্ষণ

ইতস্ততঃ করছিলেন তিনি, কথাটা মুখে এনেও বলতে পারছিলেন না,—অথচ না বললেও নয়। অবশেষে বলতেই হলো,—"শ্রীমতীর" যাবার অনুমতি নেই। —কেঁপে উঠলো তাঁর স্বর যেন বেদনা-ভারে!

স্তব্ধ হয়ে গেলেন সকলে। বজ্রাহতের মতই বসে পড়লেন সেখানে বিষ্ণুপ্রিয়া। অদম্য অশ্রু আর বাধা না মেনে গড়িয়ে পড়লো তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে, —সকলের যাবার অনুমতি আছে,—শুধু তাঁরই নেই! তবে কি প্রভু সত্যই তাঁকে ত্যাগ করেছেন। আর সেই দেবতার স্ত্রী বলে পরিচয় দেবার গৌরবটুকুও কি তবে তাঁর নেই?

শচী চাইলেন বধূর দিকে,—দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে যেন অন্তরের সুতীব্র ব্যথা। আজ মনে পড়লো তাঁর—সেই গঙ্গাতীরে—এতটুকু একটি বালিকা যখন ধীরে ধীরে এসে প্রণাম করতো তাঁকে,—সে দিনের কথা। আহা, বাছা আমার,—জীবনে কোন সুখ-আহ্লাদই মেটেনি,—কতটুকুই বা জীবন! অথচ —ওরে না, না, নিমাই, এত নিষ্ঠুর হস না,—এই কচি বুকে আর আঘাত দিস্ না।—সহসা অভিমানে ফুলে উঠলো শচীর বুক,—নিতাইয়ের দিকে চেয়ে তিনি রুদ্ধ স্বরে বললেন,—"তবে আমিও যাবো না!"

এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে তখন ঘোর দ্বন্দ্ব সুরু হয়ে গেছে! সত্যই কি, তাঁর দেবোপম স্বামী তাঁকে ত্যাগ করেছেন? না, না, তাকি সম্ভব?— তিনি যে বারবার করে বলেছেন আমাকে,—"প্রিয়া, প্রিয়া, তুমি সর্বদা আমার অন্তরে থাক্‌বে।"—সত্যসন্ধ দেবতা,—তাঁর কথা কি মিথ্যা হতে পারে?— তাঁর এ ত্যাগ তো নিজের সুখের জন্যে নয়, জীবের কল্যাণে! আমাদের দুঃখের চেয়ে তাঁর নিজের দুঃখ কত কঠোর?—ছিঃ, ছিঃ, নিজের স্বার্থে— আমি তাঁকে এ-কিভাবে বিচার করছি? সন্ন্যাস নিয়েছেন তিনি,—এখন তো সন্ন্যাসের নিয়ম পালন করতে হবে? নইলে যে তিনি ধর্মে পতিত হবেন— লোকনিন্দা হবে তাঁর? আমি কি তাঁর ধর্মপথের বাধা হবো। না, না, না, —তিনি সন্ন্যাসী হলেও আমারই! আমাকে তিনি যা উপদেশ দিয়েছেন,— তাই করবো।

মনটা একটু হালকা হতেই শাশুড়ীর কাছে এসে বললেন,—না, মা, তুমি যাও। আর আমার দুঃখ নেই। প্রভু আমার প্রতি কোন নিষ্ঠুরতা করেননি, —তাঁর নিজের ধর্ম রক্ষা করেছেন।

'হায় রে তার ধর্ম!'—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন শচীদেবী। নিত্যানন্দ বললেন,—এসো মা, দুঃখ করো না। প্রভু অন্যায় বলেননি। 'বৌমাও' বুঝেছেন সে কথা।

অতঃপর বাড়িতে বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে—তাঁকে

নানা সান্ত্বনা দিয়ে শচীদেবী ধীরে ধীরে গিয়ে দোলায় উঠলেন। মালিনী প্রভৃতি উঠলেন অন্যান্য দোলায়। ভক্তগণ তো আগেই বেরিয়ে পড়েছেন। সারা নবদ্বীপ শহরেও তখন হুলস্থুল পড়ে গেছে।

৫৪

—শচী যখন অদ্বৈতাচার্যের বাড়ি পেঁাছলেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বাড়ির ছাতের ওপর বসে কৃষ্ণকথা আলোচনা করছিলেন আচার্যের সঙ্গে। সহসা মায়ের আগমন-সংবাদ পেয়েই,—তিনি দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন নীচে। —'কই, মা কই ?'—এর-ওর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি,—বিপুল আকুলতায়। ঠিক এই সময়েই শচী এসে উপস্থিত হলেন সেখানে।—'মা, মা', —আবেগময়কণ্ঠে মা'কে ডেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন প্রভু মাতৃ-চরণে।— সন্ন্যাসীর বিধি তিনি অবহেলেই অবহেলা করলেন মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাসে।

'নিমাই!'—শচীর সর্বাঙ্গ কাঁপছে,—যেন এখুনি পড়ে যাবেন।

কিন্তু পুত্রের মুখের দিকে চেয়েই সহসা অধীরতা কমে গেল তাঁর, —মুণ্ডিত-মস্তক সন্ন্যাসী-বেশী, নিমাই এক অলৌকিক জ্যোতিঃতে, এক অপার্থিব সত্তার মূর্তিমন্ত বিগ্রহরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠলেন জননীর চক্ষে, —সম্ভ্রম জাগলো শচীর মনে,—কে-এ জ্যোতির্ময় বিরাট পুরুষ ? স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন কি কোন দেবতা বিশ্বের কল্যাণে ? কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য, —পরক্ষণেই তিনি অধৈর্য হয়ে উঠলেন বাৎসল্যের মোহে—'নিমাই, নিমাই,'— কণ্ঠ তাঁর উদ্বেল হয়ে উঠলো ব্যথার আবেগে,—এই দৃশ্য দেখাবার জন্যেই কি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলি বাছা,—হাঁরে, কই—তোর সে চাঁচর কেশ ?—কই তোর সে মোহন বেশ ?—ছেলের আপাদ-মস্তক ও পরিধেয়ের দিকে চেয়ে— তাঁর বুকের পাঁজরাও যেন খসে গেল।—না, না,—ওরে নিমাই,—তোর এ-বেশ আমি দেখতে পারছি না ? ওরে কি করেছিস! কি করেছিস তুই!'—কেঁদে ফেললেন তিনি হু-হু করে।

—মাতৃপ্রাণের বেদনা উপলব্ধি করছেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—তিনি কোন কথা বলতে না পেরে শুধু গাঢ় স্বরে ডাকলেন,—মা!

নিমাই শচীর প্রাণ;—তাঁর চেয়ে প্রিয়জন সংসারে শচীর আর কে আছে?—তাই তাঁর ওপর অভিমানের মাত্রাও প্রবল হয়ে উঠলো শচীর,—"বাছা, নিমাই. এই জন্যেই কি আমি পিতৃহীন তোমাকে এতকষ্টে মানুষ করলাম,"—বাষ্পাকুলকণ্ঠে বললেন তিনি,—'এত দুঃখ-ধান্ধা করে লেখা পড়া শেখালাম? বুড়ো মায়ের ওপর কি বাছা একবিন্দুও মায়া হলো না? তুমি না জীবের দুঃখ দূর করবে? আমি কি তোমার জীব নই নিমাই? আর ঐ কচি-মেয়েটা,—ওর মুখের দিকে চেয়ে যে বুক ফেটে যাচ্ছে!—জানি না বাবা, এই করে তুমি কি ধর্ম অর্জন করবে?

চোখের জলে বুক ভেসে গেল তাঁর। শীর্ণগণ্ডের ওপর প্রবাহিত সে অশ্রুধারা,—কি মর্মান্তিক! উপস্থিত সকলের চোখও ভরে উঠলো জলে! নিমাইয়ের মুখে কথা নেই। নিতান্ত অপরাধীর মত নতশিরে শুনছেন মায়ের আক্ষেপ-বাণী। অলৌকিক সত্তার অধিকারী মায়া-মুক্ত বিরাট পুরুষ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এখন মায়ামুগ্ধ অপরাধী সন্তান নিমাই। সে মায়ামুগ্ধ অপরাধ-কুণ্ঠিতভাবে কি সুন্দর মানিয়েছে তাঁকে! জননীর স্নেহের পাদমূলে—ভগবৎ-সত্তা যেন লীন হয়ে গেছে তাঁর। মুখ তুলে তিনি চাইতেও পারছেন না মায়ের দিকে। অনেকক্ষণ পরে তাঁর মুখে কথা ফুটলো,—'মা, সত্যিই আমি তোমার চরণে সহস্র অপরাধে অপরাধী। মা—জ্ঞানে কি অজ্ঞানে হোক, —আমি তোমাকে কাঁদিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি।—আমি শতবার স্বীকার করছি, —এই বয়সে তোমাকে কাঁদিয়ে আমার যে-ধর্ম,—তা ধর্মই নয়। তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমার বুক আজ ফেটে যাচ্ছে। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ, —তার জন্যে সন্ন্যাসের কোন প্রয়োজন নেই,—তবু যে কেন, এ কাজ করলাম,—তা আমার কৃষ্ণই জানেন।'—বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ ক্রমশঃই ভারী হয়ে আসে, —চোখের কোণেও জল টলটল করে ওঠে।

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বললেন,—কিন্তু মা, তোমার সম্বন্ধে আমি কোনদিন উদাস থাক্‌বো না। তোমার সাংসারিক এবং পরমার্থিক সকল দায়িত্ব আমার। শোন মা, তোমার আকুল 'নিমাই, নিমাই,'—ডাক আমাকে একটি পা-ও অগ্রসর হতে দেয়নি বৃন্দাবনের পথে। এ-দেহ তোমারই দান,—এর ওপর সম্পূর্ণ অধিকার তোমারই। এখনও তুমি বিচার-বিবেচনা করে আমাকে যা করতে বলবে, আমি তাই করবো। স্বেচ্ছায় কিছুই করবো না। তবু মা, তুমি দুঃখ পাও,—এ আমার ইচ্ছা নয়।

'বাছা নিমাই',—মায়ের কাছে পুত্র তাঁর কৃতকর্মের জন্য অপরাধ স্বীকার

[illegible]—কোন মায়ের অন্তর আর্দ্র না হয়ে পারে? স্নেহাতুর চক্ষু দুটি ছেলের মুখের ওপর নিবদ্ধ করে শচী বললেন,—"আমি তো তোমার সংকীর্তনে বাধা কোনদিনই দিইনি বাবা। ভক্তগণ সকলেই রয়েছেন,—তুমি বাড়ি গিয়ে—আবার তাঁদের সঙ্গে কীর্তন কর। তুমি পথে পথে ভিক্ষা মাগবে,—এ যে আমি ভাবতেও পারছি না বাবা। বাবা, সন্ন্যাসী হয়ে পৈতা ফেলে দিয়েছ,—আমি আবার ভাল ব্রাহ্মণ এনে তোমার পৈতা দেব। তুমি ঘর ছেড়ে আসার পর—বৌমা আব এক পলকও ওঠেনি। বাপ আমার ঘরের 'ছেলে,—ঘরে চল,'—আর আমায় দুঃখ দিয়ো না।"—শ্রীগৌরাঙ্গের গলা জড়িয়ে ধরে বারবার তাঁর মুখ চুম্বন করতে লাগ্‌লেন শচীদেবী। তাঁর অন্তরের কথাগুলিই যেন প্রতিধ্বনিত হলো তাঁর কণ্ঠে।

বারেকের জন্যে নিমাইয়ের মনে হলো,—হায়, এই মাতৃস্নেহ, এ-কি এ পৃথিবীর? আমি হতভাগ্য,—তাই এমন স্বর্গীয় সুধাও বিসর্জন দিলাম নিজের হাতে।'—গলাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে তিনি বললেন,—'মা, এখন বিশ্রাম কর। পরে তোমার সঙ্গে আমি কথা কইবো।

অদ্বৈতের সহধর্মিণী সীতা ঠাকুরাণী সেখানে দাঁড়িয়ে মাতা-পুত্রের কথা-বার্তা শুনছিলেন। এই স্নেহ-ভক্তির পরিমাণ নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য মনে হচ্ছিল তাঁর। সাদরে শচীর হাত ধরে এবার তিনি অন্দরে নিয়ে গেলেন তাঁকে। শচীর মনের সাধ প্রবল হয়ে উঠলো,—তিনি সীতাঠাকুরাণীকে বললেন,—বোন আমি নিমাইকে রেঁধে খাওয়াবো। আমার সাধ পূর্ণ করতে দাও। নিমাই আমার যে-সব জিনিষ খেতে ভালবাসে,—আমি তাই রাঁধবো।

শচীর প্রাণের আকুতি বুঝে সীতাঠাকুরাণীর চোখেও জল এল,—'দিদি,'—গাঢ়কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন,—তোমার নিমাইকে যা সাধ যায়, তাই তুমি খাওয়াও। আমি সব যোগাড় করে দিচ্ছি। কোন কুণ্ঠা করো না। তুমি বরং শীগ্‌গির চান করে এসো। . . .

এখানে মায়ের কাছে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের সমস্ত নিয়ম ত্যাগ করলেন। পাছে সে কঠোর নিয়ম দেখে মায়ের প্রাণে ব্যথা জাগে!—'সন্ন্যাসের চিহ্ন,—শুধু পরিধানে কৌপীন,—আর বহির্বাস। বাকী নবদ্বীপে নিজের বাড়িতে মায়েব কাছে যেভাবে থাকতেন নিমাই,—তার কোনটিরই ব্যতিক্রম করলেন না। রোজ রোজ শচী ছেলেকে মনের সাধে রেঁধে খাওয়ান,—প্রভু ভালবাসেন বাস্তু-শাক, মোচা এবং গর্ভথোড়,—রসগোল্লা-সন্দেশের চেয়েও বেশি! শচী শাক এবং থোড় ইত্যাদি আনিয়ে—তারই নানা রকম ব্যঞ্জন রান্না করতে লাগলেন।

যেন এক মহোৎসবই সুরু হয়ে গেল— অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে। অসংখ্য দর্শনার্থী আসেন প্রভুর দর্শনলাভের জন্য,—ভক্তেরা দুইবেলা কীর্তন করেন,

—প্রভুও নাচেন তাঁদের সঙ্গে,—যেমন নাচতেন শ্রীবাসের আঙিনায়। শচীও দেখেন সে প্রেমাকুল নৃত্য।—দেখতে দেখতে তেমনি অধীর হয়ে ওঠেন নিমাই-য়ের ভাবনায়। নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, হরিদাস, মুরারি, গদাধর প্রভৃতি ভক্তেরা প্রতিটি মুহূর্ত প্রস্তুত থাকেন,—প্রভুর আদেশের অপেক্ষায়। বহুলোক প্রতি-দিন ঠাকুরের প্রসাদ পান অদ্বৈতের বাড়িতে। বিষয়-সম্পত্তির অবধি নেই অদ্বৈতের,—প্রভু তাঁর গৃহে অবস্থিতি করছেন,—এই আনন্দে তিনি বিভোর! অকাতরে অন্নদান করেন অসংখ্য অতিথি-অভ্যাগতজনকে।

প্রভুর আগমনে শান্তিপুরের ঘরে ঘরে সংকীর্তন সুরু হয়েছে। হরি-প্রেমের বন্যায় 'শান্তিপুর ডুবুডুবু!—নদে ভেসে যায়!' ভক্তেরা প্রায় সকলেই এসেছিলেন এখানে। কিন্তু গৌরাঙ্গের সর্বাপেক্ষা মরমী ভক্ত পুরুষোত্তম আচার্যই আসেননি। তিনি রাধাকৃষ্ণের গূঢ় অন্তর্লীলার সাধক,—শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করুন,—এ কামনা তাঁর কোনদিন ছিল না। কিন্তু যখন শুনলেন, —কাটোয়ায় গিয়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন,—তখন অভিমানে তাঁর অন্তর জর্জরিত হয়ে উঠলো,—উঃ, প্রভু, এত পাষাণ, এত নিষ্ঠুর! এমনি করে কাঁদাতে পারেন আপনজনকে। না, না, অমন নিষ্ঠুর প্রভুর মুখ-ও দেখতে নেই,—আর প্রভুকে ভজনা করবো না,—আর তাঁর নাম মুখে আনবো না। তিনি ক্রোধে অভিমানে একেবারে বারাণসী ধামে গিয়ে উপস্থিত হলেন।...... সেখানে গিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে প্রচার করতে সুরু করলেন গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধ মত। নাম হলো তাঁর 'স্বরূপ দামোদর।' বৈষ্ণব কবিগণ তাঁর এই ক্রোধ এবং অভিমানকে 'নিষ্ঠুর শ্যামের' প্রতি শ্রীমতী রাধিকার অভিমানের সঙ্গেই তুলনা করেন।......

এদিকে তিনদিন কেটে গেল মহানন্দেই। হঠাৎ প্রভু ডেকে বললেন একে একে ভক্তদের "আমার আর এভাবে অবস্থিতি ভাল নয়। আমি কালই এস্থান ত্যাগ করবো। কিন্তু বৃন্দাবন যাবার সংকল্প সম্প্রতি বাদ দিয়েছি। যেহেতু বহুদূর স্থান এবং বৃন্দাবন এখন অরণ্যময়!...বারাণসীতে যদি থাকি—তোমরা আমার কাছে যেতে পারবে না।...কিন্তু তোমাদের প্রাণে দুঃখ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। ইচ্ছা হলে যেখানে গিয়ে তোমরা আমার মিলন-সুখ ভোগ করতে পার,—আমিও তোমাদের পেয়ে আনন্দ পাই,—এমন জায়গা হচ্ছে 'নীলাচল।' যিনি ব্রজরমণ তিনিই নীলাচলচন্দ্র।'...নিত্য নীলাচন্দ্রকে দর্শন করবো,—আর কৃষ্ণ-ভজনা করবো। তাছাড়া,—নীলাচল হিন্দুরাজ্য—মহারাজ প্রতাপরুদ্র—তার অধিপতি,—তাঁর অধিকার মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত।... বাংলার খুবই নিকটে নীলাচল। সেখানে আমি নিরাপদেই ভজনা করতে পারবো। কিন্তু একটা কথা?

'কি-প্রভু ?'—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য চাইলেন প্রভুর দিকে সাগ্রহে। 'আমি মা'কে কথা দিয়েছি'.—ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—'আমার সম্বন্ধে তিনি বিচার-বিবেচনা করে যা করতে বলবেন, আমি তাই করবো। কাজেই—মায়ের অনুমতি ছাড়া আমি কিছুই করতে পারছি না। এমন কি, আমি প্রতিজ্ঞা করছি,—মা যদি আমাকে আবার নবদ্বীপে ফিরে গিয়ে ঘর-সংসার করতে বলেন, —আমি নির্বিচারে তাঁর আদেশ মাথায় তুলে নেবো। মাকে আমি কোন মতেই দুঃখ দিতে পারবো না। তোমরা তাঁকে আমার প্রার্থনা জানাও,—আমি নিজে গিয়ে সামনে দাঁড়ালে হয়ত তিনি বিচলিত হয়ে পড়বেন।

বিপুল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন ভক্তগণ। আনন্দ-ও উথলে উঠলো সকলের বুকে,—এ-যে কল্পনাতীত—অথচ একান্তই কাম্য!—প্রভু সন্ন্যাস ছেড়ে আবার ফিরে যাবেন বাড়ি,—তেমনি নাগর বেশে আবার সংকীর্তন করবেন ভক্তজন সঙ্গে,—এ আর কে-না চায়? সারা নবদ্বীপই তো তাই চাইছে! শচী-ঠাকুরাণীর আর দ্বিতীয় কথা কি ? তাঁর বুকের মাণিক,—নয়নের মণি,—সংসারের অবলম্বন,—বংশের দুলাল,—তিনি তো সর্বাগ্রেই করছেন সে কামনা? —অন্তর তো তাঁর প্রতিটি পলক আকুল হয়ে ডাকছে,—'নিমাই আয় ফিরে আয়!'—তিনি কি বলবেন,—নিমাই, তুমি অমনি ডোর কৌপীন পরে চলে যাও নীলাচলে? 'হরি-হরি' করে পাগলের মত ঘুরে বেড়াও পথে পথে?—প্রভু এবার নিজের জালে নিজেই পড়েছেন! আর তিনি আমাদের ছেড়ে যাবেন কোথায়?

আনন্দে কোলাহল করেই ভক্তরা উঠলেন গিয়ে শচীর কাছে,—মা, মা, ভারী সুযোগ উপস্থিত! তোমার মুখের মাত্র একটি কথা। এখন তুমি একবার বললেই হয়।—আর ভাববার-ও কিছু নেই মা! আনন্দের আতিশয্যে আসল কথটাই ঘুলিয়ে ফেলছিলেন তাঁরা,—এমনকি নিত্যানন্দও কি বলতে কি কথা আনতে হবে মুখে,—তা স্থির করে উঠতে পারছিলেন না। শ্রীঅদ্বৈত সকলের কোলাহলে বাধা দিয়ে অগ্রবর্তী হয়ে বললেন,—'ঠাকুরাণী, তোমার কাতর মুখের দিকে চেয়ে প্রভু বড় কাতর হয়ে পড়েছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন,—তোমার আদেশ ছাড়া, আর তাঁর দ্বিতীয় পথ নেই। যদি নীলাচলে গিয়ে কৃষ্ণ-ভজনা করতে আদেশ দাও,—তবে নীলাচলেই যাবেন। আর যদি সন্ন্যাস ছেড়ে নবদ্বীপে গিয়ে আবার ঘর-সংসার করতে বল,—তাতেও তাঁর অন্য মত নেই। তা মা, তোমার অন্তর তো আমরা জানিই। একবার মুখ খুলে বল,—আমরা প্রভুকে নিয়ে নবদ্বীপে যাবার ব্যবস্থা করি।

একযোগে সতৃষ্ণনয়নে ভক্তগণ চাইলেন শচীর মুখের দিকে। কিন্তু প্রস্তাবটা শুনেই শচী যেন কি-চিন্তায় ডুবে গেলেন! অতি সহজ প্রশ্ন,—যা'র

উত্তর ইতিপূর্বে একেবারে প্রস্তুতই ছিল তাঁর তুণ্ডাগ্রে;—সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া—সহসা অতি দুরূহ হয়ে উঠলো তাঁর পক্ষে। এ-দিকে ভক্তগণ আশা করেছিলেন,—তাঁরা বলতে না বলতেই শচী অধীর হয়ে উঠবেন ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু এ-কি? তিনি আবার ভাবছেন কি? ভক্তগণের আশ্চর্যের যেন সীমা থাকলো না! এক একটি নিমেষ তখন কাটছে তাঁদের বিপুল ব্যাকুলতায়। অনেকক্ষণ পরে শচীর মুখে কথা ফুটলো,—অন্তরের নিবিড় বেদনা মিশিয়ে রয়েছে তাঁর স্বরে,—উচ্ছ্বাসহীন মৃদুকণ্ঠে তিনি বললেন,—'দেখ, আমার তো চিরকালের সাধ ছিল নিমাই আমার সুখে ঘর-কন্না করুক,—নাতি-নাতিনীতে আমার ঘর ভরে উঠুক,—আমি তাদের নিয়ে আনন্দ করি। কিন্তু কে জানতো, বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। নিমাই আমার—আমার আঁখির তারা নিমাই—ঘরে ফিরে যাবে,—এর চেয়ে সুখের—এর চেয়ে আনন্দের—এর চেয়ে পরম কাম্য সংসারে আমার আর কি আছে?—সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করাই যে বাহুল্য! ডোর-কৌপীন পরে সে পথে-পথে ভিক্ষা করবে,—গাছের তলায় কঠিন মাটির ওপর শোবে,—আমি কি কখনও এ-কথা ভাবতেও পারি? কিন্তু—

সহসা তাঁর কণ্ঠ আটকে গেল,—চোখ দুটির কোণে জল টলটল করে উঠলো,—স্বরেও বাষ্প এসে জম্‌লো,—অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে তিনি আবার বললেন,—'নিমাইকে আমি যদি বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাই,—আমার এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ দূর হবে,—তোমরাও সুখী হবে। কিন্তু আমার নিমাইয়ের তো ধর্ম নষ্ট হবে?—সে যে চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছে,—আমি কি তার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কারণ হয়ে—তাকে নিরয়গামী করবো? তারপর নিমাই সন্ন্যাস ছেড়ে আবার ঘরে ফিরে গেলে,—চারিদিক থেকে লোকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে,—কতজন কত নিন্দা, কত অশ্রাব্য চর্চা করবে তাকে নিয়ে,—না, না, আমার নিমাইকে নিয়ে আমি পরচর্চা হতে দেবো না।'—দুঃখের আবেগের মধ্যেও দৃঢ়তা ফুটে উঠলো তাঁর কণ্ঠে,—"সে সব কথা শুনে নিমাইও লজ্জায় প্রাণের মধ্যে গুমরে মরবে,—সে কি আমার বেশি শান্তি?—বুঝে হোক, না বুঝে হোক সে যখন সন্ন্যাস নিয়েছে,—তখন নিতান্ত ইতরজনের মত তিনদিন পরে ঘরে ফিরে আসার দারুণ কলঙ্ক তার মাথায় আমি চাপাতে পারবো না। তার চেয়ে সে নীলাচলেই যাক,—তোমরা মাঝে মাঝে যাবে, আমাকে তার সংবাদ এনে দেবে,—সেও মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করতে এসে দুঃখিনী মা'কে দেখা দিয়ে যাবে,—সেই ভাল। এতে আমার কত দুঃখ, কত কষ্ট,—তা আমি জানি,—কিন্তু নিমাইয়ের গৌরব যে আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও বড়!"

স্তব্ধ হয়ে গেলেন ভক্তগণ শচীর সুস্পষ্ট উত্তর শুনে,—'মা, মা, এ-কি

করছো?'—কেউ কেউ আকুল হয়ে বলেও উঠলেন,—তোমার একটি কথায় যে সবই উলটে যেতো মা,—আমরাও প্রভুর বিরহে যন্ত্রণা পেতাম না। তুমিও তাঁকে কাছে পেয়ে সুখী হতে পারতে। আর একবার বুঝে দেখো মা!

'না, বাবা,'—শচী দৃঢ় অথচ ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বললেন,—'আমার বুঝতে আর বাকী নেই,—নিমাইকে কোনভাবে আমি কলঙ্কিত করতে পারবো না। তোমরা বরং তাকে আমার অনুরোধ জানিয়ে বল,—আর দু'তিন দিন সে এখানে থাকুক। আমি তাকে মনের সাধ মিটিয়ে দেখি।'—ভক্তগণ আর কি বলেন?—মাথা নীচু করেই ফিরে গেলেন তাঁরা প্রভুর কাছে।

ভক্তগণ চলে যেতেই শচীর যেন চমক ভাঙলো!—হায়, হায়, এ-কি করলাম আমি?—আমার নিমাইকে আমি নিজে বিদায় দিলাম সন্ন্যাসী করে?—আমি মা,—না রাক্ষসী? না, না, রাক্ষসীই বটে! নইলে কেউ কি এমন পারে?—শচী অঝোরঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

এদিকে ভক্তগণের মুখে মাতৃ-আদেশ শুনে প্রভুর মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠলো,—আমার মা, আমার মা! তিনি যে সত্যই জগজ্জননী! হতভাগ্য আমি,—তাই এমন মায়ের সেবা করবার সৌভাগ্য আমার হলো না। ভক্তগণের দিকে চেয়ে বললেন,—'মাতৃ-আজ্ঞাই শিরোধার্য,—দু'তিন দিন পরেই আমি নীলাচল যাত্রা করবো।'

* * *

বিদায় মুহূর্ত। কি করুণ—কি মর্মস্পর্শী সে ক্ষণ! শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে এসে প্রণাম করলেন মাতৃ-চরণে,—'মা, তবে অনুমতি কর, আমি নীলাচলে যাই।—কেঁপে উঠলো তাঁর কণ্ঠ,—অন্তরেও জাগলো এক নিবিড় বেদনা মায়ের স্নেহাতুর শীর্ণ মুখখানির দিকে চেয়ে।

শচীর দৃষ্টি জলে ঝাপসা হয়ে এসেছে,—কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে গেছে বাষ্পে,—শীর্ণ দেহখানি মৃদু মৃদু কাঁপছে। অনেক কষ্টে গলায় স্বর এনে উদভ্রান্তের মতই বললেন,—'নীলাচল,—অনুমতি! অ্যাঁ,—কি বলছো বাবা?—সহসা যেন সম্বিৎ ফিরে এলো তাঁর,—'ও—হাঁ, নীলাচলে গিয়েই থাক। কিন্তু—কিন্তু—দেখিস বাছা, দুঃখিনী মা'কে ভুলিস না!' অধৈর্য হয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি শেষের দিকে।

ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন নিমাই,—'কি বলছো মা, তোমাকে ভুলবো আমি? না, না, এতো বড় অপরাধ আমাকে যেন জীবনে করতে না হয়। মনের কথা তো তোমায় সব বলেছি মা, আর দুঃখ করো না। তুমি যখনই আমাকে স্মরণ করবে,—দেখবে আমি তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাকে যদি খাওয়াতে সাধ যায় তোমার,—তুমি থালা ভরে সাজিয়ে দিও,—দেখবে আমি খেতে বসেছি।

তা'ছাড়া, ভক্তরা প্রায়ই যাবেন আমার কাছে,—তাঁদের কাছেও তুমি আমার সংবাদ পাবে। তুমি কাতর হলে আমার পা যে উঠবে না মা! মন খুলে অনুমতি দাও।

মন খুলে?—বেশ, তবে এ—সো!—শচীর কণ্ঠ জড়িয়ে এলো। যেন শেষ দেখা দেখে নিচ্ছেন,—এই ভাবেই সমগ্র দৃষ্টি সজাগ করে চাইলেন তিনি ছেলের মুখের দিকে। মায়ের দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হলো শ্রীগৌরাঙ্গের সজল দৃষ্টি। মা-কে আর একবার প্রণাম করে ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করলেন মাতৃ-প্রাণ সন্তান। দৃষ্টি-পথ থেকে আড়াল না হওয়া পর্যন্ত শচী অপলক নেত্রে চেয়ে থাকলেন—শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে। যখন আর দেখা গেল না, তখন অধৈর্য হয়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন ধুলায়,—নিমাই, নিমাই,—হায়, হায়, আমার নিমাইকে আমি নিজে বিদায় দিলাম! হায়, কি করলাম—কি করলাম!

৫৫

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর এবং গোবিন্দ এই পাঁচজন ভক্ত হয়েছেন প্রভুর নীলাচল-যাত্রার সঙ্গী। সকলেরই দেহে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশ। কিছুটা অগ্রসর হয়ে সহসা পেছন ফিরে প্রভু দেখলেন,—শান্তি-পুরের বহু ভক্ত এমনকি স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈতাচার্যও আসছেন তাঁর পিছু-পিছু। নবদ্বীপের ভক্তগণকে প্রভু এর আগেই অনেক বুঝিয়ে শান্ত করেছিলেন। কিন্তু তবু কি তাদের প্রাণ মানে? প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রাণও যে চলে যাচ্ছে! তাই তাঁরা অনেকটা দূরে প্রভুর যাত্রাপথে দৃষ্টি নিবন্ধ করে তখনো দাঁড়িয়ে ছিলেন সজল চক্ষে।

পেছনের ভক্তগণকে সম্বোধন করে প্রভু বললেন,—তোমরা ফিরে যাও। সংসারে থেকে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা কর। 'নির্লিপ্ত সংসার-যোগী'—এই তোমাদের আদর্শ। কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ, তার জন্যে সন্ন্যাসের দরকার নেই। আমার কথা স্বতন্ত্র,—আমার সন্ন্যাস তো নিজের জন্য নয়,—জীবের কল্যাণে।

'কিন্তু প্রভু,'—সমস্বরে বলে উঠলেন ভক্তগণ,—"আমরা যে আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না। আমাদের গতি কি হবে?"

প্রভু বললেন,—"আমাকে যদি প্রকৃতই ভালবাস,—তবে আমার কথা শোন। ঘরে থেকে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা কর। তবেই আমি প্রীত হব। তোমরাও আমার বিরহে শান্তি পাবে। যাও।—আর আচার্য?"—তিনি অদ্বৈতের একান্ত নিকটে এসে দাঁড়ালেন,—"তুমি অধৈর্য হলে তো, আমার কাজ হবে না? তোমাকে আমার প্রতিনিধি-স্বরূপ এখানে রেখেই তো আমি নীলাচলে যাচ্ছি। তুমি এখানে থেকে সকলকে সান্ত্বনা দেবে,—সকলের চিত্তে কৃষ্ণে মতি আনবে,—সেই তো আমার ভরসা। তুমি কাতর হলে চলে?'

'কই কাতর হয়েছি প্রভু,'—বিষণ্নকণ্ঠে অদ্বৈত বললেন,—'তোমার দুঃখে সকলে পাগল হয়ে গেল,—'আমার চোখে দেখ জল নেই। অদ্বৈত পাষাণ,—প্রভু, তোমার অদ্বৈত পাষাণ।'

'এই পাষাণ অদ্বৈতকেই আমার সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন।'—প্রভু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন,—"আচার্য, তুমি সাগর, এরা নদী। তোমার বুকে কি সহজে চাঞ্চল্য জাগে। আবার জাগলেও যে বিপদ! আচার্য, তোমার জন্যে আমি ধৈর্য ধরেছি,—তাই তুমিও এই ধৈর্য পেয়েছ। নয়, দু'য়ের জন্যে দুয়ের হৃদয়াবেগ জেনো একই! যাও, সকলকে নিয়ে ফিরে যাও। আমার নীলাচল-যাত্রা সফল কর।"

'তবে তাই হোক প্রভু।'—শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করলেন আচার্য,—ভক্তরাও প্রণাম করলেন একে একে। সর্বশেষে ভক্ত হরিদাস এসে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন প্রভুর সম্মুখে,—'প্রভু, এ অধমের কি-গতি হবে?'—করুণার্দ্র কণ্ঠে প্রভু বললেন,—'হরিদাস, তুমিও এখন থাক,—আমি শীঘ্রই তোমার নীলাচলে যাবার ব্যবস্থা করবো।'—এবার আর দেরি না করে আপন সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুতপদেই এগিয়ে চললেন শ্রীগৌরাঙ্গ।...কিছুটা পথ চলে সহসা জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীনিত্যানন্দকে,—শ্রীপাদ, তোমরা পথের কে কি সম্বল এনেছ?'

'কিছুই না প্রভু!'—নিত্যানন্দ উত্তর দিলেন,—'আমাদের সম্বলের মধ্যে দণ্ড, কৌপীন, কাঁথা আর বহির্বাস। এক কপর্দকও নেই কারো সঙ্গে।'

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো প্রভুর দৃষ্টি—"তোমরাই প্রকৃত প্রেমিক,—প্রকৃত বিরাগী! শ্রীকৃষ্ণ ত্রিজগৎ পালন করছেন,—আমাদেরও করবেন। আমাদের চিন্তা কি?

'তোমার চিন্তা থাক আর না থাক',—নিত্যানন্দ কৌতুক করে বললেন, আমাদের কিন্তু কোন চিন্তা নেই! আমরা তোমাকে পেয়েই নিশ্চিন্ত!'

'হে নীলাচলচন্দ্র, দেখা দাও।'—সহসা প্রভুর ভাবান্তর উপস্থিত হলো,—

মনে চলে গেল, তাঁর নীলাচলে,—চোখে ভেসে উঠলো নীলাচলচন্দ্রের শ্রীমূর্তি,—'প্রভু নীলাচলচন্দ্র, আর কতদূর,—আর কতদূরে তুমি ?'—বলতে বলতে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল তাঁর,—মুখে শুধু "হে জগন্নাথ, হে নীলাচলচন্দ্র, আমায় দেখা দাও !'—সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন ভাবের আবেগে। চোখে বইছে তখন অজস্রধারা।.........

—কিছুক্ষণ পরে ভক্তদের চেষ্টায় চৈতন্য ফিরে পেয়ে—আবার দ্রুত চলতে লাগলেন। শান্তিপুরে তিনি সন্ন্যাসের নিয়ম প্রায় ত্যাগ করেছিলেন,—এবার কিন্তু প্রত্যেকটি বিধিই পালন করে চলেছেন কঠোরভাবে। চল্‌তে চল্‌তে সকলে এসে পড়লেন—ছত্রভোগে। এই ছত্রভোগই ছিল গৌড়রাজ্যের শেষ সীমা।—কোন গৌড়দেশবাসীরই এই সীমা পার হয়ে উড়িষ্যায় যাবার অধিকার ছিল না। উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে—তখন গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের ঘোর বাদ-বিসম্বাদ চল্‌ছে।—দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতাপে উড়িষ্যায় মুসলমানদের প্রবেশেরও উপায় নেই। গৌড়েশ্বরের অধীনে এখানে রামচন্দ্র খান নামে এক অধিকারী ছিলেন শাসন-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁকে অতিক্রম করে ওপারে যায় কার সাধ্য ?

মুস্কিলে পড়লেন ভক্তগণ। কেমন করে তাঁরা প্রভুকে নিয়ে নদী পার হয়ে উড়িষ্যার সীমায় পেঁছিবেন ? রামচন্দ্র খানের অনুমতি ছাড়া তো সে উপায় নেই ! অথচ রামচন্দ্র খান—ঘোর তান্ত্রিক,—বৈষ্ণব ধর্মের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা নেই,—তার ওপর গৌড়েশ্বরের কঠোর আদেশ,—কেউ যেন গৌড় হতে ওপারে যাবার সুযোগ না পায়। প্রভুর কিন্তু কোন চিন্তা নেই। তিনি প্রেমানন্দে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের নাম কীর্তন করছেন। ভাবাবেগের আতিশয্যে তাঁর বাহ্যজ্ঞানও নেই,—দুটি কমল নয়ন-প্রান্তে দরদর অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।

হা-হা জগন্নাথ প্রভু বলে ঘন ঘন।
পৃথিবীতে পড়ি ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন ॥

এমন সময় সহসা অধিকারী রামচন্দ্র স্বয়ং প্রভুর সমীপে উপস্থিত ! কার অলক্ষ্য নির্দেশে যেন তিনি ছুটে এসেছেন ! প্রভুর দিকে চাইতেই—তাঁর তপ্তকাঞ্চননিভ জ্যোতির্ময় বিশাল বরবপু,—প্রেমাকুল ঢলঢল ভাব—আয়ত প্রশান্তলোচনের দর-বিগলিত প্রেমাশ্রুধারা দেখে—ঘোর তান্ত্রিক অধিকারীর প্রাণের ভেতর জাগলো এক বিপুল আলোড়ন,—তিনি প্রায় আত্মহারা হয়েই বসে পড়লেন প্রভুর চরণ-তলে।

প্রভু তখন নীলাচলচন্দ্রের নামেই বিভোর। ভক্তেরা বারবার তাঁকে ডেকে বললেন,—'প্রভু, প্রভু,' একবার চোখ মিলে চান,—দেখুন, কে আপনার পায়ের তলে।

ভক্তদের বারবার ডাকে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো,—'কে—?' সম্মুখে চাইলেন তিনি শান্তনেত্রে রামচন্দ্রের দিকে,—'বাপু, তুমি কে ?—কি চাও তুমি ?'

'আপনার চরণের এককণা ধূলি।'—প্রভুর চরণ-স্পর্শে রামচন্দ্রের অন্তরে তখন আমূল পরিবর্তন এসেছে,—গদ্‌গদকণ্ঠে তিনি বললেন,—'আপনার দাসানু-দাস হবার যোগ্যতাও আমার নেই। তবু আমি আপনার কৃপা-প্রার্থী। আমি এদেশের অধিকারী রামচন্দ্র খান।'

'তুমি অধিকারী ?'—প্রভু হৃষ্ট হয়েই বললেন,—বেশ, বেশ, বড় সন্তুষ্ট হলাম তোমার পরিচয় পেয়ে,—তার চেয়েও আনন্দ পেলাম—তোমার আর্তি দেখে। তা বাপু, তুমি আমার একটু উপকার করবে ? আমি নীলাচলচন্দ্র দর্শনে যাব। আমাকে একটু পার করে দেবে ?

কৃতার্থ হয়ে গেলেন রামচন্দ্র খান প্রভুর আদেশ পেয়ে,—'প্রভু, আপনার আদেশ শিরোধার্য।'—বললেন তিনি নির্বিচারে,—'আজ সানুচর আমার এখানে ভিক্ষা করুন,—ইতিমধ্যে আমি নৌকা প্রস্তুত করে রাখবো, এবং কাল সকালেই আপনাকে পার করে দেব।'

প্রভু সানন্দে সম্মত হলেন রামচন্দ্রের প্রস্তাবে। কিন্তু রামচন্দ্র যে প্রভুর জন্য কি গুরুতর দায়িত্ব মাথায় তুললেন,—তা ভাবলেও সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। গৌড়েশ্বরের আদেশ অমান্য করে কেউ যদি কোন গৌড়বাসীকে উড়িষ্যার সীমায় যাবার সুযোগ দেয়,—তবে, রাজরোষে তার যে কোন দণ্ড—এমনকি প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হ'তে পারে। তার ওপর রামচন্দ্র খান নিজে অধিকারী,—রাজকর্মচারী হয়ে এরূপ রাজ-দ্রোহিতা করা অমার্জনীয় অপরাধ। প্রাণদণ্ড হওয়াও তাঁর বিচিত্র নয়। কিন্তু প্রভুর এমনই মহিমা যে,—রামচন্দ্র অকাতরে নিজের প্রাণের মমতা তুচ্ছ করলেন, প্রভুর এককণা কৃপালাভের জন্য।—এবং পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই সানুচর প্রভুকে যথারীতি নৌকা করে নদী পার করে দিলেন। কি আশ্চর্য, প্রভুর ইচ্ছায়, নাবিকগণও বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিতে অস্বীকৃত হলো না।

সেই থেকে ঘোর তান্ত্রিক রামচন্দ্র খান হলেন পরম বৈষ্ণব,—মনে প্রাণে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত। প্রভুর আশীর্বাদে অবশ্য তাঁর বা নাবিকদের কোন বিপদই হয়নি। গৌর নাম জপ করে অবশিষ্ট জীবন কেটেছিল তাঁর পরম আনন্দে।

উৎকল দেশের সীমায় প্রয়াগ ঘাট। সেখানে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির-স্থাপিত মহেশ্বর আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এই ঘাটে স্নানাদি করে মহেশ্বর বন্দনা করলেন; —পরে তাঁর কি সাধ হলো—তিনি বলে বসলেন,—'আজ আমি নিজেই ভিক্ষা করে আনি।'

বলাবাহুল্য, পথের সম্বল ছিল তাঁদের ভিক্ষাই। প্রভুর কথা শুনে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন ভক্তগণ,—'সে-কি—সে-কি, আমরা থাকতে আপনি যাবেন কেন?

শ্রীগৌরাঙ্গ কৌতুক করে বললেন,—কেন, সকলেই তো খাবো,—তাহলে আমার কাজের ভাগ আমি নেবো না কেন?'—তদ্দণ্ডেই তিনি বহির্বাসখানিকে ঝুলির মত করে ভিক্ষায় বার হয়ে পড়লেন। প্রভুর ইচ্ছা হয়েছে,—বাধা দেবে কে?—নিকটে সামনেই যে গ্রামখানি দেখতে পেলেন,—সেই গ্রামেরই এক বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন প্রভু,—একবার মাত্র বললেন,—হরেকৃষ্ণ!

কি-ছিল সেই স্বরে—ছুটে এলো বাড়ির লোক স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে। ছুটে এলো আশেপাশের অনেকে,—চেয়ে দেখে,—সামনেই তাদের তরুণ বয়স্ক এক নবীন সন্ন্যাসী—প্রকাণ্ড বরবপু—আজানুলম্বিত বাহু, সর্বাঙ্গে ফুটে বেরুচ্ছে এক অলৌকিক জ্যোতিঃ! একটি প্রসন্ন নির্মল শুচিতা যেন ঘিরে রয়েছে তাঁকে চারিদিক থেকে। মস্তক নত,—চোখ তুলে চাইছেন না কারো দিকে,—যদি কোন স্ত্রীলোকের মুখের ওপর দৃষ্টি পড়ে—যেহেতু সন্ন্যাসীর প্রকৃতি-দর্শন নিষিদ্ধ।—তবু পাশ থেকে সেই অনুপম-সুন্দর প্রেম-ঢলঢল মুখখানির যতটুকু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে,—তাতেই সকলের চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে! প্রভুর দিকে চেয়ে চেয়ে সকলের প্রাণে জেগে উঠলো এক স্বর্গীয় মধুর ভাব-হিল্লোল,—কেউ কেউ বলে উঠলো অপার উচ্ছ্বাসে,—ওরে আয়, আয়, নতুন সন্ন্যাসী দেখবি, এমন অপরূপ সন্ন্যাসী আর কখনো দেখিস্‌নি!

এরপর যা সুরু হলো,—সে আর বর্ণনার নয়। প্রভু যে বাড়িই যান,—যার যা ভাল জিনিষ দেবার মত—সমস্তই এনে ঢেলে দেয় প্রভুর সম্মুখে স্তূপাকার করে।—এ সন্ন্যাসীকে সর্বস্ব ভিক্ষা দিতেও যেন কারো দুঃখ নেই,—বরং আনন্দই আছে প্রচুর! প্রভু দেখলেন,—ঘোর বিপদ! এত জিনিষ নিয়ে তিনি কি করবেন? তাঁর দরকার মুষ্টিভিক্ষা। মুষ্টি দেখিয়ে তিনি ইঙ্গিতও করলেন তার। কিন্তু তবু ঝুলি ভরে ঢেলে দিতে লাগলো লোকে। প্রভু তখন দু'তিন বাড়ি ভিক্ষা করেই ফিরে এলেন প্রয়াগ-ঘাটে।

ভিক্ষার পরিমাণ দেখে জগদানন্দ বললেন সকৌতুকে হেসে,—'প্রভু তাহলে আমাদের ভরণ-পাষণ করতে পারবেন দেখছি!'—প্রভুর কিন্তু তখন যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে,—মনে মনে ভাবছেন,—আর কখনো নিজে ভিক্ষায় যাবেন না—প্রতি গৃহস্থই যে ঝুলি ভরে দিতে আসে! কার ছেড়ে তিনি নেবেন কার?—

প্রয়াগ ঘাট থেকে আবার যাত্রা সুরু করে সানুচর প্রভু রেমুনায় এসে—সেখানে পরম কৃষ্ণভক্ত মাধবেন্দ্র পুরী-প্রতিষ্ঠিত দ্বিভুজ মুরলীধর দর্শন করলেন। প্রভু এত দ্রুত হাঁটছেন,—যে, ভক্তগণ মাঝে মাঝে থেকে যাচ্ছেন তাঁর অনেক দূরে। কখনো কখনো তিনি চলে যাচ্ছেন ভক্তগণের দৃষ্টির অন্তরালেও।

ক্রমে ক্রমে জাজপুর হয়ে তাঁরা এলেন উড়িষ্যার রাজধানী কটকে। এই কটকেই উড়িষ্যাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রাসাদ। রাজা প্রতাপরুদ্র ঘুণাক্ষরেও জান্তে পারলেন না যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বগণ-সঙ্গে চলে গেলেন পুরী-অভিমুখে তাঁর বিশাল প্রাসাদের পাশ দিয়েই।

কটকের নিম্নে মহানদী। প্রভু মহানদীতে স্নান করে—এলেন ভুবনেশ্বর। ভুবনেশ্বরে বহু শিব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য এর আর এক নাম গুপ্ত-কাশী। এখানকার প্রাচীন ভাস্কর্য অপূর্ব। এখানের মন্দিরে শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরের সম্মিলনে গঠিত একটি অপূর্ব মূর্তি আছে,—পাণ্ডারা একে 'হরিহর' মূর্তি বলেন। জগন্নাথের ন্যায় এখানেও নিত্য পূজার্চনাদি হয়ে থাকে।

ভুবনেশ্বরের শিব দর্শন করে সানুচর শ্রীগৌরাঙ্গ এলেন—কমলপুরে। এখানে এসে ভাগী নদীতে স্নান করে গেলেন কপোতেশ্বর শিব-দর্শনে। এই সুযোগে—নিত্যানন্দ প্রভুর একখানি দণ্ড দারুণ অভিমানে ভেঙ্গে ফেললেন,——প্রভু কৃষ্ণপ্রেমের কাঙ্গাল,—তাঁর এ দণ্ডের কি দরকার? ভক্ত জগদানন্দ তো ভয়েই অস্থির! যেহেতু তিনিই ছিলেন প্রভুর দণ্ডবাহী। অথচ নিত্যানন্দকে তিনি নিবারণ করতেও পারলেন না।

ভাবাবিষ্ট প্রভুর অবশ্য তখন দণ্ডের কথা মনে ছিল না। শিব-দর্শন করে ফিরে এসেও তিনি দণ্ডের খোঁজ নিলেন না। কিন্তু আঠারো-নালায় এসে তাঁর দণ্ডের কথা মনে পড়লো,—'জগদানন্দ, জগদানন্দ'—প্রভু চাইলেন জগদানন্দের দিকে,—কই আমার দণ্ড?—দাও।

দারুণ সংকটে পড়লেন জগদানন্দ। ভয়ে ভয়েই বললেন,—প্রভু, দণ্ডের কথা শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি আপনার দণ্ড ভেঙ্গে ফেলেছেন।

'কেন?'—প্রভু তাকালেন নিত্যানন্দের পানে,—'পথে কোথাও দাঙ্গা করে-ছিলে না-কি?'—তাঁর স্বর কৌতুকে তরল,—চোখেও প্রীতি-মধুর দৃষ্টি। প্রভুর ভাব দেখে নিতাই আশ্বস্ত হলেন,—তাহলে দণ্ড-ভাঙ্গার জন্যে প্রভু তাঁকে দণ্ড দেবেন না! অবশ্য নিতাই ছাড়া একাজ করবার সাহস আর কারো হতো না। কিন্তু তিনি চুপ করেই থাকলেন। প্রভু আবার প্রশ্ন করলেন,—কেন দণ্ড ভাঙ্গলে?—এবার স্বরে যেন কিছু রুক্ষতা ফুটলো।

অন্তরে ভয় হলেও নিতাই মুখে বললেন,—একখানা বাঁশ ভেঙ্গেছি, তার এত কেন?

"বাঁশ?—" প্রভুর দৃষ্টি তীব্র হয়ে উঠলো,—'জানো সন্ন্যাসীর দণ্ডে সব দেবতারা বাস করেন?'

'দেবতারা স্বর্গে থাকুন,—আমার দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ।...তিনি কৃষ্ণ-প্রেম-

ধর্মী,—তাঁর এ বিড়ম্বনা কেন? ওই একখানা বাঁশ বয়ে বেড়িয়েই বা লাভ কি?'—নিত্যানন্দ তখন মরিয়া! প্রভুর সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া করতে হয় তা-ও করবেন,—ভক্তের অভিমানেই তিনি বলতে লাগলেন,—'তুমি চাও নীলাচল-চন্দ্রকে,—আবার দণ্ড কেন?'

বস্তুতঃ শ্রীগৌরাঙ্গেরও দণ্ডের ওপর সেরূপ আস্থা ছিল না। কিন্তু তবু তিনি বাহ্যতঃ রুষ্টভাব দেখিয়েই বললেন,—ভারী উপকার করেছ আমার! সন্ন্যাসীর দণ্ড—বিধির প্রতীক তা জান?

'তুমি আবার কোন বিধির অধীন?—তুমি তো নিজেই বিধির কর্তা?'—নিতাই শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবৎ-সত্তার ইঙ্গিত করলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তবুও বাইরে রুক্ষভাব দেখিয়ে বললেন,—'বেশ, তোমরা আর আমার সঙ্গে এসো না,—হয় তোমরাই এগিয়ে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন কর,—নয় আমিই এগিয়ে যাই।'—কিন্তু জগন্নাথকে মনে পড়তেই—প্রভু সব ভুলে তদ্দণ্ডেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন—পুরী-অভিমুখে। ভক্তগণ যে পেছনে কোথায় কতদূরে পড়ে থাকলেন,—তার কোন চিন্তাই থাকলো না তাঁর মনে। ভক্তগণও চমক ভাঙতেই ছুটলেন বটে, প্রভুর পশ্চাতে,—কিন্তু জগন্নাথ দর্শনে আকুল—অতিদ্রুত-গতি প্রভুর নাগাল আর তাঁরা পেলেন না।

ভার্গীনদীর তীরে শ্রীগৌরাঙ্গের দণ্ড ভাঙ্গার জন্যে ঐ নদীর আর এক নাম হলো,—'দণ্ডভাঙ্গা।'

৫৬

পুরীর মন্দির-দ্বারে পেঁাছতে পেঁাছতে প্রভু তখন উন্মত্ত হয়ে পড়েছেন —'জগন্নাথ-জগন্নাথ' করে। সমস্ত বাহ্যানুভূতিকে লুপ্ত করে—একমাত্র জগন্নাথ দর্শন-কামনাই প্রবল হয়ে উঠেছে তাঁর অন্তরে। উর্ধ্বশ্বাসে মন্দির-চত্বরে এসে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট বিগ্রহের দিকে চেয়েই—তিনি দিক-বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে একেবারে ঢুকে পড়লেন মন্দিরের মধ্যে। লাফ দিয়ে ধরতে গেলেন জগন্নাথকে বক্ষের মাঝে—তাঁর হাতও লাগলো জগন্নাথদেব-বিগ্রহে. কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন বিগ্রহের সম্মুখে—ছিন্নমূল কদলীবৃক্ষের মত।

'কে? কে? কে?'—ছুটে এলো চারিদিক থেকে মন্দিরের সেবকগণ,—'কার এত বড় স্পর্ধা,—মন্দিরে ঢুকে এভাবে স্পর্শ করে—পুরীধামের অধীশ্বর —বিশ্বপূজ্য জগন্নাথকে? নিশ্চয়ই লোকটা পাগল!'—উত্তেজিত হয়ে ওঠে মন্দিরের সেবকগণ;—'মার, মার, মার,'—কেউ কেউ চেঁচিয়ে ওঠে দুর্বার ক্রোধে. —"যেমন কর্ম, তেমনি ফল হোক,"—অচেতন প্রভুকে প্রহার করতেই উদ্যত হয় তারা।

সহসা সেখানে প্রবেশ করলেন এক প্রৌঢ়বয়স্ক সৌম্যদর্শন উন্নতদেহ ব্রাহ্মণ,—দূর থেকে তিনি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন,—'ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও,—' ব্যাকুলকণ্ঠে বাধা দিলেন তিনি সেবকগণকে,—"কাকে মারবে তোমরা?—দেখ-ছো না—মহাপুরুষ? এমন দিব্যজ্যোতির্ময় দেহ,—এ-কি প্রহারের যোগ্য?—ক্ষান্ত হও, সরে দাঁড়াও,—আমি দেখছি।"

ব্রাহ্মণের আদেশ অমান্য করতে পারলোনা মন্দিরের সেবকগণ। যদিও এই ব্রাহ্মণের মন্দিরের কার্যের ওপর কোন অধিকার ছিলনা,—তবুও এঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করাও ছিল সেবকগণের অসাধ্য। তাই তাদের রাগ তখনও না পড়লেও—তারা নীরবেই সরে দাঁড়ালো প্রভুর চারি পাশ থেকে।

এই প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ আর কেউ নন,—ইনিই মহাপণ্ডিত অশেষ শাস্ত্রদর্শী

অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম। নবদ্বীপে এ'রই টোলে নিমাই কিছুদিন ন্যায় অধ্যয়ন করেছিলেন।...তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুনে মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহাসম্মানে এবং সমাদরে তাঁকে নিয়ে এসেছেন পুরীতে। উড়িষ্যায় তিনি ধর্মশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় সর্ববিষয়ের অধিনেতা ও মীমাংসক। মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁকে সম্মান করেন গুরুর মত।...পুরীতে তিনি সর্বশাস্ত্রেরই অধ্যাপনা করেন,—বিশেষ বেদের।...তাঁর পুরী-আগমনের পর পুরী হতে বেদ অধ্যয়ন করতে আর কাউকে যেতে হয়না কাশীতে।—রাজা যাঁকে সম্মান করেন, তাঁকে আর সম্মান করে না চলবে কে?...কাজেই তিনি প্রত্যক্ষভাবে মন্দিরের কেউ না হলেও—তাঁর আদেশ অমান্য করার শক্তি মন্দির-সেবকগণের ছিল না।

সার্বভৌম দেখলেন,—সন্ন্যাসীর বয়স অল্প,—চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যেই,—প্রতিটি অঙ্গ তাঁর এক অপার্থিব সত্তার নির্মল জ্যোতিঃতে ভাস্বর! নিমীলিত দুটি আয়ত লোচনেরই বা-কি অপূর্ব শোভা! যেন গভীর সুখ-সুপ্তির মধ্যে কোন পরম আনন্দময় স্বপ্ন দেখছেন! প্রভুর সর্বাঙ্গে হাত দিয়ে দেখলেন সার্বভৌম, ননীর মত সুকোমল সে-দেহ—হিমের চেয়েও শীতল,—দেহে প্রাণ আছে কি-না,—তা-ও ঠিক বোঝা যায় না। তবে বেঁচে যে আছেন, এবং এই অচেতনতা যে প্রভুর ভাব-সমাধি,—মহাপণ্ডিত সার্বভৌমের এটুকু বুঝতে বাকী থাকলো না। তিনি আর অন্যোপায় না দেখে মন্দিরের সেবকগণকে আদেশ করলেন,—তোমরা স্বামিজীকে কাঁধে করে আমার বাড়ি পোঁছে দাও।

প্রভুর দেহের দিকে চেয়ে চেয়ে সেবকগণেরও মনের তখন পরিবর্তন হয়েছে,—ভক্তি এসেছে তাদের চিত্তে,—তারা আর দ্বিরুক্তিমাত্র না করে—তদ্দণ্ডেই প্রভুর দেহ কাঁধে তুলে নিল সযত্নে। সঙ্গে সঙ্গে সেবকগণের কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধ্বনিত হলো,—হরি-হরি-ধ্বনি!.........

বাড়ীতে এনে পণ্ডিত সার্বভৌম সযত্নে প্রভুর সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। তখনও প্রভু তেমনি অচেতন!—সার্বভৌম প্রভুকে জানেন না,—চেনেন না,—কিন্তু বয়স অল্প হলেও প্রভু যে এক অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ,—পরম ভাগবত,—এ তাঁর দেহের লক্ষণাদি দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণাদি সম্বন্ধেও সার্বভৌমের শাস্ত্রীয় বহু জ্ঞান-গোচর ছিল,—প্রভুর শরীরে তিনি সেরূপ কোন কোন লক্ষণেরও বিকাশ দেখতে পেলেন।

এ-দিকে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণও-প্রভুর পেছনে ছুটতে ছুটতে—মন্দির দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন,—যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই তাঁরা আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন,—'একজন নবীন সন্ন্যাসীকে তোমরা আসতে

দেখছো ?'—প্রভুর সংবাদ তখন মন্দিরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনায়াসেই তাঁরা সঠিক সংবাদ পেলেন।—কিন্তু তাঁরা সার্বভৌমের বাড়ি তো জানেন-না!—কি করবেন, ভাবছেন,—এমন সময় সহসা তাঁদের দেখা হলো,—গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে। গোপীনাথ তাঁদের সকলের পরিচিত,—প্রগাঢ় পণ্ডিত, পরম গৌরাঙ্গভক্ত,—তিনি সার্বভৌমের ভগিনীপতি। নিবাস গৌড়েই। কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না—নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলে এসেছেন। ভক্তদের মুখে সমস্ত সংবাদ পেয়ে—তিনি ব্যাকুলচিত্তে সকলকে সঙ্গে করে —এলেন শ্যালকের বাড়ি।

ভগিনীপতির মুখে আগন্তুকদের পরিচয় পেলেন সার্বভৌম। তবে শুধু এইটুকু জানলেন—এ'রা সন্ন্যাসীর ভক্ত,—কিন্তু সন্ন্যাসীটি কে, সেকথা তখনও অজ্ঞাত থাকলো সার্বভৌমের। যাহোক, ভক্তদের পেয়ে—সার্বভৌম আনন্দিতই হলেন। সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাঁদের। প্রভুর ভাব-সমাধির সঙ্গে ভক্তগণের অসংখ্য বার পরিচয় ছিল,—সেই সমাধিভঙ্গের উপায়ও জানতেন তাঁরা। —নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে গিয়ে বার বার তাঁর কানে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে জেগে উঠলেন শ্রীচৈতন্যদেব।—যেন গভীর যোগনিদ্রা থেকে জেগে উঠলেন স্বয়ং নারায়ণ।...পণ্ডিত বাসুদেব সসম্ভ্রমে এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন প্রভুকে—"নমো নারায়ণায়।" প্রভুও আশীর্বাদ করলেন,--'কৃষ্ণেমতিরস্তু।'—সার্বভৌমের বুঝতে বাকী থাকলো না,—সন্ন্যাসী কৃষ্ণভক্ত।...তিনি করযোড়ে প্রভুকে বললেন,—প্রভু, বেলা দ্বিপ্রহর অতীত। আপনি ভক্তগণ সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করে এসে,—আমার এখানেই অনুগ্রহ করে আজ ভিক্ষা করুন।

—শ্রীগৌরাঙ্গ সানন্দেই ভক্তগণ সঙ্গে স্নান করতে গেলেন সমুদ্রে।—তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান অবশ্য সম্পূর্ণ ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে সার্বভৌম জগন্নাথ-মন্দির থেকে—বহু উপাদেয় প্রসাদ আনালেন উপযুক্ত লোক দিয়ে বাড়িতে।—উদ্দেশ্য, অভ্যাগত সন্ন্যাসীকে তিনি তাঁর স্বজনদের সহিত পরিতৃপ্তিতেই ভোজন করাবেন।

আহারে বসে নানা উপাদেয় ব্যঞ্জনাদি দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ চমকে উঠলেন; পরে বিনীতভাবেই বললেন,—এ-সব আমার স্বজনগণকে দিতে আজ্ঞা হয়। আমাকে মাত্র শাক-নফরা দিলেই চলবে।

'কেন স্বামী,'—পণ্ডিত বাসুদেব সবিনয়েই বললেন,—এ সব আহার্য শ্রীজগন্নাথদেব আস্বাদ করেছেন,—তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করতে দোষ কি ? জগন্নাথের

প্রসাদ তো প্রত্যাখ্যান করতে নেই! আমার একান্ত অনুরোধ,—আপনি স্বচ্ছন্দে সবই আহার করুন।

শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ,—তার ওপর সার্বভৌমের সপ্রীতি অনুরোধ,—প্রভু আর আপত্তি করতে পারলেন না। পরিতৃপ্তির সহিত সমস্ত প্রসাদ গ্রহণ করলেন। সকলে আহারে বসল—জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর ভাবাবেশের কথা বিশদভাবেই ব্যক্ত করলেন সার্বভৌম সকলের কাছে।

—আহারান্তে বিশ্রামাদির পর প্রভুর সহিত সার্বভৌমের নানা আলোচনা হতে লাগলো। ভারত-বিখ্যাত মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম! মনে তাঁর একটু পাণ্ডিত্যের অভিমানও আছে। প্রথম দর্শনে—ভাবাবেশিত প্রভুর তেজ, আকার, প্রকৃতি ও প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রেম ইত্যাদি দেখে,—প্রভু যে এক বিরাট ভগবৎ-সত্তার অধিকারী—এমনি একটা বিশ্বাস এসেছিল সার্বভৌমের মনে। কিন্তু প্রভুর সহজ অবস্থায় তাঁর দীনভাব ও বিনয়-নম্রতাদি দেখে,—ক্রমেই যেন সে বিশ্বাস একটু একটু করে শিথিল হতে লাগলো; প্রভুকে একজন ভক্তমাত্র বলেই ধারণা হলো তাঁর। তার ওপর বয়সে প্রভু তাঁর চেয়ে অনেক ছোট,—কাজেই পাণ্ডিত্যের অভিমানে সার্বভৌমের মনে হলো,—নবীন সন্ন্যাসীকে কিছু উপদেশ দেবার অধিকার তাঁর আছে।

কথায় কথায় তিনি প্রভুকে বললেন,—"আপনার যে ভক্তি-প্রেম দেখলাম, তা সাধারণতঃ দেখা যায় না। আপনাকে আমি আর কি উপদেশ দেব,—তবু আমার মনে হয়,—এত অল্প বয়সে আপনার সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত হয়নি। ইন্দ্রিয়াদি শান্ত হবার আগে,—এ-পথে এলে—অনেক সময় ব্যর্থকাম হতে হয়। আপনার বয়স অল্প, তবু সন্ন্যাস নিয়েছেন বলে,—বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আপনাকে প্রণাম করছেন,—এতেও অনেক সময় মনে দম্ভ বা অভিমান জাগে!

একান্ত বিনয়েই উত্তর দিলেন প্রভু,—আপনি জগদগুরু,—পরমজ্ঞানী মহাপণ্ডিত। আপনাকে সরল ভাবেই বলছি, যখন সন্ন্যাস নিই,—তখন কৃষ্ণের জন্য আমার যেন 'মতিচ্ছন্ন' ঘটেছিল—সুতরাং এর দায়িত্ব আমার নয়। আপনি যে আমার কত বড় সুহৃৎ,—তা আমাকে নিয়ে মন্দিরে যে ব্যাপার ঘটেছিল,—তার থেকেই বুঝেছি। আপনি না থাকলে আমার বোধহয় সেখানেই জীবনান্ত হতো। কিন্তু সন্ন্যাস যখন নিয়েছি,—তখন তার ধর্ম আমাকে যথারীতি পালন করতে হবে। এখন আপনার আশ্রয়ে এসেছি,—আপনিই আমার উপদেষ্টা। আমার যাতে ভাল হয়,—আপনি সেইরূপ নির্দেশ দিয়ে—আমাকে কৃতার্থ করুন।

প্রভুর বিনয়-সৌজন্যে বিশেষ প্রীত হলেন সার্বভৌম। এই সময় প্রভুর সঙ্গে স্বীয় ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা প্রকাশ করে,—তাঁর গার্হস্থ্য-আশ্রমেরও

পরিচয় দিলেন গোপীনাথ আচার্য। শুনেই তো সার্বভৌমের চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো,—'তাই নাকি?' একটা স্নেহজ ভাবও জাগলো তাঁর মনে,—আত্মীয়তার সুরে প্রভুকে এবার 'তুমি' বলেই সম্বোধন করলেন তিনি, —'তাহলে তুমি তো আমার একান্ত নিজজন! তোমার পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন আমার সহপাঠী। তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী ও আমার পিতা মহেশ্বর বিশারদ উভয়ে সমাধ্যায়ী। বেশ, বেশ, বড় সুখী হলাম তোমার পরিচয় পেয়ে। যা'হোক, তুমি আর ওইভাবে কোনদিন যেও না জগন্নাথ-দর্শনে। তোমার যা ভাব দেখলুম,—কোনদিন হয়ত কোন বিপদ হয়ে যাবে। মন্দিরের সামনে যে গরুড় মূর্তি আছে,—তারই পাশে দাঁড়িয়ে তুমি দেবতা দর্শন করবে। আর গোপীনাথ?" তিনি ভগিনীপতি গোপীনাথের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন,—'স্বামিজী যখন জগন্নাথ দর্শনে যাবেন,—তুমি সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকবে।'—পরে আবার প্রভুর দিকে ফিরে বললেন,—'তোমার কোন চিন্তা নেই, —তোমার যাতে কোন অসুবিধা না হয়,—তা আমি দেখবো। তুমি সন্ন্যাসী হিসাবে আমার পরম পূজ্যও বটে,—আবার নিজজন হিসাবে একান্ত স্নেহ-ভাজনও বটে।'

'না, না, না।'—দারুণ কুণ্ঠায় নম্রকণ্ঠে বললেন প্রভু—আমি আপনার পূজ্য নই,—স্নেহভাজনই। আমি সন্ন্যাসী,—কিন্তু আপনি সন্ন্যাসীদেরও শিক্ষা-গুরু। আপনার কাছে আমি অজ্ঞ বালক। আপনি উপদেশ দিয়ে আমাকে উপযুক্ত পথে চালিত করুন। আমার পরম সৌভাগ্য, তাই শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আপনার আশ্রয় পেয়েছি।'

সার্বভৌম দেখলেন,—নবীন সন্ন্যাসীর মনে দম্ভ বা অভিমানের লেশমাত্র নেই। তিনি পরমানন্দে গোপীনাথকে ডেকে বললেন,—গোপীনাথ, আমার মাসিমার বাড়ি খালি পড়ে আছে। বেশ বড় বাড়ি। সেখানে স্বামিজীর এবং তাঁর স্বজনদের বাসের ব্যবস্থা করে দাও।.........

গোপীনাথ দেখলেন,—এই উত্তম ব্যবস্থা।

* * *

'সার্বভৌম, নবীন সন্ন্যাসীকে কেমন দেখলে?'—প্রশ্ন করলেন গেপীনাথ আচার্য।—সার্বভৌম উত্তর দিলেন পরম শ্রদ্ধায়,—'প্রগাঢ় বিদ্বান, অতীব সজ্জন এবং পরম ভাগবত।"

—"আর কিছু না?"—গোপীনাথের দৃষ্টিতে ভ্রূকুটি ফুটলো।—'আবার কি?'—সার্বভৌম সবিস্ময়ে বললেন,—"একজন কৃষ্ণভক্ত সন্ন্যাসীকে আরও কি ভাবে বিশেষিত করা যায়? এবার তুমিই বল।"

'বলি শুধু কি ভক্ত?—না, তার ওপর কিছু দেখলেন?'—গোপীনাথের

মুখে ফুটলো সপ্রশ্ন মৃদুহাসি,—সে হাসিতে যেন কি রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে। সার্বভৌম বললেন,—'আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না গোপীনাথ। কি বলতে চাও তুমি?'

'আমার বক্তব্য,'—গোপীনাথের চোখেমুখে একটি শ্রদ্ধান্বিত ভাব ফুটে উঠলো,—'উনি শুধু ভক্ত নন,—ভক্ত যাঁর সাধনা করেন,—উনি সেই শ্রীভগবান! জীব ভক্তি-ধর্ম ভুলে যাচ্ছে,—তমোধর্মে দেশ অধঃপাতে যাচ্ছে,—তাই ভগবানই অবতীর্ণ হয়েছেন ভক্তরূপে—জীবকে প্রেম ও ভক্তি ধর্ম শিক্ষা দেবার জন্যে। "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়"—এই অবতারের সেই উদ্দেশ্য। ও'র নিগূঢ় লীলা-রহস্যের অনেক কিছু জানবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। ভক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তের ভগবান।

সার্বভৌম কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন,—পরে ধীরে ধীরে বললেন—মুখে তাঁর মৃদু হাসি—"ও'কে আমি ছোট করে দেখছি না গোপীনাথ। তবে উনি ভগবানের অবতার,—একথাও মানতে পারছি না,—কি লক্ষণ দেখে ও'কে তোমরা —ভগবান বলে অনুমান কর।"

'অনুমান নয় সার্বভৌম,—এ আমাদের প্রমাণ-সিদ্ধান্ত!'—দৃঢ়কণ্ঠে বললেন গোপীনাথ আচার্য,—'ঐ মহাভাব লক্ষণ, ঐ প্রেম,—ভগবৎ-সত্তার আধার ভিন্ন কি সম্ভব? তুমি তো স্বচক্ষে সবই দেখেছো,—দেখছো-ও; তবু কি তোমার মোহ ভাঙেনি? ঈশ্বর-তত্ত্ব অনুমানে সিদ্ধ হয় না,—তার জন্যে সেই ঈশ্বরের কৃপাই দবকার। চাই প্রগাঢ় বিশ্বাস—তাঁর প্রতি আত্মহারা প্রেম।"

'ভাই',—সার্বভৌম ধীরকণ্ঠেই প্রতিবাদ করলেন,—তুমি রুষ্ট বা ক্ষুণ্ণ হয়ো না। আমি শাস্ত্রমতই বলছি। শাস্ত্রে কলিযুগে অবতার নেই,—তাই শাস্ত্রে ভগবানকে "ত্রিযুগ" বলা হয়েছে। যা শাস্ত্রে পাই না,—তা কেমন করে মানি —বল?

গৌরাঙ্গ-ভক্ত গোপীনাথের মনে সত্যই আঘাত লাগলো। তিনিও প্রতি-বাদেব সুবে বললেন,—'ভগবান কি শাস্ত্রের অধীন,—শাস্ত্রকারেরা কতটুকু জানেন সেই অচিন্ত্য—অব্যক্ত অজ্ঞেয় পরমপুরুষকে? গীতায় তাহলে যে সুস্পষ্ট লেখা আছে,—'যখনই ধর্মের গ্লানি হয়,—তখনই আমি ধর্মস্থাপনের জন্য দেহ ধারণ করি?'—'ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।' ভগবানের শ্রীমুখের এই বাণী কি তবে মিথ্যা?—তবে আর সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি'—এসব যুগের প্রশ্ন আসে কেমন করে?—সর্বকালেই তো তিনি দেহ পরিগ্রহ করতে পারেন! দেশব্যাপী তমোধর্মের দিকে চেয়েও কি তোমার মনে হয় না সার্ব-ভৌম,—ভগবানের দেহ-ধারণের এই এক উপযুক্ত সময়?

"কিন্তু শাস্ত্রে যা লেখে না,"—দৃঢ় হয়ে উঠলো সার্বভৌমের কণ্ঠ,—মুখে একটি অনমনীয় ভাবও ফুটে উঠলো তাঁর,—"তা' আমি মানতে চাই না।"

মহাপণ্ডিত সার্বভৌম,—তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রীয় তর্ক করা গোপীনাথের দুঃসাধ্য। তবে তিনিও পাণ্ডিত্যে বড় কম যান না। তাছাড়া, ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে—অনেক কিছু তত্ত্ব তাঁরা ইতিপূর্বে ঘেঁটেও দেখেছেন। তাই তিনিও দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন,—"শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাই?—আচ্ছা, তাও দিচ্ছি। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

তোমার কাছে শ্লোকের অর্থ করতে যাওয়া মূঢ়তা! কিন্তু মূলতঃ এই শ্লোকে কি বোঝাচ্ছে না যে,—কলিযুগে যিনি অবিরত কৃষ্ণকথা বলেন,—পার্ষদ-পরিবৃত সেই গৌরকান্তি পুরুষকে সংকীর্তনাদি যজ্ঞ দ্বারা অর্চনা করি?—মহাভারতের দানধর্ম সর্গেও ভগবানের সহস্র নামের মধ্যে—একস্থলে তাঁকে "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গ, সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ"—বলা হয়েছে। এসব কি ও'র ভগবত্তা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ নয়?

সার্বভৌম দেখলেন,—তর্কে তর্কে এখনই অনেক কথা এসে পড়বে। গোপীনাথ স্বপক্ষে যতই বলুন,—তাঁর বিপক্ষে বলবারও অনেক কিছুই আছে—সার্বভৌমের নিজের ভাণ্ডারে। কিন্তু হাজার হোক গোপীনাথ ভগিনীপতি,—তাঁর বিশ্বাসে আঘাত করে—তাঁর অন্তরে দুঃখ দেওয়া অন্যায়। সুতরাং সম্প্রতি তর্কে নিরস্ত হয়ে তিনি বললেন,—"বেশ, বেশ, ও-সব কথা পরে হবে.—এখন তুমি তোমার ভগবানকে—তাঁর স্বগণের সহিত আমার এখানে আজ ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করে এসো। যাও,—বেলা হয়েছে,—আর দেরি করো না।

বলাবাহুল্য—শ্যালক ও ভগিনীপতির মধ্যে আলোচনা চলছিল, সার্বভৌমেরই নিজের গৃহে। শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবানত্ব সম্বন্ধে সার্বভৌম যতই প্রতিবাদ তুলুন,—তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-সৌজন্যেরও অভাব ছিল না সার্বভৌমের মনে। স-পার্ষদ প্রভু সার্বভৌমের মাসীর বাড়িতে অবস্থিতি করলেও—সার্বভৌম সর্বদাই সেখানে যাতায়াত করে তাঁদের খবরাখবর রাখতেন। মাঝে মাঝে তিনি ভিক্ষারও নিমন্ত্রণ করতেন তাঁদের। বাকী দিন জগদানন্দ ও গোবিন্দ ভিক্ষা করেও চাউল ইত্যাদি সংগ্রহ করতেন। আর গোপীনাথ তো প্রায়ই পড়ে থাকতেন--প্রভুর সান্নিধ্যে।

৫৭

এর পর প্রভু ও সার্বভৌমের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হয়ে উঠলো। তাঁদের মধ্যে প্রায়ই নানা বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। অবশ্য তার মধ্যে উষ্মা বা উত্তেজনার ভাব থাকে না কারো মনে। যেন গুরু-শিষ্যে আলোচনা হচ্ছে। সার্বভৌমকে গুরু-পদে বসিয়ে—প্রভু নিজে নেমেছেন শিষ্যের ভূমিকায়।—সার্বভৌম দেখেন,—এই নবীন সন্ন্যাসী বয়সে তাঁর পুত্রোপম হলেও,—এঁর মধ্যে জ্ঞানের অভাব নেই।—সহজে তিনি কোন বিষয়ে প্রভুকে অতিক্রম করতে পারেন না। তাতে তাঁর পাণ্ডিত্যের অভিমান ক্রমশঃই বেড়ে ওঠে! এই তরুণ সন্ন্যাসীর কাছে যদি তিনি তাঁর দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্যের প্রমাণ করতে না পারলেন,—তবে আর কৃতিত্ব কি?—প্রভুর প্রতি তাঁর একটি পরম প্রীতি এবং স্নেহের ভাব থাকলেও,—নিজের জ্ঞান, পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রীয় অভিজ্ঞতার জয়ের জন্য তাঁর যেন একটা জিদই চেপে যায়।

সার্বভৌম একদিন বললেন প্রভুকে,—তোমার ধর্ম ভাবুকের—সন্ন্যাসের নয়। অথচ তুমি সন্ন্যাস নিয়েছ। সন্ন্যাসধর্ম অবশ্য ভাবুকের ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত কিন্তু এ ধর্ম সিদ্ধ হয় না।—নৃত্য-গীত-কীর্তন প্রভৃতিতে সন্ন্যাসের হানিই হয়। তবে চিত্তকে জ্ঞান-মার্গে নিয়ে যেতে পারলে আর কোন চিন্তা নেই,—সে জন্যে সন্ন্যাসীর প্রধান কর্তব্য এমন-কি পরম ধর্ম হচ্ছে,—বেদ-শ্রবণ। তোমার সদ্‌গুণের অভাব নেই,—এর ওপর বেদ-শ্রবণে তোমার চিত্ত আরো নির্মল হবে। আমি প্রতিদিন অপরাহ্নে বেদ পাঠ করবো,—তুমি নিষ্ঠা ভরে শুন্‌বে।

'আপনার অনুগ্রহে কৃতার্থ হলাম।'—পরম দীনতায় উত্তর দিলেন প্রভু,—আমি অজ্ঞ,—আপনার কাছে শিশুমাত্র। আমার এ-দেহ আপনার,—যাতে আমার মঙ্গল হয়,—তাই করুন।'—এ-বিনয় মৌখিক নয়,—একান্ত আন্তরিক! প্রভুর মুখে বরাবর এই একই রূপ বিনয়ের কথা। দম্ভ বা অভিমানের লেশও তাতে নেই। সার্বভৌম মনে মনে ভাবলেন,—সুপাত্রে দান করলেই দানের সার্থকতা।

এমন যোগ্য পাত্র তিনি বুঝি আর জীবনেও পাননি। একান্ত আগ্রহে তিনি তার পরদিন থেকে বেদপাঠ সুরু করলেন,—প্রভুও অনুগত শিষ্যের মত তাঁর কাছে বসে পাঠ শুনে যেতে লাগলেন পরম নিষ্ঠায়।

একে একে সাতটি দিন চলে গেল। সার্বভৌম পড়ছেন, ব্যাখ্যা করছেন; প্রভু শুনছেন। কিন্তু তিনি কোন স্থলে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন না,—কেবল শুনেই যান নীরবে।

সার্বভৌম আশ্চর্য হলেন,—এ কিরূপ শিক্ষার্থী? কোন জিজ্ঞাস্যই কি এর নেই? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন প্রভুকে,—আমি যে ব্যাখ্যা করছি—তা বেশ বুঝতে পারছো তো।

'আজ্ঞে-না।'—অকপট বিনীত কণ্ঠেই উত্তর দিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—আমি অজ্ঞ, —পড়াশোনা সে রকম নেই। আর আপনি মহাপণ্ডিত,—আপনার ব্যাখ্যা বুঝবো কেমন করে? ব্যাখ্যার মধ্যে আমি ঢুকতে পারছি না।"

'তবে আমায় বলনি কেন?'—তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো সার্বভৌমের দৃষ্টি,—"তুমি যদি না বুঝবে,—তবে পড়ছি, কার জন্যে—কি জন্যে?"

'প্রভু, আপনার আজ্ঞা বেদ-শ্রবণ করা,'—শ্রীগৌরাঙ্গ নম্রভাবেই উত্তর দিলেন, —'তাই আমি নীরবে শুনে যাচ্ছি।'—

'তা ব'লে ব্যাখ্যা না বুঝলে বলবে না?—তাহলে এ-ক'দিনের মধ্যে কিছুই বোঝনি বল।'—সার্বভৌমের কণ্ঠে যেন নৈরাশ্যের সুর বেজে উঠলো। প্রভু বললেন,—'আজ্ঞে বেদের সূত্রগুলি পরিষ্কার বুঝতে পারছি—কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সে-কি?'—সার্বভৌমের পাণ্ডিত্যের অভিমানে আঘাত লাগলো,—"সূত্র বুঝতে পারছো,—ব্যাখ্যা বুঝছো না। তবে কি আমার ব্যাখ্যা ঠিক হচ্ছে না, বলতে চাও?"

'আজ্ঞে না, না, সে কথা কেমন করে বলি?'—প্রভু ব্যগ্রভাবে দুইকর সংযুক্ত করলেন,—"তবে আপনার ব্যাখ্যা যেন কতকটা মনঃ-কল্পিত; যেন মায়াবাদ প্রচারের জন্যেই এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে! তাই বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। আমার মনে হয়, বেদের সূত্রগুলির প্রকৃত সরলার্থ তা নয়।"

'কি বললে?'—বেদের আচার্য মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম,—তাঁর সম্মুখে একটি চব্বিশ বছরের যুবক কি-না বলে,—তোমার অর্থ ঠিক নয়?—সার্বভৌম এবার ক্রুদ্ধ হয়েই উঠলেন,—"আমার অর্থ মনঃকল্পিত? কিন্তু এ ব্যাখ্যা ভগবান শঙ্করাচার্যের,—তা জান? বেশ, বেশ, তুমি কিরূপ ব্যাখ্যা কর, শুনি! বুড়ো বয়সে না হয়, তোমার কাছেই বেদের ব্যাখ্যা শিক্ষা করি!—কথার শেষে তাঁর কণ্ঠে যেন একটু শ্লেষের সুরই বেজে উঠলো!

প্রভু মাথা নত করে বললেন,—ভগবান শঙ্করাচার্যকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। তাঁর মহিমা খর্ব করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি তাঁর কৃত 'প্রচলিত' ব্যাখ্যা সম্বন্ধেই আলোচনা করছি।

রুষ্টরোষে সার্বভৌম বললেন,—বেশ, তাই কর। দেখি, এইটুকু বয়সে তুমি কতটা এগিয়েছ!'—তখনও তাঁর কণ্ঠে যেন শ্লেষের সুর বাজছে!

এরপর বেদ-সূত্রের এক-একটি করে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন প্রভু। মায়াবাদ যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে যেতে লাগলো সে ব্যাখ্যায়। তখন সার্বভৌমের সহিত তাঁর ঘোর তর্ক-বিতর্ক বাধলো। সে বিপুল তর্ক-বিতর্কের বিশদ বর্ণনা পৃথক গ্রন্থ-সাপেক্ষ। যেন দুই অসামান্য শক্তিধর একে অন্যকে স্বমতে আনবার চেষ্টা করছেন। সার্বভৌমের ভাণ্ডারে যত পুঁজি ছিল,—একে একে সবই হলো নিঃশেষ,—তবু প্রভুর মত খণ্ডন করে তিনি স্বমত প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন না। সার্বভৌম যার দু'রকম অর্থ করেন, শ্রীচৈতন্য করেন তার দশ রকম। ভাগবতের একটি শ্লোক নিয়ে সার্বভৌম নয় প্রকার অর্থ করলেন,—প্রভু তার একটিও গ্রহণ না করে শব্দে শব্দে—তার অর্থ করলেন আর-ও আঠারো রকম। —এবং প্রত্যেক ব্যাখ্যা দ্বারা অখণ্ডনীয়ভাবে সেই একটি তত্ত্বই প্রমাণ করলেন যে,—ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ।—সর্বশাস্ত্র ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—সেই একই কথা বলে। বেদ-বেদান্তও তার বিরোধী নয়।

অগাধ পণ্ডিত সার্বভৌম!—এবং পাণ্ডিত্যের মহিমা পণ্ডিতেই বোঝেন!—সুতরাং প্রভুর অসাধারণ শাস্ত্র-জ্ঞান এবং অলৌকিক পাণ্ডিত্য উপলব্ধি করতে তাঁর বাকী থাকলো না; উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে অভিমান-উত্তেজনা সব ঠেলে বলে উঠলেন তিনি—অদ্ভুত, অদ্ভুত! মানবিক শক্তির পক্ষে—এ অসাধ্য—এ কল্পনাতীত!'—পরে মনে মনে ভাবলেন,—ইনি কি তবে স্বয়ং বৃহস্পতি? না, না, বৃহস্পতিও বুঝি এত শক্তিধর নন্! তবে—তবে—কে—ইনি?—তাঁর অন্তর গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠ্‌লো,—সহসা গোপীনাথ আচার্যের কথাও মনে পড়ে গেল তাঁর,—তবে কি গোপীনাথের কথাই সত্য?—ইনিই কি সেই তিনি? —সেই রাম—সেই কৃষ্ণ—সেই—সেই-কি—এই স্বর্ণপ্রভানিন্দিত গৌরকান্তি জ্যোতির্ময় পুরুষের রূপে?—সার্বভৌম চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন!—এদিকে বেদসূত্র আলোচনা করতে করতে শ্রীগৌরাঙ্গের দেহেও তখন ভগবৎ-আবেশ হয়েছে।—সার্বভৌম আর নিজেকে দমন করতে না পেরে সহসা অধীর আত্মহারাভাবে ধরতে গেলেন প্রভুর চরণে!

কিন্তু এ-কি?—মুহূর্তে যেন দৃশ্যপট বদলে গেল! সার্বভৌম চমকিত হয়ে দেখলেন,—তাঁর সম্মুখে সেই তরুণ সন্ন্যাসী নেই,—তাঁর স্থলে দাঁড়িয়ে আছেন এক অপূর্ব-সুন্দর মূর্তি—ত্রিভঙ্গঠামে।—'তিনি দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ

নন,—ষড়ভুজ! ঊর্ধ্বের দুই বাহু নবদূর্বাদলের ন্যায় শ্যাম,—সেই দুই ভুজে ধৃতধনুর্বাণ,—মধ্যে দুই ভুজ নীলকান্তমণির মত নীলোজ্জ্বল,—মুরলী ধরে রয়েছেন সেই দুই ভুজে। নিম্নের দুইবাহু, স্বর্ণবর্ণ,—তার একটিতে দণ্ড,—একটিতে কমণ্ডলু।—প্রশান্ত মধুর হাস্যজড়িত মুখখানি মুরলী-রন্ধ্রে সংযোজিত।—শিরে মোহন-চূড়া!—সর্বাঙ্গ ঝলমল করছে এক স্নিগ্ধ সুদিব্য প্রভায়।—এই ধ্যান-লোক-সম্ভব অপূর্ব মূর্তি-দর্শন কি তবে সার্বভৌমেরই প্রগাঢ় নিষ্ঠার ফল?—তাঁরই মানস-লোক-বিভাবিত রাম-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গের সম্মিলিত ভাবেরই কি আবেশ হয়েছে গৌরাঙ্গ দেহে?—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"—গীতার এই বাণীই কি সার্থক হয়েছে এখানে?—কে-জানে?

সেই মূর্তির দিকে চেয়ে সার্বভৌম থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন সেখানে।—অপূর্ব ষড়ভুজমূর্তি কোটি সূর্যময়।

দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্বভৌম মহাশয়॥

মূর্চ্ছিত সার্বভৌমের দেহে প্রভু ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে সার্বভৌমের মনে হলো,—যেন গভীর অন্ধকার থেকে এসেছেন আলোকের রাজ্যে।—যেন এইমাত্র একটা সুখ-স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন।

—সম্মুখে প্রভুকে দেখে,—তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লেন সার্বভৌম,—'প্রভু, আমাকে ক্ষমা কর।'

প্রভুর দেহে তখন-ও ভগবৎ-আবেশ রয়েছে। তিনি ভাব-গম্ভীর প্রশান্ত-কণ্ঠে বললেন,—'শান্ত হও। তুমি আমার পরমভক্ত,—তাই তোমাকে দর্শন দিলাম। আমার কৃপা ভিন্ন আমাকে পাওয়া যায় না,—আর ভক্তগণই সে কৃপার অধিকারী।'

বহুভাগ্য-ফলে রাম-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ—একাধারে ত্রিমূর্তিরই সম্মিলন দেখলেন সার্বভৌম। তাঁর তপস্যা-ফল-দৃষ্ট ওই ষড়ভুজ মূর্তি তিনি স্বহস্তে অঙ্কিত করে—জগন্নাথ মন্দিরেও রাখলেন। তাঁর অঙ্কিত সে অপূর্ব মূর্তি—আজিও পুরীর মন্দিরে অপার মহিমায় বিদ্যমান আছে।

* * *

'কেমন, আমি বলেছিলাম না সার্বভৌম?'—প্রভু এবং সার্বভৌম গল্প করছিলেন, এমন সময় গোপীনাথ আচার্য এসে প্রীতি-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঈষৎ কৌতুক মিশিয়েই বললেন—'এখন আমার কথা ঠিক হলো তো?'—একটু গর্ব এবং গৌরবের ভাবও যেন ফুটে উঠলো তাঁর মুখে।

সার্বভৌম আর 'সে সার্বভৌম' নেই,—প্রভুর করুণার স্পর্শে—তাঁর জ্ঞানও পাণ্ডিত্যের অভিমান ক্রমশঃ সরে গিয়ে,—অন্তর তাঁর ভরে উঠেছে—ভগবদ-

প্রেমের মধুর রসে,—প্রগাঢ় ভক্তির পূণ্য পীযূষ-ধারায়। প্রভু আর তাঁর কাছে তরুণ এক ভক্ত সন্ন্যাসীমাত্র নন্,—স্বয়ং শ্রীভগবান—দ্বিতীয় জগন্নাথ। কেমন করে এ পরিবর্তন সম্ভব হলো,—যাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে,—তিনিই শুধু উপলব্ধি করতে পারেন—অনন্যোপলব্ধ সে তত্ত্ব—ঈশ্বরের সে অপার মহিমা! ঈশ্বরকৃপা ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না,—এ কথার কথা নয়,—জ্বলন্ত সত্য। তার জন্যে—জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা চাই। সার্বভৌমের সে সাধনা ছিল,—শুধু একটা মোহের আবরণে আবরিত ছিল তাঁর সত্য-দৃষ্টি,—প্রভুর মহিমায় সে আবরণ সরে গেল,—সার্বভৌমের চোখে ফুটলো প্রেমের অসীম রাজ্য, অনন্ত সম্পদ—অবারিত আলোক।

গোপীনাথের কথায় আজ আর কোন উষ্মা, কোন লজ্জা অথবা কোন অভিমান জাগলো না সার্বভৌমের মনে। আজ তাঁর চিত্ত সর্বসংস্কার, অবিশ্বাস ও সন্দেহ-মুক্ত হয়ে নির্বিকল্পভাবে পূর্ণ হয়ে উঠেছে ভক্তি ও প্রেমে।—ষড়ভুজমূর্তি-দর্শনের পর-ও—সার্বভৌম বহুভাবে বহু পরীক্ষা করেছেন,—শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা সম্বন্ধে। কিন্তু প্রতিবারই নিজের পরীক্ষায় তিনি নিজেই পরাজিত হয়েছেন।

প্রীতিপূর্ণ নেত্রে গোপীনাথের দিকে চেয়ে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে তিনি বললেন. —'গোপীনাথ. তোমরা ধন্য, তাই পূর্বেই প্রভুকে চিন্তে পেরেছ। আমি অভিমান-অন্ধ,—তাই আমার এত দেরী হলো। তবু তোমাদের প্রীতি আমাকে পরম সম্পদের সন্ধান দিয়েছে, এ জন্যে তোমরা আমার ধন্যবাদর্হ।'—প্রভুর দিকে চেয়ে বললেন,—'প্রভু, গোপীনাথ, অনেক পূর্বেই তোমার স্বরূপ আমাকে জ্ঞানিয়েছিল,—আমার তর্কনিষ্ঠ অবিশ্বাসী মন,—তাই ও'র কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু প্রভু, দোষ তো আমার নয়!'—তাঁর মুখে মৃদু কৌতুকের হাসি ফুটলো,—"তুমি যে এমনি ভাবে সামান্য সন্ন্যাসী সেজে জগৎকে ছলনা করবে,—তা কি করে বুঝবো? তোমার লীলা তুমিই বোঝ,—আর তুমি বোঝালেই অন্যে বোঝে। তবু বলবো, আমার জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি ছিল. —আর তোমারও কৃপা ছিল, তাই শ্রীভগবানকে পেয়েছি নিজের ঘরে।"

'না, না, না,'—প্রভু ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন,—'ও কথা বলো না, জীবে ভগবৎ-বুদ্ধি মহাপাপ! আমি তোমার সন্তানের মত,—তোমার বাৎসল্য-স্নেহের ভিখারী,—তুমি মহাপণ্ডিত,—আমি অজ্ঞ বালক! কোন সময় তোমার কাছে কোন অপরাধ করে ফেলি,—আমাকে সংশোধন করে নিয়ো।'

আসল কথা—শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে যখন ভগবৎ-আবেশ না থাকতো, তখন তাঁকে কেউ ভগবান বললে তিনি যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠতেন! কিন্তু সার্বভৌম কি আর সহজে ভুলবার পাত্র? তিনি যে সকল রহস্যেরই সন্ধান করে

ফেলেছেন। জহুরী—জহর চিনেছেন সন্দেহাতীতভাবে। নিত্যানন্দ, হরিদাস, জগদানন্দ—মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে মিলে মিশেও নানা তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁর সংস্কারাচ্ছন্ন মনের কাছে। তাঁদের জীবনেও তিনি দেখেছেন প্রভুর অলৌকিক মহিমার বিকাশ। দেখেছেন,—প্রভুর কৃপায় তাঁরাও এক দুর্লভ সম্পদের অধিকারী নমস্য মহাজন।

সার্বভৌম শান্ত-মধুর হাস্যে বললেন,—'প্রভু, আর ভুলাতে পারবে না। গোপীনাথের কয়েকটি সহজ কথায় তোমার স্বরূপ সুন্দর ফুটেছে। আমাদের মত মোহান্ধদের প্রেমধর্ম শিক্ষা দিতেই—তুমি ভক্তরূপে এই লীলা করছো।—"ভক্তরূপেণ অবতীর্ণ যতিবশেঃ হরি",—এই তোমার আসল পরিচয়! প্রভু, তুমি আমার প্রভু, তুমি নিত্যানন্দের প্রভু,—তুমি জগতের প্রভু, তুমিই দ্বিতীয় জগন্নাথ,—মহাপ্রভু।—বলতে—বলতে ভাবের আবেশে বিপুল শিহরণ জাগলো তাঁর সর্বাঙ্গে,—তিনি যুক্ত করে—উদাত্ত স্বরে শ্রীগৌরাঙ্গের স্তব করতে লাগলেন,—

উজ্জ্বলবরং গৌরবর দেহং | বিলসতি নিরবধি ভাববিদেহং,
ত্রিভুবনপাবন কৃপয়ালেশং | তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥
যুগধর্ম যুতং পুনঃ নন্দসুতং | ধরণী সুচিত্র ভবভাবোচিতং।
তনুধ্যান চিত্রং নিজবাসযুতং | প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং
অরুণ নয়নং সুচারু কপোলং | বদনে স্খলিত স্বনাম মধুরং
কুরুতে সুরসাং জগতো জীবনং | প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং ॥

কঠোর নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ্যধর্মী সার্বভৌম প্রভুর ভাবে এমনই বিভাবিত হয়ে উঠলেন যে,—জাত্যাভিমানাদি সংস্কারগুলিও ক্রমশঃ সরে গেল তাঁর মন থেকে। প্রেমোন্মত্ততার সময়—এই ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত সর্বজনমান্য পরম গম্ভীর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সার্বভৌম—হরি হরি বলে দু'বাহু তুলে অঙ্গভঙ্গী-সহকারে নৃত্য করতেও কোন লজ্জা-কুণ্ঠা বোধ করতেন না! পরশমণির স্পর্শ এমনই বটে!

৫৮

'শ্রীপাদ,'—নিত্যানন্দের দিকে চেয়ে বললেন মহাপ্রভু,—'আমি একবার দক্ষিণ অঞ্চল ভ্রমণে যাবো।'

'কেন, প্রভু, নীলাচলে এসে আবার দক্ষিণ-দেশে ঘুরতে যাবেন কেন?'—প্রভুর উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে না পেরে প্রশ্ন তুললেন নিত্যানন্দ। মহাপ্রভু উত্তর দিলেন,—'আমার দাদা বিশ্বরূপকে খুঁজতে যাবো আমি।'

বিস্ময় আরও বেড়ে গেল নিত্যানন্দের।—একমাত্র শচীদেবী ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকলেই জানতেন,—স্বামী শঙ্করারণ্যপুরী (বিশ্বরূপ) বহু পূর্বেই দেহ-রক্ষা করেছেন। প্রভুর-ও তা না জানার কথা নয়। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য হলো অন্যরূপ,—তিনি দক্ষিণাঞ্চলে যাবেন, হরিনাম-বিতরণে—জীবোদ্ধারে। ভারতের সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চল—সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত ভ্রমণের উদ্দেশ্য আছে তাঁর। কিন্তু মনের কথা প্রকাশ করতে চান্ না কারো কাছে,—তাই একটু ছলনা করলেন নিত্যানন্দকে।

নিত্যানন্দ বললেন—তোমার ইচ্ছায় বাধা দেবে কে?—নইলে আমার ইচ্ছা ছিল না—তুমি নানা দুঃখ কষ্ট করে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। আমরা কি জন্যে আছি? আমাদের আদেশ কর,—আমরা যাই।

"না, না, তোমাদের দ্বারা হবে না,",—মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'এমনকি তোমরা এবার আমার সঙ্গেও যেতে পাবে না?'

'মানে?' বিস্ফারিত নেত্রে চাইলেন নিত্যানন্দ প্রভুর দিকে,—'আমরাও সঙ্গে যেতে পাবো না?...তুমি একাই যাবে?...কে তোমার ভিক্ষার আয়োজন করবে?...ভাবের আবেশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে অচেতন হয়ে পথের মাঝে পড়ে থাকলে,—কে তোমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাবে? চোখের জলে তো পথই দেখতে পাবে না! ...কোথাও নাচতে নাচতে আছাড় খেয়ে হয়ত দেহের হাড় ক'খানাই ভেঙ্গে চূর হয়ে যাবে!'—নিত্যানন্দের কণ্ঠ এক অপার্থিব মমতার আবেগে ভারী হয়ে এলো,

—চোখ দুটিও ভরে উঠলো জলে,—না, না, একা তোমাকে কোনমতে যেতে দেবো না আমরা।

'তোমরা শুধু আমার সুখ-দুঃখের কথা ভেবেই গেলে।' প্রভুর কণ্ঠে যেন একটু রূঢ়তা ফুটলো,—'কিসে আমি সুখে থাকি,—এই শুধু তোমাদের চিন্তা। আমার ইচ্ছামত কৃচ্ছ্রসাধন করতে গেলেই,—তোমরা দুঃখ পাও। তোমাদের কৃষ্ণকেও ভুলে যাই।—না, এ-যাত্রায় কেউ যেতে পাবে না আমার সঙ্গে। মমতা-স্নেহ আমাকে এমনভাবেই ঘিরে রেখেছে যে,—অনেক সময় আমি আমার

অভিমানে মুখ ভারী হয়ে উঠলো নিত্যানন্দের,—'প্রভু, আমরা তোমার দাস,'—ক্ষুণ্ণ কণ্ঠেই তিনি বললেন,—তোমার দুঃখ আমাদের সহ্য হয় না,—তাই তুমি আমাদের দূরে ঠেললেও আমরা যে পারি না দূরে সরে যেতে!

নিত্যানন্দের অভিমান বুঝে প্রভুর মনেও দারুণ কুণ্ঠা ও ব্যথা জাগলো,—না, না, শ্রীপাদ, তোমাদের কি আমি দূরে ঠেলতে পারি?—তোমাদের স্নেহ না পেলে আমি আজ এই নীলাচলেই কি আসতে পারতাম? এ-দেহ তোমাদের—আমার নয়। তোমরা আমাকে বেচতেও পারো। তবে এবার আমাকে একা যাবার অনুমতি দাও। আমি শীগ্‌গিরই ফিরবো।—না হয় একজন ভৃত্য দিও আমার সঙ্গে।

এর পর শুধু নিত্যানন্দই নন, ভক্তগণ সকলেই প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রায় বাধা দেবার অনেক চেষ্টাই করলেন,—এমন কি পায়ে ধরেও অনুরোধ করলেন তাঁরা,—কিন্তু মহাপ্রভু—নির্বিকার—অটল! শেষ পর্যন্ত নিজেরা না পেরে সকলেই শরণাপন্ন হলেন বাসুদেব সার্বভৌমের।...প্রভু তাঁকে গুরুর মতই সম্মান করেন,—হয়ত তিনি অনুরোধ করলে,—প্রভু তাঁর কথা ঠেলতে পারবেন না।...কিন্তু তাঁরা ভাবলেন না যে,—মহাপ্রভুর ইচ্ছাশক্তির কাছে সার্বভৌমকেও নত হতে হবে। এবং হলোও তাই। সার্বভৌম অশ্রু-উদ্বেলিত কণ্ঠে প্রাণের আকুতি ঢেলে দিলেন যেন প্রভুর চরণে,—কিন্তু প্রভুর মুখে সেই এক কথা,—'তোমরা নিশ্চিন্ত থাক,—আমি শীগ্‌গির ফিরে আসবো। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।

মহাপুরুষরা পুষ্পের মতই কোমল,—আবার বজ্রের মতই কঠিন,—একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে বহু স্থলে,—এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না।...অতঃপর একদিন একমাত্র ভৃত্য গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাত্রা করলেন দক্ষিণের পথে।...নিত্যানন্দ, দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ এবং সার্বভৌম অশ্রুসিক্ত নেত্রে তাঁর পশ্চাৎ অনুসরণ করলেন,—তাঁরা কোনক্রমেই প্রভুকে ছাড়তে পারছেন না,—প্রভু যেন সকলের প্রাণ নিয়ে যাচ্ছেন সঙ্গে করে,—তাই তার টানে টানে ভক্তবৃন্দও এগিয়ে চলেছেন আকুল অন্তরে।

কতকটা এগিয়ে মহাপ্রভু সার্বভৌমকে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন।—'আর একটু যাই না?'—সসঙ্কোচে সাগ্রহ প্রশ্ন করেন সার্বভৌম—চোখ দুটিও জলে ভরা!—প্রভু ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন,—'না, না, আপনি এবার ফিরে যান।...'

সার্বভৌম বললেন,—'তুমি স্বেচ্ছাময়,—তোমার ইচ্ছা কে রোধ করবে? তবু তোমাকে বলছি, শীগ্‌গির ফিরে এসে আমাদের প্রাণ রক্ষা করবে। নয়, তোমার বিরহে আমাদের দেহে আর জীবন থাকবে না। প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কাটবে শুধু তোমারই চিন্তায়!...তা'ছাড়া, তোমার চরণে আরও একটি প্রার্থনা আছে প্রভু,—গোদাবরীতীরে বিদ্যানগর,—সেখানকার রাজা রামানন্দ রায়। অবশ্য সে স্থানও গজপতি প্রতাপরুদ্রের অধিকার ভুক্ত।...রায় রামানন্দ রাজার মতই জাঁকজমকে থাকেন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি পরম ভক্ত—এবং প্রগাঢ় রসজ্ঞ—অনাসক্ত যোগী। তাঁর মত ভক্ত জগতেও বিরল।...বিষয়ী বলে অবহেলা না করে তাঁকে একবার দর্শন দিও। আগে আমি তাঁর মাহাত্ম্য বুঝতে পারিনি. এমনকি উপহাসও করেছি তাঁকে; কিন্তু তোমার কৃপা পেয়ে আমার সে-ভ্রম ভেঙেগেছে।

'বেশ, তাই হবে।'—প্রভু মৃদু হাসলেন।...কিন্তু সার্বভৌমকে আর একটি পা-ও অগ্রসর হতে দিলেন না। অগত্যা সার্বভৌম প্রভুকে প্রণাম করে ফিরলেন বাড়ীর পথে—ছলছল চোখে!

নিত্যানন্দ প্রভৃতি কিন্তু কিছুতেই প্রভুর সঙ্গ ছাড়েন না! প্রভু যত বলেন,—'আর না, এবার ফেরো,'—ভক্তেরা ততই বলেন,—'ওই যে ওই গাছটা—বা ওই মোড়টা পর্যন্ত যাই।'—কিন্তু এমন কত গাছ পড়ে থাকে পেছনে,—কত মোড় ঘুরে যায় কত দিকে,—তাঁরা এগিয়েই চলেন।...ক্রমে আলালনাথের কাছে আসতেই প্রভু এবার একটু রূঢ় কণ্ঠেই বললেন,—'তবে তোমরাই যাও,—আমি আর যাবো না।'

নিত্যানন্দ বুঝলেন,—আর একটি পা-ও এগোনো চলবে না।...তাঁরা সকলেই স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন সেখানে। প্রভু আর পেছনে না চেয়ে এগিয়ে চললেন। যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায়, ভক্তগণ অনিমেষ নেত্রে চেয়ে থাকলেন তাঁর দিকে। শেষে যখন আর দেখা গেল না,—তখন আকুলভাবে কাঁদতে লাগলেন সকলে।...এমনকি, সেদিনটা ব্যথাহত হয়ে সেখানেই পড়ে থাকলেন,—পরদিন ফিরে এলেন জগন্নাথে।...

মহাপ্রভু চলেছেন একমনে—মুখে অবিরাম,—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং', চোখে অজস্র বারিধারা,—কটির ডোরে ঝুলছে করোয়া,—এক হাতে জপের মালা,—আর এক হাতে দণ্ড; গায়ে কাঁথা। পেছনে চলেছে ভৃত্য নীরবে—প্রভুর সমগতিতে।—কেউ যে পেছনে আছে,—এ জ্ঞানও যেন আর প্রভুর নেই।...ক্রমশঃ

তিনি একেবারে বাহ্যজ্ঞান-হারা হয়ে পড়লেন,—চারিদিকে যাবতীয় দৃশ্য যেন সরে গেল তাঁর দৃষ্টি থেকে,—চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলেন—শুধু মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ।...ভাবের আবেগে হঠাৎ কোথাও বা থমকে দাঁড়িয়ে—'হরি-হরি' বলে নৃত্য করেন দুবাহু তুলে।—সে-ধ্বনির কি আকর্ষণ! শুনে,—ছুটে আসে পথি-পার্শ্বস্থ জনপদের কত লোক—পুরুষ-নারী-নির্বিশেষে।

চমকে ওঠে সকলে মহাপ্রভুর দিকে দৃষ্টি পড়তেই,—কে-এ—কে-এ?...এ-কোন্ দেবতা, নেমে এসেছেন পৃথিবীতে?...কৌপীন-পরিহিত—তপ্তকাঞ্চন বর্ণ—দীর্ঘদেহ—তরুণ সন্ন্যাসী—প্রেমে ঢল ঢল মুখ,—ছলছল আয়ত লোচন,—যে দেখে, সেই ভক্তিপ্লুত হয়ে প্রণাম করে মাটিতে মাথা লুটিয়েই।—প্রভুর হরি-ধ্বনির সঙ্গে সকলেই করতে থাকে হরি-হরি ধ্বনি।...ক্রমে প্রভুর সংবাদ যেন তাঁর আগে আগেই ছুটতে লাগলো।—দু পাশাড়ি অসংখ্য লোক কি-এক মধুর উন্মাদনায় ছুটে আসতে লাগলো—প্রভুর যাত্রাপথে। যেন পূর্ব থেকে কোন এক পুণ্যদর্শন মহাপুরুষের আগমন-সংবাদ পেয়ে—তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এসে দাঁড়িয়ে আছে সকলে পথের দু' পাশে।—প্রেমানন্দে বিভোর—হরি-নামোন্মত্ত প্রভু কাছে আসতেই শত শত মাথা লুটিয়ে পড়ে মাটিতে—সমবেত কণ্ঠের হরি-হরি ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে ওঠে।...মুগ্ধ-আত্মহারা জনতার কণ্ঠে ক্রমে রটে গেল,—যতিবেশী ভগবান চলেছেন পথ দিয়ে—কে দেখবে ছুটে এসো!...কেমন করে কিভাবে এই প্রেরণা জাগলো সকলের অন্তরে—অন্তরে—এ-প্রশ্ন যেন মীমাংসারও অতীত।—

বাসুদেব নামে এক ব্যক্তির কানেও পেঁছিল সে-সংবাদ। পরম ভক্ত এই বাসুদেব,—কিন্তু সর্বাঙ্গ তার গলিত কুষ্ঠে জরজর!—চলচ্ছক্তিও যেন নেই তার। তবু সন্ন্যাসীবেশে ভগবান যাচ্ছেন শুনে বহু কষ্টে নিজের দেহটাকে মাটির ওপর দিয়ে টানতে টানতেই কোনরূপে এসে থামলো সে পথের ধারে,—কিন্তু সহসা শুনলো,—ভগবান কিছুক্ষণ আগেই চলে গেছেন।

'অ্যাঁ,—চলে গেলেন!'—বাসুদেব যেন মূর্চ্ছাই যাবে!...একটু সামলে নিয়ে কেঁদে উঠলো সে আকুলস্বরে,—'হায়, হায়, প্রভু, আমি সংসারে সকলের ঘৃণ্য,—পরিত্যজ্য, শুধু তোমার নাম সার করেই পড়ে আছি। তুমি যে করুণার অবতার,—তোমার কাছে তো কেউ ঘৃণ্য নেই! কিন্তু আমার ভাগ্যে তোমারও কৃপা জুটলো না!'...আশাহত বাসুদেব ধুলায় লুটিয়ে কাঁদতে থাকে সেখানে।

ভগবান শ্রীচৈতন্য তখন প্রায় ক্রোশের পথ এগিয়ে চলে গেছেন,—সহসা তাঁর মনে হলো, কে যেন তাঁকে পেছন থেকে ডাকছে,—অমনি থমকে দাঁড়ালেন তিনি,—উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন যেন কোন বেদনাতুর ভক্তের কাতর ক্রন্দন।—আর এগিয়ে যাওয়া হলো না তাঁর,—ফিরলেন সেখান থেকে—বিপরীত মুখে,

—ভৃত্য অবাক,—কিন্তু কি প্রশ্ন করবে সে?—করবেই বা কোন সাহসে? সে-ও ফিরলো প্রভুর পিছু পিছু।

এক ক্রোশ ফিরে এসে মহাপ্রভু যেখানে থামলেন,—সেখানেই তখনও বাসুদেব কাঁদছিল ধুলায় লুটিয়ে। আর যেন ফিরে যাবারও শক্তি নেই তার।...হরি-হরি বলে উচ্চধ্বনি করে করুণাসুন্দর প্রভু দুই বাহু প্রসারিত করলেন বাসুদেবকে আলিঙ্গন করতে।...হরিধ্বনি শুনে চমকে উঠেই—প্রসারিত-বাহু প্রেমময় প্রভুকে সম্মুখে দেখেই বিহ্বল হয়ে উঠলো বাসুদেব,—'দয়াময়, দয়াময়, তোমার এত দয়া, তুমি অধমকে দেখা দিতে ফিরে এসেছো?'—উচ্ছ্বসিত রোদনে আকুল হয়ে উঠলো সে,—কিন্তু, না, না, প্রভু, আমাকে ছুঁয়ো না;—আমি তোমার স্পর্শের যোগ্য নই। জঘন্য ব্যাধি নিয়ে আমি পড়ে থাকি একপাশে,—অতি সামান্য ব্যক্তিও আমার ছায়া এড়িয়ে চলে!...প্রভু, আমাকে তুমি ছুঁয়ো না। আমি মহাপাপী—মহানারকী—

'তুমি মহাপুণ্যবান,'—ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ প্রশান্ত-উদার কণ্ঠে বললেন,—'তাই এই ব্যাধির আবরণে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরে পেয়েছ।...তুমি ভক্ত,—ভক্তের দেহ,—আমার কাছে পুষ্প-চন্দনের মতই পবিত্র।'—বাসুদেবের আর কোন বাধা না মেনে তিনি প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন তাঁকে।...কি অমিয় স্পর্শ,—ব্যাধির জ্বালা, মনের শোকতাপ—সবই যেন জুড়িয়ে গেল বাসুদেবের। একান্ত দুর্লভ পরম সম্পদ-লাভের আনন্দে—বুকের ভাষা আর মুখে ফুটলো না তার। ...কিছুক্ষণ পরে তাকে আলিঙ্গন-মুক্ত করে প্রভু বললেন,—বাসুদেব,—'কৃষ্ণ-ভজনা কর।...কৃষ্ণের কৃপায় তুমি আরোগ্যলাভ করবে।' প্রভু আর দাঁড়ালেন না—আবার ফিরলেন—'হরি-হরি' বলতে বলতে—গন্তব্য পথে। বাসুদেব প্রভুর উদ্দেশে মাটিতে মাথা লুটিয়ে অনেকক্ষণ পড়ে থাকলো সেখানে।...মহাপ্রভুর আশীর্বাদ বিফল হয়নি,—বাসুদেব সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত হয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে প্রভু এসে পৌঁছলেন গোদাবরী তীরে। এ-স্থানের দৃশ্য অতি মনোরম,—তীরে সুরম্য বন,—বিবিধ তরু-লতা-গুল্মে চারিদিক যেন এক শ্যামল শোভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,—ফল ও ফুলের বিচিত্র সমারোহে—নানা-জাতীয় বিহঙ্গের মধুর কল-কাকলীতে,—অলির গুঞ্জনে—প্রশান্ত সে-নদীতীর মনে এক অপূর্ব পুলক জাগিয়ে তোলে। প্রভুর ভক্তমন এখানে এসে এক অভাবনীয় ভাবে ভরে উঠলো। ঘাটের একপাশে বসে—তিনি কৃষ্ণনাম জপ করতে লাগলেন একাগ্রচিত্তে।

অদূরে আর এক ঘাটে—ঠিক এই সময় রাজা রামানন্দ স্নানে নামছেন।...রাজোচিত আড়ম্বরেই তিনি এসেছেন গোদাবরী-স্নানে। সঙ্গে বহু লোক-লস্কর, হাতী-ঘোড়া,—সিপাই-সান্ত্রী—বাদ্যভাণ্ড ইত্যাদি আরও কত কি?...

কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠলো গোদাবরী-তীর। সহসা প্রভুর দৃষ্টি পড়লো তাঁর দিকে। বুঝিবা এক পরম শুভক্ষণেই দৃষ্টি-বিনিময় ঘটলো উভয়ের।...প্রভু নিমেষেই বুঝলেন, ঐ ব্যক্তিই রামানন্দ রায়।...এ-দিকে প্রভুর প্রতি দৃষ্টি পড়তে রাজা রামানন্দও আকৃষ্ট হয়েছেন,—কে ও-জ্যোতির্ময় সৌম্য-শান্ত কনক-বরণ তরুণ সন্ন্যাসী ?—

রামানন্দ রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বের সাধক,—একাধারে যুগল মূর্তির উপাসক। সাধারণতঃ মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের ওপর তাঁর খুব শ্রদ্ধা নেই; কিন্তু এ-কি হলো তাঁর,—তিনি তো এ-সন্ন্যাসীকে অবহেলা করতে পারছেন না ? সন্ন্যাসী যেন কি-এক জন্ম-জন্মান্তর অবিচ্ছেদ্য অনুপেক্ষণীয় আকর্ষণে টানছেন তাঁকে নিজের দিকে।...সম্মোহিত দৃষ্টিতেই চেয়ে থাকলেন রাজা রামানন্দ কিছু-ক্ষণের জন্যে প্রভুর দিকে।...তারপর আর যেন স্থির থাকতে পারলেন না,—ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন এ-ঘাটের মুখে।—তাঁর অনুচরবর্গও অনুসরণ করলো তাঁকে।

কাছে এসে মহাপ্রভুর মুখের দিকে একবার চেয়েই তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন রায় রামানন্দ।—'ওঠ, ওঠ,'—প্রগাঢ় প্রীতিভরে দু হাত দিয়ে তাঁকে বুকে তুলে আলিঙ্গন করলেন প্রভু,—'বল, হরেকৃষ্ণ।'

—'হরেকৃষ্ণ!'—প্রেমার্দ্রকণ্ঠে বললেন রামানন্দ।

তুমি তো রামানন্দ ?—প্রভু বললেন। রামানন্দ উত্তর দিলেন,—'আমিই সেই অধম—আপনার দাস।'

'কেন, এত আর্তি প্রকাশ করছো ?'—নম্র-মধুর কণ্ঠেই বললেন প্রভু—তুমি শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত,—প্রগাঢ় প্রেমিক। আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, বাসুদেব সার্বভৌমের মুখে তোমার মহিমা শুনে সেই নিত্য-প্রেমরস আস্বাদনের জন্যেই তোমার উদ্দেশে এখানে এসেছি। সে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের কিছু আলোচনা করে আমাকে ধন্য কর।'

শুধু সার্বভৌমের কথায় নয়...রামানন্দকে স্পর্শ করেও মহাপ্রভু বুঝে-ছিলেন,—বাইরে রাজা হলেও অন্তরে তিনি প্রকৃতই ভক্ত। যেহেতু স্পর্শেরও প্রভাব আছে। আপন সন্তানকে স্পর্শ করেই পিতার অনুভূতি-কেন্দ্রে পুলক জাগে,—যেহেতু উভয়ের ধমনীতে ছুটছে একই রক্তের ধারা।—দুটি ভক্তপ্রাণেও তেমনি চলছে সেই একই মহিমময়ের লীলা! তবে রামানন্দের ক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?—প্রভুকে দর্শনমাত্রই তো তাঁর অন্তরে প্রেমের শিহরণ জেগেছিল; এখন তাঁর পুণ্যস্পর্শ পেয়ে—তিনিও বুঝেছিলেন,—এই সন্ন্যাস-ধর্মী তরুণ সুন্দর গৌরাকান্তি পুরুষ নিত্য প্রেমের আধার। তাই তিনি মৃদু হেসে কৃতার্থতার আনন্দেই বললেন,—প্রভু, দাসের সঙ্গে আর ছলনা কেন?...

জানি না, আজ কোন শুভক্ষণে আমার প্রভাত হয়েছিল,—আবার কোন পুণ্য-লগ্নে আমি এসেছিলাম গোদাবরী স্নানে!

প্রভু মধুর হাসলেন,—প্রায় ধরা পড়েছেন তিনি রামানন্দের কাছে! বুঝলেন,—মায়াবাদী সন্ন্যাসী-পরিচয়ে—রামানন্দকে ভ্রান্ত করা সুকঠিন।... তখন সাগ্রহে কৃষ্ণকথা আলোচনা করতে সুরু করলেন তাঁর সঙ্গে। রামানন্দ বললেন,—প্রভু যখন এসেই পড়েছেন, তখন দয়া করে কয়েক দিন এখানে থাকুন, —আপনার কৃপায় আমার মনের মালিন্য দূর হোক।

'কয়েকদিন কেন, রামানন্দ?'—প্রীতির আবেগেই বললেন মহাপ্রভু,—'চির-দিন থাকবো তোমার সঙ্গে।...তুমি নীলাচলে চল।...ইতিমধ্যে আমি দক্ষিণ-ভ্রমণ শেষ করে আসি।' পরে ক্ষণেক নীরব থেকে কি যেন চিন্তা করে বললেন, —আচ্ছা, রামানন্দ?

'আদেশ করুন প্রভু?'—সতৃষ্ণ নেত্রে চাইলেন রামানন্দ প্রভুর দিকে।...প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন,—এতদিন তো সাধন-ভজন অনেক করলে—কিন্তু কোন্‌ভাবে ভজনা করা,—ভজনার চরম এবং পরম পন্থা বলতে পারো?'

'প্রভু এ-কি কথা?'—সবিস্ময়ে চাইলেন রামানন্দ মহাপ্রভুর পানে,—আপনাকে বোঝাবো আমি? তবে দাস যতটুকু অধিকার পেয়েছে,—সেই অনুসারেই বলছি সর্বভাবের চেয়ে—তাঁকে কান্তভাবে ভজনা করাই ভজনার শ্রেষ্ঠ পন্থা,—রাধা-প্রেমই বিশুদ্ধ—নিস্কাম—পরম ও চরম আদর্শ!'

'রামানন্দ, রামানন্দ,'—প্রভু যেন বিহ্বল হয়ে উঠলেন,—'এসো, এসো, আমাকে আলিঙ্গন দাও,—আজ তুমি আমায় কিনে রাখলে!'—দুই বাহু বিস্তার করে তিনি নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, রামানন্দকে। তাঁর চোখ দিয়েও ঝরে পড়লো অজস্র ধারা।

কিন্তু এই আলিঙ্গন লাভ করে—এ-কি হলো রামানন্দের?...যেন তাঁর শিরা-উপশিরায় ছুটে গেল এক অননুভুত-পূর্ব শক্তি-প্রবাহ। এর পর যত বার তিনি তাঁর উপাস্য রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি স্মরণ করতে গেলেন,—ততবারই সম্মুখের ওই শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্তি জেগে উঠতে লাগলো তাঁর অন্তরে।...বার বার রাধাকৃষ্ণকে ভাবতে যান,—বার বারই শ্রীগৌরাঙ্গ হাস্যরঞ্জিত মুখে জেগে ওঠেন —যেন রাধাকৃষ্ণ মূর্তিকে আড়াল করে।—যে-দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন— সেই দিকেই শ্রীগৌরাঙ্গ।...রামানন্দের বাহ্যজ্ঞান আচ্ছন্ন হয়ে এলো; থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন প্রভুর সম্মুখে।...প্রভু পরম স্নেহে তাঁর সর্বাঙ্গে হাত বুলাতে লাগলেন।...

মূর্চ্ছাভঙ্গে রামানন্দ ভাবাবেগে শুধু একটি কথাই বললেন,—প্রভু, তবুও ছলনা?...তুমিই তো এক দেহে রাধাকৃষ্ণ!

মহাপ্রভু অমনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন,—না, না, সে-কি? ও-কথা বলতে আছে?...তুমি ভক্ত,—তাই কৃষ্ণময় জগৎ দেখছো।

'আর সেই জগৎ তোমাতেই প্রকাশমান,'—রামানন্দ মৃদু হাসলেন।

৫৯

'সার্বভৌম, এ-কি সত্য?'—গভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করেন মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র,—লোক-মুখে শুনছি, এক মহাত্মা এসেছেন নীলাচলে? তিনি ভগবানের অবতার,—দ্বিতীয় জগন্নাথ।...তুমি নাকি তাঁর অসীম করুণা লাভ করেছ?'

সম্ভ্রমে অভিবাদন জানিয়ে উত্তর দেন পণ্ডিত বাসুদেব,—'মহারাজ, যা শুনেছেন, সকলি সত্য?...তিনি করুণাময়, তাই নিজগুণে অধমকে চরণে স্থান দিয়েছেন।'

'বটে, বটে!'—ব্যাকুল হয়ে ওঠেন প্রতাপরুদ্র,—'তবে আমি যাতে তাঁর এক-বার দর্শন পাই,—তাঁর ব্যবস্থা কর।'

আসল কথা, মহাপ্রভু যতদিন নীলাচলে ছিলেন,—তাঁর সংবাদ, তাঁর মাহাত্ম্যের কথা ততটা প্রচার হয়নি,—কিন্তু যেই তিনি দক্ষিণের পথে পা বাড়ালেন, অমনি তাঁর সংবাদ যেন বাঁধভাঙ্গা রুদ্ধ স্রোতের গতিতে সমগ্র নীলা-চল প্লাবিত করে তুললো।—বিশেষ সার্বভৌমের আমূল পরিবর্তন দেখে,—এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের মধ্যে গৌরাঙ্গ-প্রেমের এক চিত্তোন্মাদনকর অভিব্যক্তির পরিচয় পেয়ে,—শ্রীক্ষেত্রের বিশিষ্ট অ-বিশিষ্ট সকলেই মহাপ্রভুর দর্শন-লাভের জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন,—সকলেই এসে সার্বভৌমকে ছেঁকে ধরলেন,—'প্রভুকে আমাদের একবার দেখাও।'

মহাপ্রভুকে দক্ষিণে বিদায় দিয়ে সার্বভৌমের মনের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। দিবানিশি তিনি চিন্তা করতেন 'গৌররূপ,' শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভুর কথা আলোচনা করে—কোনরূপে কাটতো তাঁর এক-একটি দিন।...তার ওপর সকলে এসে তাঁকে এইভাবে ঘিরে ফেলতে তিনি বড়ই বিব্রত হয়ে উঠলেন,

—তবে সম্প্রতি দর্শনাথীদের নিরস্ত করবার উপায় তো প্রভুই করেছেন;—তাই সার্বভৌমকে বেশি বিব্রত হতে হলো না,—তিনি সকলকে আশ্বস্ত করে বললেন,—'তিনি তো এখন দক্ষিণ ভ্রমণে গিয়েছেন,—ফিরে আসুন,—নিশ্চয়ই তোমরা তাঁর দর্শন পাবে।'

এতে প্রভুর জন্যে লোকের আকুলতা আরও বেড়ে গেলো, যাকে মনপ্রাণ দিয়ে চাওয়া যায়; কিন্তু পাওয়া যায় না,—তাকে পাবার আগ্রহ প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। ..লোকমুখে প্রভুর কথা তখন আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো দিকে দিকে। ক্রমে সে কথা রাজা প্রতাপরুদ্রের কানে এসেও পৌঁছল কটকে। শোনামাত্র তিনিও চঞ্চল হয়ে ডেকে পাঠালেন সার্বভৌমকে।

রাজার ব্যাকুলতা দেখে প্রমাদ গণলেন সার্বভৌম! প্রভু বিষয়ী লোকের মুখ দর্শন করতে চান না,—অথচ রাজার যে রকম আকুলতা,—তাতে হয়ত তিনি প্রভুকে কোনদিন কটকে নিয়ে আসবারই হুকুম দিয়ে বসবেন। সার্বভৌম তখন সাহস করে বলেই ফেললেন,—মহারাজ, তিনি সন্ন্যাসী, নির্জনে সাধন-ভজন করেন,—রাজদর্শন সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ।...তাও আমি আপনার জন্যে চেষ্টা করতাম.—কিন্তু এখন তিনি এখানে নেই। দক্ষিণে তীর্থভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন।

'তীর্থভ্রমণ করতে?'—বিস্ময়ে ললাট কুঞ্চিত হয়ে ওঠে মহারাজের,—'শ্রীক্ষেত্রে এসে আবার তীর্থভ্রমণ কেন?—সকল তীর্থের সার তো এই শ্রীক্ষেত্র?'

'তাঁর নিজের জন্যে নয় মহারাজ,'—সার্বভৌম উত্তর দেন,—'জীবের কল্যাণে। 'যাঁরা মহাজন,—তাঁরা নিজেদের দিকে লক্ষ্য রাখেন না;—লক্ষ্য তাঁদের অন্যের দিকে। তমোধর্মী জীবকুল ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে,—অধঃপাতের দিকে,—তাদের উদ্ধারই প্রভুর উদ্দেশ্য।'

'কিন্তু তুমি তাঁকে এত শীগ্‌গির যেতে দিলে কেন?'—তীক্ষ্ণতা ফুটে ওঠে রাজার দৃষ্টিতে,—'বুঝিয়ে পড়িয়ে এখন এখানেই রাখতে হতো। তাহলে আমি তাঁর দর্শন পেতাম।...তুমি খুব জিদ্ করলে না কেন?'

প্রভুকে দর্শনের জন্য রাজার আন্তরিক আকুলতাই যেন রূপ পরিগ্রহ করছিল তাঁর কথায়।...সার্বভৌম বললেন,—মহারাজ, আমরা পায়ে ধরেও তাঁকে নিরস্ত করতে পারিনি। তিনি স্বেচ্ছাময়, স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেয় সাধ্য কার?'

স্বতন্ত্র ঈশ্বর!—স্বতন্ত্র ঈশ্বর!—রাজা দু'বার কথাটা আত্মগতভাবে উচ্চারণ করেন,—পরে সতৃষ্ণ নয়নে সার্বভৌমের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন সাগ্রহে,—'স্বতন্ত্র ঈশ্বর!...তুমিও তাঁকে তাই বল না-কি?...সাধারণ লোককে অবশ্য বলতে শুনেছি; কিন্তু তুমিও তাঁকে—'

'হাঁ মহারাজ!'—কথা শেষ না হতেই সার্বভৌম বলেন আবেগে,—আমিও তাঁকে ঈশ্বর বলি।...আমি অধম, তর্কনিষ্ঠ-মোহান্ধ,—প্রথমে অবিশ্বাস করেছিলাম,—কিন্তু প্রেমময় করুণাসুন্দর দেবতা নিজহতে আমার মনের আঁধার সরিয়ে দিয়েছেন,—চোখে দিয়েছেন দিব্যদৃষ্টি,—তাই তাঁকে চিনেছি।—বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ বাষ্পোচ্ছাসে রুদ্ধ হয়ে এলো।

'সার্বভৌম, সার্বভৌম!'—রাজার চঞ্চলতা তখন আরও বেড়ে গেছে,—'তবে প্রভু নীলাচলে ফিরে এলে,—আমি যাতে তাঁর দর্শন পাই,—তার ব্যবস্থা করতেই হবে তোমাকে। ভারতবিখ্যাত অনন্ত শাস্ত্রদর্শী—বৃহস্পতি-সদৃশ পণ্ডিত তুমি,—তুমি যখন তাঁকে 'শ্রীভগবান' বলছো,—তখন মূঢ়মতি আমি কি আর অবিশ্বাস করতে পারি?...কিন্তু সার্বভৌম, মনে রেখো,—আমার অনুরোধ।

সার্বভৌম এবার সসংকোচেই বললেন—কিন্তু মহারাজ, আগেই তো বলেছি, —'তিনি রাজ-দর্শন করেন না—তিনি—'

মহারাজ আকুল কণ্ঠে বাধা দিলেন,—'তিনি রাজদর্শন করবেন কেন?—আমি তাঁকে দর্শন করে ধন্য হবো।'

'ও-একই কথা মহারাজ।'—সার্বভৌম তবুও সাহসভরেই বললেন।—রাজা চীৎকার করে উঠলেন,—কিন্তু এ-চীৎকার ক্রোধের নয়,—আক্ষেপের—মর্মান্তিক যাতনার,—'কি বলছো তুমি সার্বভৌম, সকলেই তাঁর কৃপা লাভ করবে,—আর আমি শুধু 'রাজা' বলেই তাঁর করুণায় বঞ্চিত হবো?—রাজা হয়ে কি আমি এতই অপরাধ করেছি?'—তীব্র অন্তর্বেদনা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো তাঁর কণ্ঠে।

সার্বভৌম রাজার মনের অবস্থা বুঝে বললেন,—'মহারাজ, শান্ত হোন; তিনি ফিরে এসে নীলাচলেই বাস করবেন।...থাকবেন আপনারই রাজ্যের মধ্যে —আপনারই আশ্রয়ে। কাজেই তাঁর দর্শন লাভ আপনার পক্ষে হয়ত কঠিন হবে না। আপনার মন যখন তাঁর জন্যে এতখানি চঞ্চল,—তখন একদিন তিনি আপনাকে দর্শন দেবেনই।...কিন্তু ব্যস্ত হবেন না মহারাজ! সময়ে সবই হবে। এখন একটা সমস্যা হয়েছে।

'কি-সমস্যা?'—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমের দিকে।... সার্বভৌম উত্তর দিলেন,—'প্রভু তো কিছুদিন পরেই ফিরে আসবেন,—কিন্তু তাঁর বাসের জন্যে বেশ বড়—যেখানে অনেক ভক্ত-সজ্জন থাকতে পারেন অথচ জায়গাটা মন্দিরের কাছাকাছি এবং নির্জন হয়—এমনই একটা বাড়ি চাই; তাই ভাবছি,—কোথায়—'

'ভাবনার আর কি?'—ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন রাজা,—মিশ্র মহাশয়ের বাড়ীটা

দিলেই হবে। অনেক বড় বাড়ী,—কুঠুরি অনেকগুলি আছে,—মন্দিরের কাছাকাছি—নির্জন স্থান।

পরম আনন্দিত হলেন সার্বভৌম,—মিশ্রমহাশয় অর্থে মহারাজার গুরু কাশী মিশ্র। সার্বভৌম ভেবে দেখলেন,—মহারাজের নির্বাচন খুব উপযুক্তই হয়েছে।...অতঃপর সার্বভৌমের কাছে রাজা অনেকক্ষণ বসে প্রভুর সম্বন্ধে বহু কথা শুনতে লাগলেন প্রগাঢ় নিষ্ঠায়—একাগ্রচিত্তে।

*　　　*　　　*

এ-দিকে প্রভু পথের পর পথ হাঁটছেন,—সেই আত্মভোলা ভাব, সেই মুখে অবিরাম কৃষ্ণনাম,—চোখে অজস্র বারিধারা। পথের দুর্গমতা যতই ভীষণ হোক,—প্রভুর মুখে কোনদিন কোন মালিন্যের ছায়া পড়ে না,—কোনদিন ভিক্ষা জোটে—কোনদিন জোটে না,—অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটে—তাও ভৃত্য গোবিন্দ মনে করিয়ে না দিলে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা যেন মনেই থাকে না তাঁর!... পথ অধিকাংশ জঙ্গলময়,—কোথাও মাঠের পর মাঠ ধু ধু করছে,—কোথাও অত্যন্ত বন্ধুর। একাদিক্রমে দু'তিন দিনও মুখে কিছু পড়ে না প্রভুর,—তবু মুখে সেই কৃষ্ণ নাম,—চোখে বারিধারা। কখনো কখনো ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন, —বৃক্ষতলে। প্রভুর দিকে চেয়ে চেয়ে ভৃত্যের প্রাণ ব্যথায় কেঁদে ওঠে,—সে যথাশক্তি প্রভুর অসুবিধা দূর করতে চেষ্টা করে,—কিন্তু বিদেশ-বিভূঁয়ে—নিঃসম্বল কপর্দকহীন অবস্থায় সে-ই বা কি করতে পারে?

বিদ্যানগর থেকে প্রভু আসেন ত্রিমন্দ নগরে। সেখানে বহু বৌদ্ধের বাস। বৌদ্ধ-শিরোমণি মহাপণ্ডিত রামগিরি প্রভুর সঙ্গে তর্ক করেন,—কিন্তু অবশেষে পরাজিত হয়ে আশ্রয় লন প্রভুরই চরণে। গ্রহণ করেন,—কৃষ্ণনাম। এখানে মহাপাণ্ডিত্যাভিমানী ঢুণ্ডিরামও প্রভুর সহিত বিচারে পরাস্ত হয়ে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন,—প্রভু তাঁর নাম দেন হরিদাস।...

এর পর প্রভু হাঁটতে হাঁটতে এলেন অক্ষয়বট নামক একস্থানে। এখানে ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে তিনি এক জায়গায় বিশ্রাম করছিলেন,—এমন সময় তীর্থরাম নামে এক যৌবনমদমত্ত ধনশালী নীচ চরিত্রের বণিক প্রভুকে পরীক্ষা করবার জন্যে সত্যবাই এবং লক্ষ্মীবাই নামে দুই পরমাসুন্দরী তরুণী বেশ্যাকে পাঠিয়ে দেয় প্রভুর কাছে। বেশ্যাদের কি কি করতে হবে—তাও শিখিয়ে দিয়েছিল পাপাত্মা তীর্থরাম।...তারা এসে প্রভুর দু'পাশে বসে নানা কলুষিত হাবে-ভাবে —লাস্যে-হাস্যে কাম-কটাক্ষে প্রভুর মন বিচলিত করবার চেষ্টা করে,—

কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী, সত্যবাই হাসে।
হাসিমুখে সত্যবাই বসে প্রভু পাশে।

প্রভুর কিন্তু কোনদিকে দৃষ্টি নেই—মুখে সেই কৃষ্ণনাম, দু'নয়নে সেই অবিরল

ধারা।...কোনমতে প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পেরে অবশেষে লক্ষ্মী খুবই বাড়াবাড়ি সুরু করলো,—এমন কি নিতান্ত লজ্জাহীনার মত প্রভুর গায়ের আবরণ কন্থখানি খুলে ফেললো সে,—এবার প্রভু তার দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন,—'কি মা?...তুমি কি চাও?'—কি প্রশান্ত করুণা-সুন্দর দৃষ্টি, —কি অমৃত-নিস্যন্দী মধুর বাণী!—প্রভুর দু'চোখ দিয়ে যেন সুধার ধারা ঝরে পড়ছে,—প্রেম-ঢলঢল অশ্রু-লাঞ্ছিত মুখখানি যেন কোন পুণ্যধামের বার্তা ঘোষণা করছে। সে-দৃষ্টির সম্মুখে লক্ষ্মী জড়সড় হয়ে পড়লো,—অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো তার—না, না, এ কোথায় এসেছে তারা?—এ তো মানুষ নয়,— এ-যে দেবতা!..ছিঃ, ছিঃ, এ-কি করেছি আমি?...সহসা কেঁদে উঠে লুটিয়ে পড়লো সে প্রভুর চরণে,—ঠাকুর, ঠাকুর, আমার অপরাধের ক্ষমা নেই।..দয়া করে নিজগুণে আমাকে কৃপা কর।

'ওঠো মা, ওঠো,'—প্রভু শশব্যস্তে সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—আমি তোমাদের পুত্র—আমাকে অপরাধী করো না। মা, শ্রীকৃষ্ণের শরণ নাও,— তবেই মনের গ্লানি দূর হবে।'

দেখে শুনে সত্যবাইয়ের অন্তরেও তখন জেগেছে দারুণ অনুতাপ! সে-ও কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়লো প্রভুর চরণে,—ঠাকুর, আমিও সমান পাপে-পাপী। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

ও-দিকে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে মূল-পাপী তীর্থরাম দেখছিল সবই। সহসা কি-যে হলো তারও মনে,—সে ছুটে এসে কেঁদে পড়লো সেখানে —ঠাকুর, ঠাকুর, ওদের দোষ নেই,—আমিই প্রকৃত অপরাধী,—আমাকে দণ্ড দাও। আমাকে দণ্ড দাও!

করুণার্দ্র নেত্রে তাদের দিকে চেয়ে প্রভু বললেন,—শ্রীকৃষ্ণ দয়াময়,—পাপ-তাপ সব দূর হবে তাঁর কৃপায়। তোমরাও তাঁর শরণ নাও। বল সকলে,— হরেকৃষ্ণ।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠেই সকলে বলে উঠলো,—হরেকৃষ্ণ!......

এর পর প্রভু প্রবেশ করলেন দশক্রোশ-ব্যাপী এক বিস্তীর্ণ-বিশাল জঙ্গলে। এই জঙ্গলে—প্রভুর দুঃখকষ্টের সীমা-পরিসীমা ছিল না,—জঙ্গলের ধারে পাশে ক্বচিৎ দু'একটা গ্রাম। গোবিন্দ কোনরকমে প্রভুর ভিক্ষার দ্রব্য সংগ্রহ করে,—তাও সামান্য। প্রায়ই উপবাসে দিন যায় প্রভুর। প্রভুর তাতে যেন কোন দুঃখ নেই,—কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ভৃত্যের বুক ফেটে যায় গভীর দুঃখে!—বনপথে—যেখানে জঙ্গল খুব ঘন হয়ে উঠেছে,—সেখানে নানা হিংস্র জন্তুর—এমন কি বাঘেরও সামনে পড়তে হয় প্রভুকে,—ভয়ে ভৃত্যের প্রাণ উড়ে যায়,—কিন্তু মহাপ্রভুর যেন কোন বাহ্যানুভূতিই নেই। তিনি

নির্ভয়ে—নিরুদ্বেগে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং' বলে অগ্রসর হতে থাকেন। আশ্চর্য যে,—ভীষণ হিংস্র জন্তুরাও কোন অনিষ্ট করে না তাঁর,—বরং তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়তেই যেন সম্ভ্রমে তাঁকে পথ ছেড়ে দিয়ে দৃষ্টি নত করে চলে যায়।

বন পার হয়ে মহাপ্রভু এলেন মুন্নানগরে, এখানে অসংখ্য লোক তাঁর পুণ্য-দর্শন লাভ করলো। ভাবোন্মত্ত প্রেমাকুল প্রভু এখানে শুধু হরি-হরি বলে যে অপূর্ব নৃত্য করলেন,—তার ছোঁয়াচ লেগে গেল—প্রাণে প্রাণে,—সকলে প্রভুকে ঘিরে হরিনামে মত্ত হয়ে নাচতে লাগলো। এখান থেকে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে হতে—তিনি এলেন ত্রিপদীনগরে,—সেখান থেকে দক্ষিণতীর্থে। ত্রিপদীতে এক রামাইত পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে তর্ক করে পরাস্ত হন,—পরিশেষে প্রভুর প্রেমের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে হরিনাম গ্রহণ করেন। দক্ষিণ তীর্থে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী সদানন্দ পুরীকেও প্রভু কৃষ্ণপ্রেম দান করেন। এর পর চাঁইপল্লী ও তাঞ্জোর হয়ে প্রভু আসেন চণ্ডালু গিরি,—এখানে বিভিন্ন মতবাদী বহু শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসীর বাস,—কিন্তু প্রভুর মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হয়ে—সকলেই আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁর পুণ্যচরণে।

প্রভু জনে জনে বলেন,—হরিনাম শুধু নাম নয়,—মহামন্ত্র। ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে যেমন লুকিয়ে থাকে ভবিষ্যতের বিরাট বনস্পতি; তেমনি হরিনামের মধ্যে স্বয়ং 'নামীই' বিরাজ করেন তাঁর অসীম শক্তি—অনন্ত মহিমা নিয়ে। যিনি অন্তরের পাপ-তাপ, দুঃখ-গ্লানি, অপবিত্রতা-মালিন্য, মোহাদিমাৎসর্য-সব হরণ করে সেখানে এনে দেন নির্মল শান্তি, আনন্দ-প্রীতি, বিনয়-তিতিক্ষা ইত্যাদি অমূল্য সম্পদ; মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে চিত্তে চিত্তে জাগিয়ে তোলেন সমপ্রীতি, সমত্ববোধ,—তিনিই হরি। নাম জপ করতে করতে স্বয়ং নামীই মূর্ত হয়ে ওঠেন অন্তরে। তাঁর প্রেমের আলোকে করুণার অমৃত ধারায়—দূর হয়ে যায় জীবনের যত অন্ধকার,—যা কিছু পঙ্কিলতা। চিত্তে আসে নব বল,—চক্ষে আসে নূতন আলোক,—সম্মুখে ভেসে ওঠে সৎ ও সুন্দরের পথ। তমোধর্মী কলিযুগে তাই—'হরের্নামৈব কেবলম'—এ ছাড়া আর অন্য গতি নেই।

ক্রমে প্রভু এলেন পদ্মকোটে, এখানে দেবী মহামায়ার অষ্টভুজা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত,—বিগ্রহ সম্মুখে মহাপ্রভু হরিনামে মত্ত হয়ে 'উদ্দণ্ড নৃত্য' করতে লাগলেন,—সেই নৃত্যের তালে তালে যেন দেবীর মন্দির—দেব-বিগ্রহ, চারি-দিকের যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু সবই ঘনঘন দুলতে লাগলো। সমাগত নর-নারীগণের মনে হোলো যেন দেবী ভগবতীর সম্মুখে স্বয়ং ভগবান এসে সন্ন্যাসী-বেশে নৃত্য করছেন,—দেবীর মন্দির মুহুর্মুহু হরি-হরি ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

সহসা এক অন্ধ ব্রাহ্মণ এসে কেঁদে পড়লেন প্রভুর পায়ে,—"হে ভগবান, দয়া কর। তোমাকে দেখতে আমি অনেক কষ্টে এখানে এসেছি, শুধু তোমাকে একবার দেখবার জন্যে।"

প্রভু একটু সরে দাঁড়িয়ে বললেন,—'এখানে তো ভগবান কেউ নেই,—তবে সম্মুখে দেবী ভগবতী অষ্টভুজা রয়েছেন,—তাঁকে প্রণাম কর।'

"না, না, তুমিই ভগবান!" রুদ্ধপ্রায় আবেগে বলে উঠলেন ব্রাহ্মণ,—'আমি স্বপ্নে দেখেছি, তোমার ভুবন-ভোলান রূপ!—তোমাকে দেখলে পাপ-তাপ সব দূরে যায়। একবার—একবার দেখা দাও প্রভু! দুর্ভাগ্য আমি,—দৃষ্টি-শক্তি আমার নেই। কিন্তু তুমি যে ভগবান! প্রভু, আমি চক্ষু চাই না, দৃষ্টি-শক্তি চাই না,—শুধু একবার—শুধু একবার—জীবনের মত—জন্মসাধ তোমাকে দেখতে চাই।'

ব্রাহ্মণের আকুলতা প্রভুর আর সহ্য হলো না। তিনি দু'হাত দিয়ে তাঁকে বুকে তুলে আলিঙ্গন করলেন গাঢ়ভাবে—শুধু তাঁর বেদনার্ত মনে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। কিন্তু—কিন্তু—এ-কি?—সহসা ব্রাহ্মণ বিপুল আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন—'পেয়েছি, পেয়েছি,—দেখতে পেয়েছি,—আহা-হা, কি স্বর্ণকান্তি উজ্জ্বল গৌররূপ,—কি প্রেমঢলঢল নয়ন,—কি করুণা-ঝরা প্রশান্ত দৃষ্টি,—কি মহিমোজ্জ্বল উদার ললাট,—আমি ধন্য, আমার জীবন ধন্য—সার্থক!—শ্রীহরি, শ্রীহরি'—হঠাৎ কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর,—অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন তিনি সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটিও মুদে গেলো তাঁর চির-তরে—

প্রভু তাঁর মৃতদেহ ঘিরে কিছুক্ষণ নাম কীর্তন করলেন,—তারপর স্বীয় তত্ত্বাবধানে তাঁর সমাধি দিয়ে...আবার চলতে লাগলেন গন্তব্য পথে। ক্রমশঃ তিনি এলেন চণ্ডেশ্বরে। কাবেরী নদীর দক্ষিণে এই তীর্থ। এখানে বহু শৈব-পণ্ডিতের বাস। অতিবৃদ্ধ মহাপণ্ডিত ভর্গদেব পণ্ডিত সম্প্রদায়ের নেতা। স্বয়ং ভর্গদেব এসে প্রণাম করলেন প্রভুকে,—'হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, আমার ও আমার সম্প্রদায়ের সকলের প্রণাম গ্রহণ কর। এতদিন তোমার নাম শুনেছি,—আজ তোমাকে চোখে দেখে জীবন সার্থক হলো।

দারুণ কুণ্ঠায়—ব্যগ্রভাবেই উঠে প্রভু প্রণাম করলেন ভর্গদেবকে,—এ-কি-এ-কি? আপনি আমার গুরুর গুরু—এভাবে আমাকে আর অপরাধী করবেন না। আমি অতি ক্ষুদ্র জীব,—আমার প্রতি এতবড় গুরুত্ব আরোপ করলে যে আমাকে পাপে ডুবতে হয়!

"তুমিই যতিবেশী গৌরকান্তি হরি!"—বৃদ্ধ কৃতার্থতার হাসি হেসে বললেন,—এতবড় জীবনটা কি মিথ্যাই সাধনা করেছি, যে, তুমি এখনও আমাকে

ভোলাবে?'—অতঃপর স-সম্প্রদায় ভর্গদেব কৃষ্ণনাম গ্রহণ করলেন মহাপ্রভুর কাছে।........

এরপর প্রভু আবার প্রবেশ করলেন এক বিশাল সুগভীর বনে,—পেছনে ভৃত্য গোবিন্দ চলেছে—ছায়ার মত। সম্পূর্ণ দুটি সপ্তাহ লাগলো এই দুর্গম বনভূমি অতিক্রম করতে। ক্রমে তিনি এসে পৌঁছলেন রঙ্গধামে,—এখান থেকে বাসভ পর্বতে; এখানে সাক্ষাৎ হলো তাঁর শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে। ইনি—প্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই। এখানে দুই একদিন মহানন্দে কাটিয়ে—পরমানন্দ পুরীকে নীলাচলে যাবার অনুরোধ জানিয়ে প্রভু এলেন কামকোটি,—এবং সেখান থেকে পরে দক্ষিণ মথুরা।—

ক্রমে রামনাদ হয়ে রামেশ্বরে,—সেখানে রামেশ্বর-শিব দর্শন করে প্রভু কিছুক্ষণ নৃত্য করলেন। এখানে বহু বড় বড় পণ্ডিত বাস করেন,—তাঁরা সকলেই প্রভুর সংবাদ পেয়ে সদর্পে তর্ক করতে এলেন তাঁর সঙ্গে। প্রভু মধুর হেসে নম্রভাবে বললেন,—আপনাদের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হবো, এমন শক্তি আমার কই? আপনারা সকলেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত,—আসুন, সকলকেই আমি জয়পত্র লিখে দিচ্ছি।—আমার নিজের পুঁজিমাত্র—'হরিনাম',—আর কিছু নেই। শুধু তাই নিয়ে আপনারা আমাকে কৃতার্থ করুন।

—কি যে হলো প্রভুর সেই কথায়,—পণ্ডিতগণের মনে আর কোন অহংকার-বুদ্ধি থাকলো না। প্রভুর মুখের দিকে চেয়ে তাঁরা যেন আত্মহারা হয়ে উঠলেন কি-এক অপূর্বভাবে। সমস্বরেই বললেন,—তুমিই প্রকৃত পণ্ডিত। তোমার মুখে ফুটে উঠছে এক দিব্যলোকের ছায়া। আমাদের মোহনাশ কর।"—প্রভু তাঁদের সকলকে কৃষ্ণনাম দান করে সেখানে থাকলেন সে দিন। কৃতার্থ হলেন পণ্ডিতগণ তাঁর সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করে।

দক্ষিণভ্রমণে তাঁকে বহু বৌদ্ধাচার্য—শৈবাচার্য, তন্ত্রচার্য, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, শংকরপন্থী প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদী সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রভু কোথাও বা পাণ্ডিত্যে, কোথাও নম্রতায়, কোথাও প্রেমে—সকলকেই নিয়ে আসেন স্বমতে। রামেশ্বর তীর্থে স্নান করে প্রভু আসেন কন্যাকুমারী। সেখানে দেবীকে দর্শন করে সাতান দিয়ে আসেন ত্রিবাঙ্কুরে। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রুদ্রপতি প্রভুর চরণপ্রান্তে পড়ে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করেন।

ত্রিবাঙ্কুর ছেড়ে তিনি প্রবেশ করেন মহারাষ্ট্রে,—শোনা যায়, মহারাষ্ট্রীয় সাধু তুকারাম প্রভুর মন্ত্র-শিষ্য। এখানেই পাণ্ডপুরে প্রভুর অগ্রজ শঙ্করারণ্য-পুরী বহুদিন পূর্বে অতি আশ্চর্যভাবেই অন্তর্ধান করেন। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে একদিন থেকে—পরে মৎসতীর্থ প্রভৃতি বহুস্থান দর্শন করে আসেন

নীলাগিরি পর্বতে। প্রভুর আগমনে সর্বত্রই হরি-নামের তরঙ্গ ছুটে যায়। নীলাগিরি থেকে গুর্জরী হয়ে বিজাপুর পর্বত দিয়ে তিনি আসেন পুণায়। পুণা থেকে প্রবেশ করেন আবার এক বিশাল অরণ্যে। এখানে নারোজী নামে এক দুর্দান্ত ডাকাত-সর্দার প্রকাণ্ড একটি দস্যুদল নিয়ে বাস করে। দলের প্রত্যেকটি লোক যেমন নিষ্ঠুর,—তেমনি ভীষণ,—আবার তেমনি শক্তিমান। শত নর হত্যা করেও তাদের প্রাণ কাঁপে না! নিষ্ঠুর এই নারোজীর সুনিশিত অস্ত্রের মুখে কত মাথা যে ধুলায় লুটিয়েছে,—তার হিসাব সে নিজেও বুঝি দিতে পারে না। মহাপ্রভু শুনলেন এই ভীষণ দস্যুর কথা। ভৃত্যকে বললেন, —গোবিন্দ. চল, ডাকাত-সর্দারের আড্ডার পাশ দিয়ে যাই।

'না, না প্রভু,'—আতঙ্কে চোখমুখ শুকিয়ে যায় গোবিন্দের,—শুনছি, বাঘের চেয়েও সে ভীষণ—সে তোমার মহিমা বুঝবে না। চল, আমরা এই দিকের পথ দিয়ে পাশে পাশে চলে যাই।

কথা হচ্ছিল,—বনের ধারে এক জায়গায়,—পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে কতকগুলি লোকও এসে জুটেছিল সেখানে প্রভুর নামে আকৃষ্ট হয়ে। তারাও সকলে শিউরে উঠলো,—না, না, গোঁসাই, অমন কাজ-ও করবেন না। তার পাপ-পুণ্যের বিচার নেই,—মানুষের রক্ত দেখেই তার আনন্দ।

কিন্তু এত বড় পাপী যদি উদ্ধার না হলো,—প্রভু ভাবলেন মনে মনে,—তবে আর তাঁর দক্ষিণ-ভ্রমণে কি লাভ? পাপী-তাপী, ডাকাত-দস্যু—অধম-নীচ প্রভৃতিই তো হরির বিশেষ কৃপার পাত্র! প্রভু কারো কথাই শুনলেন না,—তিনি ওই পথ দিয়েই অগ্রসর হলেন। গোবিন্দ আর করে কি? ভয়ে ভয়ে চললো প্রভুর পিছু পিছু। খানিকটা এগিয়ে এসে প্রভু বসলেন এক গাছের তলায়। নারোজীর আড্ডাটা তারই পেছনে।

একটু পরেই যমদূতের মত চেহারা—কয়েকজন দস্যু এসে দাঁড়ালো প্রভুর সামনে,—এরা নারোজীরই অনুচর,—'কে, তুমি?'—কঠোর কণ্ঠে তারা প্রশ্ন করলো প্রভুর দিকে চেয়ে,—'এখানে কি জন্যে এসেছ?' প্রভুর মুখে কোন উত্তর নেই। দস্যুরা গরম হয়ে উঠলো,—কথা কওনা কেন?—এখানে বসতে পাবে না; চল আমাদের সর্দারের কাছে।'

'আমি কারো ডাকে কোথায় যাই না।'—এবার প্রভু উত্তর দিলেন ক্ষণেক দস্যুদের দিকে চেয়ে,—কণ্ঠে ফুটলো বজ্রের দৃঢ়তা। এ ঔদ্ধত্য অসহ্য হলো দস্যুদের,—তারা জোর করেই প্রভুকে সর্দারের কাছে ধরে নিয়ে যেতে দু'এক-পা' এগিয়েও এলো—কিন্তু হঠাৎ কি যে হলো তাদের—প্রবল দুর্বলতা এসে পড়লো তাদের চিত্তে,—থমকে দাড়ালো তারা,—পরস্পর একবার দৃষ্টি বিনিময় করলো,

—একবার একযোগে তাকালো প্রভুর দিকে,—তারপর কি মনে হলো,—ধীরে ধীরে চলে গেল—নারোজীর আস্তার দিকে।

গোবিন্দ তখন ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে! গলার রস শুকিয়ে গেছে তার। প্রভু জপছেন নিরুদ্বেগে কৃষ্ণ নাম। একটু পরেই সানুচর নারোজী—প্রচণ্ড অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসে পড়লো সেখানে। বয়সে প্রৌঢ়,—লৌহ-কঠিন দীর্ঘ-দেহ—সবল দুই বাহু,—প্রশস্তবক্ষ—সর্বাঙ্গে কাঠিন্য,—মুখের রেখায় রেখায়—নিষ্ঠুরতার ছাপ! প্রাণ উড়ে গেল গোবিন্দের তাকে দেখেই.—আর বুঝি রক্ষা নেই। অনুচররাও সকলে সেজে এসেছে এবার অস্ত্রশস্ত্রে!

কিন্তু জগতে অসম্ভব-ও সম্ভব হয়। নিতান্ত অকল্পিত বস্তুও পরিণত হয় বাস্তবে। একটি পুণ্য মুহূর্ত-ও বদলে দিতে পারে—মানুষের সমগ্র জীবনের কলুষিত গতি।—ফিরিয়ে দিতে পারে তার মোড় একেবারে বিপরীত দিকে। প্রভুর দিকে চাইতেই কি-যে আলোড়ন জাগলো নরঘাতী ভীষণ দস্যু নারোজীব অন্তরে,—সে অস্ত্রশস্ত্র দূরে ছুড়ে ফেলে লুটিয়ে পড়লো প্রভুর চরণে।—'প্রভু প্রভু',—বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলো সে,—'তুমি কি সেই দয়াল ঠাকুর? নিজগুণে এসেছ অধমকে উদ্ধার করতে? দণ্ড দাও, প্রভু, দণ্ড দাও,—আমি ব্রাহ্মণের ছেলে—স্ত্রীপুত্রাদিও আমার নেই,—জানি না, কিসের মোহে আমি চিরদিন এত পাপ করেছি। ঘোর নারকী আমি, এই হাত কত মানুষের রক্তে রাঙ্গা হয়ে গেছে!—দয়া নয় প্রভু, দয়া নয়,—আমাকে দণ্ড দাও—দণ্ড দাও।

অনুতপ্ত দস্যুসর্দার অঝোর ঝরে কাঁদতে লাগলো,—তার দেখাদেখি,—দস্যুগণও ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়লো প্রভুর সম্মুখে। নারোজী তাদের দিকে চেয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে,—তোমরা যাও, সুপথে থেকে জীবিকা অর্জন কর। ভুলেও আর পাপ-পথে যেও না। আমি ঠাকুরের চরণ আর ছাড়বো না।'—পরে প্রভুর দিকে চেয়ে বললে,—'প্রভু, অধমকে পায়ে স্থান দেবে তো?'—চোখে তার কাতর আকুল দৃষ্টি। গণ্ড ভেসে যাচ্ছে অশ্রুধারায়।

'—ওঠো-ওঠো নারোজী,'—প্রভু স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বললেন,—ভয় কি? কৃষ্ণ দয়াময়, তাঁরই কৃপায় আজ তোমার মনের ময়লা দূর হয়েছে,—বল হরেকৃষ্ণ!

'হরেকৃষ্ণ. হরেকৃষ্ণ।'—বলে নারোজী নাচতে লাগলো। তার সঙ্গে তার অনুচরগণও নাচতে লাগলো হরেকৃষ্ণ বলে।

এই নারোজী মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রভুর আশ্রয় ছাড়েনি। প্রভুর মহিমার স্পর্শে—সে হয়েছিল পরমভক্ত। কিছুদিন পরে—প্রভুর সম্মুখেই সে পরম-গতি লাভ করে।.........

এরপর প্রভু আসেন খণ্ডলায়। প্রভুর আগমনে তাঁর চারিপাশ লোকে

লোকারাণ্য হয়ে উঠলো। সকলের মুখেই এক কথা,—'সন্ন্যাসী-বেশী শ্রীহরি এসেছেন।'—এক ব্রাহ্মণ-সন্তান প্রভুর মুখে হরিনাম শুনে—হরিনামে মত্ত হয়ে উঠলো,—সে আর বাড়ি যেতে চায় না। তার পিতা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে এগিয়ে এলো প্রভুর দিকে,—'ভণ্ড সন্ন্যাসী, নানা মায়া জানে! যাদু করে বেড়াচ্ছে। আমার ছেলেকে যাদু করেছে! মারের চোটে বার করে দিচ্ছি,—যত ভণ্ডামি।'—সরোষে এগিয়ে এলো সে মহাপ্রভুর দিকে লাঠি উঁচিয়ে। প্রভু মধুর হাসলেন,—'মারবে? মার। মেরে যদি আনন্দ পাও,—যত খুশী মার আমাকে। কিন্তু বাপু,একটি সর্ত,—যত ঘা মারবে,—ততবার হরিনাম বলতে হবে তোমাকে। রাজী আছো?'—স্মিতনেত্রে চাইলেন তিনি ব্রাহ্মণের দিকে।

তখন অন্যান্য সকলে রুখে এলো ব্রাহ্মণকেই মারতে,—'তুই ঘোর পাপিষ্ঠ—তাই তোর এমন মতি!'—গর্জে উঠলো তারা একযোগে,—'ফের যদি একটি কথাও বলেছিস ঠাকুরকে,—তোকে পুঁতে ফেলবো মাটিতে।'

'না, না, ওর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ো না।'—প্রশান্ত নেত্রে সকলের দিকে চেয়ে প্রভু বললেন,—'সন্তান-বাৎসল্যই ওকে উত্তেজিত করে তুলেছে।'—পরে ব্রাহ্মণ-কুমারের মাথায় হাত দিয়ে বললেন সস্নেহে,—'বৎস, পিতার কথা অবহেলা করতে নেই,—যাও বাড়ি যাও।'—ছেলেটিরও যে কি-হলো,—সে তার বাপের পাশে এসে দাঁড়ালো। ব্রাহ্মণ তখন অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা চাইলো প্রভুর কাছে।

এখানে এক ভিখারিণী এসে প্রভুর কাছে ভিক্ষা চায়। কিন্তু তিনি তো কপর্দকহীন সন্ন্যাসী,—কি-দেবেন ভিখারিণীকে? ভিখারিণীর কাতর মুখ কিন্তু কাতর করে তুললো তাঁকে। তখন তিনি হাত পাতলেন সকলের কাছে। মুহূর্তে কতদ্রব্য স্তূপীকৃত হয়ে উঠলো তাঁর সম্মুখে।—সমস্ত নিয়ে ভিখারিণীকে দিয়ে তিনি বললেন,—"মা, তোমার সন্তানও নিঃসম্বল ভিখারী। কৃষ্ণ তোমার কল্যাণ করুন।"

এরপর প্রভু ইলোরা, নাসিক, পঞ্চবটী, সুরাট, বরোদা, আহমদাবাদ, সোমনাথ, জুনাগড় প্রভৃতি বহুস্থান ঘুরে চলে গেলেন—দ্বারকার উদ্দেশে। বরোদার মহারাজা প্রভুকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করেন। প্রভুর আগমনে সুরাটের দেবীস্থানে পশুবলি বন্ধ হয়ে যায়। প্রভু যেখানেই যান,—সেখানেই লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে তাঁর বন্দনার গান! কোথাও কেউ তাঁর নাম জানতে পারে,—কোথাও পারে না। কিন্তু সর্বত্র প্লাবিত হয়ে ওঠে—তাঁর প্রেমের বন্যায়!.........

*

—ও-দিকে তখন সমগ্র নবদ্বীপ মহাপ্রভুর ভাবনায় উদ্বেগে আকুল হয়ে

উঠেছে,—ভক্তদের মনে পলকের জন্যেও শান্তি বা স্বস্তি নেই!—প্রভুর বিষয় চিন্তা করে করে নানা আশঙ্কা জাগে তাঁদের মনে,—কিছু ভালো লাগে না তাঁদের! এক অদম্য অধীরতা বুকে নিয়ে কোনরকমে দিন কাটেন তাঁরা।

শচীদেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার চিত্তের অবস্থা, আন্তরিক ব্যাকুলতা, এবং বিপুল আশঙ্কার কথা তো জগতের সব ভাষা একত্র করেও বর্ণনা করা সুকঠিন। শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে আছেন,—নিত্যানন্দ প্রভৃতি—গৌর-গত-প্রাণ ভক্তগণ সর্বদাই ঘিরে আছেন তাঁকে প্রেম, প্রীতি স্নেহ-মমতা দিয়ে;—অসামান্য প্রতিপত্তিশালী বাসুদেব সার্বভৌম তাঁর ভক্ত হয়েছেন,—প্রতি মুহূর্ত ভাল-মন্দের সংবাদ রাখছেন তাঁর,—সুতরাং শচী কি বিষ্ণুপ্রিয়া,—অথবা ভক্ত বা নবদ্বীপ-বাসীগণের তবু কিছুটা সান্ত্বনা বা স্বস্তি ছিল;—দূরে থাকলেও তাঁর নিরাপত্তার জন্যে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন সকলে। কিন্তু যখন থেকে তাঁরা শুনেছেন,—শ্রীগৌরাঙ্গ একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে করে—ঘুরে বেড়াচ্ছেন জঙ্গলময় দক্ষিণ-প্রদেশের—দুর্গম পথে;—কবে কোথায় যাচ্ছেন,—কি করছেন,—কেমন আছেন,—কোথায় গাছতলায় না পথের ধুলায় পড়ে দিন কাটছে তাঁর;—এসবের কোন সংবাদই নেই,—তখন থেকেই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্যে মন-প্রাণ একেবারে আকুল-অধীর হয়ে উঠলো সকলের!

নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের পর থেকেই তো শচীদেবী বা বিষ্ণুপ্রিয়া ধূলিশয্যা গ্রহণ করেছিলেন; আবার তাঁর দক্ষিণ-যাত্রা এ দুটি বিরহ-সন্তপ্তা নারীকে ধৈর্যের শেষ-সীমায় এনে উপস্থিত করেছিল। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ,—এবং বয়সোচিত প্রগাঢ় লজ্জাও তাঁকে সর্বদা ঘিরে থাকতো,—তাই অন্তর-নিহিত, প্রাণান্তিক প্রচণ্ডশোকের বাহ্য-প্রকাশ তাঁকে দমন করতে হতো বহুকষ্টেই। কিন্তু বৃদ্ধা জননী শচীমাতা সেই দুর্বিষহ শোকে যেন পাগলিনীই হয়ে উঠেছিলেন।

কখনো বাড়ির বাইরে এসে উচ্চকণ্ঠে—'নিমাই, নিমাই' করে ডাকতেন,—কখনো আপন মনে বিড়বিড় করে বলতেন,—'কখন যে গেছে বাপু সেই গঙ্গা-স্নান করতে,—এখনো দেখা নেই!'—সহসা হয়ত কোন পথচারী লোককে ডেকে বলে বসতেন,—'ওগো, একবার শ্রীবাসের বাড়িতে নিমাইকে একটু ডেকে দাও না,—রাত যে অনেক হলো,—আর কত কীর্তন করবে?' কখনো নিত্যানন্দকে উদ্দেশ করে বলে উঠতেন,—'ও বাছা নিতাই, শুনছো,—নিমাই নাচতে নাচতে বড় আছাড় খায়,—তুমি একটু দেখো।'

কখনো থালাভর্তি অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সাজিয়ে—আসন পেতে জল দিয়ে,—বলতেন,—'খা নিমাই খা'—না, না,—বেশি দিইনি'—আমার মাথা খাস,—সবই খেতে হবে তোকে।'—পরে একটু চুপ করে থেকে আবার বলতেন,—'গর্ভ-

থোড়ের তরকারী তো তুই ভালবাসিস নিমাই,—দেব আর একটু? ও-কি, ওকি, পায়েসটা যে খেলি না বড়,—না, না, খা' আর-একটু—"

নিমাই যেন তাঁর সামনে বসে খাচ্ছেন,—আর নিমাই-অন্ত-প্রাণা জননী—তাঁকে খাওয়াচ্ছেন আদর করে মনের সাধে। জানি না,—শোকাহতা বৃদ্ধা জননীর চোখের সামনে—তখন তাঁর নিমাই-সুন্দর এসে আসন গ্রহণ করতেন কিনা,—কিন্তু লোকে তাঁর শোকের এই অভিব্যক্তিগুলি দেখে চোখের জল মুছতে মুছতে বলতো,—'আহা,—বেচারা ছেলের শোকে পাগলই হয়ে গেল!'

সাধু-সন্ন্যাসীর ওপর এখন আর বিরাগ নেই শচীদেবীর, বরং তারাই যেন আজ তাঁর আত্মীয়। নবদ্বীপের রাজ-পথে যদি কোনদিন সাধু-সন্ন্যাসী কাউকে দেখতেন, অমনি লজ্জাকুণ্ঠা ঠেলে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন আকুল-কণ্ঠে,—'তোমরা কি একজন সন্ন্যাসীকে দেখেছো,—এই—এই—নাম তার,—নিম্—না, না, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,—দেখেছো তোমরা?

বয়সে নবীন, গলিত কাঞ্চন জিনি তনুখানি গোরা।

হরেকৃষ্ণ নাম বোলয়ে সঘন নয়নে গলয়ে ধারা।

হাঁ-গো, দেখেছো? দেখছো তোমরা?

সন্ন্যাসী বলেন,—কই, দেখিনি তো? তবে শ্রীচৈতন্যদেব নামে একজন সন্ন্যাসীর নাম শুনেছি। লোকে বলে,—তিনি না-কি ভগবানের অবতার।

'ওই—ওই,'—গভীর দুঃখেও শচীর দেহে পুলকের রোমাঞ্চ জাগে,—লোকে 'ভগবানই' বলে বটে।—কিন্তু আমার ছেলে—আমার ছেলে—আমার নিমাই—আমার নিমাই—বলতে বলতে 'নিমাই নিমাই' করে শচী যেন পাগলই হয়ে যান। কিন্তু কোন সন্ন্যাসী যদি তাঁকে শুধু বলেছেন,—'না, দেখিনি,'—অমনি যেন সেখান থেকে দেহটা নিয়ে ঘরেও আসতে পাবেন না শচী।

কোনদিন বা বিষ্ণুপ্রিয়াকে আলুথালু বেশে পড়ে থাকতে দেখলে—অমনি তিরস্কার করে ওঠেন,—আচ্ছা, বৌমা, তোমার কি আক্কেল বলো ত? একে-তো নিমাইয়ের আমার সংসারে মন নেই,—তার ওপর তুমিও যদি বাছা, এমনি করে থাকবে,—তবে আর ঘরে তার মন কি করে বসবে?

শাশুড়ীর মনের অবস্থা বুঝতে পারেন বিষ্ণুপ্রিয়া,—কিন্তু কি উত্তর দেবেন তিনি?—তাঁর শোক-সমুদ্রে শুধু আর একটি প্রচণ্ড তরঙ্গ জেগে ওঠে তাঁকে অধৈর্য করে তোলে!.........

৬০

দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করে প্রভু প্রথমে এসে উপস্থিত হলেন—প্রভাস-তীর্থে। এই প্রভাসের তীরেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৈচিত্র্যময় দ্বাপরিক লীলা শেষ করেছিলেন তাঁর। সে এক মর্মান্তিক মহান্-ইতিহাস,—ভূ-ভার-হারী শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধির অগম্য—এক অচিন্ত্যলীলা! প্রভাসের তীরে দাঁড়িয়ে একে একে বহু স্মৃতি আলোড়িত করে তুললো প্রভুর চিত্ত,—চোখ দিয়ে প্রবাহিত হলো তাঁর অজস্র ধারা—প্রভাসের তীরে কৃষ্ণ-প্রেমে আকুল হয়ে বহুক্ষণ নৃত্য করলেন তিনি। দলে দলে লোক এসে জুটলো প্রভুর সে ভাব-নৃত্য দেখতে। ক্রমে ক্রমে সমগ্র প্রভাস ভেসে গেল মহাপ্রভুর প্রেম-তরঙ্গে। হরেকৃষ্ণ, আর হরি-হরি ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো প্রভাসের আকাশ-বাতাস। কণ্ঠে কণ্ঠে রটে গেল,—রাধার বর্ণ-সুষমা নিয়ে—রাধা-বিভাবিত সন্ন্যাসীবেশী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এসেছেন—প্রভাস-তীর্থে বহু যুগ-যুগান্ত পরে।

প্রভাস-তীর্থে স্নান করে প্রভু গেলেন দ্বারকায়। যাঁর আদি লীলা সুরু হয়েছিল,—বৃন্দাবনে যশোদার অঙ্কে,—রাধার কুঞ্জে,—তাঁর অন্তলীলার সমাপ্তি ঘটেছিল এই দ্বারকায় সত্যভামা ও রুক্মিণীর বিয়োগ-বিধুর প্রেমাশ্রু-সলিলে। এই দ্বারকা থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষভাবে বিশাল ভারত-রাস্ট্রের কর্ণ-ধারণ করেছিলেন। রৈবতক গিরিদুর্গ-সুরক্ষিত দ্বারকাই ছিল যেন ভারতের কেন্দ্র, এবং কেন্দ্রাধিপতি ছিলেন কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ। যাঁর পাঞ্চজন্যের অভ্রভেদী আরাবে ধ্বনিত হতো সাম্যের সুর। যাঁর সম্বন্ধে একদিন তাঁর অগ্রজ হলায়ুধ বলভদ্রও বলেছিলেন,

> গোবিন্দের জাতিকুল নাহিক বিচার।
> ভক্তিতে যে ডাকে হয় সেই প্রিয় তার॥

আজ তাঁরই অন্যতম লীলাস্থল দ্বারকায়—যিনি তাঁরই প্রেমে বিভোর হয়ে—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্' বলতে বলতে এসেছেন,—তাঁরও বাণী,—'জাতিকুল আবার কি?—যে ভক্ত সেই শুচি,—সেই ব্রাহ্মণ!'—তিনিও এক হরিনাম মহা-

জন্যে গেয়ে চলেছেন সাম্যের গান,—বাঁধতে চাইছেন সকলকে ঐক্য ও মৈত্রীর বন্ধনে। দুই মহামানবের মহাবাণীর বাহ্যরূপ বিভিন্ন হতে পারে—প্রয়োগ-ধারা স্বতন্ত্র হতে পারে,—কিন্তু অন্তর্গত উদ্দেশ্য যেন একই। এক জাতীয়-তার বন্ধনে সকলকে বেঁধে—ভাবীকালের জন্যে এক সমতল বিশাল কর্মক্ষেত্রের প্রস্তুতি।

যেভাবেই হোক ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গও প্রস্তুত করেছিলেন এক নবজাতীয়-তার ভিত্তি। প্রাণে প্রাণে জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনি—এক অপূর্ব মহামিলনের সাড়া। কিন্তু তারপর?—তার পরের কথা ইতিহাস বলবে।

দ্বারকাও প্লাবিত হয়ে উঠলো প্রভুর আগমনে প্রেমের বন্যায়! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যদিও সমুদ্রগর্ভে,—তবু তাঁর স্মৃতি বুকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে—তারই পাশে যে দ্বারকা,—সেও সেই সুদূর অতীতের পুণ্যস্মৃতি-বর্জিত নয়; তারও বুকে উজ্জ্বল হয়ে আছে লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের বহু স্মৃতিরেখা। মহাপ্রভু এখানে এসে নিজেও মাতলেন,—অপরকেও মাতিয়ে তুললেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল নতুন প্রাণে জেগে উঠ্‌লো যেন মহাপ্রভুর আগমনে—পুণ্য কৃষ্ণনামের মধুর ঝঙ্কারে।......

প্রায় দুই সপ্তাহ মহাপ্রভু থাকেন দ্বারকায়,—তারপর প্রত্যাবর্তন করেন নীলাচলের উদ্দেশে। ইতিমধ্যে কয়েকজন ভক্তও মিলেছিলেন প্রভুর সঙ্গে। ভক্তজন সঙ্গে নর্মদার ধারে ধারে বহুপথ এসে বিন্ধ্যাচলে উঠে এলেন তিনি মন্দুরা। তারপর দেবঘর, শিবানীনগর, রায়পুর-ইত্যাদি বহু বহু স্থান দিয়ে এসে সর্বত্র নাম প্রচার করে উপস্থিত হলেন তিনি বিদ্যানগরে,—রামানন্দ রায়ের কাছে। প্রভুকে দেখেই রামানন্দ মহানন্দে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন তাঁর চরণে।—বহু পথশ্রমে,—অনাহারে অর্ধাহারে—প্রভুর দেহ তখন অনেক কৃশ হয়ে গেছে। মাথার চুল অনেক বড় হয়েছে, শমশ্রু দীর্ঘ হয়ে উঠেছে,—প্রভুকে যেন চেনাই যায় না। তবু কি রত্নের জ্যোতিঃ লুকিয়ে থাকে?—দীর্ঘ কেশ-শমশ্রু-সমন্বিত প্রভুর কৃশদেহে—তখন যেন অন্য একটি দিব্যভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রভু প্রায় দু'বছরই ঘুরে বেড়িয়েছেন দক্ষিণের বিস্তীর্ণ প্রদেশে।

[illegible]

‘আমি একরূপ প্রস্তুত হয়েই আছি প্রভু,’—রামানন্দ উত্তর দিলেন,—‘আমি মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে অনেক অনুনয়-বিনয় করে—কাজকর্ম থেকে অবসরও নিয়েছি,—তবু আমার কয়েকদিন দেরী হবে। রাজকার্যে অবসর নিলেও

আমার আশ্রিত বহু লোক আছে,—বহু হাতী ঘোড়া, এবং অন্যান্য পশুপক্ষী আছে,—হঠাৎ তাদের কোথায় ফেলবো প্রভু?—সকলকে নিয়ে গিয়ে—সেখানেই থাকবার জায়গা করে দেবো তাদের। পরে নিশ্চিন্ত হয়ে আপনার চরণে আশ্রয় নেবো।

প্রভু আনন্দিত হয়ে বললেন,—রামানন্দ, তোমার এই জীব-প্রেম আমাকে মুগ্ধ করেছে,—জীবে প্রেম না থাকলে কি সেই জীবের জীবনের প্রেম লাভ হয়? তুমি ধন্য। তা যা হোক,—আমি এগিয়ে যাই,—পরে তুমি এসো।

'যে আজ্ঞা প্রভু।'—রামানন্দ আবার প্রভুকে প্রণাম করলেন। প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করলেন নিবিড়ভাবে।

৬১

পূর্বাহ্নেই প্রভুর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়েছিলেন সার্বভৌম। নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে বহুদূর এগিয়ে এসে বিরাট এক শোভাযাত্রা করে—তিনি প্রভুকে নিয়ে গেলেন নীলাচলে।—দিকে দিকে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল,—মহাপ্রভু ফিরে এসেছেন নীলাচলে!—তড়িৎবার্তার মত সে সংবাদ পেঁৗছে গেল মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কানে কটকে।

সেদিন সার্বভৌমের ওখানেই ভিক্ষা করলেন মহাপ্রভু। ইতিমধ্যে গৌড় থেকে ভক্ত গদাধর, নরহরি, ভগবান আচার্য, মুরারি এবং শ্রীরামভট্ট প্রভৃতি—প্রভু-বিরহে গৌড় দেশে আর থাকতে না পেরে চলে এসেছিলেন নীলাচলে। এঁদের ইচ্ছা আর প্রভুকে ছেড়ে দেশে ফিরে যাবেন না। তাঁরাও অপেক্ষা করছিলেন সাগ্রহে এবং আকুল চিত্তে প্রভুর প্রত্যাগমনের। সার্বভৌমের বাড়িতে সকলে এসে প্রণাম করলেন প্রভুকে। প্রগাঢ় প্রীতিতে প্রভু আপ্যায়ন ও আলিঙ্গন করলেন সকলকে সহর্ষে।

পরদিন প্রাতে—কাশী মিশ্রের বাটীতে প্রভুকে নিয়ে গেলেন সার্বভৌম,—'এই তোমার বাড়ি, বাড়িখানি মহারাজের গুরু কাশী মিশ্রের। এই—ইনিই কাশীমিশ্র।'—কাশীমিশ্র সঙ্গেই ছিলেন, সার্বভৌম তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করে

বললেন,—'মহারাজা তোমার জন্যে—এই বাড়ি ঠিক করে দিয়েছেন। মন্দিরের কাছেও বটে,—সমুদ্রও নিকটে, বাড়িতে জায়গাও অনেক।

কাশীমিশ্রও এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন প্রভুকে,—'এখন আপনি বাড়িখানি গ্রহণ করলে আমি কৃতার্থ হবো!'—

প্রভু সাদরে আলিঙ্গন করলেন মিশ্র মহাশয়কে,—'এ দেহ তোমাদেরই, তোমরা যে ব্যবস্থা করবে,—তাই আমার আনন্দের।'—বাড়িখানির চারিদিকে একবার চাইলেন তিনি,—'বেশ বাড়ি তোমার,—এমনই খুঁজছিলাম।'

'মহারাজই ভেবে চিন্তে বাড়িখানি নির্বাচন করেছেন প্রভু।'—সার্বভৌমের ইচ্ছা মহারাজের প্রতি প্রভুর একটু প্রীতি আকর্ষণ,—তাই কথাটা আবার একবার বললেন। যেহেতু রাজা একেবারে পাগল করে তুলেছেন সার্বভৌমকে,—প্রভুর দর্শন-পিপাসায়। এই সময় জগন্নাথ-মন্দিরের প্রধান কর্মকর্তা পরীক্ষা মহাপাত্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট মন্দির-সেবকগণ এসে প্রণাম করলেন প্রভুকে। ভারী সংকুচিত হলেন প্রভু মন্দির-সেবকগণের প্রণাম গ্রহণ করতে। তাঁরা শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবক। সুতরাং তাঁরাই তো প্রণম্য!—অবশ্য প্রভুর নিজের তাই ধারণা। কিন্তু সন্ন্যাস নিয়ে নিজের জালে নিজে পড়েছেন প্রভু,—অন্তরে হাজার আকুলতা জাগলেও একমাত্র সন্ন্যাসী ছাড়া পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করতে পারেন না আর কাউকে,—সন্ন্যাসের বিধিভঙ্গ হয়। যাই হোক, প্রভু সকলকে গাঢ় প্রীতিভরে আলিঙ্গন করলেন। রাজার পাত্র-মিত্রগণও এ সময় প্রভুর সহিত পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করলেন।

পরদিন মহাপ্রভুর অনুমতি নিয়ে নিত্যানন্দ একজন লোক পাঠালেন নবদ্বীপে,—প্রভুর প্রত্যাগমনের সংবাদ দিয়ে। শচীমা এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের অবস্থা মনে-প্রাণেই উপলব্ধি করতেন শ্রীনিত্যানন্দ। যে-কথা অপরে বলতে সাহস করতেন না, একমাত্র নিত্যানন্দই তা বলতে পারতেন প্রভুকে।

অতঃপর মহাপ্রভু ভক্তজন সঙ্গে এই নূতন বাড়িতে সানন্দে বাস করতে লাগলেন। নিত্য-নিত্য নানাদিক থেকে বহু ভক্তজন এসে মিলিত হতে লাগলেন প্রভুর সঙ্গে।...দিনকয়েক পরেই এলেন 'স্বরূপ দামোদর',—এঁরই পূর্বনাম পুরুষোত্তম আচার্য,—প্রভুকে সন্ন্যাস করতে দেখে দারুণ অভিমানে চলে গিয়েছিলেন কাশী। এখন আর তিনি কোন মতেই থাকতে পারলেন না প্রভুকে ছেড়ে।...প্রভু তাঁকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন,—'এসো, এসো স্বরূপ।' কোন রাগ-অভিমানের সুর বাজলো না প্রভুর কণ্ঠে,—উচ্ছ্বসিতভাবেই তিনি বললেন,—'আমি জানি তুমি আসবে। আমাকে ছেড়ে তোমরা কি থাকতে পারো? আমি যে তোমাদেরই। তোমার অভাবে আমি যেন অন্ধ হয়েছিলাম।'—গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন তিনি স্বরূপকে।

স্বরূপ বললেন গদ্‌গদ কণ্ঠে,—'প্রভু, আমি অধম, তাই তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে পেরেছিলাম।...কিন্তু তোমার প্রেমের আকর্ষণ অবহেলা করে কার সাধ্য ?'—প্রভুর পায়ে মাথা রেখে বহুক্ষণ চোখের জল ফেললেন স্বরূপ দামোদর।

এরপর এলেন পরমভক্ত পরমানন্দ পুরী।—তারপর এলেন ব্রহ্মানন্দ ভারতী,—ইনিও কেশব ভারতীর শিষ্য,—প্রভুর গুরুভাই। পরম পণ্ডিত বলে তাঁর মনে কিছু দম্ভ ছিল,—কিন্তু প্রভুর দু-একটি কথায় তিনি দম্ভ-অভিমান ভুলে প্রেমে আকুল হয়ে উঠলেন। প্রভু তাঁকে প্রণাম করতে তিনি বললেন,—'জীবের শিক্ষার জন্যেই তোমার এই অবতার। তা জানি। কিন্তু তোমার প্রণাম নিতে আমার বড় ভয় হয়।'—প্রভু মৃদু হাসলেন,—কিছুক্ষণ কৌতুকও করলেন ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে—তাঁর কথা নিয়ে! রঙ্গভরে বললেন,—'তোমরা এতজন থাকতে আমিই অবতার হয়ে গেলাম!'

—এদিকে সার্বভৌম মহা-মুস্কিলেই পড়েছেন। পত্রে পত্রে মহারাজা প্রতাপরুদ্র তাগাদা দিচ্ছেন তাঁকে,—'কবে আমি মহাপ্রভুর দর্শন পাবো ? আমি যে আর স্থির থাকতে পারছি না। শীগগির ব্যবস্থা কর।'—সার্বভৌম আর করেন কি ?.. ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এলেন প্রভুর কাছে—'একটা নিবেদন ছিল প্রভু, তোমার কাছে।'—বললেন কুণ্ঠাভরেই—'যদি অভয় দাও, বলি।'

প্রভু বললেন,—'কহ তুমি, নাহি কিছু ভয়।
যোগ্য হইলে করিব,—অযোগ্য হইলে নয়॥'

তবেই তো বিপদ!—প্রথমটা দমে গেলেন সার্বভৌম,—পরে কপাল ঠুকে বলেই ফেললেন,—প্রভু, রাজা প্রতাপরুদ্র তোমার দর্শনের জন্যে ভারী ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন,—রোজ রোজ চিঠি লিখছেন আমাকে। যদি কৃপা করে তাঁকে একবার দর্শন দাও—

'সে-কি ?'—প্রভু যেন চমকে উঠলেন,—'বিজ্ঞ লোক হয়ে তুমি কি বলছো সার্বভৌম ? . আমি সন্ন্যাসী,—সন্ন্যাসীর রাজদর্শন অবৈধ। ..ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করলে লোকে কি আর আমার কাছে হরিনাম গ্রহণ করবে ?...বিষয়ী ব্যক্তি বা নারীর মুখ দর্শনেও যে সন্ন্যাসীর মহাপাপ!'

যাঁর রাজ্যে—যাঁর আশ্রয়ে বাস করছেন,—তাঁর প্রতি এই কঠোরতা,—এ-শক্তির উৎস কোথায় ?—কত বড় শক্তিধর এমন কথা বলবার শক্তি রাখেন ?—সে বুঝি অচিন্তনীয়! তবু সার্বভৌম আবার বললেন,—'প্রভু, রাজা সামান্য বিষয়ী নন,—ভেবে দেখ, তিনিই জগন্নাথের প্রধান সেবক,—তাঁর পরম ভক্ত।...সেই দিক দিয়ে বিচার করে তাঁকে দর্শন দিলে হয়ত তোমার ধর্মহানি হতো না।'

'সার্বভৌম,'—প্রভুর কণ্ঠে রূঢ়তা ফুটে উঠলো,—'বুঝে দেখ, আমি কি বলছি।...বিষয়ী হলেই পরিত্যজ্য নয়,—রামানন্দ রায়ও ছিল বিষয়ী।...বিষয় মনে বিষের সঞ্চার করে,—সে-বিষ হচ্ছে, দম্ভ, মোহ, আসক্তি,—কিন্তু রামানন্দ বিষয়ী হয়েও নির্লিপ্ত অনাসক্ত যোগী,—পরমভক্ত।...আর রাজা প্রতাপরুদ্র মহা-ঐশ্বর্যশালী, বিষয়ভোগী,—রাজদম্ভ এবং আসক্তি রয়েছে তাঁর মনে পুরো-মাত্রায়। এরূপ লোকের সঙ্গে মিশলে নিজের মনেও মোহ আসে। তাই এত কঠোর নিষেধ। তবু যদি তুমি আমাকে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে বল,—তবে আমাকে নীলাচল ছেড়েই চলে যেতে হবে। যেহেতু তোমার আজ্ঞা তো আমি লঙ্ঘন করতে পারি না!'

এ-কি নিদারুণ কথা!...সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো সার্বভৌমের। করযোড়ে তিনি ক্ষমা চাইলেন প্রভুর কাছে।...রাজাকে স্পষ্ট লিখলেন,—সম্প্রতি অনুমতি হলো না। তবু নিরাশ হবার কারণ নেই। ভক্তের মন পরীক্ষা করার জন্যেই প্রভু এখন কঠোর হয়েছেন,—কিন্তু তিনি ভক্তবৎসল,—রাজার মন ভক্তিতে আকুল হয়ে উঠলে—তিনি দর্শন দেবেনই।...রাজা ধৈর্য ধরুন।

রাজার মনে কিন্তু ভারী ধিক্কার জন্মালো,—যদি প্রভু তাঁকে দর্শন না দেন, —তিনিও যোগী হয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন কোথাও। অর্থাৎ এদিক দিয়ে রাজাও ছিলেন সুযোগ্য পরীক্ষার্থী;—তাঁর মনে কোন অভিমান জাগলো না,—তাঁর রাজদম্ভেও কোন আঘাত লাগলো না। তিনি এরপর শ্রীনিত্যানন্দকে অনু-রোধ করলেন;—যেহেতু রাজা জানতেন,—প্রভু তাঁকে জ্যেষ্ঠের মত মান্য করেন।—তিনি বললে, হয়ত তাঁর ভাগ্যে প্রভুর দর্শন মিলতেও পারে। নিত্যানন্দ রাজার ভাব দেখে সত্যই বড় বিচলিত হলেন,—বুঝলেন,—রাজার মনে প্রকৃতই নিত্যের ক্ষুধা জেগেছে,—নইলে এতবড় একজন রাজার কি এ-দীনতা আসতে পারে?

পণ্ডিত দামোদরকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীনিত্যানন্দ একদিন প্রভুকে বললেন রাজার কথা।...নিজে রাজার সম্বন্ধে সুপারিশও করলেন অনেক,—দামোদরও যোগ দিলেন তাতে। বললেন,—'রাজার মনে প্রকৃতই প্রেম-ভক্তি জেগেছে,—তিনি কৃপা পাবার যোগ্য।'—কিন্তু তবু প্রভুর মন টললো না—বরং দারুণ অভিমানেই বললেন,—'তোমরা শেষ পর্যন্ত আমাকে কটকে ধরে নিয়ে যাবে দেখছি!'

সর্বনাশ!—ভয়ে শুকিয়ে গেলেন নিত্যানন্দ, এবং দামোদরও।—'এত বড় দুঃসাহস কার হতে পারে?'—বললেন নিত্যানন্দ,—'যে তোমাকে কটকে নিয়ে যাবার কথা বলতে পারে? তবে রাজা বড়ই ব্যাকুল হয়েছেন দেখছি,—হয়ত তোমার কৃপা না পেয়ে ধিক্কারে কিছু করেই বসবেন!...তাই সম্প্রতি কৃপা-চিহ্ন-

স্বরূপ তোমার একখানা বহির্বাস তাঁকে পাঠিয়ে দাও,—তবু তিনি কতকটা সান্ত্বনা পাবেন।'.........

অবশেষে তাই হলো। মহাপ্রভুর একখানা বহির্বাসই পাঠিয়ে দেওয়া হলো রাজার কাছে।...শুধু বহির্বাস পেয়েই কি শান্ত হতেন রাজা? তবে সেই সঙ্গে সার্বভৌমের পত্রেও অনেক আশা এবং আশ্বাস ছিল,—তাই রাজা কিছু স্থির হলেন।...তিনি দেশের রাজা,—ইচ্ছা করলেই তো তিনি তাঁর আশ্রিত ব্যক্তির দর্শন পেতে পারেন!—তবে তাঁর জন্যে এত আকুতি, এ হীনতা-বরণ কেন?—এরূপ দম্ভ একবারও উঁকি মারলো না রাজার মনে।...হয়ত প্রভুরও পরীক্ষার বিষয় ছিল তাই।

ইতিমধ্যে রামানন্দ রায়ও সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে এসে পেঁছিলেন নীলাচলে। প্রভুকে আগে প্রণাম করে তিনি গেলেন কটকে রাজার সঙ্গে দেখা করতে। এর আগেই তো তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেন রাজার কাছে;—সাক্ষাৎ হতেই রাজাকে অভিবাদন করে বললেন,—'আর বিষয়কার্য ভাল লাগছিল না মহারাজ, —মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় নিয়েছি; তিনি অধমকে কৃপা করেছেন।...আপনিও সন্তুষ্ট হয়ে অব্যাহতি দিন।'

'রাম রায়. তুমি ভাগ্যবান।'—প্রীত কণ্ঠে বললেন রাজা প্রতাপরুদ্র,—তাই প্রভুর করুণা পেয়েছ।...আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু রাম রায়,'—রাজার কণ্ঠ সহসা গভীর দুঃখে বাষ্পাকুল হয়ে উঠলো,—'আমার ভাগ্যে কি প্রভুর দর্শন মিলবে না?...কোন দিনই?...এ জন্মে না হোক পরজন্মে?—একথা তুমি প্রভুকে একবার জিজ্ঞাসা করো।'—শেষের দিকে তিনি কেঁদেই ফেললেন উচ্ছ্বসিতভাবে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ,—লক্ষ লক্ষ লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা,—প্রচণ্ড শক্তিমান স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্র,—যেন ভুলেই গেলেন নিজের পদেরও গুরুত্ব।

রামানন্দ দেখলেন—রাজার মধ্যে যে প্রেমার্তি জেগেছে,—এ সেই শ্রীমতী রাধার পূর্বরাগের আকুলতাই স্মরণ করিয়ে দেয়।—তিনি রাজাকে আশ্বস্ত করে বললেন,—'মহারাজ, শান্ত হোন। প্রভু প্রেমভক্তির বশ। আপনি অবশ্যই তাঁর দর্শন পাবেন।'

'তুমি অনুরোধ করবে রামানন্দ?'—সতৃষ্ণ আকুল নেত্রে রাজা চাইলেন রাম রায়ের দিকে,—বল, করবে? তুমি করলে অবশ্যই ফল হবে।'

'আমি প্রাণ দিয়ে করবো মহারাজ।'

রাজা কৃতার্থ হয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন,—'রামানন্দ, তুমি কাজে ইস্তফা

দিয়েছ—প্রভুর সেবার জন্যে। তার পুরস্কারস্বরূপ আমার সরকার থেকে তুমি দ্বিগুণ বেতন পাবে।...যতদিন আমি বাঁচবো।'

রাজার ভাব দেখে রামানন্দ কিছুক্ষণের জন্যে নির্বাক হয়ে গেলেন।

৬২

দেখতে দেখতে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার দিন এসে পড়লো।...রাজা প্রতাপরুদ্র প্রতি বছর আসেন এ সময় কটক থেকে নীলাচলে। এবার এসে জগন্নাথ দর্শন করেই ডেকে পাঠালেন রামানন্দ রায়কে।...তিনি এলে বললেন, —'রামানন্দ, মহাপ্রভুর যাতে একবার দর্শন পাই, এবার তার ব্যবস্থা কর। আমি আর কোনমতেই স্থির থাকতে পারছি না।'

রামানন্দও মহারাজার জন্যে সত্যই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন অন্তরে অন্তরে। ...রাজাকে আশ্বাস দিয়ে ফিরে এসে, তিনি প্রভুর মনে রাজার প্রতি করুণা উদ্রেকের সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু রাজার যেন আর ধৈর্য ছিল না। ...একদিন পরেই তিনি ডেকে পাঠালেন সার্বভৌমকেও।...সার্বভৌম যেন আর রাজার কাছে মুখ দেখাতেও পারছিলেন না,—যেহেতু দেখা হলেই রাজার মুখে শুধু ওই এক কথা,—'সার্বভৌম, প্রভুর দয়া হয়েছে?'

কিন্তু রাজাদেশ তো অবহেলা করা চলে না, তাই সার্বভৌম দারুণ কুণ্ঠা নিয়েই এলেন রাজার কাছে। তাঁকে দেখতেই রাজা বলে উঠলেন,—সার্বভৌম, আজ আমাকে প্রভুর কাছে নিয়ে চল।

মহামুস্কিল! সার্বভৌম কোন রকমে কণ্ঠে স্বর এনে বললেন,—'প্রভুর এখনও অনুমতি হয়নি মহারাজ!'

'সার্বভৌম!'—প্রতাপরুদ্র যেন আর্তনাদ করেই উঠলেন,—'তবে কি প্রভু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে,—এক প্রতাপরুদ্র ছাড়া জগতের সকলকেই কৃপা করবেন? ...আমার এক কণা করুণাপ্রার্থী যারা,—তারাও প্রভুর দর্শন পেলে,—আর আমি

রাজা বলেই পেলাম না ? ধিক আমার রাজ্যপাটে ! কিন্তু সার্বভৌম,—আমারও প্রতিজ্ঞা শোন,—তিনি শ্রীভগবান, প্রতিজ্ঞা করেছেন,—আমাকে দর্শন দেবেন না, —আমিও প্রতিজ্ঞা করছি,—তাঁর দর্শন না পেলে আমি এ-জীবন আর রাখবো না।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন সার্বভৌম,—'মহারাজ, আপনার সুসময় আগত;—এমন দৃঢ় যার নিষ্ঠা, তাকে স্বয়ং ভগবানও বিমুখ করতে পারেন না।'...

এ-দিকে সুযোগ পেয়ে রামানন্দ এক সময় বললেন প্রভুকে,—'প্রভু, রাজা তোমার দর্শন লাভের যোগ্য ব্যক্তি। তোমার প্রতি তাঁর অন্তরে যে প্রগাঢ় প্রেমের সঞ্চার হয়েছে,—তার কণামাত্রও বুঝি আমার অন্তরে নেই।...তোমার কৃপা না পেলে রাজা এবার সত্যিই প্রাণ বিসর্জন দেবেন।

'কিন্তু তোমরা কি আমাকে বিধি-বিরুদ্ধ কাজ করতে বল ?'—মহাপ্রভু তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাইলেন রামানন্দের পানে। রামানন্দ মৃদু হাসলেন.—'প্রভু, বিধির দোহাই দিয়ে তুমি আর কত ভোলাবে ?...বিধিও তোমার,—পালনও তোমার। তবে লোকশিক্ষার জন্যে তোমাকে অবশ্যই বিধির অধীন হয়ে চলতে হবে। কিন্তু প্রতাপরুদ্র নামে রাজা,—অন্তরে প্রেমাকুল ভক্ত। তাঁকে দর্শন দিলে তোমার বিধিরও অবিধি হবে না।

মহাপ্রভু এবার যেন কি চিন্তা করতে লাগলেন,—'রামানন্দ',—একটু পরে গভীর স্বরে তিনি বললেন,—তুমি এক কাজ কর। রাজার বড় ছেলেকে নিয়ে এসো আমার কাছে,—'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।'—আমি রাজকুমারকে আলিঙ্গন করবো ;—তাকে স্পর্শ করে রাজা অনেকটা সান্ত্বনা পাবেন।

রামানন্দ ভাবলেন,—এ তবু মন্দেরও ভাল।...হঠকারিতা করে লাভ নেই। এতদূর যখন এগিয়েছে,—তখন রাজা একদিন সাক্ষাৎভাবে প্রভুর কৃপা লাভ করবেনই।—সুতরাং উপস্থিত সেই ব্যবস্থাই হলো।...রাজকুমার বয়সে কিশোর —শ্যামলবর্ণ, পরমসুন্দর চেহারা,—তাকে পরিপাটি করে শ্রীকৃষ্ণের বেশভূষায় সাজিয়ে রামানন্দ নিয়ে এলেন প্রভুর কাছে। হুবহু মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি-মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে কুমার। তাকে দেখে সহসা প্রভুর মনে রাধা-ভাব জেগে উঠলো,—তিনি আবেশে বিবশ হয়ে উঠে,—প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন রাজকুমারকে।

প্রভুর স্পর্শে কিশোর রাজকুমারের বুকে ছুটলো এক আত্মহারা ভাবের ধারা। সর্বাঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো তার।...চোখ দুটি ভরে এলো প্রেমাশ্রু-ধারে।—এবং সেই অবস্থায় সে ফিরলো পিতার কাছে।...মহাপ্রভুর পুণ্য স্পর্শ-পূত কুমারকে অধীর আগ্রহে বুকে চেপে ধরলেন রাজা।...আত্মজ

সন্তানের স্পর্শে যে প্রীতি জাগে বুকে,—আজ রাজা যেন কুমারকে আলিঙ্গন করে লাভ করলেন তার চতুর্গুণ প্রীতি।...

প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণ শেষ করে নীলাচলে ফিরেছেন,—সংবাদ পেয়েই নবদ্বীপের ভক্তগণ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস, শিবানন্দ প্রভৃতি সকলেই এবং আরও অনেকে শচীদেবীর সঙ্গে দেখা করে এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে যাত্রা করেছিলেন নীলাচলের উদ্দেশে।...দীর্ঘ কুড়ি দিনের পথ অতিক্রম করে তাঁরা এসে পৌঁছলেন জগন্নাথে। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর ভক্ত হয়েছেন শুনে ভক্ত হরিদাসও এসেছেন এবার। এতদিন শুধু নামে মুসলমান বলে উড়িষ্যায় আসবার তাঁর সাহস হয়নি,—এবং প্রভুও তাঁকে সঙ্গে আনেন নি।

প্রত্যেক ভক্তই বাড়ী থেকে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় নানা উপাদেয় দ্রব্য প্রস্তুত করে প্রভুকে উপহার দেবার জন্যে এনেছেন সেই সুদূর গৌড় থেকে।...গৃহাঙ্গণারা পরম নিষ্ঠায় এবং মমতায় তৈরী করেছেন সে-সকল দ্রব্য।—শচীদেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়াও নিজের নিজের হাতের এবং শুধু হাতেরই নয়—প্রাণেরও সমগ্র প্রীতি দিয়ে তৈরী মিষ্টান্নাদি পাঠিয়েছেন শ্রীবাসের হাতে।—আর এসেছে 'রাঘবের ঝালী,'—জনৈক ভক্ত রাঘবের ভগিনী পরম শুদ্ধমতী দময়ন্তীর হাতে বিশেষ নৈপুণ্যে প্রস্তুত দীর্ঘস্থায়ী নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যের পেটিকা।... ভক্তেরা পায়ে নূপুর বেঁধে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্তিত কীর্তন গেয়ে নাচতে নাচতে প্রবেশ করলেন নগরে।

মহাপ্রভুর ভক্তেরা আসছেন শুনে রাজা প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমকে নিয়ে উঠলেন তাড়াতাড়ি তাঁর প্রাসাদের ছাদে। মৃদঙ্গের তালে তালে—মঞ্জীর-ঝঙ্কারে—নৃত্যশীল ভক্তগণ এগিয়ে চলেছেন,—কণ্ঠে তাঁদের ভগবৎ-প্রেমের পূত মন্দাকিনী-ধারা ছুটছে কীর্তনের সুরে। মহারাজ প্রতাপরুদ্র বললেন সার্বভৌমকে,—সার্বভৌম, এ-কি সঙ্গীত? কথা একটিও বুঝতে পারছি না, কিন্তু সুরের ঝঙ্কারে যেন নিজেকেও ভুলে যাচ্ছি। এ-ধরণের সঙ্গীত কে প্রবর্তন করেছে,—সার্বভৌম?

'মহারাজ!'—গদ্‌গদকণ্ঠে বললেন পণ্ডিত সার্বভৌম,—'পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট জীবের নিত্যানন্দ রস-আস্বাদনের জন্যই আমাদের প্রেমময় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সর্বরসের আকর অপূর্ব এই সঙ্গীত-ধারা প্রবর্তন করেছেন। এক সঙ্গে বহুজন এ-সঙ্গীত গেয়ে ও শুনে পরমানন্দ লাভ করে সমানভাবে। এর নৃত্য-ছন্দেও প্রাণে আনন্দের শিহরণ জাগে।...এর নাম সংকীর্তন।—বহুজন-গীত এই সংকীর্তনকে এর সর্বকল্যাণকারিতার জন্যে 'যজ্ঞ' বলা হয়েছে।'

এদিকে ভক্তেরা নাচতে নাচতে ক্রমশঃ এগিয়ে এসে পৌঁছলেন কাশীমিশ্রের বাড়ীতে।...প্রভু-বিরহে সন্তাপিত আকুল ভক্তগণ একে একে লুটিয়ে পড়লেন প্রভুর চরণে।...মহাপ্রভুর মনের আনন্দ তখন আর বর্ণনা করা যায় না,—পরম উল্লাসে এক একজনকে তিনি দুই ব্যগ্র বাহু দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরছেন,—দুটি প্রশান্ত নয়নে ঝরছে তাঁর আনন্দের ধারা,—নবদ্বীপের প্রায় প্রত্যেক ভক্ত—প্রত্যেক লীলা-সঙ্গীকে দেখে, তাঁর মনে হচ্ছে,—যেন তিনি অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হয়েছেন নবদ্বীপে। বাল্য—কৈশোর ও যৌবনারম্ভের লীলাস্থল নবদ্বীপের প্রত্যেকটি বস্তু—যেন একে একে তাঁর স্মৃতিপটে জেগে উঠছে। সেই শ্রীবাসের আঙ্গিনা,—সেই গঙ্গার তীর,—সেই শুক্লাম্বরের বাড়ী,—স্বীয় গৃহাঙ্গণে কর্মলিপ্তা সেই মহিমময়ী জননী শচীদেবীর বুকভরা স্নেহ,—বিচ্ছেদ-শোকাতুরা কিশোরী পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার সেই দুটি ছলোছলো আঁখি—যেন এক-যোগে চলচ্চিত্রের ছবির মতই চোখের সামনে ভেসে উঠছে তাঁর। ভুলে গেছেন যে তিনি সন্ন্যাসী কৃষ্ণচৈতন্য—ভুলে গেলেন যেন সন্ন্যাসীর বিধি,—সহসা এক মুহূর্তে তিনি যেন শচীমাতার নিমাই এবং ভক্তগণের শ্রীগৌরাঙ্গ হয়ে উঠেছেন!

ভক্তগণের এক একজনকে প্রভুর সে কি প্রাণাকুল আপ্যায়ন,—তাঁদের পথ-শ্রম ক্লান্ত দেহের ক্লান্তি দূর করার জন্যে,—পরিচর্যার সে কি ব্যাকুল আগ্রহ। প্রভু কাউকে নিজে হাতে জল দিচ্ছেন,—কাউকে বা নিজেই পাখা নিয়ে বাতাস করতে সুরু করেছেন,—যুগপৎ কুণ্ঠায় ও আনন্দে ভক্তগণের কন্ঠে যেন আর ভাষাও ফুটছে না! মনে মনে ভাবছেন তাঁরা,—এই সন্ন্যাসী কৃষ্ণচৈতন্য! আপন ক্ষুদ্র সংসার ছেড়ে এ-যে বিশাল বিশ্ব-সংসারই পেতে বসেছেন!

এ-দিকে মহারাজ মন্দিরের অন্যতম কর্মকর্তা পরীক্ষা মহাপাত্রকে ডেকে আদেশ দিলেন,—দেশ থেকে মহাপ্রভুর বহু ভক্ত এসেছেন,—এঁরা যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন,—এমন একটা বাড়ী ঠিক করে দিন। তা ছাড়া কোন দিকে কোন বিষয়ে তাঁদের যাতে কোন অসুবিধা না হয়,—সেদিকেও যথোচিত লক্ষ্য রাখবেন।...মন্দির থেকে তাঁদের জন্য নিত্য-নিয়মিত প্রচুর প্রসাদ,—এবং সরকার থেকে উপযুক্ত আহারীয় দ্রব্যাদিও যেন যথারীতি পাঠানো হয়।—প্রভু নিজে সন্ন্যাসী—তাঁর কিছুই প্রয়োজন নেই,—কিন্তু ভক্তদের আগমনে—এখন তাঁর এক বিশাল গোষ্ঠী হয়েছে।—মহাপ্রভু এখন বহু পরিবারী!—কিন্তু তিনি নিজে মুখে কিছু বলবেন না,—তোমরা সর্বদাই প্রভুর সন্তোষবিধানে তৎপর থাকবে। ভক্তগণের দুঃখ হলে—প্রভুও দুঃখ পাবেন। না, না, তা যেন না হয়!' শুধু চাঞ্চল্য নয়—কঠোর সতর্কতার নির্দেশও যেন বেজে উঠলো মহারাজার কণ্ঠে।...

ভক্তগণের আনীত উপহার-দ্রব্য প্রভু গ্রহণ করলেন পরম আদরে। কে কি দিয়েছেন জিজ্ঞাসা করেন,—আর চোখেমুখে যেন প্রীতি উছলে ওঠে।...সামান্য উপহার যে এতখানি মূল্য ও মর্যাদা পাবে মহাপ্রভুর কাছে,—এ-যেন ধারণাও ছিল না ভক্তগণের।...এ মূল্য বা মর্যাদা তো দ্রব্যের নয়,—দ্রব্যগুলির মধ্যে যে আন্তরিক প্রগাঢ় প্রেম মিশিয়ে আছে,—তার। মায়ের দেওয়া জিনিষ তো প্রভু বারবারই মাথায় ঠেকালেন!

হরিদাসকে পেয়ে প্রভুর কতই না আনন্দ! দু'হাত বাড়িয়ে পরম আগ্রহে আলিঙ্গন করেন তাঁকে। দারুণ কুণ্ঠায় হরিদাস সরে যেতে চান,—'না, না, প্রভু, আমি অস্পৃশ্য, আমি অধম,—আমি নীচ,—আপনি আমাকে স্পর্শ করবেন না।' —কোন কথা না শুনে প্রভু ততক্ষণে জড়িয়ে ধরেছেন তাঁকে বুকে,—'সে-কি সে-কি হরিদাস?'—বলেন গাঢ়কণ্ঠে,—'তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে আমিও যে পবিত্র হবো?—বহুভাগ্যেই যে তোমার মত ভক্তের পুণ্যস্পর্শ লাভ হয়!—তুমি যে সম্পদের অধিকারী,—আমি তার কাঙ্গাল।'—কৃতার্থ হরিদাস প্রেমে বিবশ হয়ে লুটিয়ে পড়েন প্রভুর চরণে। মুখে তাঁর আর কথা ফোটে না। মনে ভাবেন, এত মহান না হলে কি আর মহাপ্রভু হয়?

প্রভু কাশী মিশ্রকে ডেকে বলেন,—মিশ্রমশায়, তোমার বাগানের মধ্যে যে ছোট ঘরখানি আছে,—ওখানি আমাকে ভিক্ষা দিতে হবে।

'ভিক্ষা?'—মিশ্রমশায় লজ্জায় নুয়ে পড়েন,—'প্রভু সবই তো তোমার। 'কণ্ঠে ফুটে ওঠে তাঁর পরম দীনতা।'—

প্রভু হরিদাসকে নিয়ে আসেন সেই ঘরখানির কাছে,—'হরিদাস,'—বলেন সাদরে হরিদাসকে সম্বোধন করে—'তুমি এই ঘরে থাকবে,—আমি নিত্য তোমার কাছে আসবো,—নিত্য তোমার জন্যে মহাপ্রসাদ আসবে। তুমি দূর থেকে মন্দিরের চক্র দেখে ঠাকুরকে প্রণাম করবে। মন্দির-সান্নিধ্যে তোমার যাবার দরকার নেই।'

প্রভুর দৃষ্টি সর্ববিষয়েই সজাগ। হিন্দু-সেবিত দেবতার মন্দির-প্রাঙ্গণে সহসা হরিদাস গেলে যদি কোন অপ্রীতির সৃষ্টি হয়,—তাই করলেন সম্প্রতি এই ব্যবস্থা। প্রেমে ও ভক্তিতে হরিদাসের চিত্ত দ্রব হয়ে উঠলো!

* * *

এর পর ভক্তদের নিয়ে প্রভু মেতে উঠলেন সংকীর্তনে।—নানা নির্মল আনন্দোৎসবে!...লোক কি কম এসেছে গৌড় থেকে?—তা প্রায় দু-তিনশ'ই হবে। প্রভু যখন ভক্তগণ সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করতে যান, তখন রাস্তার দু' পাশে অগণিত নর-নারী দাঁড়িয়ে যায় সারি দিয়ে। সর্বজনবিমোহন অসামান্য রূপ, তায় ফুটে উঠছে দিব্যজ্যোতিঃ, প্রেম-ঢলঢল দুটি কমল-আঁখি,—কণ্ঠে

বিগলিত হরিনাম-সুধা,—যে দেখে, তারই অন্তর ভরে ওঠে অমেয় পুলকে। অসংখ্য মাথা নুয়ে পড়ে ভক্তিভারে প্রভুর উদ্দেশে!

ভক্তদের সঙ্গে প্রভু কত আনন্দেই না প্রসাদ গ্রহণ করেন। ভক্তদের আগে বসিয়ে পরিবেষণ করেন তিনি নিজের হাতে।—প্রভুর সে কি আগ্রহ—কি আপ্যায়ন।...যেন নিজের বাড়ীতেই এসেছেন নিমন্ত্রিত অতিথি। ভুলে যান তিনি নিজের প্রসাদ গ্রহণের কথা। পাতে পাতে নানা জিনিষ ঢেলে দিচ্ছেন প্রভু,—ভক্তরা বসে আছেন হাত গুটিয়ে। প্রভু না বসলে কি করে বসবেন তাঁরা? —অবশেষে বসতেই হয় প্রভুকে।

শ্রীক্ষেত্রের কথা স্বতন্ত্র।—কিন্তু প্রভুর ধর্মেও তো জাতিবিচার নেই,—ভক্তের আবার জাতি কি?...যে ভক্ত,—সে মুচি হলেও শুচি।...একসারি বসে যান নানা বর্ণের ভক্তগণ,—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি সব।—সেই মহা-মিলন-ক্ষেত্রের দিকে চেয়ে প্রভুর কি আনন্দ! ভোজন করতে করতে কত মধুর রসালাপ করেন ভক্তদের সঙ্গে।—দুই চোখের প্রশান্ত দৃষ্টিতে ঝরে পড়ে যেন প্রীতির ধারা। মানুষে মানুষে ব্যবধান দূর করে দিয়েছেন প্রভু।...মানুষ এবার মানুষকে চিনবে শুধু 'মানুষ' বলে।—মহিমময় মহাপ্রভু মানুষকে দিয়েছেন সেই শুদ্ধি-মন্ত্র হরিনাম।

একসঙ্গে বসে প্রসাদগ্রহণের সময় তাই সকল ভক্তের প্রাণেই ছুটে যায় সমান প্রীতি—সম-তৃপ্তির সুবিমল ধারা।—ভেদজ্ঞানহীন গৌরাঙ্গ-ভক্তের গণ —এ-এক অপূর্ব অমূল্য সম্পদ লাভ করেছেন—মহাপ্রভুর কাছে। দলে দলে লোক ছুটে আসছে,—ওই সম্পদের অধিকার লাভে।—জাতির ভাণ্ডারে প্রভুর এ মহান অবদানের বুঝিবা তুলনা নেই!.........

দেখতে দেখতে এসে পড়ে জগন্নাথের রথযাত্রা-উৎসব। বিপুল সাড়া পড়ে যায় সমগ্র নীলাচলে,—ভক্তগণ-সঙ্গে প্রেম-বিভোর প্রভু কীর্তন করতে করতে নৃত্য করেন রথের সম্মুখে। তাঁর ভাবাবেশিত নৃত্যের লীলায়িত ভঙ্গিমা চিত্তে চিত্তে প্রবাহিত করে অমিয়ধারা। দর্শকগণের মনে হয়,—বিশ্বে বুঝিবা এর চেয়ে মনোহর—এর চেয়ে চিত্তোন্মাদনাকর নৃত্য-ছন্দ আর কোনদিন প্রবর্তিত হয়নি। নাচতে নাচতে প্রভু কতবার আছাড় খেয়ে পড়েন,—ভক্তরা সকলে ঘিরে থাকেন তাঁকে,—কিন্তু কারো সে-সময় স্পর্শ করবার ভরসা হয় না তাঁকে। হঠাৎ স্পর্শে ভাবাবেশ কেটে গেলে প্রভু হয়ত বিরক্ত হতে পারেন!

মহারাজা প্রতাপরুদ্র, সার্বভৌম, রামানন্দ রায় ইত্যাদি সকলেই প্রভুর নৃত্য দেখছেন তন্ময় হয়ে। ভুলে গেছেন তাঁরা,—ওই সুন্দর নৃত্য-লাস্য ছাড়া জগতে

আর কিছু আছে।...মহাপ্রভু ভাবাবেশে বার বার আছাড় খেতে খেতে হঠাৎ এক সময় মহারাজ প্রতাপরুদ্র আর স্থির থাকতে পারলেন না,—তিনি তো এখনও প্রভুর ভাবাবেশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন না। ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে প্রভুকে ধরে তুলতে গেলেন ঃ অমনি ভাবাবেশ কেটে যেতেই প্রভু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে দূরে সরে গেলেন,—'ছিঃ, আমার দেহে 'বিষয়ীর' স্পর্শ লাগলো!' —ললাট যেন ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠলো তাঁর,—কিন্তু পরক্ষণেই আবার নাচতে লাগলেন তেমনি আত্মহারাভাবে।

এ-দিকে তখন দর্শকগণের অনেকে চমকে উঠেছেন প্রভুর কথা শুনে।... দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহারাজ প্রতাপরুদ্র,—বিশাল এক রাজ্যের স্বাধীন অধিপতি। তাঁরই আশ্রিত এক সন্ন্যাসী এইভাবে তাঁকে অপমান করেন,—তাঁরই পাত্রমিত্র ও প্রজাবর্গের সম্মুখে! মহারাজ কি সহ্য করবেন এই অপমান নীরবে নির্বিকারভাবে?...তাঁর রাজমর্যাদায় এই প্রচণ্ড আঘাত কি উত্তেজিত করে তুলবে না তাঁকে? কিন্তু না, মহারাজ আদৌ নিজেকে হতমানিত বোধ করেছেন বলে মনে হলো না।...মনে কোন ক্ষোভও জাগেনি তাঁর। তিনি তেমনি আগের মতই প্রভুর নৃত্য দেখতে লাগলেন তন্ময় হয়ে।

কিন্তু আজ যেন কি হয়েছে মহারাজের।...কে যেন তাঁকে এক প্রবল আকর্ষণে টানছে বারবার।...প্রভু আবার পড়ে যেতে, আবার রাজা পূর্বের কথা ভুলে গিয়ে ব্যাকুলভাবে এসে ধরলেন তাঁকে।...প্রভু আবার সরে গেলেন দূরে, —কিন্তু এবার কোনরূপ বিরক্তির ভাব দেখা গেল না তাঁর। যেন কিছুই হয়নি—এইভাবেই আবার নাচতে লাগলেন।

রামানন্দ, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের দিকে রাজা চাইলেন আকুল-দৃষ্টিতে, —বললেন গদ্‌গদকণ্ঠে,—'তোমরা কৃপা কর, তাহলে হয়ত আমি প্রভুর করুণা লাভ করবো।'—প্রভুকে দু-দুবার স্পর্শ করে রাজার অন্তরে তখন অভূতপূর্ব আনন্দের তুফান ছুটেছে,—প্রভু শুধু শ্রীমুখে একবার তাঁকে তাঁর দাস বলে স্বীকার করলেই তিনি ধন্য মনে করবেন নিজেকে।...রামানন্দ রাজাকে বললেন, —মহারাজ, এবার প্রভু যেমনি আছাড় খেয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বেন,—অমনি আপনি তাঁর শ্রীপাদপদ্ম কোলে তুলে নিয়ে—শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার শ্লোকগুলি —আপনাকে যেমন যেমন শিখিয়ে দিয়েছি,—ঠিক তেমনিভাবে আবৃত্তি করে যাবেন। এবার আর ধরতে যাবেন না। তাহলেই আপনার কামনা সার্থক হবে। প্রভুর এ ভাব-মূর্চ্ছা,—আপনার ব্যাকুল হবার কারণ নেই।

মহানন্দে রাজা তখনই শ্লোকগুলি মনে মনে স্মরণ করতে সুরু করলেন, —কি জানি, ঠিক সময়ে আবার যদি মনে না পড়ে?...ঐ পাদপদ্ম কোলে তুলে ধরলে মন কি আর নিজের বশে থাকবে?—সুযোগ অবিলম্বেই অবশ্য উপস্থিত

হলো।.. নৃত্য করতে করতে বাহ্যজ্ঞানহারা প্রভু কতবার আছাড় খান—কতবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন! অনেক সময় মূর্চ্ছার মধ্যেই চলে যায় দীর্ঘ সময়।... এবার প্রভু মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তেই রামানন্দ রায়ের উপদেশ মত রাজা ধীরে ধীরে স্পন্দিত বুকে এগিয়ে এলেন। সযত্নে প্রভুর পা'দুটি তুলে ধরলেন কোলের ওপর,—সঙ্গে সঙ্গে শিহরণ খেলে গেল যেন সর্বাঙ্গে। খুব আস্তে আস্তে হাত বুলাতে লাগলেন তিনি পা'দুটির ওপর। মুখে আবৃত্তি করছেন,—ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার শ্লোক—সে যেন শ্লোক নয়—সুধার ধারা। একটি একটি করে রাজা আবৃত্তি করতে লাগলেন প্রেমার্দ্রকণ্ঠে।

সহসা এক সময় প্রভু ভাবাবেশের মধ্যেই বলে উঠলেন,—সাগ্রহ উৎফুল্লতায়,—তারপর? তারপর? গোপীরা কি বললেন? বল, বল।

আরও দু-একটি শ্লোক বলে শেষে আবৃত্তি করলেন নৃপতি,—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম।
শ্রবণং মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদা জনাঃ॥

হে বজ্রজনের আর্তিহারী—আমরা তোমার কিংকরী। তোমার বিরহে আমাদের মৃত্যুই উপস্থিত হয়েছিল,—তোমার কথামৃতপানে তা নিবারিত হয়েছে। পূর্ব-জন্মে যাঁরা ভুরিদান করেছেন—তাঁরাই এই কথামৃত পানের অধিকারী। দর্শন-কারীদের পুণ্যের কথা আর কি বলবো? হে প্রিয়, আমাদের দর্শন দাও।

'ভুরিদা ভুরিদা।'—বলে মহাপ্রভুও সহসা হুংকার দিয়ে উঠলেন উল্লাসে; চারিদিকে ইতস্ততঃ চেয়ে বললেন,—কে, কে তুমি পরম সুহৃৎ, আমাকে কৃষ্ণ-লীলা-কথামৃত পান করিয়ে সঞ্জীবিত করলে? তুমিও আমাকে অনেক দিয়েছ, প্রচুর দিয়েছ—ভুরি দিয়েছ! কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, আমার কিছু নেই। এস, এস, তোমাকে প্রাণভরে আলিঙ্গন করি।

দুই বাহু প্রসারিত করে মহাপ্রভু বক্ষে আবদ্ধ করলেন রাজাকে। প্রভুর সে-আলিঙ্গনে মহারাজের শিরা-উপশিরায় যেন প্রেমানন্দের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছুটে গেল,—তাঁর সর্বাঙ্গ আবেশে বিবশ হয়ে এলো।...সহসা প্রভু বাহ্যজ্ঞান লাভ করেই ছুটলেন রথের দিকে।...রাজা কিছুক্ষণ ভাবের আবেগে পড়ে থাকলেন—জ্ঞানহারা! জ্ঞান ফিরে পেয়েই—একটি প্রণাম নিবেদন করলেন প্রভুর উদ্দেশে। তাঁর মনে হলো,—তিনি এমন এক পরম সম্পদ লাভ করেছেন,—যার কাছে তাঁর রাজ্যের মত শত শত রাজ্য তুচ্ছ! তিনি বিপুল পুলকে এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে। নিত্যানন্দ পরম প্রীতিভরে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে বুকে। বললেন বাষ্পাকুলকণ্ঠে,—মহারাজ, তুমিই প্রকৃত ভক্ত। —অনাসক্ত যোগী।"

৬৩

রাজাও এবার প্রেমানন্দে মেতে উঠলেন সংকীর্তনে। পূর্ণ হয়েছে তাঁর বহুদিনের পোষিত আশা।—প্রভুর ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে তিনি ক্রমেই একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করলেন।...নবদ্বীপ থেকে এসেছেন বহু ভক্ত,—নীলাচলেও প্রভুর ভক্ত হয়েছেন অনেকে। ভক্তগণকে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভাগ করে মহাপ্রভু প্রত্যহ হরিনাম-মহা-উৎসব আরম্ভ করলেন শ্রীক্ষেত্রে।...শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতি হলেন মূল কীর্তনীয়া,—সকলের ওপর মহাপ্রভু নিজে।...

বড় আনন্দেই—বড় সুখেই দিন চলতে লাগলো। মহারাজের ব্যবস্থাপণায় ভক্তদের কোনদিকে কোন অসুবিধাই নেই।...প্রভুর সান্নিধ্যে এসে গৌড়ভক্তেরা যেন ভুলেই গেছেন দেশের কথা। মাঝে মাঝে প্রভু সাধারণ মানুষের মত হালকা হয়ে কতই-না রঙ্গ-কৌতুক, হাস্য-পরিহাস করেন ভক্তদের সঙ্গে। কত কথা,—কত আলাপন!...ভক্তরা তখন একান্তভাবে মিশে যান এক হয়ে প্রভুর সঙ্গে,—প্রত্যেকের মনে হয়,—প্রভু যেন তাঁরই প্রাণের সুহৃৎ।

দেখতে দেখতে এসে পড়ে জন্মাষ্টমী!...পীড়িতা ধরিত্রীর দুঃখ লাঘবের জন্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন কংস-কারাগারে,—দেবকীর ক্রোড়ে।...অবিস্মরণীয় সে পুণ্য দিন! যুগে যুগে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে তার অমর স্মৃতি ধরিত্রীর বুকে। নীলাচলের সর্বত্র সুরু হলো বিপুল উৎসব—সাড়ম্বরে।..জন্মাষ্টমীর দিন—মহারাজ প্রতাপরুদ্র জগন্নাথের প্রসাদী বহু মূল্যবান দ্রব্য দান করেন পূজ্য ও সম্মানিত ব্যক্তিদের।...মহাপ্রভুকেও তাঁর কিছু দিয়ে প্রণাম করবার সাধ জাগলো।...কিন্তু কি দেওয়া যায়?

জিজ্ঞাসা করলেন মহারাজ—সার্বভৌমকে। সার্বভৌম উত্তর দিলেন,—মহাপ্রভু তো সন্ন্যাসী, তাঁর নিজের কিছু দরকার নেই। তাঁর জননীর জন্য কিছু দেওয়া যায়,—কিন্তু পুত্র-বিরহে-কাতর বৃদ্ধা জননীর সামান্য একখানি শাদা ধুতি ছাড়া—আর কি-ই বা দরকার? কিন্তু সে সামান্য বস্তু কি প্রভুকে

দেবার মত? তবে হ্যাঁ, প্রভুর সহধর্মিণীর জন্যে মূল্যবান্ একখানি শাড়ী দেওয়া যেতে পারে।

উত্তম যুক্তি। মহারাজ সেই যুক্তিই গ্রহণ করলেন। কিন্তু প্রভু যখন সহজভাবে থাকবেন,—তখন তাঁকে কিছু দিতে যাওয়া তো নিষ্ফল! তাই অনেক ভেবে চিন্তে—মহাপ্রভু যখন মহাভাবের আবেশে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হয়ে পড়লেন,—সেই সময় প্রসাদী দ্রব্যসমূহ থেকে একখানি বহুমূল্য শাড়ী বেছে এনে,—বেঁধে দিলেন রাজা মহাপ্রভুর মাথায়। প্রভু তখন সে কথা জানতেও পারলেন না। বাহ্যজ্ঞান্ ফিরে পেতে শাড়ীখানি দেখে তিনি আশ্চর্য হলেন। নিকটেই দাঁড়িয়েছিলেন শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী। জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রভু চাইলেন তাঁর দিকে।

পরমানন্দ বুঝলেন প্রভুর মনের কথা; বললেন,—"প্রভু, শাড়ীখানি জগন্নাথের প্রসাদী। মহারাজ দিয়েছেন এখানের প্রথামত আপনাকে। দেবতার প্রসাদী বস্তু অবহেলা করার দরকার নেই। ভক্তগণ যখন নবদ্বীপ ফিরবেন, তখন পাঠিয়ে দেবেন তাঁদের হাতে—শচীমায়ের কাছে।"—শচীমাতার হাতে গেলে শাড়ীখানি যে বিষ্ণুপ্রিয়ার ব্যবহারেই আসবে,—শ্রীপাদ পুরী এই উদ্দেশ্যেই অবশ্য স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করলেন। প্রভু আর কিছু না বলে শাড়ীখানি রাখতে দিলেন গোবিন্দকে ডেকে।

এরপর এলো গৌড়ভক্তগণের বিদায়ের পালা। বিদায়ের দিন আসতে বিচ্ছেদ-ব্যথায় সমানভাবে ব্যথিত হয়ে উঠলেন প্রভু এবং ভক্তগণ। সকলের চোখেই জল দেখা গেল। আজ চারটি মাস তাঁদের কি-আনন্দেই না কেটেছে! কিন্তু মহাপুরুষদের চিত্ত যেমন কোমল,—তেমনি সবল। প্রভু ধৈর্য ধারণ করে—ভক্তগণকে বললেন,—না, তোমরা গৃহী, তোমাদের ঘর-সংসার আছে, স্ত্রী-পুত্রাদি আছে,—তোমাদের এ-ভাবে আমার কাছে বসে থাকলে চলবে না। তোমরা যাও। তবে আমাকে ভুলো না, প্রতি বছর রথের সময় একবার করে আমার এখানে আসবে। তোমরা আমার প্রাণের সর্বত্র রয়েছ,—তোমাদের জন্যেই আমি কৃষ্ণপ্রেম পেয়েছি।"—প্রভুর চোখে আবার জল এলো।—শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে আলিঙ্গন করে তিনি বললেন,—"আচার্য, তুমিই তো মূলাধার! তাই তোমাকে সব চেয়ে গুরুতর দায়িত্ব বহন করতে হবে,—তুমি মূর্খ, স্ত্রীলোক, চণ্ডাল ইত্যাদি সকলকে কৃষ্ণনাম দান করবে। কেউ যেন উপেক্ষিত না হয়।"

কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ বসু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্ত।—তাছাড়া, উক্ত বসু-বংশই প্রভুর অনুরাগী,—প্রভু তাঁদের সাদরে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, —'তোমাদের মালাধর বসু—(গুণরাজ খান) 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ লিখে আমার পরম কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। তোমরা প্রতি বছর জগন্নাথের পট্টডোরী

নিয়ে আসবে নীলাচলে—রথের সময়।'—অতঃপর কাঞ্চনপল্লী-নিবাসী, অন্তরঙ্গ ভক্ত মুকুন্দ দত্তের দাদা বাসুদেবের দিকে চাইলেন প্রভু,—"তোমার আয় কম। অথচ তুমি বড় মুক্তহস্ত। যা উপার্জন কর, তাই খরচ করে ফেল। কিন্তু তুমি সংসারী,—তোমার সঞ্চয়ের-ও প্রয়োজন। কিছু কিছু সঞ্চয়ও করবে। মানুষের সময়-অসময় সম্পদ-বিপদ সবই তো আছে? শোন শিবানন্দ,—" প্রভুর দৃষ্টি ফিরলো কাঞ্চনপল্লীবাসী অন্যতম মরমী ভক্ত শিবানন্দ সেনের দিকে,—"তুমি বাসুদেবের দিকে একটু দৃষ্টি রাখবে।—যাতে সে কিছু সঞ্চয় করতে পারে।"

অতঃপর প্রভু ডাকলেন শ্রীবাসকে—'পণ্ডিত!'—গলাটা কেঁপে উঠলো মহাপ্রভুর। শ্রীবাসের আঙিনার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র নবদ্বীপের স্মৃতিই আবার জেগে উঠলো প্রভুর মানস-পটে,—"পণ্ডিত, আমি তোমাদের বড় দুঃখই দিয়েছি। তুমি আমার পিতৃ-বন্ধু,—তুমি আমার প্রধান লীলা-সহচর,—তোমার ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না। আর আমার বৃদ্ধা জননী,—সহসা প্রভুর কণ্ঠে বিপুল বাষ্প জমে উঠলো,—"আমার কর্তব্য ছিল তাঁর সেবা করা। তাঁর একটি ধার স্তন্যের ঋণ তো আমি শোধ করতে পারিনি,—অধিকন্তু, তাঁর বুকে দারুণ শেল হেনে—এই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি!"—দুটি গণ্ড ক্রমেই অশ্রু-ধারায় প্লাবিত হয়ে উঠলো তাঁর,—'শোন পণ্ডিত, মা আমার নবদ্বীপে হাহাকার করেন,—তাঁর সে আকুল কণ্ঠ—আমি নীলাচল থেকে শুনতে পাই,—প্রতিদিন আহারের সময় মায়ের কথা মনে পড়ে,—আর গ্রাস তুলতে পারি না। তুমি তাঁকে বলো, আমি তাঁর অবোধ শিশু,—আমার অপরাধ তিনি যেন মার্জনা করেন।'

প্রভু কিছুক্ষণ মায়ের দুঃখে নীরবে মাথা নত করে রোদন করলেন,—তাঁর এই ব্যথা ভক্তগণের প্রাণে প্রাণেই যেন দুঃখের তরঙ্গ জাগিয়ে তুললো।

'হ্যাঁ, শোন পণ্ডিত,'—প্রভু ধৈর্য ধরে চোখদুটি মুছতে মুছতে আবার বললেন,—'শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী বস্তু কিছু পেয়েছি,—তুমি নিয়ে গিয়ে মাকে দিয়ো। বলো,—এ-সব তাঁর নিমাই পাঠিয়েছে।'—প্রভু গোবিন্দকে শাড়ীখানি এবং আনুষঙ্গিক আর যে দু'একটা প্রসাদী দ্রব্য ছিল,—আনতে বললেন। গোবিন্দ সেগুলি আনলে প্রভু নিজে হাতে জিনিষগুলি তুলে দিলেন শ্রীবাসের হাতে।—এবং আবার বললেন,—'মাকে দিও। আর তাঁকে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানিও। তাঁর কথা আমি মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারি না পণ্ডিত!' আবার তাঁর গলা ভারী হয়ে উঠলো। প্রভু বেশ জানেন,—শাড়ীখানি মা পরবেন না,—অবশ্যই তুলে দেবেন বিষ্ণুপ্রিয়ার হাতে। বিষ্ণুপ্রিয়ার স্মৃতি অন্তরে জেগে না থাকলে,—কার জন্যে পাঠাচ্ছেন প্রভু এই শাড়ী মায়ের কাছে?

এই ক্ষুদ্র ব্যাপারের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের কথা ভেবে উপস্থিত সকলের চক্ষুই ভরে উঠলো জলে।

অতঃপর প্রভু এইভাবে জনে জনে আলিঙ্গন, আপ্যায়ন করে বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন। ভক্তেরা যেন শূন্য প্রাণেই নীলাচল ত্যাগ করে—চললেন গৌড়ের পথে।

* * *

'না, না, প্রভু, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না।'—ব্যাকুল-কণ্ঠে বলে উঠলেন শ্রীনিত্যানন্দ,—'তোমার জীব তুমি উদ্ধার কর,—আমার দ্বারা ও-সব হবে না। আমি শুধু তোমার কাছে পড়ে থাকবো।'

মহাপ্রভু গাঢ়কণ্ঠে বললেন,—শ্রীপাদ, তুমি আমার ডান হাত। তুমি যদি গৌড়ে না যাও,—তবে আর সেখানে হরিনাম বিতরণ করা হয় না। শাস্ত্রজ্ঞানী অধ্যাপক-পণ্ডিতগণের সে জায়গা,—সেখানে তোমার মত শক্তিমান ব্যক্তিরই প্রয়োজন। আমার কথা যদি বল,—আমি পারি না শ্রীপাদ,—হরিনাম উচ্চারণ করতে করতে আমি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলি,—তাই নাম-বিতরণ আমার সাধ্য নয়। তুমিই পারবে। তুমি আর আপত্তি করো না,—শীঘ্র গৌড়ে যাত্রা কর।

গৌড়ের ভক্তেরা বিদায় নিলেও—স্বরূপ, নিত্যানন্দ, গদাধর, হরিদাস, জগদানন্দ, দামোদর, বাসুঘোষ প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন প্রভুর কাছে। সার্বভৌম, গোপীনাথও অবশ্য গৌড়ীয় ভক্তগণের মধ্যেই। গদাধর ক্ষেত্রে সন্ন্যাস নিয়ে যমেশ্বর টোটায় গোপীনাথের সেবা করছেন। ক্ষেত্রে সন্ন্যাস নেওয়ার জন্যে,—অন্যত্র যাবার আর উপায় ছিল না তাঁর। তিনি রোজ ভাগবত পড়তেন, —প্রভু শুনতে যেতেন। নিত্যানন্দ আত্মভোলা-ভাবে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন হরিনাম করে। প্রভু দেখলেন,—গৌড়ে শ্রীঅদ্বৈত আছেন,—কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন,—হরিনাম বিতরণের জন্য সেখানে একান্তই প্রয়োজন নিত্যানন্দের।

নিত্যানন্দ প্রথমটা সম্মত না হলেও পরে প্রভুর একান্ত অনুরোধে আর আপত্তি করতে পারলেন না। বিশেষ প্রভুর নির্দেশ নির্বিচারে পালন করাই তাঁর কাজ। এতক্ষণ শুধু প্রভুর সহিত বিচ্ছেদের আশঙ্কাই তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল। প্রভুর একান্ত ইচ্ছা দেখে তিনি বললেন,—প্রভু, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র,—আমি তোমার হাতের পুতুল,—যেদিকে যেমন করে ঘোরাবে, —সেই দিকেই ঘুরবো। আমার তো সেই কাজ!

নিত্যানন্দ প্রায় সম্মত হয়েছেন দেখে মহানন্দে বললেন মহাপ্রভু,—তুমি আর-ও কয়েকজন ভক্তকে নিয়ে গৌড়ে গিয়ে থাক। আচণ্ডাল সকলকে হরিনাম বিতরণ কর। পাপী-তাপী, মূর্খ-পণ্ডিত, জ্ঞানী-অজ্ঞান, উচ্চ-নীচ, ধনী-দীন,—কোন বিচার নেই,—কোন ভেদ নেই। মানুষ মানুষই। সকলেই সেই

এক 'হরির।' হরিনামই প্রাণে প্রাণে জাগিয়ে তুলবে মিলনের সাড়া,—সকলের প্রীতি সকলের সমত্ব-বোধে। সেই সমত্ববোধ থেকে আসবে শক্তি,—আর শক্তি থেকেই আসবে মুক্তির আনন্দ প্রাণে প্রাণে।—এরই নাম জীবোদ্ধার!

কথাগুলি শুনতে শুনতে নিত্যানন্দও অভিভূত হয়ে উঠলেন,—বললেন তিনি বিহ্বল কণ্ঠে,—প্রভু, তাই হোক, তাই হোক, আমি নিলাম তোমার দেওয়া এ-কর্তব্য-ভার মাথায় তুলে। কিন্তু শক্তি আমার নয়,—তোমারই,—আমার প্রাণে সঞ্চার ক'রো তুমি সেই শক্তি!'

প্রভু আনন্দের আবেগে অধীর হয়ে নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন করলেন নিবিড়-ভাবে,—'শ্রীপাদ'—বললেন হর্ষাপ্লুত স্বরে,—'ভারী সন্তুষ্ট হলাম আমি। কিন্তু শ্রীপাদ, আমার আর একটি অনুরোধ,—আমার টানে তুমি ঘনঘন এসো না এখানে।'

নিত্যানন্দের চোখে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো। মুখে কিন্তু আর কোন কথা ফুটলো না।.........

পরদিনই তিনি কয়েকজন ভক্ত-সঙ্গে করে—বেরিয়ে পড়লেন গৌড়ের পথে। যে ক'জন তাঁর সঙ্গী হলেন,—সকলেই হরিনামে পাগল। নাম-গানে চারিদিকে মুখরিত করে—ক্রোশের পর ক্রোশ পথ যেন অক্লেশেই অতিক্রম করতে লাগলেন তাঁরা।

ক্রমে তাঁরা এসে পেঁাছলেন পানিহাটি। মহাপ্রভুকে ছেড়ে এসে নিত্যানন্দের প্রাণের তারে তখন শুধু—"গৌরাঙ্গ" নামই ঝঙ্কৃত হচ্ছে। তিনি দু'পায়ে নূপুর বেঁধে জাহ্নবীর তীর দিয়ে নেচে নেচে চলতে লাগলেন,—'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম।'—এবং সেই পথ থেকেই তিনি সুরু করলেন হরিনাম প্রচার করতে। অদ্ভুত তাঁর শক্তি! দেখতে দেখতে চারি-দিকেই পড়ে গেল হরিনামের বিপুল সাড়া।...ক্রমে নবদ্বীপে পেঁাছে নিত্যানন্দ প্রণাম করলেন এসে শচীদেবীকে।

নিতাইকে পেয়ে শোকাকুলা শচীমাতা যেন অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে উঠলেন। সহস্রবার তিনি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন,—তাঁর নিমাইয়ের সর্বাঙ্গীণ সংবাদ। অন্তরালে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও শুনতে লাগলেন স্বামীর কথা উৎকর্ণ হয়ে—শুধু কান দিয়ে নয়—সমগ্র প্রাণ দিয়ে।

৬৫

সার্বভৌম ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করেছেন প্রভুকে। বিপুল অয়োজন করেছেন তাঁর। মন্দির থেকেও আনিয়েছেন নানা উপাদেয় প্রসাদী দ্রব্য। কলাপাতার ওপর স্তূপীকৃত করে অন্নব্যঞ্জন সাজিয়ে—তার ওপর দেওয়া হয়েছে তুলসী-মঞ্জরী। তুলসীর মালা, তুলসীর পত্র, তুলসীমঞ্জরী প্রভুর নিকট পরম শ্রদ্ধার বস্তু। তুলসীমন্ত্রেই তিনি অনেকের মনের মালিন্য দূর করে—অন্তরে প্রবাহিত করেছেন ভক্তি-প্রেমের ধারা।

মহাপ্রভু এসে বসলেন আসনে। প্রভু অনেক সময় ভক্তের তুষ্টির জন্য চার-পাঁচজনেরও আহার্য খেতে পারতেন। আবার সামান্য শাক-অন্নে—অথবা সমগ্রদিন উপবাসেও তাঁর বেশ কেটে যেতো । সার্বভৌম সাধ করেই বিপুল অন্নব্যঞ্জন দিয়েছেন সাজিয়ে। মহাপ্রভু সেই আয়োজন দেখে চমকে উঠলেন—সার্বভৌম, এত খাবে কে ?

'খেতে হবে প্রভু,'—সার্বভৌম মৃদু হেসে উত্তর দিলেন,—'একটি ফেলে রাখলেও চলবে না। তাহলে আমার স্ত্রীও ভারী দুঃখিত হবে।' প্রভু মৃদু হেসে আচমন করলেন। এমন সময় কোত্থেকে সার্বভৌমের জামাতা অমোঘ এসে পড়লো সেখানে। এই যুবক সম্ভ্রান্ত কুলীনবংশীয় হলেও ছিল নির্বোধ,—শিষ্টাচার-জ্ঞানও ছিল না তার। প্রভুর আহার্যের দিকে চেয়ে সহসা সে বিদ্রূপ ভরে বলে উঠলো,—বাপ,একটা সন্ন্যাসী এত খাবে ?

মহাপ্রভু কৌতুকভরে একটু হাসলেন। কিন্তু সার্বভৌমের মাথায় আগুন জ্বললো। নিমন্ত্রিত মহাপ্রভুকে এই অপমান! জামাতার মর্যাদা ভুলে সার্বভৌম লাঠি নিয়ে প্রহার করতে গেলেন অমোঘকে। এবং দারুণ আপশোষে বলে উঠলেন,—এমন জামাই থাকার চেয়ে মেয়ে বিধবা হওয়াই ভাল!

'ছিঃ, ছিঃ, সার্বভৌম',—প্রভু তিরস্কার করে উঠলেন তাঁকে,—'ওসব কি বলছো তুমি ? এ যে আমার-ও লজ্জার কথা। তোমার মেয়েও এতে দুঃখ পাবে। আর অমোঘ ছেলেমানুষ,—তার কি অপরাধ নিতে আছে ? তাছাড়া,

দোষ তো তার নয়,—দোষ তোমারই। এত অন্ন-ব্যঞ্জন একজনকে খেতে দেখলে কে-না সে কথা বলবে,—বল? এত আয়োজন করা উচিত হয়নি তোমার।

সার্বভৌম চুপ করে থাকলেন। জামাইয়ের ওপর মনে মনে তখনও গজগজ করছেন। অমোঘ কিন্তু শ্বশুরের লাঠির বহর দেখেই তখন সরে পড়েছে—কোথায়—কে-জানে।

দু'তিন দিন পরে অমোঘ পড়লো মারাত্মক রোগে। সার্বভৌম সখেদে বললেন,—'নিমন্ত্রিত মহাপ্রভুকে অপমান করেই এমনি হলো। পাপের ফল ভোগ করতে হবে না?'—কথাটা কোন রকমে উঠলো গিয়ে প্রভুর কানে,—ব্যগ্রভাবে তিনি ছুটে এলেন সার্বভৌমের বাড়ি,—'সার্বভৌম',—বললেন ক্ষুব্ধ স্বরেই—'তোমার মুখে এ-সব কি-কথা শুনছি? অমোঘ তো আমার কাছে কোন অপরাধ করেনি। কৌতূহল-বশে একটা কথা বলে ফেলেছে মাত্র। রোগ হয়েছে,—স্বাভাবিকভাবে। কার না রোগ হয়? শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আরোগ্য লাভ করবে অমোঘ। চিন্তা নেই।

প্রভুর কথা মিথ্যা হয়নি। রোগ তার যে-ভাবেই হোক,—শীঘ্রই সে সুস্থ হয়ে উঠলো। মহাপ্রভুর প্রেমের স্পর্শে সে অতঃপর এক নূতন দিব্যজীবনও লাভ করলো।

* * *

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে লিখন-অধিকারী ছিলেন শিখি মাহাতি। তাঁর কনিষ্ঠের নাম মুরারি। মাধবীদাসী তাঁদের সহোদরা। কিন্তু এঁদের তিন ভাই-বোনকে লোকে তিন ভাই-ই বলতো। কারণ মাধবী পুরুষের ন্যায়ই নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন,—এবং পুরুষের মতই যোগ-সাধনাদি করতেন। এঁরা তিনজনেই ছিলেন জগন্নাথদেবের পরম ভক্ত। কিন্তু মুরারি এবং মাধবী যেদিন শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রথম দর্শন করেন,—সেইদিন থেকেই তাঁদের অন্তরে মহাপ্রভুর প্রতি প্রবল অনুরাগ এবং ভক্তি জন্মে। ক্রমে ক্রমে মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য দেখে দেখে, তাঁদের অন্তরে এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয়ে ওঠে যে,—মন্দিরে যিনি পূজিত হচ্ছেন বিগ্রহ-রূপে,—সেই লোকপাবন জগন্নাথই ধরাতলে নেমে এসেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ-দেহে। যতিবেশে নীলাচলে লীলা করছেন স্বয়ং লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ—'স্বাত্মানন্দে' বিভোর হয়ে।

একদিন তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন অগ্রজ শিখিকে,—দাদা, শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে কেমন বুঝলে?

'পরমভক্ত, মহাপুরুষ!'—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠেই উত্তর দেন শিখি মাহাতি,—'এমন পুণ্যশীল, চিত্তমোহী সন্ন্যাসী আর দেখা যায় না। নিঃসন্দেহে ভক্তির পাত্র।'

'কিন্তু আমরা যে ও'কে আরও বেশি করে জেনেছি দাদা।'—মাধবী উত্তর দেন নির্মল মৃদুহাস্যে,—'উনিই স্বয়ং জগন্নাথ।'

'না, না,'—শিখি ব্যগ্রকণ্ঠে বলে ওঠেন,—'অমন কথা বলো না। জীবে ঈশ্বর-জ্ঞান মহাপাপ।'

মুরারি বিরক্ত হয়েই বলেন,—দাদা, তোমার মনের মোহ এখনও যায়নি। তুমিও পাণ্ডিত্যের বড়াই কর কি-না! তাই সন্দেহমুক্ত হতে পারছো না। কিন্তু সার্বভৌম তো তোমার চেয়েও বড় পণ্ডিত! তাঁকে আজকাল দেখেছ?

'কেউ যদি ভ্রান্ত হয়, আমাকেও ভ্রান্ত হতে হবে নাকি?'—শিখি উত্তেজিত কণ্ঠেই তিরস্কার করতে লাগলেন ভাই-বোনকে।

দিন কয়েক পরে হঠাৎ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন শিখি মাহাতি।...যেন শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরের ভেতর থেকে বাইরে এলেন এবং রোজ যেমন গরুড়-মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দর্শন করেন,—তেমনি জগন্নাথ-দর্শন করতে লাগলেন। হঠাৎ শিখি গিয়ে পড়লেন জগন্নাথ-দর্শনে; শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁকে দেখেই বলে উঠলেন—তুমি মুরারি-মাধবীর বড় ভাই,—তুমি আমার পরম প্রিয়,—এসো, তোমাকে আলিঙ্গন করি।—বলেই শ্রীগৌরাঙ্গ যেন আলিঙ্গন করলেন তাঁকে।...

নিত্যকার-মত পরদিন শিখি গেলেন জগন্নাথ দর্শনে। মন্দির-প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁর মনে হলো,—ছায়ার মত কে-যেন বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে, —দাঁড়ালেন গরুড়-মূর্তির কাছে। কিন্তু সহসা চোখের ঘোর কাটতেই শিখি দেখলেন,—প্রকৃতই তখন শ্রীগৌরাঙ্গ গরুড়-মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে যথারীতি জগন্নাথ দর্শন করছেন। দর্শনান্তে মুখ ফিরিয়েই তিনি যেমন দেখলেন,—অদূরে শিখি দাঁড়িয়ে, অমনি বলে উঠলেন সহর্ষে,—তুমি মুরারি ও মাধবীর বড় ভাই,—আমার পরম প্রিয়, এসো, এসো তোমাকে আলিঙ্গন করি।'—সাগ্রহে এগিয়ে এসে মহাপ্রভু বক্ষের মাঝে আবদ্ধ করলেন শিখিকে।

শিখির চোখে তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব যেন একাকার হয়ে গেছে,—গত-রাত্রির স্বপ্ন তাঁর মনে পড়েছে,—শিরা-উপশিরায় বিদ্যুৎ ছুটে যাচ্ছে তাঁর,—এ-কি, এ-কি? অবিকল এই স্বপ্নই তো দেখেছেন তিনি? তবে-তবে—কে —কে এই গৌর-দেহে? তবে কি—তবে কি, মুরারি-মাধবীর কথাই সত্য?—ভাবতে ভাবতে মস্তিষ্ক তাঁর আচ্ছন্ন হয়ে এলো। চারিদিক যেন গৌরাঙ্গময় হয়ে উঠলো। কাঁপতে কাঁপতে সহসা তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন সেখানে। মহাপ্রভু সস্নেহে তাঁর গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গে শিখি লুটিয়ে পড়লেন প্রভুর চরণে,—প্রভু, প্রভু, তুমি নিজ হতে আমার চোখের পর্দা সরিয়ে দিয়েছো। চিনেছি,—এবার চিনেছি তোমাকে।

আর এ-চরণ ছেড়ে কোথাও যাচ্ছিনা। আমি নীচ, শূদ্রাধম,—তবু আমার ওপর তোমার এত কৃপা ?

শ্রীচৈতন্য হাসলেন,—উদার প্রশান্ত হাসি,—শিখি, তুমি শ্রীকৃষ্ণের পরম কৃপার পাত্র।...তোমাকে আলিঙ্গন করে আমি ধন্য হলাম। তুমি শূদ্র নও,—ভক্ত। ব্রাহ্মণেরও নমস্য।

অতঃপর শিখির অন্তরে গৌরাঙ্গ-মূর্তি অঙ্কিত হয়ে গেল চিরতরে ভাস্বর—অম্লান। তিনি ক্রমশঃ মহাপ্রভুর পরম প্রীতির পাত্র এবং প্রিয় পার্ষদ হয়ে উঠলেন।

৬৫

দোল পূর্ণিমার দিন মহা-আড়ম্বরে মহাপ্রভুর 'জন্মোৎসব' অনুষ্ঠিত হলো নবদ্বীপে। নীলাচলেও মহাপ্রভু এ-দিন উৎসবের বিশেষ আয়োজন করলেন,—শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুসরণে।...

দেখতে দেখতে আবার রথযাত্রার সময় এসে পড়লো। গৌড় থেকে আবার ভক্তগণ এলেন নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শন করতে। এবার গৃহিণী-ঠাকুরাণীরাও এলেন কর্তাদের সঙ্গে। সীতাঠাকুরাণী, মালিনীদেবী এবং প্রভুর মাতৃস্বসা প্রভৃতি কেউ বাদ গেলেন না। যে সকল যাত্রীর যাতায়াতের ব্যয়ভার বহনের সামর্থ নেই—অথচ গৌরাঙ্গ-দর্শনের বিপুল আগ্রহ,—তাঁদের সমস্ত ব্যয় বহন করেছেন—বিশিষ্ট সমাজ-পতি ও মুক্তহস্ত ধনী কাঞ্চনপল্লীর শিবানন্দ সেন। সমর্থ-অসমর্থ নেই;—গৌরাঙ্গ-দর্শনোৎসুক হাজার হাজার ব্যক্তির ব্যয়ভার-বহনেও তিনি কোনদিন কুণ্ঠিত হতেন না। এমন কি নীলাচলে থাকবার ব্যবস্থাও তিনি করতেন সকলের। বলা বাহুল্য,—তিনিও এসেছেন সপরিবারে।

প্রভু ও ভক্ত-সম্মিলনে প্রচুর আনন্দ উথলে উঠলো হৃদয়ে-হৃদয়ে। মহারাজ প্রতাপরুদ্রও নিত্য-নিয়মিত সংবাদ রাখতে লাগলেন—প্রভুর ভক্ত-গোষ্ঠীর। যেন কারো কোন অসুবিধা না হয়,—সে জন্য নির্দেশ দিলেন যোগ্য রাজকর্ম-চারীদের।

পুরীর রাজাদের নিয়ম আছে,—শ্রীজগন্নাথের রথ-যাত্রা-পথে সমার্জনী দিয়ে চন্দন ছিটিয়ে দিতে হবে। অবশ্য এ-সমার্জনী সুবর্ণ-মণ্ডিত,—রাজা যেখানে 'ঝাড়ুদার' সেখানে ঝাড়ুও অবশ্য তেমনি হবারই কথা। তবু কাজটা তো ঝাড়ুদারেরই। হোক না জগন্নাথের? তাই রাজা যখন সুবর্ণ-মার্জনী দিয়ে রথের সম্মুখে পথ পরিস্কার করেন,—তখন মহাপ্রভু একটু দূরে দাঁড়িয়ে স্মিতনেত্রে চেয়ে থাকেন তাঁর দিকে। বড় ভাল লাগে তাঁর সে-দৃশ্য! রাজ-অভিমান ভুলে রাজা লক্ষ লোকের চলার পথ পরিষ্কার করছেন ঝাঁটা দিয়ে! জগতের নাথ তো চলেন জগৎ-জনেরই চলার পথে!.........

সীতাঠাকুরাণী, মালিনীদেবী এবং প্রভুর মাসীমাতা প্রায়ই ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করেন মহাপ্রভুকে। মহাপ্রভু এ'দের দেখেন জননী শচীদেবীর মতই। এ'রাও প্রভুর প্রতি বাৎসল্য-প্রেমে মুগ্ধা,—তাই সন্ন্যাসের বিধি এখানে মেনে চলতে হয় না মহাপ্রভুকে। শচীমাতার মতই পরমস্নেহে এ'রা কাছে বসে প্রভুকে মনের সাধেই কত উপাদেয় দ্রব্যই না ভোজন করান! শচীদেবী যে-সব দ্রব্য তৈরী করে পাঠিয়েছেন,—তাও মায়ের নাম করে খেতে দেন তাঁকে। প্রভুর তাতে কত আনন্দ—কি তৃপ্তি! নবদ্বীপে ফিরে কি-কি বলতে হবে মা'কে,—তাও বলে দেন তিনি এ'দের বার-বার। যেন মায়ের ছেলে মায়ের কোলেই রয়েছেন!

এবার নিত্যানন্দও এসেছিলেন সকলের সঙ্গে। প্রভু একদিন তাঁকে নিভৃতে ডেকে বললেন,—'শ্রীপাদ, তুমি যদি বার বার আমার টানে এখানে এসে পড়, তাহলে তো ও-দিকের সব কাজ নষ্ট হয়!'

'তা বলে কি বছরে একবারও আসতে পাবো না তোমার কাছে!'—অভিমান জাগলো শ্রীপাদের মনে,—"এত এত লোক তোমাকে দেখতে আসতে পারে,— আর আমিই বঞ্চিত হবো?"

'অভিমান করো না শ্রীপাদ!'—প্রভু মধুর কণ্ঠে বললেন,—'তুমিই যে আমার শক্তি! আমার অন্তরেই তো তোমার স্থান,—সর্বদা আমি সেখানে তোমাকে দেখতে পাই। আবার তোমার অন্তরেও তুমি আমাকে খুঁজে পাবে। কিন্তু শ্রীপাদ,'—মহাপ্রভু একটু ইতস্ততঃ করলেন,—তার পর বলেই বসলেন,—'এবার গৌড়ে ফিরে গিয়ে তুমি সংসারী হও। বিবাহ কর,—

'কি-কি বললে প্রভু?'—চমকে উঠলেন নিত্যানন্দ। যেন গায়ে কেউ আগুন ছিটিয়ে দিলে!—"আমি বিবাহ করবো, সংসারী হবো? তার চেয়ে বধ কর প্রভু, আমাকে বধ কর।"—নিথর হয়ে গেলেন নিত্যানন্দ।

মৃদু হাসলেন প্রভু,—'আমাকে ভুল বুঝো না শ্রীপাদ,—তোমাকে বধ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং তোমার দ্বারা আমি একটা মহান আদর্শ স্থাপন করতে চাই। আমি সন্ন্যাসী, তোমরা সন্ন্যাসী,—আমার ভক্তেরাও কেউ কেউ

সন্ন্যাসী,—এ-সব দেখে শুনে লোকের ধারণা হয়ে যাচ্ছে,—বৈষ্ণব-ধর্ম নিতে হলে—সন্ন্যাস নিতে হবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভজনার সঙ্গে সন্ন্যাসের তো কোন সম্বন্ধ নেই শ্রীপাদ! অদ্বৈতাচার্য কি বৈষ্ণব নন?—শ্রীবাস কি বৈষ্ণব নন?—কিন্তু তাঁরা তো দিব্যি সংসার করছেন!—আমার সন্ন্যাসের হেতু তো তুমি জান? তাই তোমাকে আমি মিনতি করছি,—তুমি গাহর্স্থ্য-ধর্ম গ্রহণ করে জীবকে শিক্ষা দাও,—সংসারে থেকে কেমন করে ধর্ম-সাধনা করতে হয়। অনাসক্ত সংসারীর আদর্শ তোমাকে স্থাপন করতে হবে। গার্হস্থ্য ধর্ম হেয় নয় শ্রীপাদ,—বরং যথাযথভাবে এই ধর্ম পালন করাই সবচেয়ে দুরূহ। অবশ্য এত বড় একটি বৃহৎ ব্যাপারে দু'একজন সর্বত্যাগীরও প্রয়োজন,—তাই আমাকে সন্ন্যাস নিতে হয়েছে। কিন্তু 'গৌর-নিতাই' এর দুটি দিক,—আমি একদিকে আছি,—তুমি আর এক দিকের ভার নাও। এ তুমি না করলে ভবিষ্যতে জগতে বৈষ্ণব-ধর্মের চিহ্নও থাকবে না শ্রীপাদ!

মহাপ্রভু সাগ্রহে চেয়ে থাকলেন নিত্যানন্দের মুখের দিকে,—তাঁর উত্তরের জন্যে। আজীবন সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে তিনি যে কি কঠোর পরীক্ষায় ফেলেছেন,—তা' তিনি ভাল করেই জানেন। কিন্তু তবু নিত্যানন্দকে দিয়ে—এ আদর্শ স্থাপন করতেই হবে তাঁর। লোকে যখন দেখবে,—স্বয়ং নিত্যানন্দ গৃহ-ধর্ম পালন করছেন, তখন তাদের মনে আর কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকবে না।

মাথা নত করে অনেকক্ষণ ভেবে নিত্যানন্দ মুখ তুলে চাইলেন প্রভুর দিকে,—চোখ দুটি তখন ছলছল করছে,—'প্রভু, আমি যে কিছুতেই ধারণাতেও আনতে পারছি না গৃহ-ধর্ম পালনের কথা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।'

'তবে কি আমার অনুরোধ তুমি অবহেলা করবে শ্রীপাদ?'—প্রভুর স্বরে এবার যেন গভীর ব্যথা ফুটে উঠ্‌লো,—এতে তোমার মহিমা বাড়বে বই কমবে না,—জগৎ একটা সর্বজন-গ্রাহী নূতন আদর্শ দেখতে পাবে চোখের সামনে। গৃহধর্মে থেকে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করা,—একে তুমি নিকৃষ্ট মনে কর শ্রীপাদ?

'প্রভু, প্রভু,'—ব্যাকুলকণ্ঠে বললেন নিত্যানন্দ,—'আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে আমি ক্ষুণ্ণ করতে চাই না। তোমার আদেশই আমার নির্বিচারে পালনীয়। এ-জীবন তোমার চরণে উৎসর্গ করেছি,—ভাল কি মন্দ আমি আর তার বিচার করবো না। সে অধিকার-ও আমার নেই। তুমি প্রীত হও,—আমি তোমার আদেশ পালন করবো।'

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন মহাপ্রভু,—'শ্রীপাদ, শ্রীপাদ, তুমি আমায় আজ পরম সান্ত্বনা দান করলে।.........

দেখতে দেখতে নানা আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে একে-একে চারটি মাস কেটে গেল। কোনদিন কীর্তনোৎসবে, কোন দিন জলক্রীড়ায়, কোনদিন বন-ভোজনে,

কোনদিন ভক্তজনের সঙ্গে প্রভুর নৃত্য-বিলাসে—দিনগুলি কাটলো যেন সুস্বপ্নের মত! আবার এসে পড়লো বিদায়ের পালা। বিষাদের ছায়া নেমে এলো গৌড়-ভক্তজনের মুখে। নির্দিষ্ট দিনে তাঁরা—প্রভুর কাছে বিদায় নিয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতেই—প্রত্যাবর্তন করলেন নবদ্বীপের উদ্দেশে। শ্রীনিত্যানন্দও প্রভুর আদেশ মাথায় নিয়ে ফিরলেন গৌড়ে।

৬৬

নবদ্বীপ পৌঁছে শ্রীনিত্যানন্দ থাকলেন পুত্রের মতই শচীদেবীর কাছে। তাঁকে পেয়ে শচীদেবীর পুত্র-বিরহ-তাপ যেন অনেকটাই শান্ত হলো। নিত্যানন্দের উপস্থিতিতে নবদ্বীপ মেতে উঠলো হরিনামে। নাম-তরঙ্গে যেন ভাসতে লাগলো নবদ্বীপ এবং তার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান। নিত্যানন্দকে পেয়ে বৈষ্ণবদেরও প্রভাব দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। এদিকে প্রভুর নির্দেশ আছে,—নিত্যানন্দকে সংসারী হতে হবে। তাই তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ করলেন,—সন্ন্যাস-আশ্রমের যত কিছু আচার-আচরণও বর্জন করলেন তার সঙ্গে। পরিধানে পট্টবস্ত্র,—অঙ্গে আভরণ,—গলায় ফুলের মালা,—পায়ে নূপুর,—নিত্যানন্দের সে মোহন-বেশও হোল দেখবার মত!

কিন্তু তাঁকে পুরো সংসারী হতে হবে। বিবাহ করতে হবে। সুতরাং পাত্রীর সন্ধান চললো। নবদ্বীপের নিকটবর্তী শালিগ্রাম-নিবাসী পণ্ডিত সূর্যদাসের দুইটি বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল,—বসুধা ও জাহ্নবী। সূর্যদাস সানন্দেই কন্যা-সম্প্রদান করলেন নিত্যানন্দের হাতে। বিবাহের পর নিত্যানন্দ সস্ত্রীক খড়দহে এসে বাস করতে লাগলেন। তাঁর আগমনে খড়দহ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও ভাসতে লাগলো হরিনাম-তরঙ্গে। তখন সুবর্ণবণিক-সমাজের প্রধান ছিলেন উদ্ধারণ দত্ত। তিনি দীক্ষিত হলেন নিত্যানন্দের কাছে বৈষ্ণব-ধর্মে। তাঁর দেখাদেখি সপ্তগ্রামের সমগ্র সুবর্ণবণিক-সমাজ নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো। তখন কিন্তু হিন্দু-সমাজ সুবর্ণবণিক-সম্প্রদায়কে অবহেলা করেই চলতো। নিত্যানন্দের প্রভাবে তাঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

কিন্তু এক বিরাট শত্রুর দল গড়ে উঠলো নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে।...চারিদিক থেকে নানা বিদ্রূপের বাণ বর্ষিত হতে লাগলো তাঁর ওপর। সামাজিক নির্যাতনও সুরু হলো কঠোরভাবে। এমনকি অনেক বৈষ্ণবও ঘৃণায় ত্যাগ করলেন তাঁর সংশ্রব। সকলেই বলতে লাগলো,—'লোকটার ভেতরে ভেতরে ছিল ভোগের সম্পূর্ণ স্পৃহা। শুধু শ্রীচৈতন্যের নাম ভাঙিয়ে এতদিন সন্ন্যাসী সেজে লোককে প্রতারণা করেছে! 'কোপ্নী' এ'টে, ভিক্ষের শাক-ভাত খেয়ে দিন কাটতো,—এখন চলছে রাজ-ভোগ,—গায়ে উঠেছে রাজ-পোষাক! আবার 'গুরুগিরি' ফলানো হচ্ছে!

এমন-কি নীলাচলে এসে মহাপ্রভুর কানেও অনেকে অনেক বিরুদ্ধ কথা তুললো নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে।

'সমাজের উৎপীড়নে এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জ্জরিত হতে হতে নিত্যানন্দও অধীর হয়ে উঠলেন। বহুদিন সহ্য করে করে সহ্যের ক্ষমতা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল,—তখন তিনি নবদ্বীপে এসে শচীদেবীর অনুমতি নিয়ে—বেরিয়ে পড়লেন নীলাচলের উদ্দেশে। অবশ্য মনে মনে তিনিও বড় আহত হয়েছেন,—হায়, কি ছিলেন,—আর কি হয়েছেন! কোথায় ছিলেন মুক্ত আকাশের বিহঙ্গ,—আনন্দে গান গেয়ে ভেসে বেড়াতেন নীলাকাশে,—আর আজ পায়ে শেকল পরে আকর্ষণ করছেন মানুষের অশ্রদ্ধা,—তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ!

বড় বেদনা বুকে নিয়েই নিত্যানন্দ অতিক্রম করতে লাগলেন দীর্ঘ পথ।... চোখের সামনে ধ্রুবতারার মতোই জ্বলতে লাগলো শুধু শ্রীগৌরাঙ্গের অভয়-সুন্দর মূর্তি!

* * *

এ-দিকে গৌড়-ভক্তেরা নীলাচল ত্যাগ করার পর থেকেই প্রভুর একবার জন্মভূমি দর্শন করে—ওই পথেই শ্রীধাম বৃন্দাবন যাবার প্রবল কামনা জেগে উঠেছে অন্তরে! সন্ন্যাস নেবার পূর্ব থেকেই তাঁর মন ছুটেছিল বৃন্দাবনের উদ্দেশে। সে আশা আজিও পূর্ণ হয়নি তাঁর। কিন্তু আর যেন তিনি নিজেকে স্থির রাখতেও পারছেন না।

গোল বাধিয়েছেন কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্র, রামানন্দ ও সার্বভৌম। তাঁরা কিছুতেই ছেড়ে দিতে চান না প্রভুকে। প্রভুর বিরহের আশঙ্কায় আকুল হয়ে ওঠে তাঁদের হৃদয়। প্রভুই যেন তাঁদের প্রাণ,—প্রাণ ছেড়ে তাঁরা বাঁচবেন কেমন করে? নানা অজুহাতে তাঁরা বারবারই প্রভুর নীলাচল-ত্যাগে বাধা দিয়েছেন।—এ সময়টা বড় শীত,—পথঘাটের অবস্থা আজকাল ভারী খারাপ,—হিন্দু-মুসলমানে ঘোর বিবাদ চল্ছে,—আর কিছুদিন পরে যাওয়াই ভাল,—এই সব বলে বলেই তাঁরা কোনরকমে আটকে রেখেছেন প্রভুকে। দেখতে

দেখতে বছরই ঘুরে গেছে। আবার গৌড়-ভক্তগণের নীলাচলে আসবার সময়ও প্রায় হয়ে এসেছে,—এমন সময় নিত্যানন্দ এসে পৌঁছলেন নীলাচলে।

মনের বেদনায় তিনি বরাবর প্রভুর কাছে গিয়েও উঠতে পারলেন না। আর কি তাঁর কাছে গিয়ে স্ব-মর্যাদায় দাঁড়াবার দিন আছে তাঁর? এক-এক বার তাঁর মনে আশা জাগে,—কিন্তু সংসারী হয়ে তিনি তো প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ করেছেন? কিন্তু তবু-ও তাঁর পা যেন আর উঠতে চায় না,—বসে থাকলেন তিনি ম্লান মুখে একটা বাগানর ধারে। তাঁর সংবাদ কিন্তু কোন রকমে গিয়ে উঠলো মহাপ্রভুর কানে। তিনি সেই দণ্ডেই ব্যগ্রপদে ছুটে এলেন সেখানে। নিত্যানন্দ তখন কাঁদছেন,—দু'টি গণ্ড ভেসে যাচ্ছে তাঁর অজস্র জলে। প্রভু কোন কথা না বলে—প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন তাঁকে, আর মুখে মুখে একটি শ্লোক রচনা করে মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে লাগলেন তাঁর।

সহসা সে দৃশ্য দেখে সম্ভ্রমে চমকে উঠলেন নিত্যানন্দ। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে প্রভুকে প্রণাম করতে গিয়ে আছড়ে পড়লেন। শশব্যস্তে প্রভু তাঁকে দু'হাত দিয়ে তুলে নিলেন বুকে,—'শ্রীপাদ,'—প্রভুর স্বর প্রীতি-মধুর,—অথচ কেমন একটু ক্ষুব্ধ-ও,—'কিসের দুঃখে তোমার চোখে জল এসেছে? তোমার কথা কিছু কিছু আমারও কানে তুলেছে নির্বোধ নিন্দকের দল! কিন্তু তোমার দুঃখিত হবার কারণ তো কিছু নেই! যারা অন্ধ, তারাই তোমাকে অশ্রদ্ধা করবে। কিন্তু আমি তো জানি তোমার অন্তর? তোমার অঙ্গের অলঙ্কার তোমার নিষ্কলুষ সরল চিত্তের সাত্ত্বিক-সদানন্দ-ভাবের দ্যোতক! তুমি নিরাসক্ত হয়ে—সংসার-ধর্ম পালন কর,—নিজে আচরণ করে অপরকে শিক্ষা দাও,—সেই তো চেয়েছিলাম আমি?—গৌড়ে গিয়ে তুমি অল্প দিনের মধ্যে যে বিপুল কাজ করেছ,—তা' তোমার পক্ষেই সম্ভব। তুমি আমাকে পরম আনন্দ দিয়েছ শ্রীপাদ!'

'প্রভু',—তবুও ভারীকণ্ঠেই উত্তর দিলেন নিত্যানন্দ,—আমি তো নির্বিচারে তোমারই আদেশ পালন করেছি। ভালমন্দ বিচারের ভার তো আমার নয়? আমি ছিলাম—সন্ন্যাসী,—তুমিই আমাকে সংসারী করেছ। কিন্তু প্রভু, আমাকে দেখে যে লোকে হাসছে!

'তারা এখনও তোমার মহিমা বোঝেনি।'—প্রভু প্রগাঢ়কণ্ঠেই বললেন. 'কিন্তু শীঘ্রই বুঝবে। তুমি 'বৃন্দাবনের গোপাল',—নিত্যানন্দ মুক্তাত্মাপুরুষ—তোমার কি জপতপ শোভা পায়? গৌড়দেশে তুমি আর অদ্বৈতই তো আমার আশা-ভরসা! তোমরাই আমার প্রতিনিধি। আশ্বস্ত হও,—স্বচ্ছন্দ মনে ফিরে যাও সেখানে। নিজের কাজ কর। একদিন বিরোধী দলের ভুল

ভাঙবে। তোমার মহিমা বুঝবে তারা। ছুটে আসবে তোমার শরণলাভের আশায়। তুমি যাই কর,—তবু তুমি দেবতারও বন্দনীয়।

'প্রভু,'—নিত্যানন্দ আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন,—সহসা মহাপ্রভু বাধা দিলেন,—'শ্রীপাদ,'—কণ্ঠে ফুটে উঠলো তাঁর প্রচুর আবেগ,—'জীবের নিজের কল্যাণেই আমার এ কৃষ্ণনাম-বিতরণের প্রয়াস। নাম-জপ কি শুধু নাম জপেরই জন্য? তা তো নয় শ্রীপাদ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের সর্বমানবের এক মহত্তম আদর্শ। একাধারে তিনি প্রেমিক-ভক্তবৎসল, শিষ্টপালক, দুষ্টদ্রোহী, বীরও অক্লান্ত কর্মী। তিনি অনন্ত লীলাময়,—অনন্ত ভাবময়,—আবার তিনি সর্বনীতিজ্ঞ সর্বজীবে সম-উদার! তাঁর নাম নিষ্ঠাভরে জপ করতে করতে জীব যেদিন তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারবে,—সে দিন কে রোধ করবে তাদের উদ্ধারের পথ? তাঁরই নাম নিয়ে তুমি ফিরে যাও গৌড়ে। সংসারে থেকেই তাঁকে ভজনা কর,—এবং নিজের আচরণে অপরকেও তার পথ দেখাও।'

মনের গভীর ক্ষত জুড়িয়ে গেল নিত্যানন্দের প্রভুর সান্ত্বনায়। প্রভুর বাণী তখন তাঁর অন্তরেও এক নূতন প্রেরণার সঞ্চার করেছে। মহানন্দে প্রভুকে প্রণাম করে—চলে গেলেন তিনি যমেশ্বর টোটায়,—পরম সুহৃৎ গদাধরের কাছে।—প্রভুও ফিরলেন নিজের বাসস্থানে।

দুচার দিনের মধ্যে গৌড়ভক্তের দলও এসে পড়লেন নীলাচলে প্রতিবারের মত। প্রভু তাঁদের অভ্যর্থনাদি করে পূর্বাহ্নেই বললেন,—'দেখ,—এবার তোমরা রথ দেখেই ফিরে যাবে। কারণ এবার আমি বিজয়া দশমীর দিন যাত্রা করবো গৌড়ে। জন্মভূমি দর্শন করে ওই পথেই যাব শ্রীধাম বৃন্দাবনে। এ-সংকল্প আমার অনেক দিনের। শুধু নীলাচল-ভক্তদের অনুরোধেই এতদিন যেতে পারিনি। কিন্তু এবার আমাকে যেতেই হবে।

'প্রভু, তুমি তো স্বেচ্ছাময়',—শ্রীবাস বললেন পুলকিত কণ্ঠে,—জন্মভূমি দেখতে যাবে,—এ-তো আমাদের আনন্দেরই কথা! তবে আমরা তোমার সঙ্গেই ফিরবো?

না, না, পণ্ডিত,—ব্যগ্রকণ্ঠে উত্তর দেন মহাপ্রভু,—'তা হবেনা। আমার কথার দ্বিরুক্তি করো না। তোমরা রথ দেখেই চলে যাবে,—পরে আমি যাত্রা করবো।'—শ্রীবাস আর কিছু বলতে সাহস করলেন না।.........

থাকতে থাকতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য একদিন প্রবল ভক্তির আবেগে,—শ্রীগৌরাঙ্গের মাহাত্ম্য নিয়ে একটি পদ রচনা করে ফেললেন,—এবং কীর্তনের সময় কৃষ্ণ-কীর্তন অথবা হরি-সংকীর্তনের পরিবর্তে সকলকে নিয়ে গাইতে সুরু করলেন গৌরাঙ্গ-কীর্তন। রচিত পদটিতে গৌরাঙ্গকেই স্বয়ং ভগবানরূপে বন্দনা করা হয়েছিল। মহাপ্রভুও ছিলেন সেখানে। সে পদটি শুনতেই চমকে উঠলেন

তিনি,—'এ কে রচনা করেছে? এ-পদ কোথায় পেলে তোমরা?'—জিজ্ঞাসা করলেন ভক্তদের মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে।

'প্রভু'.—মুকুন্দ এগিয়ে এসে বললেন,—'এ রচনা আচার্যদেবের।' প্রভুর মুখ ভার হয়ে উঠলো,—তিনি কাউকে কিছু না বলে চলে এলেন কীর্তন-স্থান ছেড়ে বাসস্থানে। ভক্তদের প্রসন্ন মুখ শুকিয়ে গেল,—'এ কি হলো?'—তাঁরা ভয়ে ভয়ে ছুটলেন প্রভুর বাসায়,—'প্রভু, প্রভু',—জিজ্ঞাসা করলেন অদ্বৈতাচার্যই,—"সহসা চলে এলে যে? কি-অপরাধ হলো আমাদের?"

কৃষ্ণনাম ছেড়ে তোমরা আমাকে শোনাতে লাগলে আমারই নাম?—প্রভুর কণ্ঠ রীতিমত ক্ষুব্ধ ও গম্ভীর,'—গৌরাঙ্গ ভগবান? কে শেখালে তোমাদের?

'আমরা নিজের অন্তরেই জেনেছি প্রভু.'—এবার শ্রীবাস উত্তর দেন প্রগাঢ় বিশ্বাসে—বুকে ভরসা নিয়ে,—'হাতের আড়াল দিয়ে সূর্যের আলোক আটকানো যায় না। আজ আমরা বলেছি,—কাল জগৎ বলবে।'

'কিন্তু আমার কৃষ্ণ, আমার কৃষ্ণ।'—ভাবের আবেগে বিচলিত হয়ে উঠলেন প্রভু,—'না, না, এমন কোনদিন করো না, কখনো করো না।'—

প্রভুর ক্ষোভের ভাব দেখে ভক্তেরা চুপ করে থাকলেন। মন কিন্তু তখনও তাঁদের বলছে,—'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ!......

প্রভুর আদেশ,—সুতরাং এবার গৌড়-ভক্তের দল রথযাত্রা দেখেই ফিরলেন গৌড়ের মুখে। নিত্যানন্দও ফিরলেন। প্রভুর দৃঢ় সংকল্প বুঝে রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তের বুক কেঁপে উঠলো,—না, এবার আর কোন রকমে আটকানো যাবে না মহাপ্রভুকে।...ফলে বিজয়াদশমীর দিন যত ঘনিয়ে আসে,—ততই ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাঁদের অন্তর। তবু তাঁরা নানা রকমে—প্রত্যক্ষভাবে সাহস না হলেও প্রকারান্তরে চেষ্টা করতে থাকেন প্রভুর গৌড়-যাত্রার দিন বিলম্বিত করতে।...কিন্তু শীঘ্রই বুঝলেন,—প্রয়াস বিফল!—প্রভু গৌড়-যাত্রার আয়োজন সুরু করেছেন। জননী, ভক্ত ও প্রিয়জনদের জন্যে জগন্নাথের প্রসাদ সংগ্রহ করতেও আদেশ দিচ্ছেন যোগ্য ব্যক্তিকে। প্রভুর যেন ব্যস্ততার সীমা নেই,—আনন্দেরও অন্ত নেই!...এ-যে কার টানে,—জন্মভূমির—না বৃন্দাবনের,—তা অবশ্য প্রভুর মনই জানে। হয়ত দুয়েরই। মনের সহজ অবস্থায় জন্মভূমি—ভাবাচ্ছন্ন অবস্থায় বৃন্দাবন,—দু'টি ভিন্নধারা ভিন্ন ভিন্ন গতিতে বয়ে যাচ্ছে এখন প্রভুর মনের খাতে।

দেখতে দেখতে এসে পড়ে বিজয়া দশমী।...প্রভু আজ নীলাচল ত্যাগ করবেন,—নীলাচলবাসীদের কাছে তাই আজ উভয়তঃই বিজয়াদশমী। বিদায়ের সময় নানা দিক থেকে এসে সমবেত হন প্রভুর নীলাচল-ভক্তগণ। আসেন

সার্বভৌম, আসেন রামানন্দ, কাশীমিশ্র ইত্যাদি সকলে। সন্ন্যাসী পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, ভক্ত হরিদাস, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, দামোদর, বক্রেশ্বর প্রভৃতি হলেন প্রভুর সহযাত্রী।...গদাধর যে কোন্ সময় এসে দলে ভিড়েছেন,—মহাপ্রভু তা জানুতেও পারেননি।

ক্রমে প্রভু সদলে এসে পড়লেন কটকে। সংবাদ শুনেই রাজা প্রতাপরুদ্র রাজ-পরিবারের সকলকে নিয়ে এলেন প্রভু-দর্শনে এবং তাঁকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে।—এবার রাজা এসেছেন রাজোচিত মহা-আড়ম্বরেই। সুবৃহৎ হস্তীর ওপর থেকে নেমে মহারাজা রত্ন-খচিত উষ্ণীষ ধুলায় লুটিয়ে প্রণাম করলেন প্রভুকে। কি মহিমময় সে-দৃশ্য!—কৌপীন-পরিহিত সর্বত্যাগী নিঃসম্বল এক সন্ন্যাসীর চরণে স্বাধীন এক বিশাল রাজ্যের অধিপতির রত্নমণ্ডিত শির লুটিয়ে পড়ছে!—রাজকুমাররাও প্রভুকে প্রণাম করলেন একে-একে। রাজ-মহিলারা পর্দার আড়ালে থেকে দর্শন করলেন মহাপ্রভুকে।

অবিলম্বে দিকে দিকে প্রচারিত হলো রাজাজ্ঞা,—প্রভুর গমন-পথ যেন সর্বত্র সুগম থাকে,—প্রভু যেখানে রাত্রিবাস করবেন, সেইখানেই যেন অস্থায়ী গৃহ-নির্মাণ করা হয়,—প্রভুর স্নানের ঘাটে এক-একটি স্তম্ভ নির্মাণ করে যেন সেগুলিকে নির্দিষ্ট করা হয় পুণ্যতীর্থ বলে।—উড়িষ্যার সীমায় কোথাও প্রভুর কোন অসুবিধা হয়েছে শুনলে,—তত্রস্থ অধিকারীকে দণ্ডিত করা হবে রাজ-দণ্ডে।

সার্বভৌম ও রামানন্দ প্রভুর প্রত্যুদ্গমন করেছেন কটক পর্যন্ত,—প্রভু তাঁদের দিকে চেয়ে বললেন,—'তোমরা এবার ফিরে যাও নীলাচলে।' সহসা গদাধরের প্রতি দৃষ্টি পড়লো তাঁর,—চমকে উঠলেন তিনি,— এ-কি, গদাধর, তুমি এসেছো কেন?

—'আমি যাবো তোমার সঙ্গে।'—গদাধরের চক্ষে আকুল মিনতি।

'গদাধর, তুমি না ক্ষেত্রে সন্ন্যাস নিয়েছ?'—প্রভুর কণ্ঠস্বর রূঢ় হয়ে ওঠে,—ক্ষেত্র-সন্ন্যাসীর কি ক্ষেত্র ত্যাগ করে যাবার নিয়ম আছে? তুমি ফিরে যাও সার্বভৌমের সঙ্গে।

'তোমাকে ছেড়ে আমি নীলাচলে থাকতে পারবো না প্রভু!'

'থাকতে পারবে না?'—প্রভুর স্বর এবার একটু কোমল হয়ে ওঠে;—গদা-ধরের কাতর মুখখানি তাঁর মর্ম আলোড়িত করে তোলে,—'গদাধর, আমি তো শীগ্গির ফিরবো। তোমার চিন্তা কি? তুমি তো জান,—আমি নিজে সন্ন্যাসী।—সন্ন্যাসের বিধি সহজে ভঙ্গ করা পাপ বলেই মনে করি। তোমাকে আমি ভালবাসি,—তাই তুমি পাপে লিপ্ত হও,—এ আমি চাই না। গদাধর, তুমি জ্ঞানী,—বুদ্ধিমান। ভুল করো না। ফিরে যাও এঁদের সঙ্গে।'—সঙ্গে

সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি ফিরে আসে সার্বভৌমের দিকে,—'আপনারা একে সঙ্গে করে নিয়ে যান।'

'কিন্তু আমরা আর একটু যাই না প্রভু।'—রামানন্দ কুণ্ঠিত হাস্যে বলেন। প্রভু ব্যগ্র হয়ে ওঠেন,—না, না, অনেক দূর এসেছ। তোমরা এবার ফেরো।... যাও গদাধর।...

* * *

এর পর প্রভু সদলে উপস্থিত হন এসে যাজপুরে। শত শত লোক ছুটে আসে—মহাপ্রভুর সংবাদ পেয়ে তাঁকে দর্শন করতে।—'কই, কই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু কই?'—ব্যাকুল হয়ে ওঠে সকলের কণ্ঠ,—আগ্রহ-চঞ্চল দৃষ্টিতে তারা এদিক সেদিক চাইতে থাকে।

কৌতুকভরে মৃদু হেসে প্রভু বলেন,—'এই যে প্রভু কৃষ্ণচৈতন্য।'—তিনি দেখিয়ে দেন পার্শ্বস্থ পরমানন্দ পুরীকে।...পরমানন্দ পুরী দারুণ লজ্জায় ব্যগ্রকণ্ঠে বলে ওঠেন,—'না, না, আমি না, আমি না।—এই ইনিই মহাপ্রভু।'—তিনি আবার মহাপ্রভুকেই দেখিয়ে দেন।—দর্শকেরা বিভ্রান্ত হয়ে যায়,—কে কৃষ্ণচৈতন্য?—উভয়েরই পরমসুন্দর চেহারা,—উভয়েই সন্ন্যাসী। অবশেষে কয়েকজন হাস্যমুখে দ্রুত এগিয়ে এসে প্রণাম করেন প্রভুরই চরণে,—'চিনেছি চিনেছি—এই প্রভু কৃষ্ণচৈতন্য।'—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কলরব করে ওঠে তারা। পরম কৌতুকে ভক্তগণও হাসতে থাকেন সকলে।

ক্রমে ক্রমে সানুচর প্রভু এলেন উড়িষ্যা-সীমান্তে। এর পর গৌড়-রাজ্যের অধিকার। উড়িষ্যা হতে আর কোন পথেই লোক যাবার হুকুম নেই এখান থেকে। গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের কঠোর নির্দেশ! অবশ্য গৌড় আসতে জলপথই ছিল প্রশস্ত। প্রভুরও ইচ্ছা, নৌকা বেয়ে গঙ্গা দিয়ে যাবেন তিনি পাণিহাটি পর্যন্ত। কিন্তু সীমা-রক্ষক মুসলমান অধিকারীর আদেশ ভিন্ন উপায় নেই তার। বিশেষ তখন হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বও প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রায়ই যুদ্ধ হচ্ছে দুই পক্ষে।—সঙ্গে সঙ্গে রাজ-নির্দেশও হয়ে উঠেছে কঠোর থেকে কঠোরতর। ভক্তগণ ভাবতে লাগলেন সকলে।......

কিন্তু প্রভুর কথা শুনে সীমা-রক্ষক মুসলমান অধিকারীর অন্তর সহসা ভক্তিপ্লুত হয়ে উঠলো যেন কি যাদুমন্ত্রে! সে সানন্দে এসে প্রণাম করলো প্রভুকে। প্রভু সস্নেহে জগন্নাথের প্রসাদ দিলেন তাকে। মুসলমান হয়েও প্রসাদ ভক্ষণে কোন আপত্তি করলো না সে। প্রভুর হাতের প্রসাদ পেয়ে তার মন যেন আরও উদার হয়ে উঠলো। প্রভু ও তাঁর সহযাত্রীদের জন্যে সে একখানি সুবৃহৎ নূতন নৌকাও ঠিক করে দিলে। প্রফুল্ল অন্তরে 'হরি হরি' ধ্বনি

করতে করতে সকলে আরোহণ করলেন সে-নৌকায়—স্বচ্ছন্দে। নৌকা ছুটতে লাগলো গঙ্গার বুক দিয়ে তর তর করে।

৬৭

প্রভু পাণিহাটির ঘাটে এসে নৌকা থেকে তীরে নামতেই জানিনা, কেমন করে—কিভাবে সংবাদ পেয়ে হাজার হাজার লোক এসে জুটলো সেখানে,—চারিদিকেই শুধু হরি-ধ্বনি,—চারিদিকেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ রোল,—অনেকের মুখে 'জয় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর জয়।' দেখতে দেখতে লোকসংখ্যা বাড়তেই লাগলো। পাণিহাটিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে প্রভু আবার নৌকায় উঠলেন,—নৌকার গতির সঙ্গে সমতা রেখে নদীর তীর দিয়ে ছুটতে লাগলো অসংখ্য নর-নারী।

নৌকা এসে লাগলো কুমারহট্টের ঘাটে।...কুমারহট্টে শ্রীবাসের একখানি বাড়ী ছিল। এ সময় তিনি সপরিবারে বাস করছিলেন কুমারহট্টে; সংবাদ পেয়ে তিনি আকুল আনন্দে ছুটে এসে মহাপ্রভুকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়ী।... এখানেই আগে থাকতেন উদাসীন ভক্ত জগদানন্দ,—তিনি তদ্দণ্ডেই ছুটলেন কাঁচড়াপাড়া—শিবানন্দ সেনের কাছে—প্রভুর আগমনের সংবাদ দিতে। ফলে মহাপ্রভুর সম্বর্ধনার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শিবানন্দ। শীঘ্রই সমস্ত আয়োজনাদি করে তিনি এলেন কুমারহট্টে—প্রভুকে তাঁর বাড়ি নিয়ে যেতে।

ভক্তের আহ্বান! প্রভু সানন্দেই শ্রীবাসের কাছে বিদায় নিয়ে আবার নৌকায় উঠে নামলেন এসে কাঞ্চনপল্লীর ঘাটে। নেমেই দেখেন, পথের দু'পার্শ্ব কদলীবৃক্ষে, পূর্ণ কুম্ভ ও আম্রপল্লবে এবং পুষ্পলতা ও প্রদীপ-মালায় সুসজ্জিত করা হয়েছে।—ঘাট হতে শিবানন্দের বাড়ী পর্যন্ত সারাপথ মূল্যবান বস্ত্রে মণ্ডিত,—প্রভু যাবেন তার ওপর দিয়ে। প্রভু কৌতুক-হাস্যে চাইলেন শিবানন্দের দিকে,'—এ যে রাজ-সম্বর্ধনার ব্যবস্থা!

'আপনি যে রাজারও রাজা!'—শিবানন্দ উত্তর দিলেন বুকভরা গৌরবে,—'নইলে জগদানন্দ যে ছাড়ে না!'—মুখে ফুটলো তাঁর প্রীতির হাসি। এর পর

প্রভু গ্রামে ঢুকতেই পথের দু' পার্শ্বে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর-ঝাঁঝর বেজে উঠলো,—মহিলা-কণ্ঠের ঘন ঘন হুলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো চতুর্দিক। চারিদিক থেকে শুভ্রলাজ এবং রাশি রাশি পুষ্প বর্ষিত হতে লাগলো প্রভুর শিরে। ...এ-দিকে তখন জনতা বিপুল হয়ে উঠেছে,—পথচারীর পথ পাওয়াও মুস্কিল। চারিদিক থেকে উচ্চধ্বনি উঠছে,—জয় গৌরাঙ্গ প্রভুর জয়।.........

কাঁচড়াপাড়ায় আবার নৌকায় উঠে প্রভু এলেন শান্তিপুরে, মহাপ্রভুকে পেয়ে আনন্দের সীমা থাকলো না প্রভু অদ্বৈতাচার্যের,—কিন্তু মহাপ্রভু সেখানে বেশিক্ষণ না থেকে আবার নৌ-যাত্রা করে এলেন নবদ্বীপের এক অংশে বিদ্যানগরে বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতি মহাশয়ের বাড়ী। প্রভুকে পেয়ে যেন কৃতার্থ হলেন বাচস্পতি। প্রভু বললেন,—'আমি কয়েকদিন তোমার আশ্রয়ে একটু নির্জনে থাকতে চাই।'

'সে আমার পরম সৌভাগ্য।'—উত্তর দিলেন বাচস্পতি পরম পুলকে,—'আমি আপনাকে যথাসাধ্য নির্জনে রাখবার চেষ্টা করবো।'—বললেন বটে; কিন্তু তাঁর চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হয়ে গেল।...সূর্যোদয় হলে কে না বুঝতে পারে?—ফুল ফুটলে অলি আপনা থেকেই ছুটে আসে।...বাচস্পতির বাড়ীতে শ্রীগৌরাঙ্গ খুব সংগোপনে থাকলেও কেমন করে যে তাঁর আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে; দলে দলে হাজারে হাজারে লোক ছুটে আসতে লাগলো বাচস্পতির বাড়ী-মুখে।...বাচস্পতি দরজা বন্ধ করে দরজায় তিন-চারজন লোক মোতায়েন করেও আগ্রহী লোকদের নিবারণ করতে পারেন না,—'কই, গৌরাঙ্গদেব কই,—কই মহাপ্রভু কোথায়? আমরা কি প্রভুর দর্শন না পেয়েই ফিরে যাবো।'—ইত্যাদি রবে দর্শনেচ্ছু জনতা চীৎকার করতে থাকে।...প্রভু তখন কাউকে কিছু না বলে অনুচরদের সঙ্গে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে চলে যান—ফুলিয়ায়।

সঙ্গে সঙ্গে ফুলিয়াও লোকে-লোকারণ্য হয়ে ওঠে।—চারিদিকেই খোল-করতাল বেজে ওঠে,—'হরি হরি ধ্বনি এবং জয় গৌরাঙ্গদেবের জয়'—ইত্যাদি রবে গঙ্গাতীর থেকে ফুলিয়া গ্রামের সর্বত্র মুখরিত হয়ে ওঠে।...লোকে মুখের আহার ছেড়ে দিয়ে ব্যাকুলভাবে ছুটে আসে প্রভু-দর্শনে। ফুলিয়া ও নবদ্বীপের মধ্যে গঙ্গার প্রশস্ততা খুবই কম,—এ তীর থেকে ও-তীরের লোককে দেখা যায়।—নদীর বুকে অবিরত অসংখ্য নৌকা ছুটছে—নবদ্বীপ ভেঙে লোক আসছে ফুলিয়ায়—প্রভুকে দেখতে।...

কিন্তু প্রভুকে সন্ন্যাসের বিধি-অনুযায়ী একবার জন্মভূমিও দর্শন করতে হবে। তাই ফুলিয়া থেকে তিনি আবার ফিরে এলেন নদীয়ায়। সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের বুকে জেগে উঠলো বিপুল সাড়া,—লোক ছুটে এলো চারিদিক থেকে কাতারে কাতারে। ঘরে ঘরে আরম্ভ হলো সংকীর্তন,—আজ আর প্রভুর

বিদ্বেষী বলতে কেউ নেই; সকলেই মাথা নত করছে প্রভুর চরণে।—সেই পুণ্য-বিমল প্রশান্ত-সুন্দর নর-দেবতাকে দর্শন করে পুলকে রোমাঞ্চ জাগছে সকলের শরীরে।...যিনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন সমভাবে,—তিনিই কৃষ্ণ। প্রভুও সকলের চিত্ত আকর্ষণ করছেন একই ভাবে। এই অর্থে-ও তাঁকে কৃষ্ণ বলতে বাধে কোথায়?

পথের দু'ধারের প্রত্যেকটি বস্তু দেখতে দেখতে ধীর-মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়েছেন প্রভু মাতঙ্গের মত। দেখছেন প্রত্যেকটি বৃক্ষলতা, প্রত্যেকটি দেব-মন্দির, প্রত্যেকটি গৃহ,—এবং তার প্রতিটি লীলাস্থল! সমগ্র মন এবং দৃষ্টি-ভরেই যেন দেখছেন এ-জীবনের মত!...সহসা এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালেন;—দীনা মলিনবেশা পরমাসুন্দরী এক যুবতী পড়ে রয়েছেন পথের মাঝে উপুড় হয়ে—আলুলায়িত কুন্তল ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর পৃষ্ঠদেশে,—তাঁকে অতিক্রম না করলে পথ পাওয়া কঠিন। চমকে উঠে প্রভু এক পা পিছিয়ে গেলেন,—'কে. কে তুমি কল্যাণী, কি চাও?'

যুবতী ঈষৎ মাথা তুলে চাইলেন প্রভুর চরণের দিকে, আনত চোখে,—দুটি গণ্ড ভেসে যাচ্ছে অশ্রুধারায়—শুভ্র-সুন্দর মুখখানি কি-যেন বেদনার ভারে—তাপ-দগ্ধ পুষ্পের মতই ম্লান হয়ে উঠেছে,—'আমি দাসী বিষ্ণুপ্রিয়া!'—বাষ্পা-কুল মৃদুকণ্ঠে ধ্বনিত হলো তাঁর!—চমকে উঠলেন সকলে সে-নাম শুনে,—সকলের চোখ ভরে এলো জলে,—হৃদয়ের মধ্যে জাগলো সুনিবিড় ব্যথার আলো-ড়ন। প্রভু কিছুক্ষণ স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থেকে বললেন,—'কি প্রার্থনা তোমার?'

'প্রভু',—কেঁপে উঠলো বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বর,—'জগৎ উদ্ধার হয়ে গেল ওই পুণ্য চরণের করুণা পেয়েঃ শুধু বিষ্ণুপ্রিয়াই বাকী থাকলো!'

প্রভু মাথা নত করে কি যেন ভেবে বললেন,—'তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া, এখন কৃষ্ণ-প্রিয়া হও। তোমার নাম সার্থক কর।'

'কিন্তু আমি যে তোমাকে ছেড়ে কৃষ্ণকে ভাবতে পরি না প্রভু!'—রোদনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বর,—'আমার কৃষ্ণ, বিষ্ণু সবই যে তুমি।'

প্রভু আবার কিছুক্ষণ ভাবলেন নীরবে।—'হে সাধ্বী,'—তাঁরও কণ্ঠে তখন যেন বাষ্প এসে জমেছে,—'আমি সন্ন্যাসী, আমার দেবার তো আর কিছু নেই। আমার এই খড়ম নিয়ে গিয়ে পুজো কর,—মনে শান্তি পাবে।' পা থেকে খড়ম দুটি খুলে দিলেন প্রভু। সাগ্রহে দু' হাত বাড়িয়ে সে-খড়ম মাথায় তুলে নিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।...দুই গণ্ড আবার ভেসে গেল তাঁর জলে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রভুকে প্রণাম করে উঠে গেলেন সেখান থেকে ধীরে ধীরে। পেছনে ধ্বনি উঠলো,—'জয় শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার জয়!'—প্রভুর চোখে ও-কি?—জল?

৬৮

অতঃপর ভক্ত শ্রীনরহরির নিবাস শ্রীখণ্ড দিয়ে প্রভু এলেন অগ্রদ্বীপে। নরহরি ঠাকুরই নাকি গৌরাঙ্গ-লীলার পদ প্রথম রচনা করেন। সেদিন অগ্রদ্বীপে ভিক্ষা করে মুখশুদ্ধি চাইলেন প্রভু। ভক্ত গোবিন্দ ঘোষ নিকটে ছিলেন,—তিনি ছুটলেন পাড়ায়,—এবং এক ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে একটি হরীতকী চেয়ে এনে তার কিছুটা কেটে দিলেন প্রভুর হাতে।...পরদিন ভিক্ষার পর প্রভু আবার মুখশুদ্ধি চাইলেন,—গোবিন্দই তখন গত কালের বাকী হরীতকী খণ্ডটুকু দিলেন প্রভুর হাতে। সাশ্চর্যে চাইলেন প্রভু গোবিন্দর মুখের দিকে,—'গোবিন্দ, কাল যখন মুখশুদ্ধি চাইলাম, তখন দিতে তোমার অনেক দেরি হয়েছিল, কিন্তু আজ চাইবামাত্র দিলে কেমন করে?

সরল গোবিন্দ বললেন মৃদু হেসে,—কালকার হরীতকীরই একটু রেখে দিয়েছিলাম প্রভু। সেইটুকুই আজ দিয়েছি।

'বটে!'—প্রভু হাসলেন,—কিন্তু সে-হাসি করুণার নয়,—যেন-কি বিরূপতার,—'গোবিন্দ, তোমার সঞ্চয়-প্রবৃত্তি এখনো যায়নি,—তুমি আর আমার সঙ্গে যেতে পারবে না।'

মাথায় যেন বজ্র খসে পড়লো গোবিন্দের!...এ-কি নিদারুণ কথা?—সরলপ্রাণ মানুষ। নিতান্ত সরলমনেই রেখেছিলেন হরীতকী খণ্ডটুকু,—প্রভুরই জন্যে।—কিন্তু প্রভু যে এতেই তাঁর ওপর বিরূপ হয়ে উঠবেন,—এমন কল্পনাও করতে পারেননি তিনি। কেঁদে পড়লেন তিনি মহাপ্রভুর পায়ে,—'প্রভু, প্রভু, অপরাধ ক্ষমা করুন। না বুঝে অন্যায় করে ফেলেছি!'

'আশ্বস্ত হও গোবিন্দ,'—প্রভু এবার কৃপানেত্রেই তাঁর দিকে চেয়ে বললেন,—'আমি বেশ জানি, তোমার অন্তর নির্মল। তুমি দুঃখিত হয়ো না। এখানেই থাক। আমি তোমাকে দিয়ে আমার কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করবো। আমি শীঘ্রই একদিন ফিরে এসে তোমার কর্তব্য নির্দেশ করে দেব।'

গোবিন্দ আর কি করেন?—প্রভুর কথার ওপর বেশি কথা কইবার সাহস তাঁর নেই,—তিনি সেইখানেই গঙ্গাতীরে কুটির বেঁধে বাস করতে লাগলেন।...

এর পর ভক্তজনসহ প্রভু অগ্রসর হয়ে এলেন রাজধানী গৌড়ের প্রান্তে।—গঙ্গার তীর ধরে নগরের পাশ দিয়ে চলেছেন তিনি—বিপুল জনতা তাঁকে অনুসরণ করেছে,—চারিদিক থেকেও ছুটে আসছে অগণিত লোক তাঁর দর্শনে। মহাকলরবে ভরে উঠছে সুদূর আকাশ-বাতাস। সমবেত গণ-কণ্ঠে উঠছে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি!—প্রভু চলেছেন আপন প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে,—অভ্রভেদী কোলাহলও তাঁর রসভঙ্গ করতে পারছে না; চারিহস্তাধিক দীর্ঘ দেহ তাঁর,—বিপুল জনতার মাঝেও তাঁকে দেখা যাচ্ছে তাই সুস্পষ্টভাবে। সহসা তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়লো সুউচ্চ প্রাসাদস্থিত গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের।—'কে এই ব্যক্তি?...কোথা হতে যাচ্ছেন কোথায়?...কেনই বা এত লোক অনুসরণ করছে তাঁকে?'—প্রশ্ন জাগলো রাজার মনে। কৌতূহলী হয়ে তিনি তন্দণ্ডেই ডেকে পাঠালেন মন্ত্রী কেশব ছত্রীকে।

অবিলম্বে কুর্ণিশ করে এসে বাদশার সম্মুখে দাঁড়ালেন কেশব ছত্রী,—জাঁহাপনা আদেশ করুন।

প্রভু ও জনতার দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করে বললেন রাজা,—'জান, উনি কে?'—কেশব সবই জানতেন, কিন্তু প্রভুর আসল পরিচয় এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা শুনলে মুসলমান নরপতি পাছে ঈর্ষাবশে প্রভুর কোন অনিষ্ট করেন,—এই সন্দেহে তিনি বললেন,—'এমন কেউ নয় জাঁহাপনা,—একজন সামান্য সন্ন্যাসী গুটিকতক চেলা নিয়ে তীর্থে যাচ্ছেন,—হুজুগে লোক ছুটে এসেছে!

ছত্রীর কথা কিন্তু মন দিয়ে মেনে নিতে পারলেন না বিচক্ষণ নরপতি হোসেন শাহ।...সামান্য একজন সন্ন্যাসীর পেছনে এত লোক! তাঁর এত প্রভাব! রাজা সন্দেহবশে আবার ডেকে পাঠালেন অন্যতম দুই সচিব—দবির খাস এবং সাকর মল্লিককে।—এবং তাঁরা এলে ওই একই প্রশ্ন করলেন তাঁদের সাগ্রহে।

দুজনেই বললেন শ্রদ্ধা-পূরিত মুক্তকণ্ঠে,—'জনাব, এ-সন্ন্যাসী নর-রূপী নারায়ণ,—আপনারা যাঁকে আরাধনা করেন 'মহান আল্লা' বলে,—আমাদের কাছে ইনিই সেই পরম পিতা।...আপনি রাজা,—কিন্তু ইনি রাজারও রাজা।'

উদারমনা বাদশাহ কোন উষ্মা প্রকাশ করলেন না,—তাঁর রাজদম্ভে কোন আঘাতও লাগলো না মন্ত্রীদের কথায়।—ওই মহান বিপুল দৃশ্যের দিকে চেয়ে চেয়ে তিনিও তখন ভাব-বিহ্বল হয়ে উঠেছেন। বললেন অকুণ্ঠিত কণ্ঠেই,—'আমারও তেমনি কোন অলৌকিক শক্তিধর বলে মনে হয় ওঁকে। আমি রাজা—লক্ষ লক্ষ লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা,—আমার অধীনে কত সৈন্য-সেপাই, কত অসংখ্য লোক কাজ করছে,—কিন্তু আমি যদি দুদিন কাউকে বেতন না দিই—

কেউ আমাকে মানতে চাইবে না,—উপরন্তু বিদ্রোহ করবে আমার বিরুদ্ধে। আর এই সন্ন্যাসী, নিঃসম্বল কপর্দকহীন,—শাসনদণ্ডও নেই এ'র হাতে,—কাউকে এক কপর্দক দেবার ক্ষমতাও এ'র নেই,—তবু এত লোক এ'র জয়গান করে পিছু পিছু ফিরছে—আহার-নিদ্রা ভুলে! ঈশ্বর-শক্তি ভিন্ন কি এমনটি সম্ভব?'

'জনাব মহানুভব!'—দবির উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন,—'তাই নিঃসন্দেহে বুঝেছেন মহতের মহিমা।'

'শোন সাকর মল্লিক,'—শ্রদ্ধার সুর বেজে ওঠে রাজার কণ্ঠে,—'এই সন্ন্যাসী স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করবেন আমার রাজ্যে। তোমরা ঘোষণা করে দাও,—যেন কেউ কোনভাবে এ'র অসম্মান না করে। এ'র কাজে বাধা না দেয়।'

'জাঁহাপনার জয় হোক'—মাথা নত করলেন সাকর মল্লিক।...

এই দবির খাস এবং সাকর মল্লিক দুই সহোদর ভাই। এ'রা ব্রাহ্মণ-সন্তান,—এ'দের পিতৃদত্ত নাম সন্তোষ এবং অমর। নিবাস ছিল এ'দের দাক্ষিণাত্যে,—কিন্তু সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে আসেন বাংলায়। পরে গৌড়েশ্বরের অধীনে চাকরী করে স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধি-বলে লাভ করেন অসাধারণ উন্নতি—উচ্চপদ—প্রভূত প্রভাব-প্রতিপত্তি।...এমন কি এ'দের দু' ভাইকে গৌড়রাজ্যের কর্ণধার বললেও অত্যুক্তি হয় না।

হোসেন শাহ-ই এ'দের অভিহিত করেন মুসলমানী নামে। এবং বাহ্য-আচার-আচরণে এ'রা প্রায় মুসনমানই হয়ে দাঁড়ান।—রাজার ইঙ্গিতে শাসন-ছলে এ'রা হিন্দুদের ওপর বহু অত্যাচার—দারুণ পীড়ন করেছেন,—এবং ধন-সম্পদ ও রাজ-সম্মান লাভের আশায় এ'রা হিন্দু-ধর্ম-বিগর্হিত বহু অপকর্ম করতেও দ্বিধা করেননি।...কিন্তু আশ্চর্য যে,—অন্তরে অন্তরে এ'রা ছিলেন পুরো হিন্দু।—অপকর্মও যেমন করতেন, তেমনি আবার সৎকর্মেও অর্থ-ব্যয় করতেন প্রচুর।...ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের এ'রা ছিলেন পৃষ্ঠপোষক,—প্রতিপালক,—বৈষ্ণব-সজ্জনও এ'দের কাছে লাভ করতেন প্রভূত সমাদর—অকুণ্ঠ সাহায্য।...অন্যদিকে মুসলমান-সমাজেও এ'দের খাতির প্রতিপত্তি ছিল অসীম।...দুদিক মিলে শাসন-ক্ষমতায় এ'রাই যেন ছিলেন দ্বিতীয় হোসেন শাহ।

মহাপ্রভুর প্রতি এ'দের অন্তরে অনুরাগ জাগে বহুপূর্বেই,—তাঁর মহা-প্রকাশের পর এ'রা বারবার পত্র লিখতেন তাঁকে সকাতরে এবং সংগোপনে;—কিন্তু প্রভু কোন উত্তর দিতেন না। শুধু পার্ষদদের কাছে একদিন এ'দের তুলনা করেছিলেন কুলটা নারীর সঙ্গে।—'কুলটা' যেমন বাহ্যতঃ স্বামীর

সংসারে সবই করে,—কিন্তু মন থাকে তার উপপতির দিকে,—তেমনি এ'রা দু'ভাইও রাজকার্য করছে,—অথচ মন আছে এ'দের পরমার্থের দিকে। কৃষ্ণ-প্রেমাকুল ভক্তের দশাও ঠিক তাই,—যেমন শ্রীমতী রাধা।...আয়ান ঘোষের সংসারে সবই করছেন—কিন্তু কান আছে কানাইয়ের বাঁশীর দিকে,—মন আছে যমুনা-কুলে কদম্ব-মূলে!

সেই দবির খাস এবং সাকর মল্লিক!—আর প্রভুও এসেছেন এত নিকটে। সুতরাং তাঁরা এই সুবর্ণ সুযোগ আর ছাড়লেন না। খুব সন্তর্পণে সংগোপনে—রাত্রিকালে দীনবেশে এসে দাঁড়ালেন প্রভু যে-বাড়ীতে রাত্রি-যাপন করছিলেন,—তার দ্বারে। নিত্যানন্দ ছিলেন সেখানে। দু ভাই তাঁর শরণ নিলেন মহা-প্রভুর চরণে আশ্রয়ের আশায়।—বিষয় তাঁদের কাছে এখন 'বিষ' হয়ে উঠেছে, প্রভু যদি তাঁদের মত নরাধম পাপীদের করুণা করেন,—তাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করে কৌপীন পরে প্রভুর চরণসেবা করবেন। নিত্যানন্দ তাঁদের কাতর আকুলতায় বিচলিত হয়ে নিয়ে গেলেন তাঁদের প্রভুর কাছে।

দু' ভাই গলবস্ত্র হয়ে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন প্রভুর সম্মুখে,—প্রভু, প্রভু, জীবনে আমরা বহু পাপ করেছি,—এবার আমাদের উদ্ধার করুন।—চোখ দিয়ে তাঁদের জল ঝরে পড়লো দর-বিগলিত ধারে।

করুণার্দ্র নেত্রে প্রভু চাইলেন তাঁদের দিকে। অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন. প্রভূত ঐশ্বর্যশালী রাজ-মন্ত্রী তাঁরা। তাঁদের এই আর্তি—এই দীনতা—এই পর-মার্থিক আকুলতায় বিশেষ প্রীত হলেন প্রভু;—তাঁদের পত্রোল্লিখিত কাতর আবেদনের কথাও মনে পড়লো তাঁর।...বললেন মধুর প্রশান্ত স্বরে,—দবির, সাকর, তোমরা আশ্বস্ত হও। নিশ্চিন্ত থাক। অচিরে তোমরা কৃষ্ণের কৃপা লাভ করবে। তোমাদের মনের কথা আমি জানি। আজ থেকে আমি তোমাদের নাম রাখলাম,—রূপ-সনাতন।

'জয় মহাপ্রভুর জয়!'—সকলে সোল্লাসে ধ্বনি করে উঠলো সমবেত কণ্ঠে।... অতঃপর দবির হলেন—রূপ,—আর সাকর—সনাতন।—প্রভুর করুণা পেয়ে—তাঁদের চোখে ঝরলো পুলকাশ্রু,—অন্তরে বৈরাগ্যের আগুন জ্বলে উঠলো চতু-র্গুণ তেজে।...বিদায়-কালে সনাতন বললেন প্রভুকে,—প্রভু, গৌড়-সন্নিকটে আপনার আর না-থাকাই ভাল। আপনি স্বয়ং ভগবান, আপনার অবশ্য কোন চিন্তা নেই। কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র জীব,—আমাদের তো চিন্তা যায় না! তা ছাড়া, এত লোক সঙ্গে বৃন্দাবন গেলেও আপনি আনন্দ পাবেন না।

প্রভু মৃদু হাসলেন। কিন্তু সনাতন বিচক্ষণ রাজ-মন্ত্রী, কূটনীতিজ্ঞ; তাঁর যুক্তির মধ্যে অবশ্যই কিছু সারবত্তা আছে। প্রভু সরল বিশ্বাসেই তাই মেনে নিলেন তাঁর কথা।—নিজেও বুঝে দেখলেন,—বৃন্দাবন শ্রীভগবানের অতি পবিত্র

গুপ্ত লীলাস্থল,—সে অপূর্ব লীলারসের আস্বাদ পেতে হলে কোলাহল তুলে না যাওয়াই সমীচীন। অথচ অসংখ্য জন তাঁর বৃন্দাবন-পথের সঙ্গী হতে চাইছে! গৌড়-সান্নিধ্যে অবশ্য তাঁর বেশিদিন থাকার সময় নেই,—তা সনাতন যে-কারণেই হোক, তাঁকে সতর্ক করুন;—কিন্তু এদের সকলকে বিদায় দিয়ে প্রথমে তাঁর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করাই উচিত। সেখান থেকে দু-একজন মাত্র সঙ্গী নিয়েই বৃন্দাবন যাওয়া ভাল।

অতঃপর সঙ্গের লোকদের তিনি একে একে বিদায় দিতে লাগলেন এবং শীঘ্রই একদিন এসে উপস্থিত হলেন শান্তিপুর—অদ্বৈতাচার্যের বাড়ী। মহাপ্রভুকে পেয়ে মহোৎসব পড়ে গেল আচার্যের গৃহে। সমগ্র শান্তিপুর মেতে উঠলো,—নাম-সংকীর্তনে। নানাদিক থেকে আগ্রহী-উৎসাহী জনতা প্রভুর দর্শন লালসায় ছুটে আসতে লাগলো শান্তিপুরে। গৌড়ীয় ভক্তগণের কেউই আর বাকী থাকলেন না সেখানে আসতে।...প্রভু নবদ্বীপে সংবাদ পাঠালেন জননীর কাছে। উদ্দেশ্য—মায়ের স্নেহচ্ছায়াতলে কয়েকদিন থাকবেন আচার্যের গৃহে। পূর্ব থেকে সে কামনা ছিল বলেই নবদ্বীপে গিয়ে জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার চেষ্টা করেননি প্রভু। অল্পক্ষণের সাহচার্যে প্রাণ কি পরিতৃপ্ত হতো তাঁর? শচীদেবীও পেয়েছিলেন সে-খবর!

*　　　*　　　*

এখন সংবাদ পেয়েই শচী এলেন দোলায় করে শান্তিপুরে। কতদিন পরে দেখবেন তাঁর প্রাণের প্রাণ নিমাইকে,—অন্তর তাঁর উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে আনন্দাবেগে,—স্নেহ-প্রীতি-মমতার অজস্র ধারায়। তিনি যেমনি নামলেন দোলা থেকে—অমনি তাঁর নিমাই দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন তাঁর চরণপ্রান্তে; তার পর ধীরে ধীরে মাকে প্রদক্ষিণ করতে করতে বললেন,—'তুমি যশোদা, তুমি দেবকী, তুমি স্নেহময়ী বিশ্বজননী,—আমার এ-দেহ তোমার,—তুমি এক পলকে আমার জন্য যা করেছ,—আমি জন্মে জন্মেও তার ঋণ শোধ করতে পারবো না। আমি তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি।'

হতবাক—আত্মহারা হয়ে চেয়ে আছেন শচীদেবী জ্যোতির্মণ্ডিত-দেহ সন্ন্যাসী পুত্রের দিকে!...প্রভুর দেহ থেকে পদ্মের মত একটি সুমিষ্ট গন্ধ বার হতো,—শচীর সমগ্র প্রাণ আমোদিত হয়ে উঠছে সেই পুণ্য মৃদু সৌরভে। মুখে তাঁর কথাও ফুটছেনা বিহ্বলতায়।...অনেক ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে তিনি বললেন,—নিমাই, তুমি আমাকে প্রণাম কর, আমার যেন কেমন কুণ্ঠালাগে!

'সে-কি মা?'—নিমাই ব্যগ্রকণ্ঠে বলে ওঠেন,—'তোমার চরণ যে আমার পরমতীর্থ!...তোমার পদধূলি যে আমার চন্দন-রেণু।...মা, আমি

কাঙ্গাল,—যদি কিছু কৃষ্ণভক্তি আমার হয়ে থাকে,—তা সে তোমার ওই চরণের কৃপাতেই হয়েছে। বার বার প্রণাম করলেন তিনি মাকে।

শচীর অন্তরে আনন্দ উথলে উঠলো,—কে বলে সন্ন্যাসীরা মাকে 'মা' বলে না,—আমার নিমাই তো আমারই নিমাই আছে!—'প্রাণের ব্যথা-বেদনা যেন জুড়িয়ে গেল তাঁর,—সেই মুহূর্তেই তিনি চলে গেলেন আচার্যের বাড়ীর অভ্যন্তরে।—সীতাদেবী তাঁকে আপ্যায়ন করলেন পরম আদরে,—গদ্‌গদকণ্ঠে তিনি বললেন সীতাঠাকুরাণীকে,—বোন, নিমাই যে কদিন থাকবে,—আমিই তার জন্যে রান্না করবো। নিজে হাতে আমি খাওয়াবো নিমাইকে। আবার জীবনে এ-দিন কি আসবে?—সহসা বাষ্প জমে উঠলো তাঁর কণ্ঠে। সানন্দেই সীতাঠাকুরাণী রন্ধনের যাবতীয় ভার তুলে দিলেন তাঁর হাতে।...

কয়েকদিন শচীদেবী মনের সাধ মিটিয়ে খাওয়ালেন তাঁর ছেলেকে নিজে কাছে বসে। প্রভুর প্রসাদ নিয়ে অদ্বৈতাচার্যের বাড়ীতে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ভক্তদের মধ্যে।...ভক্তদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য-শূদ্র ইত্যাদি সবই আছে,—কিন্তু প্রভুর ভক্তদের জাতিবিচার তো নেই,—যিনি যাঁর হাত থেকেই পেলেন,—প্রসাদ গ্রহণ করলেন অম্লান বদনে।—সে যেন জগন্নাথ-ক্ষেত্র!

এখানে থাকতে প্রভু একদিন গেলেন ভক্ত গৌরীদাসের বাড়ী কালনায়। তারপর সদলে এসে পড়লেন আবার অগ্রদ্বীপে, গোবিন্দ ঘোষের কাছে। গোবিন্দ পরম কৃতার্থ হয়ে সানুচর প্রভুর ভিক্ষার আয়োজন করলেন গ্রামবাসীদের সাহায্যে। প্রভু ভাস্কর দিয়ে কৃষ্ণপ্রস্তরের এক গোপীনাথ মূর্তি নির্মাণ করালেন এখানে,—এবং যথারীতি স্বহস্তে গোবিন্দের গৃহে সে-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে বললেন গোবিন্দকে,—গোবিন্দ, তুমি এই গোপীনাথের সেবা কর। তাহলেই কৃষ্ণের কৃপা লাভ করবে,—আমার বিরহ-তাপও ভুলতে পারবে।"

প্রভুর নির্দেশমত সেই থেকেই গোবিন্দ বাৎসল্য-ভাবে গোপীনাথের সেবা করতে লাগলেন। এই বিগ্রহই 'অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ।'...

অগ্রদ্বীপ থেকে প্রভু পুনরায় শান্তিপুরে ফিরলেন। সহসা সপ্তগ্রাম থেকে এক বালক এসে প্রভুর চরণ-তলে পড়লো নতজানু যুক্তকরে,—"প্রভু, সংসার আমার ভাল লাগেনা, আমাকে আপনার চরণে স্থান দিন। আমি আপনার সঙ্গে যাবো।

বালকের নাম রঘুনাথ,—সে সপ্তগ্রামের জমিদার বিশিষ্ট ধনী গোবর্দ্ধনের পুত্র,—জাতিতে কায়স্থ।...প্রভু তাঁর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন,—বৎস, তুমি এখন বাড়ী ফিরে যাও। হঠাৎ সাধু হওয়া যায় না। তার জন্যে সাধনা করতে হয়। নিষ্ঠা জাগিয়ে তুলতে হয় অন্তরে। কপট বৈরাগ্যের কোন মূল্য নেই। সংসারে থেকে যথাসাধ্য অনাবিষ্ট হয়ে বিষয় ভোগ কর,—

কিন্তু তার মোহে ডুবে যেওনা। ভবিষ্যতে মন স্থির হলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।—তুমি কৃষ্ণের কৃপা লাভ করবে।

প্রভুর উপদেশে রঘুনাথ ফিরে গেল বাড়ি, এবং চলতে লাগলো তাঁরই নির্দেশ মত নিষ্ঠাভরে।...

শান্তিপুর থেকে বিদায়-কালীন জননীকে প্রণাম করে প্রভু বললেন,—মা, আমাকে বৃন্দাবন যাবার অনুমতি দাও। তুমি স্বচ্ছন্দে অনুমতি না দিলে আমার আশা বিফল হবে। বারবার চেষ্টা করেও আমার বৃন্দাবন যাওয়া হয়ে উঠছে না।

'নিমাই, তোমার আশা পূর্ণ হোক।'—মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করে শচীদেবী কাতর নেত্রে চাইলেন পুত্রের মুখের দিকে,—চোখ দুটি তখন জলে ভরে এসেছে. —মায়ের মুখের দিকে চেয়ে নিমাইয়েরও চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। শচীর সমগ্র প্রাণ কেঁদে উঠলো,—হায় এ-জীবনের মত এই বুঝি শেষ দেখা।...

শান্তিপুর থেকে অদ্বৈতচার্য ও নিত্যানন্দের কাছেও বিদায় নিলেন প্রভু; এলেন কুমারহট্টে, শ্রীবাসের বাড়ী,—শ্রীবাস সপরিবারে প্রভুকে প্রণাম করে তাঁর ভিক্ষার আয়োজন করলেন।...ভিক্ষার পর প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন,—'শ্রীবাস, তোমার তো বড় সংসার অথচ আয় তেমন নেই, দিন নির্বাহ হচ্ছে তো কোন রকমে ?"

শ্রীবাস মৃদু হেসে বললেন,—'প্রভু, একদিন, দুদিন, তিন দিন পর্যন্ত উপবাস দেব,—তবু যদি ভগবান অন্ন না দেন,—তখন গঙ্গার আশ্রয়।'—কোন বিকার-চিহ্ন ফুটলো না শ্রীবাসের মুখে!

'এত বিশ্বাস তোমার ভগবানে!'—প্রগাঢ় কণ্ঠে বল্লেন প্রভু,— 'শোন শ্রীবাস, আমি তোমাকে বর দিচ্ছি,—স্বয়ং লক্ষ্মীও যদি উপবাস করেন, তোমার সংসারে তবু কোনদিন অন্নকষ্ট হবে না।"

উচ্ছ্বসিত ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে শ্রীবাস প্রণাম করলেন প্রভুকে। এখান থেকে প্রভু এলেন তাঁর মেসো চন্দ্রশেখরের বাড়ী। মেসো-মাসী উভয়েই পরম আনন্দিত হলেন তাঁকে পেয়ে। প্রভু তাঁদের ছেলের মত। সুতরাং বাড়ীর মধ্যেই গেলেন। সেখানে একটি সুন্দরী যুবতী এসে প্রণাম করলো প্রভুকে। যুবতী সধবা। প্রভু তাকে আশীর্বাদ করলেন,—মা, তুমি পুত্রবতী হও।

যুবতী কিন্তু কেঁদে উঠলো। প্রভু দারুণ দ্বিধায় এবং কুণ্ঠায় পড়ে চাইলেন তাঁর মাসীর দিকে,—'কেন, কিছু দোষ করে ফেললাম না-কি ?

মাসী বললেন,—ওর স্বামী ভগবান আচার্য। সে তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না; স্ত্রীকে পরের বাড়ি ফেলে দিয়ে পড়ে আছে তোমার কাছে নীলাচলে।'

'বটে।—প্রভু মাথা নত করে কি যেন ভাবলেন,—তার পর সহসা দৃঢ় কণ্ঠে

বলে উঠলেন,—'আমার কথা মিথ্যা হবে না!'—যুবতীর দিকে চেয়ে বললেন, মা, তুমি নিশ্চয়ই পুত্রবতী হবে।—যুবতী আবার ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো প্রভুকে।...

৬৯

'গদাধর, তোমার মনে দুঃখ দিয়ে গেলাম, তাই বুঝি আমার মনস্কাম পূর্ণ হলো না।'—মৃদুহাস্যে বললেন মহাপ্রভু গদাধরকে,—'কই বৃন্দাবন যাওয়া তো হলো না আমার!'

'প্রভু.—কৃতার্থ গদাধর উত্তর দিলেন পরম প্রীতিতে,—'বৃন্দাবন আর কোথায়? —যেখানে তুমি, সেখানেই বৃন্দাবন।—এ-সব শুধু তোমার লোকশিক্ষা মাত্র।... যা হোক, এখন তো সামনে আবার চার মাস বর্ষা পড়ে যাচ্ছে,—বর্ষাটা বাদ দিয়েই তুমি বৃন্দাবন যাত্রা করবে,—আর আমরা কেউ তোমায় আটকাবো না।'

আজ কয়েকদিন হলো, প্রভু সদলে ফিরেছেন গৌড় থেকে নীলাচলে। আবার বিপুল সাড়া পড়ে গেছে নীলাচলে প্রভুর প্রত্যাবর্তনে। রামানন্দ, সার্বভৌম, মহারাজা প্রভৃতি ভক্তগণের বিষণ্ন মুখে আবার ফুটেছে পরিতৃপ্তির সুনির্মল হাসি।...প্রভুর বিরহে কি দুঃখেই না দিন কেটেছে তাঁদের।..:প্রভু যেন অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনে বেঁধে ফেলেছেন সকলকে; প্রাণ থাকতে সে বন্ধন ছেদন করবে কে? ...কিন্তু প্রভুর মনে সুখ নেই,—সনাতনের পরামর্শের সমীচীনতা বুঝে উপস্থিত তিনি বৃন্দাবন-যাত্রা স্থগিত রেখেছেন বটে,—কিন্তু তাঁর বিরহী অন্তর কেঁদে উঠছে শুধু—বৃন্দাবন-বৃন্দাবন ব'লে।...যার সঙ্গে দেখা হয়,—তাঁরই সঙ্গে ওই এক বৃন্দাবনেরই কথা।...মহারাজা, সার্বভৌম প্রভৃতি ভক্তগণ যখন প্রণাম করতে এলেন—তখনও তাঁদের সম্ভাষণ করলেন ওই বৃন্দাবনের কথা বলেই।...

গদাধর আজ ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করেছিলেন প্রভুকে,—ভিক্ষা করতে গিয়ে তাঁরও সঙ্গে—ঐ বৃন্দাবনেরই কথা।—প্রভুর হাবেভাবে কথাবার্তায়—কারো বুঝতে বাকী থাকলো না যে,—বৃন্দাবন-বিরহে প্রভু আকুল হয়ে উঠেছেন।...

ভিক্ষা করে প্রভু ফিরে আসছেন,—গদাধর আসছেন পিছু পিছু,—সহসা

পথে ভগবান আচার্য প্রণাম করলেন মহাপ্রভুকে।—তাঁকে দেখেই গর্জে উঠলেন মহাপ্রভু.—'তোমার লজ্জা করেনা, যুবতী-স্ত্রীকে—পরের ঘরে ফেলে দিয়ে—তার রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা না করে—আমার কাছে এসে পড়ে থাকতে ?—আমি সন্ন্যাসী হয়েছি বলে কি—তোমরা সব্বাই সন্ন্যাসী হবে না-কি ?—সন্ন্যাস-ধর্ম এতই সহজ ?...যাও, কালই তুমি ফিরে যাও দেশে,—স্ত্রীকে ঘরে এনে যথোচিত গার্হস্থধর্ম্ম পালন কর। তোমার পুত্র হলে তুমি আবার না-হয় আমার কাছে আসবে।

এই ভগবান আচার্যের স্ত্রীকেই কুমারহট্টে পুত্রবর দিয়ে এসেছেন প্রভু,—মনে আছে তাঁর সে কথা,—মনে আছে,—ভগবানের স্ত্রীর সেই উচ্ছ্বসিত আকুল রোদন!—ভগবান প্রভুর কথা ঠেলতে পারলেন না,—তার পরদিনই প্রভুর আশীর্বাদ নিয়ে ধরলেন গৌড়ের পথ।

কিন্তু দিন যত যায়,—প্রভু বৃন্দাবনের জন্য ততই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।... এমনকি বর্ষাটাও যেন আর তিনি পার করতে পারছেন না।...কিন্তু বর্ষাকালে বৃন্দাবনের দুর্গম পথে যাত্রা করাও তো মুস্কিল! তাই প্রভুকে অপেক্ষা করতেই হলো—বর্ষা কয়েক মাস। কিন্তু বর্ষার পরই একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠলেন। স্বরূপ দামোদরকে ডেকে বললেন,—স্বরূপ, আমি মিনতি করছি, তোমরা আমার বৃন্দাবন যাত্রার ব্যবস্থা করে দাও। আমি আর মুহূর্তও স্থির থাকতে পারছি না।

—প্রভুর দুইচোখে জল টলটল করে উঠলো।—স্থির যে তিনি থাকতে পারছেন না,—এবং আর পারবেনও না,—এ কথা স্বরূপ পূর্বেই বুঝেছিলেন। তিনি রামানন্দ প্রভৃতি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার ব্যবস্থা করে ফেললেন অচিরে।...

বলভদ্র ভট্টাচার্য নামে এক তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণ এসেছিলেন তখন নীলচলে,—তাঁর সঙ্গে একজন ভৃত্যও ছিল।...তিনিও ছিলেন বৃন্দাবন-যাত্রার অভিলাষী,—সুতরাং প্রভুর সান্নিধ্যের লোভে তিনি প্রভুকে নিয়ে বৃন্দাবন যেতে সানন্দেই সম্মত হলেন।...অতঃপর আবার সেই শুভ বিজয়া-দশমীর দিন—প্রভু নীলাচল ত্যাগ করলেন বৃন্দাবনের উদ্দেশে।...কিন্তু বলভদ্রের সঙ্গে তাঁর একটা সর্ত হলো,—তিনি আপনমনেই পথ চলবেন,—পথে কেউ যেন তাঁর সঙ্গে বেশি কথাবার্তা কইবার চেষ্টা না করে।

মৃদু হেসে বলভদ্র বললেন,—'তাই হবে প্রভু।'—

অবিলম্বেই তাঁরা অগ্রসর হলেন কটক ছাড়িয়ে ঝারিখণ্ডের পথে। হিংস্র-জন্তু-সমাকুল দুর্গম সে বন-পথ,—এ-পথে লোক-চলাচল একেবারে নেই;... ক্রমে তাঁরা প্রবেশ করলেন নিবিড় বনে। পথ আরও দুর্গম হয়ে উঠলো,—

ঘন বৃক্ষ-লতা-গুল্মের মধ্যে মাঝে মাঝে পথ পাওয়াও যায় না,—আবার ঘুরে যেতে হয় অন্য দিক দিয়ে।...চারিদিক থেকে জন্তু-জানোয়ারের গর্জনের শব্দ ভেসে আসে কানে,—বুক ছম্ ছম করে ওঠে বলভদ্রের,—কেঁপে ওঠে তাঁর ভৃত্যের। কিন্তু প্রভুর কোনদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। চলেছেন তিনি আপন মনে,—মুখে,—'কাঁহা জীবন-ধন, বৃন্দাবন-প্রাণ,'—চোখে ভাসছে রাখাল-বেশী বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি!

বনের ফলমূল আহার,—আর বন্যতটিনী বা নির্ঝরিণীর জল-পান—এই ভাবেই দিন কাটে।—দিনের পর দিন কেটে যায়,—কিন্তু লোকালয়ের চিহ্নও মেলে না। রাত্রে আগুন জেবলে বসে থাকেন বলভদ্র হিংস্র জন্তুর ভয়ে।...প্রভু নির্বিকার। কখনো সম্মুখ দিয়ে হস্তিযূথ নদীতে জলপান করতে যায়,—তাদের বৃংহণে বন মুখর হয়ে ওঠে,—কখনো বা চলতে চলতে সহসা ভীষণ ব্যাঘ্রের সম্মুখেই পড়তে হয়।...বলভদ্র ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন। প্রভু নিরুদ্বেগ; দুরন্ত হিংস্র নরখাদক—প্রভুর দিকে চেয়েই শান্ত দৃষ্টি নত করে চলে যায় অন্যদিকে। কখনো বা ব্যাঘ্রও চলতে থাকে প্রভুর পিছু পিছু।—হিংসাই হিংসাকে উত্তেজিত করে।...হিংসা শুধু বাঘের প্রাণেই নেই, মানুষের প্রাণেও আছে। উভয়ে উভয়ের প্রতিই হিংসা পোষণ করে—অবশ্য আপন আপন ভাবে।...তাই বুঝি বাঘে-মানুষে পরস্পর এত শত্রুতা! কিন্তু প্রভুর প্রাণে তো হিংসা সেই,—জীব প্রেমে পরিপূর্ণ তাঁর অন্তর,—জীবে জীবে তাঁর আত্মপর ভেদহীন সমান স্নেহ; তাই বুঝি বাঘের অন্তরেও কোন হিংসার উদ্রেক হয় না তাঁকে দেখে!...আশ্চর্য যে,—কখনো কখনো তাঁর এক পাশে বাঘ,—এক পাশে হরিণ—নিরুদ্বেগেই এবং শান্তভাবেই অগ্রসর হতে থাকে।...যেন তারা খাদ্য-খাদক নয়,—দুয়েই সমান।

ফলপুষ্পমণ্ডিত বৃক্ষলতাগুল্মের পরম শোভা,—বিজন বনের প্রশান্ত গম্ভীর ভাব,—বন্য পশুদের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপন—পুষ্পেপুষ্পে অলির নৃত্য-গীত,—বনের সুনির্ম্মল মৃদু শান্ত বাতাস—বৃক্ষপত্রের মর্মরধ্বনি অপার শান্তিতে পরিপূর্ণ করে তোলে প্রভুর হৃদয়। প্রাণভরে তিনি তাঁর কৃষ্ণকে ডাকতে থাকেন প্রেমাকুল কণ্ঠে।...দিনের পর দিন বন-পথ অতিক্রম করে প্রভু অবশেষে এসে পেঁছালেন—বারাণসীর মণিকর্ণিকার ঘাটে।

স্নানরত নরনারী প্রভুর দিকে চেয়েই সম্মোহিত হয়ে যায় এক অপূর্ব ভাবে,—অন্তর তাদের নেচে ওঠে যেন কি অজানা আনন্দে।,—প্রভুর কণ্ঠোচ্চারিত হরিধ্বনির সঙ্গে তারাও হরিধ্বনি করে ওঠে সমস্বরে।...সহসা একজন ছুটে এসে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে প্রভুর চরণে,—'প্রভু, প্রভু আমাকে চিনতে পারেন?—আমি আপনার সেবক তপন মিশ্র। আপনার উপদেশেই কাশী বাস করছি।...এবং আপনার পথ চেয়েই বসে আছি।

এ সেই তপন মিশ্র,—বহু পূর্বে অধ্যাপনা-কালে প্রভু পূর্ববঙ্গ সফরে গেলে যিনি জানিয়েছিলেন প্রভুর কাছে উদ্ধারের প্রার্থনা। প্রভুরই নির্দেশে তিনি এসেছেন কাশীতে। মহাপ্রভুও তাঁকে চিনতে পারলেন এক নিমেষে,—বললেন প্রীতকণ্ঠে,—'মনে শান্তি পেয়েছো মিশ্র ?'

'হাঁ প্রভু,'—তপন মাথা নত করে বললেন,—'আপনার আশীর্বাদ।...আপনার কৃপার পরশ আমি নানাভাবেই উপলব্ধি করি।'

'না, না, আমার কৃপা নয়।'—প্রভু ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন,—"কৃষ্ণ দয়াময়,—তাঁরই কৃপায় তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে,—হবেও। আমি এখন বৃন্দাবন যাচ্ছি,—ফিরবার পথে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো"—তপন কৃতার্থ হয়ে প্রভুকে আবার প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

স-সঙ্গী মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করে প্রভু আবার অগ্রসর হলেন।... পথে বলভদ্রের সঙ্গে প্রভুর কথাবার্তা খুব কমই হয়। অবশ্য ভট্টাচার্যের তাতে দুঃখ নেই,—বরং প্রভুর আত্মহারা প্রেম-বিগলিত ভাব দেখে তিনি আনন্দ পান বেশি। প্রভুর বৃন্দাবন-আকুলতা তাঁর অন্তর-ও ভরে দেয় এক অপার্থিব মাধুর্যে।...তাঁর প্রেমাবিষ্টতা ভাঙ্গতে চান না বলভদ্র।

ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে প্রভু এলেন প্রয়াগে,—গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে।...সম্মুখেই প্রবাহিতা নদীরূপা কালের ভগিনী কালিন্দী। কালিন্দী-প্রবাহের দিকে চেয়েই প্রভুর মনে পড়ে গেল, কালিন্দী-তট-বিহারী গোপিকা-বিলাস কৃষ্ণের কথা। কত লীলা করেছেন তিনি এই কালিন্দী-সলিলে,—তার তীরস্থ কদম্বমূলে! সহসা প্রেমাবেগে আত্মহারা হয়ে প্রভু ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন কালিন্দীর কালো জলে! তারপর আর কোন মতেই উঠতে চান না! শীত-কাল,—দুরন্ত শীত,—কিন্তু প্রভুর যেন কনামাত্রও শীতবোধ নেই। চারিদিক তখন তাঁর কৃষ্ণময়। মুস্কিলে পড়লেন বলভদ্র। অবশেষে নিজে জলে নেমে অনেক কষ্টে প্রভুকে নিয়ে উঠে এলেন তীরে।

এরপর মহাপ্রভু এসে পড়লেন মথুরায়।—বলভদ্র সহসা বলে ওঠেন,—"প্রভু, আমরা মথুরায় এসেছি।" প্রভু চমকে ওঠেন,—মথুরা,—এই মথুরা ?—ব্রজলীলা সাঙ্গ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন মথুরায়,—কর্ত্তব্যের আহবানে। দিগন্ত কেঁপে উঠেছিল তাঁর পাঞ্চজন্যের নিনাদে।...ধরাভার অত্যাচারী কংসের নিধন করে মুক্ত করেছিলেন তিনি কংস-কারাগারে বন্দী জনক-জননীকে।...কিন্তু ব্রজের প্রাণে প্রাণে বেজেছিল বিচ্ছেদের গভীর বেদনার সুর;—যে বেদনার অন্তর্নিহিত রসধারা মূর্ত হয়ে উঠেছে—মাথুরের করুণ ছন্দে।

মথুরার নাম শুনেই প্রভু সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন সেখানে,—তার পর উঠে বিশ্রাম-ঘাটে স্নান করে নৃত্য করতে লাগলেন প্রেমানন্দে। বহুলোক

জমে গেল প্রভুর সেই অপূর্ব ভাব-নৃত্য দেখতে,—প্রাণে প্রাণে ছুটলো এক নিত্য আনন্দের রসধারা। এখানে কৃষ্ণদাস নামে এক ভক্তের সংগে মিলন ঘটলো প্রভুর। কৃষ্ণদাস স-সংগী প্রভুকে পরম আদরে নিয়ে গেলেন বাড়িতে ভিক্ষার জন্যে।...বিদায়কালে কৃষ্ণদাসও হলেন প্রভুর বৃন্দাবনের সংগী।

যে-বৃন্দাবনের আকর্ষণে প্রভু আজ কয়েক বছরই অধীর, যার পুণ্য রজ সর্বাঙ্গে মেখে—মনের সাধে মুকুন্দ-ভজন করতে তিনি—সর্বস্ব ত্যাগ করে গভীর রাত্রে ছুটেছিলেন কাটোয়ার দিকে,—প্রাণ-বীণার তারে অবিরত ঝঙ্কৃত হয়েছে যে পুণ্যধামের নাম,—অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর-লীলা-স্থল,—সেই বৃন্দাবনে এসে পেঁছিলেন প্রভু! বহুদিন-পোষিত আকুল কামনা আজ পূর্ণ হলো তাঁর।...'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে তিনি নাচতে লাগলেন আত্মহারা আনন্দে। যেহেতু বৃন্দাবনে,—হরিনাম নেই,—সর্বত্র কৃষ্ণ নাম।

শ্রীভগবান আনন্দময়। এই বৃন্দাবনেই তাঁর আনন্দের পূর্ণ প্রকাশ। সখ্য, বাৎসল্য এবং প্রেমরসের ধারায় নিত্য নবনব ভাবে অভিষেক হতো তাঁর এখানে। যশোদার বাৎসল্য, শ্রীদাস-সুদামের সখ্য—রাধা ও গোপীগণের প্রেম তাই অমর হয়ে আছে জগতে। পূর্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা বিপ্রলব্ধা উৎকণ্ঠা, মান, মিলন, বিরহ,—প্রেমের এই বিবিধ অংগ। প্রত্যেকটিই যেন আনন্দের খনি,—এবং এই সম্মিলিত পূর্ণানন্দের মূর্তিমতী বিগ্রহ শ্রীমতী রাধা। প্রভুর সাধনাও তাই রাধাভাবে। রাধার বিশুদ্ধ প্রেমের প্রতিটি লক্ষণই প্রকাশ পায় তাঁর দেহে এবং মনে। বৃন্দাবনে এসে সেই ভাবের আবেশে তিনি একেবারে যেন ভুলে গেলেন নিজেকে।

বৃন্দাবনের নিধুবন, ভাণ্ডারীবন, মধুবন, তালবন, বেহুলাবন প্রত্যেকটি ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়ান শ্রীগৌরাঙ্গ। পলকে পলকে রোমাঞ্চ জাগে তাঁর দেহে। বৃক্ষলতা-গুল্মের শ্যাম সমারোহে দেখেন যেন সেই শ্যামসুন্দরেরই রূপের ছায়া। বিটপি-শাখে ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্য, শুকসারীর গান চিত্তে জাগিয়ে তোলে দ্বাপরের সেই নিত্যপ্রেমলীলার মধুময় স্মৃতি,—বৃন্তচ্যুত রাশি রাশি পুষ্প ঝরে পড়ে মহাপ্রভুর শিরে,—যেন বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীমতী বৃন্দা পুষ্প বৃষ্টি করে বরণ করছেন তাঁকে,—কোন পুণ্যদিনের স্মৃতি স্মরণ করে।

ভাবাবেশে প্রভু নৃত্য করেন,—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলে। কখনও কখনও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন ভাবের প্রবল আবেগে। প্রভুর নৃত্য দেখতে ছুটে আসে অগণিত নর-নারী। কি জানি, কোন দৈবী-প্রেরণায় কণ্ঠে কণ্ঠে রটে যায়,—শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এসেছেন বহুদিন পরে—বৃন্দাবনে গৌরদেহে। যাঁরা ভক্ত, তাঁরা প্রভুর হর্ষ, বিষাদ, অশ্রু, পুলক, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ দেখে—

সিদ্ধান্ত করেন তাঁকে ভক্তরূপে অবতীর্ণ যতিবেশী হরি বলে। সমগ্র বৃন্দাবন যেন কৃষ্ণনামে পুনর্জাগরিত হয়ে ওঠে। প্রভু অনেককে জিজ্ঞাসা করেন,—শ্যাম-কুণ্ডু ও রাধাকুণ্ডু কোথায়?—কিন্তু কেউ সে স্থান দেখাতে পারে না। তখন প্রভু নিজেই এক ধানের ক্ষেতে ঢুকে—সেই স্থানই শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড বলে নির্দেশ করেন।—প্রভুর নির্দিষ্ট স্থানই শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড বলে মেনে নিয়েছে সকলে।

বৃন্দাবন ছেড়ে প্রভু যেন আর আসতে চান না,—বনভ্রমণ করতে করতে একদিন উঠলেন গিয়ে গোবর্ধন পর্বতে। এই গোবর্ধন পর্বতের নামে গোবর্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। এখানে এক পাঞ্জাব-নিবাসী তরুণ ব্রাহ্মণ-কুমার সহসা এসে প্রভুকে প্রণাম করে,—"হে শ্রীগৌরাঙ্গ, আমি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বহুদিন ধরে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।"—বলে সে গদ্‌গদকণ্ঠে,—'স্বপ্নেই দেখেছি তোমার স্বর্ণকান্তি সুদিব্য মূর্তি,—স্বপ্নেই জেনেছি তোমার নাম। স্বপ্নেই এক দিব্যপুরুষ বলেছেন আমাকে, তোমার চরণে আশ্রয় নিতে। তুমিই ভগবান। বহুদিন ধরে বহুস্থান ঘুরে আজ আমার ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে। কৃপা করে আমাকে উদ্ধার কর।'

মহাপ্রভু পলকমাত্র তার দিকে চেয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন তাঁকে, —যেন সে বহুদিনের পরিচিত একান্ত আপনার। —তারপর বললেন সস্নেহ কণ্ঠে,—তুমি এসেছ? কৃষ্ণদাস, তুমি এসেছ!...ভাল, তুমি পশ্চিমে যাও,—সেখানে হরিনাম প্রচার কর।'—তরুণের আসল নাম কি ছিল, সেই জানে,—কিন্তু প্রভু তাকে কৃষ্ণদাস বলে সম্বোধন করতে সেই থেকে তার নাম হলো কৃষ্ণদাস।...কৃষ্ণদাস প্রভুর দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে বললে,—"প্রভু, আমার—কি শক্তি যে, আমার কাছে লোকে হরিনাম গ্রহণ করবে? আমি নগণ্য ক্ষুদ্র জীব।"

'এই নাও আমার গুঞ্জ মালা!'—প্রভু তাঁর গলার গুঞ্জ মালা খুলে তার গলায় পরিয়ে দিলেন,—'এই মালাই তোমার শক্তি। এরই বলে তোমার অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম স্ফূর্ত হবে। তোমাকে যে দেখবে,—সেই নাম গ্রহণ করবে তোমার কাছে।'

প্রভুর গুঞ্জমালা ধারণ করে—তার পুরো নাম হয়—কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালী।

কৃষ্ণদাসের মত এমন অনেককেই প্রভু শক্তি-সম্পন্ন করে দিকে দিকে প্রেরণ করেন তাঁর বাণী-প্রচারে।...একটি প্রদীপ্ত দীপশিখার স্পর্শে জ্বলে উঠতে থাকে যেন শত শত দীপশিখা!'...

প্রভু এবার ফিরলেন প্রয়াগ-অভিমুখে।

৭০

এদিকে প্রভুর গৌড়-ত্যাগের পর রূপ-সনাতনের প্রাণ অধীর হয়ে উঠেছে পরমার্থিক প্রেরণায়।...কাজে কর্ম্মে তাঁদের মন আর কিছুতেই বসেনা। রূপ চলে এলেন রামকেলী গ্রামে,—সেখানেই তাঁদের নিবাস,—কিন্তু আর ফিরলেন না গৌড়ে।...সনাতন যদিও থাকলেন গৌড়ে,—তবু আর রাজ-সভায় গেলেন না। অসুস্থতার ভান করে পড়ে থকলেন নিজের প্রাসাদে।...একটা গুজবও রটলো যে,—রূপ সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন।

মহা-মুস্কিলেই পড়লেন গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ। 'রূপ-সনাতন' ছিলেন তাঁর ডান-হাত বাঁ-হাত;—দুজনেই কাজকর্ম ছেড়ে দিতে তাঁর রাজকার্যে বিশৃংখলা ঘটতে লাগলো নানাদিকে। চিকিৎসককে পাঠিয়ে সংবাদ নিয়ে তিনি জানলেন,—সনাতনের অসুস্থতার কথা মিথ্যা,—ইচ্ছা করেই তিনি কাজে যোগ দেননি।

তখন বাদশাহ নিজেই এসে উপস্থিত হলেন সনাতনের বাড়ীতে।—সনাতন সাদরেই অভ্যর্থনা করলেন রাজাকে। বাদশাহ বললেন,—সাকর মল্লিক, ভাই, তোমাদের কি মতলব বল তো?...এক ভাই তো শুনেছি, ফকিরী নিয়েছে,—আর তুমিও অসুখের ভান করে পড়ে আছ বাড়ীতে।—তোমরা যে আমাকে মুস্কিলে ফেললে! আমি কেমন করে রাজ্য চালাই বল দেখি?

'জাঁহাপনা,'—সনাতন সবিনয়ে বললেন,—কাজকর্ম আমার আর ভাল লাগছে না,—আমাকে দয়া করে এবার অবকাশ দিন।

হোসেন শাহ বললেন,—'তাহলে বল, আমিও গৌড়-সিংহাসন ছেড়ে—ফকিরী নিয়ে মক্কায় চলে যাই। বেশ, কাজকর্ম ভাল না লাগে,—পরে দবির খাসের মত না হয় ফকিরীই নেবে। কিন্তু এখন তো চল আমার সংগে উড়িষ্যা-আক্রমণে। 'উড়িষ্যা জয় করে এসে তুমি যা' খুশী করবে। আমি বারণ করবো না।'

সনাতনের বুক কেঁপে উঠলো,—যে উড়িষ্যার নীলাচলে তাঁর প্রাণের প্রাণ

মহাপ্রভু আছেন,—সেই উড়িষ্যা আক্রমণে সাহায্য করতে হবে তাঁকে? সনাতনের বৈরাগ্য যেন আরও তীব্র হয়ে উঠলো।—'আমি পারবো না জনাব,'—বললেন তিনি নির্ভয়ে—'আমাকে মুক্তি দিন। আমার কাজের ভার অন্য কাউকে দিন।'

বাদশাহ এবার রেগে গেলেন। রুদ্ধ রোষে বললেন,—'হ্যাঁ, তাই দেব',—সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাইরে এসে সনাতনকে বন্দী করার আদেশ জারী করলেন। রাজাদেশ অমান্য করায় সনাতন অবশেষে আবদ্ধ হলেন কারাগারে।

রূপ-সনাতন বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। কিন্তু ঐশ্বর্যের প্রতি কোন মোহ নেই আর তাঁদের মনে। তাঁদের এক ভাই ছিল,—নাম অনুপম। তিনিও ছিলেন ঈশ্বর-ভক্ত—অন্তরে অন্তরে বৈরাগী। তিনিও সংসার ত্যাগে প্রস্তুত হলেন। এদিকে সনাতনের বন্দীত্বের সংবাদও এসে পৌঁছল রূপের কানে। তখন রূপ অনুপমের সঙ্গে যুক্তি করে—বহুধন বিলিয়ে দিলেন দরিদ্রের মধ্যে। বাকী বিষয়-সম্পত্তির অধিকার দিলেন অনুপমের একমাত্র পুত্র শ্রীজীবকে। তার পর সনাতনের মুক্তির জন্য দশ সহস্র মুদ্রা এক মুদীর দোকানে জমা রেখে—একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়লেন বৃন্দাবন-অভিমুখে। বিদায়-কালে একখানি গোপন পত্রে সনাতনকে জানিয়ে গেলেন সব কথা। বলা বাহুল্য, অনুপমও হলেন তাঁর সঙ্গী।

রূপের পত্র পেয়ে সনাতন কারা-রক্ষকের কাছে দশ হাজার মুদ্রার বিনিময়ে মুক্তি চাইলেন। দশ হাজার মুদ্রা,—বড় সোজা কথা নয়! একজন কারারক্ষক জীবনেও একসঙ্গে অত টাকা দেখেনি। তাছাড়া, এই কারারক্ষক ছিল সনাতনেরই অনুগৃহীত ব্যক্তি। প্রচুর উৎকোচ পেয়ে সে দিন কয়েক পরে সুকৌশলে কারাগার থেকে মুক্ত করে দিলে সনাতনকে। সনাতন সেই মুখেই—একবস্ত্রে ভৃত্য ঈশানকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লেন বৃন্দাবনের উদ্দেশে। প্রভু যে নীলাচল থেকে শীঘ্রই বৃন্দাবন যাত্রা করবেন,—এ তো তাঁদের জানাই ছিল।

* * *

এদিকে রূপ ও অনুপম ক্রমাগত পথ হেঁটে একদিন পৌঁছলেন এসে প্রয়াগে,—প্রয়াগ অতিক্রম করে যাবেন বৃন্দাবন। কিন্তু প্রয়াগে প্রবেশ করে তিনি সহসা একস্থানে বিপুল হরিধ্বনি শুনতে পেলেন। ধূম দেখে পণ্ডিতেরা অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করেন। রূপও পরম পণ্ডিত,—সংস্কৃত-শাস্ত্রে তাঁর ছিল অসাধারণ অধিকার,—তার ওপর তিনি বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী। হরিধ্বনি শুনেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন,—এখানে হরিধ্বনি ওঠে কেন? নিশ্চয়ই প্রভু আছেন তবে এখানে। ধ্বনি অনুসরণ করে কিছুটা অগ্রসর হতেই তিনি দেখলেন,—বহুজনের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের মত বসে রয়েছেন প্রভু।

রূপ ও অনুপমের সমগ্র হৃদয়ে উথলে উঠলো অপার আনন্দোচ্ছ্বাসে। নিতান্ত দীন অকিঞ্চনের মত—তাঁরা প্রভুর সম্মুখে গিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন।

মাত্র একবার রূপকে দেখেছিলেন মহাপ্রভু,—তা-ও রাত্রে। তবু মুহূর্তে চিনতে পারলেন তাঁকে।—"ওঠ, ওঠ, রূপ! ভগবান কৃষ্ণের করুণা অপার,—তাই মোহান্ধকার থেকে তোমরা চৈতন্যের আলোকে এসেছ।"—বলতে বলতে তিনি ভূ-পতিত দুই ভাইকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। পরে জিজ্ঞাসা করলেন সনাতনের সংবাদ। রূপ বললেন,—রাজা তাঁকে কারাবন্দী করেছেন।

মাথা নত করে কি-যেন ভাবলেন প্রভু। তারপর সহসা মুখ তুলে বললেন,—'না, সনাতন মুক্তি পেয়েছে। সে-ও আসছে আমার কাছে। তোমরা আশ্বস্ত হও।'—রূপ ও অনুপম সাশ্চর্যে চাইলেন প্রভুর মুখের দিকে। প্রভু কি তবে সর্বজ্ঞ?

—এরপর রূপকে কিছুদিন নিজের কাছে নিভৃতে রেখে প্রভু তাঁকে শিক্ষা-দিলেন নানাভাবে। রূপ যেন জীবনে এক নূতন আলোকের সন্ধান পেলেন। প্রভুর উপদেশামৃতে প্রেম-ধর্মের অঙ্কুর উদ্ভব হলো রূপের হৃদয়-ভূমিতে। অতঃপর প্রভু তাঁকে বৃন্দাবনে যেতে আদেশ করলেন। রূপ কিন্তু প্রভুর সঙ্গে নীলাচলেই আসতে চাইলেন। সহসা প্রভুর কণ্ঠ ঈষৎ রূঢ় হয়েই উঠলো,—সে-কি? আমি যা আদেশ করছি, তাই কর। নিজের দিকে না চেয়ে জীবের কল্যাণ সাধন কর। এর পর বরং এক সময় নীলাচলে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করো। যাও এখন বৃন্দাবনে।

রূপ আর দ্বিরুক্তি করলেন না। সেই দণ্ডেই অনুপমকে নিয়ে অগ্রসর হলেন বৃন্দাবনের পথে। প্রভুও প্রয়াগ ত্যাগ করে যাত্রা করলেন বারাণসীর উদ্দেশে।

* * *

ও-দিকে সনাতন ঈশানকে নিয়ে ক্রমাগত হাঁটতে হাঁটতে এসে পেঁৗছলেন পাতড়া পর্বতে। এখানে আশ্রয় নিলেন এক ভুঁইয়া সর্দারের। তাঁকে অনুরোধ করলেন পর্বতটা পার করে দিতে। ভুঁইয়া-সর্দার তাঁকে খুবই আদর-যত্ন করতে লাগলো। যেন তার গুরু এসেছেন বাড়িতে! বিশাল গৌড়রাজ্যের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন সনাতন,—কূটনীতিতে জ্ঞান ছিল তাঁর গভীর। সহসা মনে প্রশ্ন জাগলো তাঁর,—ভুঁইয়া সর্দার তাঁদের এত খাতির-যত্ন করছে কেন? কি যেন সন্দেহে তিনি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন ঈশানকে,—ঈশান, তোমার সঙ্গে কি টাকা-কড়ি কিছু আছে?

ঈশানও বুদ্ধিমানের মত অস্ফুট স্বরে উত্তর দিলে,—'আছে কর্তা, আটটি মোহর।'—সনাতন চকিত হয়ে বললেন,—ঠিক! ওই আটটি মোহরের জন্যেই

আজ আমাদের প্রাণ গিয়েছিল আর কি? ভূঁইয়া নিশ্চয়ই সন্ধান পেয়েছে তোমার ওই মোহরের। তাই তার এত খাতির-যত্ন আমাদের। রাত্রে আমরা ঘুমিয়ে পড়লেই সে তার কাজ উদ্ধার করতো।—কই, কোথায় মোহর?—দাও আমাকে।

ঈশান ভয়ে ভয়ে ট্যাঁক থেকে মোহরগুলি বার করে তুলে দিলে মনিবের হাতে। সনাতন সর্দারকে ডেকে বললেন,—'ভাই, তুমি আমাকে অনেক যত্ন করেছ,—এই নাও তার পুরস্কার!'—সাতটি মোহরই দিলেন তিনি সর্দারকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাইলো সর্দার সনাতনের পানে,—বুঝেছে সে,—এ ব্যক্তি তার চেয়েও চতুর। অতঃপর সনাতন একটি মোহর ঈশানের হাতে দিয়ে বললেন,—তুমি বাড়ি ফিরে যাও ঈশান, আর আমার সংগে তোমাকে আসতে হবে না।'

ঈশান সেখান থেকেই ফিরলো গৌড়-অভিমুখে। সনাতন অগ্রসর হলেন নিজের পথে। কয়েক দিন পথ হেঁটে তিনি এলেন হাজিপুরে। সেখানে দেখা হলো তাঁর ধর্ম-ভগিনীপতি শ্রীকান্তর সংগে। তাঁর দীন মলিন বেশ,—উদাস ভাব,—চোখে প্রেমাশ্রু দেখে বিস্ময়ের সীমা থাকলো না শ্রীকান্তের।—সনাতন সংক্ষেপে তাঁর কাহিনী বললেন তাঁকে। শ্রীকান্তের বাড়িও গৌড়ে,—তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন সনাতনকে। কিন্তু সনাতন কি ফিরবার জন্যেই সর্বস্ব ছেড়ে বেরিয়েছেন? তিনি অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বললেন,—না, না, ও-বিষয়ের মোহে আমি আর ভুলছি না। তুমি যেখানে যাচ্ছ, যাও। আমি আমার পথের সন্ধান পেয়েছি।

তখন শীতকাল,—সনাতনের গায়ে কিছুই নেই,—শ্রীকান্ত তাঁকে দামী একখানা শাল দিলেন। কিন্তু শালের কি অভাব ছিল সনাতনের নিজেরই? তিনি শালখানা ফিরিয়ে দিলেন ভগিনীপতিকে। তখন শ্রীকান্ত তাঁকে একখানি ভোটকম্বল দিলেন। বারবার শ্রীকান্তকে ক্ষুণ্ণ করতে কেমন কুণ্ঠা এলো সনাতনের মনে। তিনি ভোটকম্বলখানি নিয়ে অগ্রসর হলেন স্বীয় গন্তব্য পথে।

* * *

বারাণসী। মহাপ্রভু ভক্তজন সংগে বসে আলাপ করছেন স্থানীয় ভক্ত চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে—সহসা তাঁর ভাবান্তর উপস্থিত হলো। বললেন চন্দ্রশেখরকে,—'দ্বারে যে বৈষ্ণবটি বসে আছে, তাকে ডেকে আন।'—

চন্দ্রশেখর কিন্তু দ্বারে এসে কোন বৈষ্ণবকেই দেখতে পেলেন না। তার পরিবর্তে দেখলেন,—একজন দীন মলিন বেশী, ফকির বসে আছেন সেখানে ভোটকম্বল গায়ে দিয়ে। বলা বাহুল্য, ইনিই সনাতন। বৃন্দাবনের উদ্দেশে

বারাণসীর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বিপুল হরিধ্বনি শুনে এবং অসংখ্য-জনের যাতায়াত দেখে—তিনি রূপের মতই অনুমান করে বসে পড়েছেন—চন্দ্রশেখরের গৃহের দ্বারে। কিন্তু ভেতরে ঢুকবার সাহস হয়নি তাঁর। চন্দ্রশেখর প্রভুর কাছে ফিরে এসে বললেন,—'কোন বৈষ্ণবকে তো দেখতে পেলাম না প্রভু,—ফকিরের মত কে একজন বসে রয়েছে।'

'তাকেই ডেকে আন।'—প্রভু পুনরায় নির্দেশ দিলেন,—তিনি পরমবৈষ্ণব,—তাঁর আগমনেরই অপেক্ষা করছি আমি।

চন্দ্রশেখর আর কি করেন? আবার এলেন দ্বারে। সনাতনকে ডেকে বললেন,—গোঁসাই, আপনি ভেতরে আসুন, প্রভু আপনাকে ডাকছেন।

'আমাকে?'—বিস্ময়ে কুণ্ঠায় সনাতন যেন জড়সড় হয়ে উঠলেন,—'না, না, আমাকে নয়—আমাকে নয়,—আপনি ভুল করছেন। অন্য কাউকে হবে।'—সনাতন কিছুতেই আসতে চান না। কিন্তু চন্দ্রশেখর আর তাঁকে ছাড়লেন না। এক রকম জোর করেই নিয়ে এলেন মহাপ্রভুর কাছে। মহাপ্রভুর দিকে চেয়েই সনাতনও তাঁর সম্মুখে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। প্রভু ব্যগ্রভাবে উঠে দুবাহু দিয়ে সনাতনকে তুলে ধরলেন—'সনাতন ওঠ, ওঠ, তোমার দৈন্যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! তোমার ওপর কৃষ্ণের কৃপার সীমা নেই। তোমাকে স্পর্শ করলে আমার দেহ-ও পবিত্র হয়।—ওঠ, ওঠ।'—প্রভু নিবিড়ভাবে বুকে চেপে ধরলেন সনাতনকে। সনাতনের দুই চোখ দিয়ে তখন অশ্রু ঝরে পড়েছে দর-বিগলিত ধারে।

প্রভু সনাতনকে কাছে রেখে রূপের মতই শিক্ষা দিতে লাগলেন তাঁকে। প্রভুর ইচ্ছা বুঝে সনাতন ভোটকম্বল ছেড়ে কাঁথা গায়ে দিলেন।

৭১

ঘোর অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী। থাকেন কাশীতেই। সোঽহং মতের পরিপোষক এবং প্রচারক। ভারতের যাবতীয় মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের অধিনেতা,—দশ সহস্র সন্ন্যাসী আছেন নাকি তাঁর অধীনে। সর্বশাস্ত্রদর্শী, প্রগাঢ় পণ্ডিত। অসাধারণ তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি। —বিপুল প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তৎকালীন সন্ন্যাসীদের মধ্যে ভারতের দিগ্-দিগন্তে। জ্বলন্ত পাবক-সমতেজোময় বিরাট পুরুষ!

কিন্তু সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রতি বিদ্বেষ তাঁর অত্যন্ত প্রবল। প্রভুর নাম শুনে জ্বলে যান,—কথায় কথায় অগ্রাহ্য অবহেলা করেন তাঁকে। তার ওপর বাসুদেব সার্বভৌমের ন্যায় মহাপণ্ডিত-ও তাঁর বশীভূত হয়েছেন শুনে, তাঁর ঈর্ষানল যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। লোককে বলেন—শ্রীচৈতন্য মায়াবী, ঘোর ঐন্দ্রজালিক,—নানা রকম ভাবকালি করে লোককে ভ্রান্ত করে। নেচে গেয়ে লোককে ভুলিয়ে নিজেকে 'ভগবান' বলায়।—সন্ন্যাস-ধর্মে আবার 'নাচন গায়নের' স্থান কোথায়? বেদ-বেদান্তের কোন ধারই ধারে না লোকটা,—কেউ যেও না তার কাছে,—মায়াজালে মুগ্ধ করে নিয়ে যাবে ভ্রান্ত পথে।

মহাপ্রভু শুনেছেন তাঁর কথা,—এমনকি প্রকাশানন্দ তাঁর প্রতি দারুণ অশ্রদ্ধা-জ্ঞাপক দু-একটা শ্লোক লিখেও পাঠিয়েছিলেন একবার তাঁর কাছে নীলাচলে। এখন সেই কৃষ্ণচৈতন্য কাশীতে এসেছেন শুনে সরস্বতী আবার তাঁর বিরুদ্ধে লোককে উত্তেজিত করতে লাগলেন। এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন—মহাপ্রভুর পরমভক্ত। প্রকাশানন্দের অপ-প্রচার সহ্য হলো না তাঁর। তিনি ছুটে এলেন প্রভুর সভায়।'

—'প্রভু, প্রভু, আর তো সহ্য হয় না!'—বললেন বিক্ষুব্ধ উত্তেজনায়,—'প্রকাশানন্দের দম্ভ যেন আকাশ ছুঁতে চায়। কথায় কথায় আপনার নিন্দা, —আপনার বিরুদ্ধে লোক-ক্ষেপানো,—এই তাঁর কাজ। কৃষ্ণনাম শুনলেও

ঘৃণায় নাক কুঞ্চিত করেন,—মুখে আনা তো দূরের কথা! ওঁকে যথোচিত শিক্ষা দিতে হবে প্রভু।'

মহাপ্রভু হাসলেন প্রশান্ত হাসি। মহারাষ্ট্রীয় ভক্তটি ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন,—'না, না, প্রভু, আপনার এই নির্বিরোধ ভাব প্রকাশানন্দের জন্যে নয়। আপনি যে হরিনাম প্রচারের জন্যে এত করছেন,—তিনি তাঁর বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। গভীর তমোর মধ্যে পড়ে আছেন তিনি। তাঁকে উদ্ধার করাও আপনার কাজ। তাঁর মত প্রভাবশালী লোক আপনার মহিমায় মুগ্ধ হলে—তাঁর অনুরাগী অগণিত জনও এসে সমবেত হবে বৈষ্ণবধর্মের পতাকা-তলে। তাঁকে দিয়ে আপনার অভীষ্টও সিদ্ধ হবে প্রচুর!

কথাগুলি যুক্তিযুক্ত। প্রভুর মনেও জেগেছে—প্রকাশানন্দের চৈতন্য-সম্পাদনের অভিলাষ। একটু ভেবে তিনি বললেন,—কিন্তু প্রকাশানন্দ তো আমার কাছে আসতে চাইবেন না। বিনা-আহ্বানে আমিই তাঁর সভায় যাই কি করে? পরস্পর সংযোগের একটা উপায় তো দেখতে হবে!

সে আমি ভেবে ঠিক করেছি প্রভু,—তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত.—আমি শীঘ্রই এক সন্ন্যাসী-সভার আয়োজন করছি,—ভারতের সর্ব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ—নিমন্ত্রিত হয়ে আসবেন সেখানে। আপনারও নিমন্ত্রণ থাকবে। প্রকাশানন্দকেই নির্বাচিত করবো সভাপতি। তার পর যা করতে হয়, আপনি করবেন।

'তুমি চতুর!'—মৃদু হেসে প্রভু সম্মতি দিলেন,—ব্যবস্থা ভালোই হয়েছে। আমি যাবো সে সভায়।

*   *   *

বিরাট সন্ন্যাসী-সভা। বিভিন্ন মতবাদী অগণিত সন্ন্যাসী সমবেত হয়েছেন সেখানে। তবে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী অর্থাৎ প্রকাশানন্দের মতের সমর্থকই বেশি। মধ্যস্থলে বসে আছেন স্বয়ং প্রকাশানন্দ প্রদীপ্ত ভাস্করের মত। সহসা ভক্তগণ-সহ উপস্থিত হলেন সেখানে—সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।... অনেকেই চিনতেন তাঁকে,—চারিদিকে একটা গুঞ্জন উঠলো.—'কৃষ্ণচৈতন্য এসেছেন. কৃষ্ণচৈতন্য এসেছেন।' গুঞ্জন উঠতেই সমগ্র সভায় আলোড়ন জাগলো, —যেহেতু মহাপ্রভুর নাম কারো অবিদিত ছিল না,—আর যিনি যেভাবেই গ্রহণ করুন তাঁকে,—তাঁর একটা অনতিক্রম্য প্রভাব আছে,—এ-কথাও স্বীকার করতেন সকলে।

মহাপ্রভু কিন্তু সভার মধ্যে না-গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন একপাশে। হাত দুটি যোড় করে সকলের উদ্দেশে একটি নমস্কার-ও জানালেন! প্রকাশানন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তাঁর দিকে,—কিন্তু এ-কি? যাঁর প্রতি তিনি এতদূর

বিদ্বেষ-পরায়ণ, যাঁর নিন্দায় তিনি পঞ্চমুখ,—তাঁর সরল-শান্ত সৌম্য প্রেম-ঢলঢল চোখমুখের দিকে চাইতেই তাঁর অন্তরের বিদ্বেষ যেন অর্ধেক প্রশমিত হয়ে গেল! ভাবলেন তিনি মনে মনে,—এ-যে নির্মল প্রশান্তির আধার,—এ'র দৃষ্টি যেন কোন এক পুণ্যলোকের সন্ধান দিচ্ছে,—যেখানে 'ভাবকালির' স্থান নেই,—স্থান নেই ইন্দ্রজালের ঃ যার অভ্যন্তরে বিরাজ করছে শুধু এক পরম সত্যের আলোক! তবে—তবে?

হাজার হোক প্রকাশানন্দ নিজে মহাসম্মানী ব্যক্তি,—পরম পণ্ডিত! মানীর মান তাঁর না-বোঝার কথা নয়। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে এলেন আপন আসন ছেড়ে প্রভুর কাছে,—'শ্রীপাদ, আপনি সভার মধ্যে না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে কেন?'—বললেন সাদর সাগ্রহকণ্ঠে,—'আসুন, আসুন ভেতরে আসুন।' —হাত ধরে তিনি নিয়ে গেলেন প্রভুকে সভার মধ্যে,—সসম্মানে বসালেন নিজেরই পাশে,—'আচ্ছা, শ্রীপাদ,'—পরে আবার বিনীত কণ্ঠেই বললেন,—'আপনি সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করে,—নৃত্য-গীত করেন কেন? বেদ-বেদান্তের চর্চা ছেড়ে বেদের বিরুদ্ধ ভাবধারাই বা প্রচার করেন কেন? আপনাকে লোকে ভগবান বলে। আপনার চোখমুখের দিকে চাইলে—আমারও তাই বলতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু আপনার বিধি-বিরুদ্ধ আচরণ আমাকে বড়ই ক্ষুব্ধ করেছে। দয়া করে, আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

'শ্রীপাদ!'—বিনয়-নম্রকণ্ঠে মহাপ্রভু উত্তর দিলেন,—'আমি যা করি, আমার গুরুর আজ্ঞানুসারেই করি।' যখন গুরুর আশ্রয় নিলাম,—তখন গুরু আমাকে পরীক্ষা করে বুঝলেন,—আমি মূর্খ। তাই বললেন, বাপু তুমি তো বেদ-বেদান্ত পড়তে পারবে না,—তবে আমি তোমাকে একটি বীজমন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি,—বেদ-বেদান্তর সারতত্ত্ব তার মধ্যে নিহিত আছে। তুমি সেই মন্ত্র জপ করবে,—তাহলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

'কি-কি সে মন্ত্র শ্রীপাদ?'—প্রকাশানন্দের কণ্ঠে যুগপৎ বিস্ময় ও ব্যগ্রতা ফুটে উঠলো।—প্রভু বললেন,—সে মন্ত্র,—'হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্।'—তমোময় কলিতে এছাড়া আর অন্যগতি নেই। সেই মন্ত্র জপ করতে-করতেই আমার মধ্যে নানা ভাবের প্রকাশ হতে লাগলো। কখনো হাসি, কখনো কাঁদি, কখনো নাচি,—কখনো গাই,—কখনো মূর্চ্ছা যাই।—অর্থাৎ আপনি যাকে ভাবকালি বলেছেন। কিন্তু গুরু বললেন, এ তোমার কৃষ্ণপ্রেম।—বেদ ঈশ্বরের বচন,—কৃষ্ণ সেই ঈশ্বর,—তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি-প্রেম জেগেছে! চিন্তা করো না।

'কিন্তু বেদান্ত তো প্রেম-ভক্তি স্বীকার করেন না শ্রীপাদ,'—প্রকাশানন্দ প্রতিবাদ করলেন,—"তাঁর সিদ্ধান্ত,—অদ্বৈতবাদ।—ভগবান শঙ্করাচার্য-কৃত

বেদান্তের ভাষা যদি আপনার পড়া থাকতো,—তাহলে আপনার মনের এ-ভ্রান্তি দূর হতো।”

‘কিন্তু ভাষ্যের প্রয়োজন কোথায় শ্রীপাদ?’—প্রভু সবিনয়েই বললেন,—‘যেখানে মূল সূত্র বুঝতে কষ্ট হয়,—সেখানেই। কিন্তু বেদের সূত্রগুলি সর্বত্র প্রাঞ্জল, সরল,—বেশ বোঝা যায়,—অথচ ভগবান শঙ্করের ভাষ্য পড়লে—বিষয় যেন জটিল হয়ে ওঠে। স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠার জন্যে—অথবা ঈশ্বরের কোন বিশেষ উদ্দেশ্যেই কি-না জানি না,—তিনি বেদান্তভাষ্যে প্রচার করেছিলেন মায়াবাদ। তারপর থেকে সেই মতই চলে আসছে।—কেউ আর আসল তত্ত্ব ঘেঁটে দেখেনি। নচেৎ বেদ-সূত্রের যথার্থ অর্থের মধ্যে ঈশ্বর-প্রেম,—এবং সেই প্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ,—এর সুস্পষ্ট স্বীকৃতি আছে।’—বলতে বলতে শ্রীগৌরাঙ্গ একে একে বেদের সূত্রগুলির অর্থ করতে লাগলেন। প্রকাশানন্দ নিজে এবং অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ সকলেই—সাগ্রহ-বিস্ময়ে দুই চোখ স্থির করে শুনে যেতে লাগলেন মহাপ্রভুর অপূর্ব ভাষ্য। সঙ্গে সঙ্গে এলো কত কথা—কত আলোচনা—কত শাস্ত্রীয় প্রমাণ। তার বিশদ পরিচয় দিতে হলে পৃথক একটি গ্রন্থেরই প্রয়োজন।

নিস্তব্ধ হয়ে উঠলো বিরাট সে-সভা—যেন সূচী-পতনেরও শব্দ শুনতে পাওয়া যায় সেখানে।...শুধু প্রভুর উদাত্ত-গম্ভীর মধুর কণ্ঠ একটি অমিয়-সঙ্গীত-ধ্বনির মত বাজতে লাগলো কানে কানে—প্রাণে প্রাণে।...অবশেষে প্রভুর মুখে ফুটলো অমায়িক হাসি,—‘কিন্তু শ্রীপাদ’,—প্রকাশানন্দের দিকে চেয়ে তিনি বললেন,—‘যদি অদ্বৈতবাদকেই স্বীকার করা যায়, তাতেই বা ঈশ্বর-প্রেমকে বাদ দেওয়া যায় কেমন করে?—অদ্বৈত এবং দ্বৈতবাদ তো এক জিনিষেরই দুটি পিঠ?—জীব ব্রহ্মের অংশ,—সে-হিসাবে ব্রহ্ম আর জীব একই বস্তু,—সুতরাং অদ্বৈত; আবার অংশরূপে জীব যখন পৃথক,—তখন দ্বৈত।...যত্র জীব, তত্র শিব,—বললে বুঝতে হবে, জীবের মধ্যেই শিব আছেন,—অর্থাৎ প্রতিটি জীবই শিবের অংশ।...কিন্তু জীবমাত্রেই শিব নয়,—শিব একটিই,—‘একমেবাদ্বিতীয়ম্।’ ‘আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ,’—পিতার আত্মাই পুত্র,—সুতরাং পিতা-পুত্র একই,—আবার পিতার অংশ পুত্র,—এই অর্থে পৃথক। এই পৃথকত্ব স্বীকার না করলে কিন্তু পিতা-পুত্র পরস্পর যে ভক্তি-স্নেহ-প্রীতির মাধুর্য উপভোগ করে,—সে মাধুর্য আর থাকে না। তেমনি জীবমাত্রেই যদি নিজেই শিব বা ভগবান সেজে বসে থাকে,—তাহলে সেই প্রেমময় সচ্চিদানন্দের প্রেমানন্দরস উপভোগের সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত হয়। ফলে আত্মানুভূতি বা আত্মানন্দও তার সম্যক জাগে না। তাই দ্বৈতভাবে তাঁর ভজনা করাই ভজনার উৎকৃষ্ট পন্থা—জীবের পরমগতি। বেদের অনুজ্ঞার সঙ্গেও এর কোথাও

বিরোধ নেই। মহাসমুদ্রের এক অঞ্জলি বারি আর অগাধ বারি বস্তু-হিসাবে সমানই,—কিন্তু ওই অঞ্জলি-বদ্ধ বারির কি অভিমান করা সাজে,—নিজেকে বিপুল মহাসমুদ্র মনে করে?—সমুদ্রের স্বরূপ তাকে সমুদ্র-তত্ত্ব আলোচনা করেই বুঝতে হবে।

প্রভুর বক্তৃতাশেষে সমগ্র সভার মধ্যে আলোড়ন জাগলো। হাজার হাজার সন্ন্যাসীর চিত্তেও তখন আপন আপন মতের সঙ্গে বেধেছে প্রবল দ্বন্দ্ব,—তাঁদের বহুদিনের সংস্কার যেন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে!—প্রকাশানন্দ নিজে মাথা নত করে গভীর চিন্তায় মগ্ন!—গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে দ্রুত চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেছে যেন তাঁর গতি,—পথ ভুল করেই তিনি এতদূর এসেছেন কি-না, দেখছেন যেন চারিদিক চেয়ে।...এই অবস্থার মধ্যেই অবশ্য সভা ভঙ্গ হলো। —গর্বে গৌরবে আনন্দে মহারাষ্ট্রীয় ভক্তের বুক তখন ফুলে ফুলে উঠছে;—ভক্তদের মধ্যে সনাতন ও তপন মিশ্রও এসেছিলেন প্রভুর সঙ্গে। পরম বিস্ময়ে ভাবছেন তাঁরা মহাপ্রভুর শক্তির কথা।

স্বস্থানে ফিরে প্রকাশানন্দ ভাবতে লাগলেন প্রভুর তত্ত্ব।—ভাবতে ভাবতে তাঁর কি যে হলো, তিনি চারিদিক শুধু গৌরাঙ্গময় দেখতে লাগলেন। সম্মুখে পেছনে,—ডাইনে-বাঁয়ে,—ওপরে-নীচে—যে দিকেই তাকান,—সেই দিকেই যেন শ্রীগৌরাঙ্গ দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন,—বরাভয়ভরা প্রশান্ত হাসি!...সমস্ত রাত্রি প্রকাশানন্দের কাটলো বিনিদ্রভাবে।—পরদিন সহসা তিনি শুনলেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নৃত্য করছেন।...শুনেই তিনি ছুটলেন সেখানে।...প্রভু তখন বাহ্য-জ্ঞানহারা,—দু'বাহু তুলে নাচছেন শুধু হরি বলে। চতুর্দিকে জমে গেছে হাজার হাজার লোক সেই অপূর্ব ভাব-নৃত্য দেখতে। সেই নৃত্যচ্ছন্দে প্রাণে প্রাণে জাগছে—বিপুল শিহরণ,—স্বর্গীয় ভাব-হিল্লোল।

সহসা প্রকাশানন্দের দিকে প্রভুর দৃষ্টি পড়লো। মুহূর্তে ভাব-সংবরণ করে তিনি এগিয়ে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে গেলেন প্রকাশানন্দকে,—অমনি প্রকাশানন্দই তাঁর চরণপ্রান্তে পড়ে বললেন,—'হে শ্রীচৈতন্যদেব, আমাকে উদ্ধার কর,—হে গৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ,—তুমি আমার মোহ নাশ করে চিত্তকে আকৃষ্ট করেছ। আমাকে নীলাচলে যাবার অনুমতি দাও।

মুহূর্তে মহাপ্রভু যেন তাঁর কত পরিচিত হয়ে উঠলেন, বললেন,—'তুমি আমার পরম প্রিয়! তুমি বৃন্দাবনে যাও, সেই স্থানই তোমার উপযুক্ত।—সেখানেই তুমি আমাকে স্মরণ করলে দেখতে পাবে।'

'প্রভু, তোমার প্রবোধ পেয়ে আমি কৃতার্থ হলাম,'—উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন প্রকাশানন্দ,—'আমার এ আনন্দ যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।'—

প্রভু উত্তর দিলেন,—'আমার প্রবোধ তোমাকে আনন্দ দিয়েছে, তাই আজ থেকে তোমার নাম রাখলাম—'প্রবোধানন্দ।'

'প্রভুর জয় হোক।'—মহাপ্রভুকে প্রণাম করে প্রকাশানন্দ সেই দণ্ডেই ধরলেন বৃন্দাবনের পথ।...প্রভুও অগ্রসর হলেন নীলাচলের পথে। ভক্তগণ প্রভুকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। সনাতন কিন্তু কিছুপথ তাঁর সঙ্গে এলেন,—ইচ্ছা ছিল নীলাচলেই আসবেন। কিন্তু প্রভু তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন,—বললেন—'এখন বৃন্দাবনেই যাও,—পরে আমি তোমাকে ডেকে পাঠালে নীলাচলে আসবে।'—সনাতন ফিরলেন বৃন্দাবনের পথে।

এরপর কাশীও মেতে উঠলো হরিনাম-সংকীর্তনে।...

বৃন্দাবনে গিয়ে প্রবোধানন্দ শুধু 'গৌর' নাম জপ করতে লাগলেন। তাঁর কৃত 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' গ্রন্থে তিনি মহাপ্রভুর অনন্ত রূপ, অনন্ত গুণ, অনন্ত ঐশ্বর্য, অসীম প্রেম, অমেয় শক্তি ইত্যাদি বহু মাহাত্ম্যের উল্লেখ করেছেন। তাঁর একটি শ্লোকে তিনি বলেছেন,—

সৌন্দর্যে কামকোটি সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি
বাৎসল্যে মাতৃকোটি স্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য সারে।

যিনি কোটি কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর, কোটি চন্দ্রের ন্যায় সকলের আনন্দদায়ক, কোটি জননীর ন্যায় স্নেহবান, কোটি কল্পতরুর সম দাতা,—সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব জয়যুক্ত হোন!

৭২

কয়েকমাস বৃন্দাবনে থেকে রূপ কোন প্রয়োজনীয় কার্যে অনুপমকে নিয়ে গিয়েছিলেন গৌড়দেশে,—সেখানে অনুপম পরলোক গমন করেন। তাই রূপের কিছু দেরি হয় গৌড় ত্যাগে।...গৌড় থেকে তিনি বৃন্দাবনে না গিয়ে বরাবর চলে আসেন নীলাচলে।...আশ্রয় নেন ভক্ত হরিদাসের ওখানে। মহাপ্রভু হরিদাসের কাছে এলে রূপ তাঁকে প্রণাম করলেন ভূমিষ্ঠ হয়ে।

'রূপ, এসেছ?'—প্রীতির আবেশে প্রভুর চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, —'এসো, এসো, খবর তোমাদের ভাল!'—গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন তিনি রূপকে।

রূপ গৌড়-গমনের এবং সেখানে অনুপমের মৃত্যুর সংবাদ দিলেন মহাপ্রভুকে। প্রভু ভারী ব্যথিত হলেন, বললেন,—'অনুপম সরল অকপট ভক্ত ছিল, —কোন আড়ম্বর তাঁর ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ তার আত্মার কল্যাণ করুন! যা-হোক, তুমি এখন আমার কাছেই থাক।'

ইতিমধ্যে গৌড়-ভক্তরাও প্রতিবারের মত এসে পড়লেন নীলাচলে।...প্রভুর সঙ্গে একই ভাবে আনন্দোৎসবে চারমাস কাটলো তাঁদের।—বিদায়কালে প্রভু এবারও জগন্নাথের বহু প্রসাদী দ্রব্য এবং একখানি বহুমূল্য শাটী পাঠালেন তাঁদের হাত দিয়ে মায়ের কাছে।......

রূপ কিন্তু প্রভুর কাছে থেকে গেলেন আরো কয়েকমাসের জন্যে। প্রভু তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে লাগলেন নানা বিষয়ে।...একদিন রূপ তালপাতার ওপর একটি শ্লোক রচনা করে সে-টি গুঁজে রাখলেন ঘরের চালে।...সহসা কিভাবে সেটি প্রভুর হাতে পড়ে যায়। প্রভুর বিস্ময় সীমা ছেড়ে যায় শ্লোকটি পড়ে,— 'এ-কি?'—বলে উঠলেন তিনি আপন মনে,,—'রূপ আমার মনের ভাব জানলো কেমন করে? এ-যে আমারই অন্তরের কথা রূপ পেয়েছে রূপের শ্লোকের মধ্যে।'

স্বরূপ ছিলেন পাশে দাঁড়িয়েঃ বললেন,—'তুমি যাকে কৃপা কর,—তার

পক্ষেই এ-অসম্ভব সম্ভব।'—প্রভু মৃদু হাসলেন,—ঐ শ্লোক অবলম্বন করে রূপকে কাব্য-প্রণয়নেও উৎসাহ দিলেন।...রূপ প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁর ছিল না। 'বিদগ্ধ মাধব এবং ললিত মাধব'—সংস্কৃতে রচিত এই নাটক দু'খানি বৈষ্ণব-সাহিত্যে রূপ গোস্বামীর অমর অবদান! রূপ বহু ভক্তি-গ্রন্থও রচনা করেন।...

শিক্ষাদান সমাপ্ত হলে মহাপ্রভু রূপকে আবার বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেন। বিদায়কালে বলেন,—'সেখানে পেঁাছে একবার সনাতনকে পাঠিয়ে দিও আমার কাছে।'—কিন্তু রূপ বৃন্দাবনে পেঁাছে সনাতনের দেখা পেলেন না;—তার আগেই তিনি অন্যপথ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন প্রভুর উদ্দেশে—নীলাচল-অভিমুখে।...

সুদীর্ঘ পথ।...আসতে অনেক দিন লাগে। দুর্গম পথে চলার কষ্টও বড় কম নয়। নীলাচলে পেঁাছতে পেঁাছতে সনাতনের সর্বাঙ্গ বিসর্পে ছেয়ে যায়। বিষাক্ত কণ্ডুর মুখ থেকে দূষিত রসও নির্গত হতে থাকে,—দুর্গন্ধে সনাতনের কাছে দাঁড়ানোও দায়।...কেউ বলে, পূর্বানুষ্ঠিত পাপের ফলে—কেউ বলে, পথে ঝারিখণ্ডের জল খেয়েই সনাতনের এই দুর্দশা! কিন্তু নির্বিকার-চিত্তেই ভোগ করেন সনাতন এই ব্যাধির যন্ত্রণা।

যা'হোক, সনাতনও এসে আশ্রয় নিলেন ভক্ত হরিদাসের বাসায়। উদার—সরল—অতিদীন—পরম নম্র হরিদাস,—কারো প্রতি কোন বিরাগ ছিল না তাঁর মনে, ছিল না কিছুমাত্র ঘৃণা,—সমাদরে আলিঙ্গন করে বসতে দিলেন তিনি সনাতনকে। প্রতিদিনকার মত মহাপ্রভুও এসে পড়লেন সেখানে হরিদাসকে দেখতে! প্রভু নিত্যই সংবাদ রাখেন তাঁর।...সনাতন মহাপ্রভুকে দেখেই একেবারে বিশ হাত দূরে গিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন।...'ও-কি, ও-কি সনাতন?'—প্রভু ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলেন,—'এসো, এসো কাছে এসো!—সাগ্রহে দুই বাহু বিস্তার করে অগ্রসর হলেন সনাতনকে আলিঙ্গন করতে।

'না, না, না,'—দারুণ কুণ্ঠায় সনাতনের কণ্ঠে গভীর আর্তি ফুটে উঠলো,—ছোঁবেন না, ছোঁবেন না প্রভু, পাপী অধমকে ছোঁবেন না,'—তিনি পিছিয়ে যেতে লাগলেন,—'আমি একে অস্পৃশ্য,—তায় সারা অঙ্গ আবার দূষিত বিসর্পে ভরে গেছে।—না, না, আপনার পুণ্য দেহে কণ্ডুর রস লেগে যাবে।...প্রভু, প্রভু, দূর থেকেই আশীর্বাদ করুন।

'সনাতন!'—প্রভুর কণ্ঠ গাঢ় হয়ে উঠলো,—'তুমি অস্পৃশ্য,—তোমার কণ্ডুর রস লেগে যাবে আমার গায়ে?—তাই তুমি আমাকে আলিঙ্গন দেবে না?...তবে

কি আমাকে ভালবাস না সনাতন?...তুমি অস্পৃশ্য নও সনাতন,—অতি পবিত্র,—তোমার ঐ কণ্ডুরস আমার কাছে চন্দনের প্রলেপ,—কৃষ্ণ তোমাকে দয়া করেছেন,—কৃষ্ণের কাছে আমাকে অপরাধী করো না সনাতন।'—সনাতনের কোন বাধা না মেনেই তাঁকে বক্ষে আবদ্ধ করলেন মহাপ্রভু। সে-দৃশ্যে হরিদাসের চোখেও জল এলো। প্রভু বললেন,—সনাতন, তুমি এখন কয়েক মাস আমার কাছে থাক,—তোমাকে আমার বিশেষ দরকার।

'প্রভুর আদেশ শিরোধার্য!'—সনাতন যুক্তকর হয়ে মাথা নত করলেন।

কিন্তু সনাতনের হলো মহা-মুস্কিল!...দিনের পর দিন অন্তর তাঁর ভরে ওঠে নিদারুণ অস্বস্তিতে—গভীর দুঃখে—প্রবল অনুশোচনায়। প্রভুর আদেশ,—রোজ তাঁর কাছে আসতে হবে।...আদেশ অবহেলা করতেও পারেন না সনাতন,—আর তিনি এলেই প্রভু তাঁকে আবদ্ধ করেন প্রগাঢ় আলিঙ্গনে। তাঁর বিসর্প-নির্গত যত দূষিত ক্লেদ লেগে যায় প্রভুর শ্রীঅঙ্গে। প্রভুর মনে অবশ্য বিকার নেই,—কিন্তু সনাতনের বুকের পাঁজরগুলো যেন খসে যায়,—ছিঃ, ছিঃ, কি পাপী সে,—কত শত লোক যাঁকে পুজো করছে,—ফুলচন্দন দিয়ে,—যাঁর পদ্মগন্ধী বরবপু অসীম পুণ্যের আধার,—তাঁর দেহে দূষিত কণ্ডুর রস লেপন করছে সে!...হায়, হায়, মৃত্যু কেন হয় না তার!

চোখের জলে ভেসে সনাতন যত বলেন,—'দোহাই প্রভু, আর না—আর না,—দীন-দয়ালের এত দয়া এ-পাপী আর নিতে পারছে না।—আপনি সচ্চিদানন্দ নির্বিকার পুরুষ,—পরম ভক্তবৎসল,—কিন্তু—কিন্তু আমি যে নরকের কীট!'—প্রভু ততই হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করেন সনাতনকে। সনাতনের এ-এক হয়েছে দুর্বিষহ যন্ত্রণা,—অথচ এ-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতিও নেই তাঁর।

শেষে সনাতন একদিন সংকল্প করলেন,—সামনে রথের সময় প্রভু যখন রথযাত্রা দেখবেন,—তখন তাঁরই সম্মুখে তাঁর চরণ দেখতে দেখতে তিনি জীবন বিসর্জন দেবেন রথচক্র-তলে।...কিন্তু প্রভু যেন অন্তর্যামী। সনাতনের সংকল্প গোচর হয়ে গেল তাঁর কোন রকমে। সনাতনকে আহ্বান করে তিনি বললেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে,—'সনাতন, তোমার কাছে আমি এমন কি অপরাধ করেছি যে—তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাও?...তোমার দেহ-প্রাণ তুমি আমাকে সমর্পণ করেছ,—আমার জিনিষে তোমার কি অধিকার সনাতন,—যে তাকে নষ্ট করবে?'—ক্রমেই গাঢ় হয়ে ওঠে প্রভুর স্বর,—'তোমার দেহ স্পর্শ করে আমিও পবিত্র হই,—ওই দেহ দিয়ে আমি লক্ষ লক্ষ জীবের কল্যাণ সাধন করবো। তোমার কণ্ডুরসের কোন দুর্গন্ধ তো আমি পাইনে সনাতন!' সহসা তিনি ব্যাকুলভাবে

একখানা হাত চেপে ধরলেন সনাতনের,—'বল সনাতন, তুমি এ-পাপ সংকল্প পরিত্যাগ করবে। তুমি পরম বৈষ্ণব, শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপার পাত্র,—আত্মহত্যার কল্পনা কি তোমার সাজে?'—এবার মহাপ্রভুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো ঝর ঝর করে।

সনাতন তখন মূক হয়ে গেছেন।...করুণাময় দেবতার অপার কারুণ্যের অমিয় স্পর্শে স্তব্ধ হয়ে গেছে তাঁর কণ্ঠের ভাষা। কোথায় সে শক্তি সনাতনের, যার দ্বারা প্রকাশ করবেন তিনি মহিমময়ের অনন্ত মহিমা?—শুধু প্রাণ দিয়ে যা উপলব্ধি করা চলে,—কিন্তু ব্যক্ত করা যায় না,—সেই বাক্যাতীত ভাবের প্রবল স্রোতে তখন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন সনাতন। বহু চেষ্টাতেও তাঁর কণ্ঠে কথা ফুটলো না। দুই গণ্ড শুধু প্লাবিত হয়ে গেল অশ্রুবন্যায়।

মহাপ্রভু আবার ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন,—উত্তর দাও সনাতন! বল, তোমার সংকল্পের কথা তুমি একেবারে ভুলে যাবে?

'প্রভু, প্রভু'—আকুল সনাতন প্রভুর চরণপ্রান্তে মাথা রেখে বললেন,—'আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনার প্রাণে ব্যথা দিয়ে আমি মহাপাপ করেছি।'

প্রভু এবার আশ্বস্ত হলেন।

এদিকে সনাতনের কণ্ডুর ক্লেদ প্রভুর পুণ্য দেহে লেগে যায় দেখে ভক্তদের মনে মনেও বিরক্তি জন্মেছে সনাতনের ওপর।—তাঁরা প্রভুর জন্যে বেদনাও অনুভব করেন প্রাণে। বিশেষ জগদানন্দ একেবারেই দেখতে পারেন না সে-দৃশ্য। জগদানন্দের অবিরত লক্ষ্য প্রভুর সুখ-সুবিধার দিকে,—তাঁর ভালমন্দের প্রতি। তা'ছাড়া, তাঁর যেন আর কোন চিন্তাই নেই।...এ-নিয়ে প্রভুর ওপর তাঁর রাগ-অভিমানও চলে। প্রভু কোন জিনিষ খাবেন না,—জগদানন্দ জিদ ধরবেন খেতেই হবে। কথা না রাখলেই জগদানন্দের হলো রাগ! অভিমান করেই হয়ত পড়ে থাকলেন তিনি দু'দিন না খেয়ে। তখন অনেক করে প্রভুকেই তাঁর মান ভাঙ্গাতে হয় শেষে। ভক্তবৎসল প্রভুর এ-ও হয়েছে এক কঠিন মায়া। ভক্তের ব্যথা যে তাঁরই প্রাণে বাজে!

জগদানন্দ একদিন যুক্তি দিলেন সনাতনকে,—'তুমি প্রভুকে না বলে বৃন্দাবনে চলে যাও।' সনাতন অবশ্য ভক্তদের বিরক্তি তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য বলেই মনে করতেন। সত্যিই তো, এ-যে তাঁর নিজের পক্ষেই বেদনা-দায়ক,—অন্যে বেদনা না পাবেন কেন? কিন্তু তিনি কোন দিন তাঁর আরোগ্যের জন্য প্রভুর দয়া-ভিক্ষা করতেন না। ভাবতেন,—নিজের পাপের ফল ভোগ করছে সে,—প্রভুর দয়া প্রার্থনার কি অধিকার আছে তার?—আত্মহত্যার সংকল্প যখন বিফল হলো, তখন জগদানন্দের যুক্তিই সমীচীন বলে মেনে নিলেন সনাতন। কিন্তু প্রভু বুঝি সর্বজ্ঞ-ও। সবই জানতে পেরে তিনি বললেন ক্ষুব্ধ উত্তেজনায় সনাতনকে,

—'জগদানন্দের এত স্পর্ধা, তোমাকে যুক্তি দেয়! কিন্তু আমিও বলি, সনাতন, —আমার আদেশ না পেলে তুমি কোথাও এক পা যাবে না। আর কারো যুক্তি বা আদেশ তোমার জন্যে নয়।'

কথা হচ্ছিল হরিদাসের ওখানে। সহসা প্রভুর দিকে মিনতির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন তিনি,—'কিন্তু প্রভু, তোমার কৃপায় কতজনের কত ব্যাধি উপশম হয়ে গেল,—সনাতনের এ দুর্ভোগ কেন? সনাতন তো নিজে বলবে না, কিন্তু আমি মিনতি করছি প্রভু, এ যন্ত্রণা থেকে সনাতনকে মুক্তি দাও।—সনাতনের দেহ তো তোমার কাজেই লাগবে?'

প্রভু মৃদু হাসলেন। এতদিন ধরে তিনি কঠোরভাবে পরীক্ষা করেছেন তাঁর নিজেকে.—এবং সনাতনকেও। এবার কিন্তু পরীক্ষা শেষ হয়েছে তাঁর।... সনাতনকে প্রীতি-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে তিনি বললেন,—'সনাতন, তুমি প্রকৃত ভক্ত,—ভক্তের দেহ কি কখনো দূষিত হয়? কৃষ্ণের কৃপায় তুমি অবশ্যই ব্যাধিমুক্ত হবে।

কৃষ্ণের কৃপা, কি মহাপ্রভুরই কৃপা,—অথবা এ-দুই কৃপাই অভিন্ন,—তা মহাপ্রভুই জানেন! সনাতনের দেহের কণ্ডু কিন্তু সেই থেকেই আশ্চর্যভাবে মিলিয়ে গেলো। সনাতন সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত হয়ে উঠলেন। পরীক্ষা শেষে আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে প্রভু যেন শান্তি-প্রেলেপ মাখিয়ে দিলেন তাঁর সর্বাঙ্গে। াতনের দেহে ফুটে উঠলো এক নবীন দীপ্তি—স্নিগ্ধ, পুণ্য ও নির্মল।

পরে মহাপ্রভু আদেশ করলেন সনাতনকে,—'এবার বৃন্দাবন যাও, কাজ কর। রূপ এবং তোমার ওপর আমার অনেক আশা,—বৃন্দাবনের লুপ্ত গরিমা তোমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে—বৈষ্ণবের মহান আদর্শ। কোন চিন্তা নেই, শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের শক্তি যোগাবেন।'

কৃতার্থ সনাতন প্রভুকে প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করলেন। মহাপ্রভুর শক্তি-সম্পন্ন দু' ভাই রূপ ও সনাতন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন মহাপ্রভুর নির্দেশ। নিঃসম্বল কপর্দকহীন সন্ন্যাসী,—শুদ্ধ প্রেম-ভক্তি-নিষ্ঠা ও হৃদয়-বত্তার গুণে—বন-জঙ্গলময় বৃন্দাবনকে সমৃদ্ধ করে তোলেন অপূর্ব শোভা-সম্পদে। কত দেবালয়, কত মন্দির গড়ে ওঠে তাদের জীব-কল্যাণাত্মিকা নিষ্কাম সাধনা-প্রভাবে। সেই সে-দিনের নানা অপকর্ম-নিরত দবির খাস ও সাকর মল্লিক,—রূপ ও সনাতন গোস্বামীরূপে আজিও লক্ষ লক্ষ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন শ্রদ্ধার আসনে—অপূর্ব গরিমায়। বৃন্দাবনের দিকে দিকে অক্ষয়-অমর হয়ে আছে তাঁদের পূত জীবনের পুণ্যকীর্তি। সকলের ওপর দীপ্তিমান ভাস্করের মত বিরাজ করছে একটি নাম—প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ।

৭৩

অতঃপর মহাপ্রভু সগৌরবেই বাস করতে লাগলেন নীলাচলে। ভক্ত রামানন্দ এবং সার্বভৌম তো প্রভুর অনুক্ষণেরই সঙ্গী,—তা'ছাড়া রাজা প্রতাপরুদ্রও প্রায়ই আসেন প্রভুকে প্রণাম করতে; তাঁর সান্নিধ্যলাভে কৃতার্থ হতে।...প্রভুর ভক্তগোষ্ঠী ক্রমেই বেড়ে উঠেছে,—কতদিক থেকে কত বিশিষ্ট ঐশ্বর্যশালী লোক সর্বস্ব ছেড়ে এসেও শরণ নিচ্ছেন প্রভুর চরণ-তলে। চট্টগ্রাম থেকে পরমভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিও এসেছেন নীলাচলে। ভক্তজন-সঙ্গে অবিরত কৃষ্ণ-কথা আলোচনায় প্রভুর দিন কাটছে আনন্দেই।

প্রভুর কাছে কিন্তু কপটতার স্থান ছিল না। অন্তরে এক—বাইরে আর,—এ তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না।...সর্বজনমান্য ভক্ত হরিদাস ছাড়াও প্রভুর হরিদাস-নামে আর এক ভক্ত ছিলেন। তাঁকে অভিহিত করা হতো 'ছোট হরিদাস' বলে।...মাধবী দাসীর কাছে তণ্ডুল ভিক্ষা করায় 'প্রকৃতি-দর্শন' অপরাধে প্রভু তাঁকে বর্জন করেন। প্রভুর ভক্তগোষ্ঠীর মাঝে দামোদর ছিলেন যেমন সরল, প্রভুভক্ত—তেমনি স্পষ্টবাদী। প্রভুকেও স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিতে বাধতো না তাঁর। তিনি বললেন,—'ছোট হরিদাসকে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।...শিখি মাহাতির বোন মাধবী দাসী,—বৃদ্ধা, সুপণ্ডিতা,—প্রভুর ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যেই গণ্যা,—প্রভুর কৃপাও তিনি পেয়েছেন,—তাঁর কাছে তণ্ডুল-ভিক্ষা—হরিদাসের 'প্রকৃতি-দর্শন-পাপ' বলে গণ্য হতে পারে না।'

তা বটে!—প্রভু হাসলেন,—মৃদু হাসি!—'তোমার কথা যুক্তিযুক্ত'—বললেন দামোদরের দিকে চেয়ে,—'কিন্তু আমি লোকের অন্তর পড়তে পারি,—তাই হরিদাসকে দণ্ড দিয়েছি। মাধবী দাসী উপলক্ষ-মাত্র।......হরিদাস আমার পার্ষদ,—কিন্তু তার বৈরাগ্য—'মর্কট বৈরাগ্য।' অন্তরে অন্তরে এখনও তার ইন্দ্রিয়-লালসার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়নি।...অন্যে না জানুক,—হরিদাসের নিজের মন তা জানে। এ রকম লোক আমার পার্ষদ-গোষ্ঠীর মধ্যে থাকতে পারে না।

তাই তাকে বর্জন করেছি। যদি সে কোন দিন নিজেকে সংশোধন করে ফিরে আসে,—আমি সানন্দেই গ্রহণ করবো তাকে। গীতা বলেছেন—

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ।
ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥...

কিন্তু ফিরে আর এলেন না হরিদাস।...ইন্দ্রিয়ের দিক দিয়ে তাঁর এখনও কিছু দুর্বলতা ছিল বটে,—কিন্তু মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তি ছিল তাঁর অকপট। তাই প্রভুর বর্জন তাঁর অন্তরে করলো প্রচন্ড আঘাত। তিনি মনের দুঃখে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁর দেহত্যাগের সংবাদ প্রভুর সভায় পেঁাছতে—দামোদর বলে উঠলেন,—মুখে তাঁর কি-যেন ক্ষোভের মলিন হাসি,—'কিন্তু প্রভু, তোমারও একটা কাজ ভাল হচ্ছে না!...তবে তুমি ভগবান, তাই তুমি সকল সন্দেহ—সকল তর্কের অতীত। তবু জগৎ যে বড় মুখর প্রভু!

প্রভু বুঝলেন,—তাঁর কোন আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন দামোদর।—তাই ব্যগ্র-কণ্ঠে বললেন,—কি বলছো দামোদর,—একটু খুলে বলো ত?...কি অপরাধ করেছি আমি?

'প্রভু',—স্পষ্টবাদী দামোদর,—কণ্ঠে তাঁর কোন জড়তা নেই,—'ওই যে একটি পরম সুন্দর বালক,—নিত্য দুবেলা আসে তোমার কাছে,—আর তুমিও তাকে বড় ভালবাস; আদর করে কাছে বসিয়ে কথা কও তার সঙ্গে। তা' তুমি নিজে বালক-স্বভাব,—শিশুসঙ্গও পবিত্র সঙ্গ; তাই আনন্দ পাও সে এলে।—তাতে দোষের কিছু নেই।...কিন্তু ওই বালক পিতৃহীন,—আর তার মা পরমাসুন্দরী যুবতী লাবণ্যময়ী।—আর তুমিও কন্দর্পতুল্য রূপবান যুবক,—লোকে কবে কি আলোচনা করে বসে,—তাই ভাবছি!

এতক্ষণে দূর দৃষ্টি দামোদরের ক্ষোভের কারণ বুঝতে পারলেন প্রভু,—এবং মুক্তকণ্ঠেই বললেন,—সত্যিই দামোদর, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি বালকের কথাই ভেবেছি, তাকে জড়িয়ে আর যা আছে,—তা আমার চিন্তারও বাইরে! তবু লোকে যাতে আমার ছিদ্র না পায়,—আমাকে সেইভাবেই চলতে হবে।.. তুমি আমার পরম সুহৃৎ।...এবার থেকে তুমি আমার মায়ের কাছে ......যদিও সেখানে উপযুক্ত লোক আছে—তবু আমার মায়ের রক্ষণাবেক্ষণের তুমিই যোগ্যতর পাত্র।......

মহাপ্রভুর আর একজন ভক্ত ছিলেন,—বল্লভ ভট্ট। তিনি পূর্ব থেকেই ছিলেন বৈষ্ণব,—তবে তাঁর সাধন-ভজনের ধারা ছিল স্বতন্ত্র।...তাঁরও একটি সম্প্রদায় ছিল।—তিনি মনে করতেন, চৈতন্যদেবও যেমন এক সম্প্রদায়ের প্রভু,—তিনিও তেমনি।...শ্রীচৈতন্যও ধর্মপ্রচারক,—তিনিই-ও তাই। সুতরাং দু'জনেই

সমান। বরং তিনি একজন গ্রন্থকর্তা,—শ্রীচৈতন্য তা মন।...কিন্তু মুখে প্রভুর কাছে এসে তিনি বলতেন,—'আপনার চরণ দর্শন না করে থাকতে পারি না।—আপনি স্বয়ং নারায়ণ,—অধম যেন আপনার কৃপা থেকে বঞ্চিত না হয়।'—তাঁর এই কপটতা শীঘ্রই ধরা পড়ে গেল গভীর অন্তর্দর্শী মহাপ্রভুর কাছে। তিনি নির্বিচারে বর্জন করলেন তাঁকে।

তখন চোখ ফুটলো বল্লভ ভট্টের। শীঘ্রই বুঝলেন,—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর তিনি এক নয়,—দুয়ের মধ্যে কল্পনাতীত ব্যবধান।...মহাপ্রভু কিন্তু আর তাঁর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাও ক'ন না।...তখন তিনি অন্যোপায় না দেখে যমেশ্বর টোটায় গিয়ে গদাধরের শরণাপন্ন হলেন।

গদাধরের চেষ্টায় আবার স্থান হলো বল্লভ ভট্টের প্রভুর পার্ষদ-গোষ্ঠীতে। —অবশ্য তখন তাঁর মনের মোহ কেটে গেছে নিঃশেষে।

*　　　*　　　*

ভক্তদের মধ্যে রঘুনাথ ছিলেন তিন-চারজন। তবে—রঘুনাথ দাস এবং রঘুনাথ ভট্ট (মিশ্র) এ'দেরই নাম সকলের পরিচিত। এ'রা দুজনেই ঐশ্বর্য-শালী পিতার সন্তান। রঘুনাথ দাস কিশোর বয়সেই—প্রভুর শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে অবস্থিতির সময় তাঁর চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।...প্রভু তাঁকে নানা উপদেশ দিয়ে তখন বাড়ী ফিরিয়ে দেন।...তারপর তাঁর পিতা সুন্দরী মেয়ে দেখে তাঁর বিয়ে দেন;—তাঁকে ঘরে ধরে রাখতে সাংসারিক বহু প্রলোভনই তুলে ধরেন তাঁর সম্মুখে।...কিন্তু রঘুনাথ সব মায়া এবং বন্ধন কেটে—এবার এসে পড়লেন নীলাচলে। তাঁর আকুতি দেখে,—প্রভু আর তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তিনি বরাবর প্রভুর কাছেই থেকে গেলেন নীলাচলে। দীনতায় তিনি ছিলেন বৈষ্ণবেরও আদর্শ!...উত্তরকালে রঘুনাথ দাস—রূপ-সনাতনের ন্যায় গোস্বামীরূপে বাস করেন বৃন্দাবনে।......

এর পর তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট সহসা কাশী থেকে একদিন উপস্থিত হলেন এসে নীলাচলে।...প্রভুর কৃপালাভের সৌভাগ্য বহু পূর্বেই হয়েছিল মিশ্রঠাকুরের।...এখন তাঁর পুত্র রঘুনাথকেও প্রভু গ্রহণ করলেন সস্নেহে —সাদরে।...কিন্তু কয়েকদিন তাঁকে কাছে রেখে বললেন,—রঘু, তুমি এখন বাড়ী যাও। তোমার মাতা-পিতা বৃদ্ধ হয়েছেন। এখন তাঁদের সেবা করাই তোমার পরম ধর্ম,—প্রধান কর্তব্য। তাঁরা গত হলে তুমি আসবে আমার কাছে। ...তা ছাড়া, বৈষ্ণবশাস্ত্র, ভাগবত ইত্যাদি আগে ভাল করে অধ্যয়ন কর। আর আমার কাছে যদি ফিরে আসতে চাও,—তবে বিবাহ করো না।

আসল কথা, বৃদ্ধা মাতাকে শোকে ভাসিয়ে,—কিশোরী পত্নীর বুকে দুঃখের আগুন জেবলে সন্ন্যাস নিয়ে—প্রভুর প্রাণে একটা অস্বস্তি থেকেই

গিয়েছিল।...বিশেষ বৃদ্ধ বয়সে মায়ের সেবা না করে—সন্ন্যাস গ্রহণ করায় তিনি নিজেকে সময়ে সময়ে অপরাধীই মনে করতেন! অনুরূপ অপরাধ তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে যেন আর কেউ না করে—সে দিকে ছিল মহাপ্রভুর সদা-জাগ্রত দৃষ্টি।

অল্পদিনের মধ্যেই কিন্তু রঘুনাথ ভট্টের মাতা-পিতা সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন পরলোকে।...মহাপ্রভুর উপদেশমত শেষ বয়সে তাঁদের সেবা-যত্ন করে রঘুনাথ জীবনে পেলেন পরম সান্ত্বনা।...নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি এবার নীলাচলে এসে প্রভুর আশ্রয় নিলেন।...কিন্তু সাত-আট মাস তাঁকে নিজের কাছে রেখে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে প্রভু বললেন,—'রঘুনাথ, তুমি এবার বৃন্দাবনে যাও। রূপ-সনাতনের আশ্রয়ে গিয়ে থাক। তাতে তোমার আরো কল্যাণ হবে।'

রঘুনাথ দ্বিরুক্তি করলেন না। অবিলম্বে হৃষ্টচিত্তেই তিনি যাত্রা করলেন বৃন্দাবনে। রূপ-সনাতন সমাদরেই গ্রহণ করলেন তাঁকে।...রঘুনাথের কণ্ঠ ছিল অতি সুললিত,—ভাগবতে তাঁর অধিকারও ছিল প্রচুর। তিনি যখন রূপ-সনাতনের সভায় বসে ভাগবত পাঠ করতেন, তখন যেন সুধাই ঝরে পড়তো চারিদিকে। এইগুণে তিনি প্রধান ভাগবতীরূপে সম্মানিত হলেন বৃন্দাবনে।

বৃন্দাবনের লুপ্ত-গৌরব পুনরুদ্ধারে এই গোস্বামীদেরও দান বড় কম ছিল না।...রূপ-সনাতনের সহায়করূপে এ'দেরও নিষ্ঠা ছিল প্রচুর।

কথিত আছে,—সনাতন গোস্বামী সম্রাট আকবর এবং জাহাঙ্গীরেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন—তাঁর অসাধারণ শক্তি ও ত্যাগের মহিমায়।

৭৪

'প্রভু, আমি আর দেহভার বহন করতে পারছি না।'—বললেন ভক্ত হরিদাস, —'আশীর্বাদ' করুন, শীঘ্রই আমি যেন শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় পাই। আমি আর নামের সংখ্যাও পূরণ করতে পারছি না।'

পরম ভগবত হরিদাস অতিবৃদ্ধ হয়েছিলেন। জরাভারগ্রস্থ দেহ দুর্বহ হয়ে উঠেছিলেন তাঁর পক্ষে। আগে তিন লক্ষ বার হরিনাম জপ করতেন তিনি প্রতিদিন। এখন সে-শক্তিও আর ছিল না তাঁর। হরিদাসের প্রার্থনায় প্রভুর চোখ-দুটি ছলছল করে উঠলো। 'যবন' হরিদাস,—প্রভুর বড় আদরের—বড় স্নেহের। অবশ্য তিনিও বুঝে দেখলেন,—এই দুর্বিষহ জরার যন্ত্রণা ভোগের চেয়ে হরি-দাসের এবার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হওয়াই মঙ্গলের। গাঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন,—'হরি-দাস, তোমার বিচ্ছেদ আমার বুকে বড়ই বাজবে। তবু আশীর্বাদ করি,—শীঘ্রই তুমি মুক্তিলাভ কর। কিন্তু এখন আর নাম-জপ নেই বা করলে হরিদাস?—নাম কেন—নামীই যে মিশে আছেন তোমার প্রতি অনু-পরমাণুতে!'

'কিন্তু প্রভু,'—হরিদাসের চোখে ফুটলো কাতর ঐকান্তিক প্রার্থনা—'আমাকে একটি বর দিতে হবে। আমি যেন তোমার সম্মুখে সজ্ঞানে তোমার চরণ ধ্যান করতে করতে বিদায় নিতে পারি।'

'তাই হবে হরিদাস!'—মহাপ্রভুর কণ্ঠ গাঢ় হয়ে উঠলো!...

এর দু-এক দিন পরেই হরিদাসের জ্বর হলো।—জ্বর সামান্যই। তবু সংবাদ পেয়েই মহাপ্রভু ভক্তজন-সঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হলেন তাঁর কাছে।...মহা-আনন্দিত হয়ে হরিদাস জ্বর দেহেই প্রভুকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে—ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে ভক্তগণ কীর্তন সুরু করলেন। প্রভুর চরণ-প্রান্তে বসে তাঁর করুণা-ঢলঢল মুখখানি দেখতে দেখতে হরিদাস নশ্বর-দেহ ত্যাগ করে চলে গেলেন দিব্যধামে!...তাঁর তিরোধানে এক পরম ভাগবত-জীবনের অবসান হলো,—একটি সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়লো যেন মহাপ্রভুর হৃদয়াকাশ থেকে। মহাসমারোহে প্রভু তাঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করলেন।...

কিন্তু জগদানন্দকে নিয়ে প্রভু কি ঝঞ্ঝাটেই না পড়েছেন! প্রভুর পক্ষে যা মঙ্গলকর মনে হবে,—তাই করে বসবেন জগদানন্দ।—আর প্রভু অমত করলেই বিপদ! মধ্যে একবার গৌড়ে গিয়ে জগদানন্দ অনেক পরিশ্রমে—অনেক ভাল ভাল মশলাদি-সংযোগে প্রভুর জন্যে তৈরী করে এনেছেন একেবারে এক কলসী সুগন্ধী চন্দনাদি তৈল।—আহা, প্রভুর আমার ভাবের শরীর,—বায়ু তো কুপিত হয়েই আছে!...তেলটা ব্যবহার করলে, প্রভুর মাথা তবু ঠাণ্ডা থাকবে।...একটু আরাম পাবেন।

তেলের কলসীর কথা শুনে প্রভু তো ভেবেই অস্থির! এই রে, আবার বুঝি ঝগড়া বাধে জগাইয়ের সঙ্গে। ভয়ে ভয়ে খুব মিষ্টি করেই তিনি বললেন, —ওহে-ও জগাই, তেলটা তুমিই মাথায় দাও,—তোমারই দেখছি মাথা খারাপ হয়েছে!...নইলে আমি সন্ন্যাসী মানুষ,—তুমি আমার জন্যে নিয়ে এলে গন্ধতেল তৈরী করে। বলি—আমার বিলাসিতা দেখে লোকে যখন বিদ্রূপ করবে,— তখন কি তোমার ভাল লাগবে?—দেখতো বুঝে?

কিন্তু এ আর কেউ নয়, স্বয়ং জগদানন্দ। মুহূর্তে মুখ ভার হয়ে উঠলো তাঁর!—'স্বাস্থ্যরক্ষা আর বিলাসিতা তো এক নয় প্রভু,'—অনেক ভেবে একটা উত্তর খাড়া করলেন তিনি,—'আর গন্ধ তো ওর মশলারই,—আমি তো আর ইচ্ছে করে কোন গন্ধ মেশাইনি ওতে! লোকের কি?...বলে দিলেই হলো! মুখ থাকলেই অমন বলে! কিন্তু যখন ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাও,—তখন আসে লোকে খবর নিতে?—তখন এই জগাইদেরই যত ভাবনা!'

না, জগদানন্দের সঙ্গে পারবার যো নেই!—প্রভু মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন,—কিন্তু তা বলে সত্যিই তো আর সুগন্ধী তেল ব্যবহার করা যায় না? —'শোন জগদানন্দ,'—একটু ইতস্ততঃ করেই প্রভু বললেন,—তেলের কলসীটা জগন্নাথ-মন্দিরে পাঠিয়ে দাও। সেখানে প্রদীপে ব্যবহার করা চলবে। তাতে তোমারও পুণ্যে আছে।...কারণ জগন্নাথের সেবায়—

আর শোনার ধৈর্য থাকলো না জগদানন্দের। কত পরিশ্রমে, কত দ্রব্য সংগ্রহ করে প্রভুর উপকারের জন্যে তেল তৈরী করে আনলাম,—আর তিনিই বলেন কি-না,—প্রদীপে পুড়িয়ে দাও!—যার জন্যে চুরি করি,—সেই বলে চোর! দারুণ অভিমানে জগদানন্দ তন্দণ্ডেই বাসায় ফিরে দরজায় খিল এঁটে পুরো দুটি দিন নির্জলা উপবাস দিয়ে পড়ে থাকলেন। কেউ তাঁকে দরজা খোলাতে পারলেন না।...সংবাদ পেয়ে প্রভু হাসতে হাসতে ছুটলেন জগদানন্দের কাছে।...তারপর জগদানন্দের মান ভাঙ্গাতে প্রভুর সে কি উদ্বেগ,—কি আকুল প্রয়াস!......

কিন্তু তবু কি নিস্তার আছে জগাইয়ের কাছে ? একদিন তো প্রভুর জন্যে —প্রভুর ব্যবহৃত বহির্বাস-কৌপীন ইত্যাদি দিয়ে এক তোষক আর এক বালিশ তৈরী করে বসলেন।—আহা, প্রভু আমার কঠিন মেঝের ওপর বাহু-উপাধানে শুয়ে থাকেন,—না-জানি গায়ে কতই না বাজে! এতে তবু একটু আরাম পাবেন!...শয়ন-কক্ষে ঢুকতেই তো প্রভুর চোখ কপালে ওঠে,—'এ আবার কে করলে ?'—বললেন ভক্তদের ডেকে,—'এ সব কে পাতলে এখানে ?'...জগদানন্দ তখন দাঁড়িয়ে আছেন এক পাশে চুপটি করে। কে একজন উত্তর দিলেন,— 'তোমার জগাই প্রভু ?'

'না, পাগলটাকে নিয়ে আর পারি না!'—প্রভুর মুখে যেন ঈষৎ বিরক্তিই ফুটে উঠলো,—'আজ এলো তোষক-বালিশ, কাল আসবে লেপ,—তার পর আসবে খাট-মশারি,—তারপর আরও কিছু!—তাহলে তো নবদ্বীপ ফিরে যাওয়াই ভাল।'

ওদিকে জগাই-এর মুখে তখন আঁধার নেমে এসেছে। তবে এবার আর বেশি বাড়াবাড়ি করলেন না। মাত্র একদিন উপোস দিয়েই প্রভুর 'অনাদরের' শোধ তুললেন।

ভক্তেরা কৌতুক করে বলতেন,—'প্রভু হয়েছেন কৃষ্ণ, আর জগাই হয়েছে সত্যভামা।'

মন্তব্য শুনে প্রভুও মৃদু মৃদু হাসতেন,—তা বটে! ও আমার সত্যভামাই হয়েছে!...অনুরাগও যত,—অভিমানও তত! আর আমি মান ভাঙ্গাতেই সারা!—

প্রভু কিন্তু বড় ভালবাসতেন জগদানন্দকে,—তাঁর অকপট নির্বুদ্ধিতা এবং অকৃত্রিম প্রেমানুরাগের জন্যে!......

* * *

গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ানো হবে। সব ব্যবস্থাই হয়ে গেছে। একেবারে মৃত্যুর মুখেই এসে দাঁড়াতে হয়েছে তাঁকে।...এ-গোপীনাথ অবশ্য সার্বভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্য নন,—ইনি রামানন্দ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীনাথ রায়।...মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অধীনে তিনি তাঁর রাজ্যের একাংশের 'অধিকারী,'—মানে শাসন-কর্তা।...রাজার প্রাপ্য রাজস্ব 'বারো লক্ষ কাহন' তিনি আত্মসাৎ করেছেন নির্বিচারে।...তবু সহৃদয় নরপতি তাঁকে প্রচুর সময় দিয়েছিলেন ঘাটতি পূরণ করে দিতে। কিন্তু সে আর সম্ভব হয়নি গোপীনাথের পক্ষে। এ-দিকে রাজার এক ছেলের রাগ ছিল গোপীনাথের ওপর খুব বেশি। সুযোগ বুঝে রাজ-কুমার পিতাকে উত্তেজিত করতে লাগলেন গোপীনাথের বিরুদ্ধে।

পুত্রের প্ররোচনায় উত্তেজিত হয়ে রাজা অবশেষে বললেন,—আর দশ দিনের মধ্যে ও যদি টাকা না দিতে পারে,—তবে ও-কে চাঙ্গে চড়ানো হবে। তবে হ্যাঁ, একেবারে চাঙ্গে চড়িয়ে দিয়ো না। প্রথমে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চেষ্টা করবে। তাতে ফল হয়,—কাজ নেই আর ও-সব করে।

কিন্তু রাজকুমারের মনের অবস্থা তখন 'ডেকে আনতে বললে বেঁধে আনার' মত। তিনি গোপীনাথকে একেবারে চাঙ্গে চড়াবারই হুকুম দিয়ে বসলেন! ...এ চাঙ্গে-চড়ানো হলো একেবারে চরম দণ্ড। নীচে পাতা থাকে ভীষণ-দর্শন বিশালকায় এক সুতীক্ষ্ম অস্ত্র,—ওপর থেকে অপরাধীকে ফেলে দেওয়া হয় তার ওপর। ব্যস, অমনি সে দু ফাঁক। যেন বঁটির মুখে কচি লাউ দুখানা হয়ে গেল! সুতরাং গোপীনাথের জীবনাশঙ্কায় তাঁর হিতৈষীরা ছুটে এলেন ব্যাকুলভাবে মহাপ্রভুর কাছে। তাঁদের বিশ্বাস,—রাজা প্রভুর মহাভক্ত; প্রভু যদি ইঙ্গিতমাত্রও করেন,—তবে গোপীনাথ এ-যাত্রা বেঁচে যাবে।......

কিন্তু তাঁদের প্রার্থনা শুনেই বিরক্তি ফুটে উঠলো প্রভুর মুখে,—'সে-কি ?' —বললেন তিনি অপ্রসন্ন কণ্ঠেই,—'এ-বিষয়ে আমি রাজাকে অনুরোধ করবো কোন্ অধিকারে ?...হতে পারেন তিনি আমার ভক্ত,—কিন্তু রাজ্যের অধিপতি তো তিনি ?...আমি কি তাঁর রাজ্যে বাস করে তাঁর রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করবো ? ...আর গোপীনাথ তো সত্যই অপরাধী,—তিনি প্রচুর 'তঙ্কা' পান এজন্যে রাজার কাছে, তবু পরস্ব অপহরণ করেছেন! অপরাধীর যোগ্যদণ্ডের বিধান করবেন রাজা,—রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী আমার প্রিয় হলেও—আমি তাতে অনধিকার চর্চা করতে পারবো না। ছিঃ ছিঃ, এই সব দেনা-পাওনার কথাও আমাকে শুনতে হয় ? এমন হলে যে আমাকে নীলাচল ছেড়েই চলে যেতে হবে !'......

কথাটা উঠলো সহসা রাজার কানে।...'কি, কি ?'—চমকে উঠলেন তিনি যেন ঘোর আতঙ্কে,—'এই সব কথায় মহাপ্রভুকে বিরক্ত করা হয়েছে ? এত নির্বোধ সব !..কি সাংঘাতিক কথা,—প্রভু নীলাচল ছেড়ে চলে যাবেন বলেছেন ! না, না, চাইনে আমি গোপীনাথের কাছে টাকা ফিরে !'—সঙ্গে সঙ্গে এক কর্ম-চারীকে ডেকে আদেশ দিলেন,—'যাও, এক্ষুনি গোপীনাথকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো। হাজার হোক, সে রাম রায়ের ভাই,—তার প্রাণদণ্ড হলে আবার এ-সব কথা প্রভুর কানে উঠবে।...না, না, তাতে আর কাজ নেই। গোপীনাথ যেমন কাজ করছে, করুক।'

মহাপ্রভু নিজে কিছু করলেন না বটে,—কিন্তু পরোক্ষে তাঁরই প্রভাব এ-যাত্রা রক্ষা করলো গোপীনাথকে।

* * *

গরুড় মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে নিত্যকার মত জগন্নাথ দর্শন করছেন মহা-

প্রভু।...তন্ময় হয়ে চেয়ে আছেন নিষ্পলক নেত্রে দেব-বিগ্রহের দিকে। কৃষ্ণভদ্রা-বলরাম যেন জীবন্ত হয়ে স্ব-স্ব মহিমায় ফুটে উঠেছেন তাঁর ভাবমুগ্ধ নেত্রে। এ-দিকে কখন যে একটি স্ত্রীলোক ভিড়ের জন্য জগন্নাথ দর্শনের সুবিধা করতে না পেরে—এক পা গরুড় মূর্তির ওপর এবং আর এক পা মহাপ্রভুর কাঁধে দিয়ে স্বচ্ছন্দে জগন্নাথ দেখছে,—সে-হুঁস প্রভুর একেবারে নেই।—আর মেয়েটিরও খেয়াল নেই কোথায় পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে সে।

সহসা ভৃত্য গোবিন্দর দৃষ্টি পড়লো সেদিকে,—'এই, এই'—চমকে উঠে রূঢ় তিরস্কার করে উঠলো সে মেয়েটিকে,—'তোমার কি একটু কাণ্ডজ্ঞানও নেই বাপু,—দাঁড়িয়েছ একেবারে মহাপ্রভুর কাঁধে পা দিয়ে?...নামো, নামো।' —মেয়েটিরও এবার চমক ভাঙলো,—নীচের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দারুণ লজ্জায় জিভ কেটে অপার কুণ্ঠায় নেমে পড়লো সে,—'প্রভু, প্রভু,'—প্রভুর চরণে পড়ে কাতর কণ্ঠে বললে,—'বড় অপরাধ হয়েছে আমার!—ক্ষমা কর ঠাকুর, ক্ষমা কর।'

এ-দিকে গোবিন্দর রূঢ়কণ্ঠে প্রভুর তন্ময়তাও কেটে গিয়েছিল। কিছুই বুঝতে আর বাকী ছিল না তাঁর।—গোবিন্দ কিন্তু তখনও তিরস্কার করছে মেয়েটিকে। প্রভু বলে উঠলেন ব্যগ্র কুণ্ঠায়,—'গোবিন্দ, কর কি? থাম, থাম। ও কিছু অন্যায় করেনি।.........ওর নিষ্ঠা কত গভীর ভাব দেখি?.........শ্রীমুখ দেখবার আগ্রহে আমার কাঁধে যে পা দিয়েছে,—সে হুঁসও নেই!—আহা, এমন নিষ্ঠা আমার কবে হবে?'—পরে মেয়েটিকে আশ্বস্ত করে বললেন,—'কুণ্ঠা কিসের মা? ওঠো, ওঠো। তোমার এই নিষ্ঠার আমিও কাঙগাল। হবে—হবে,—তোমার প্রতি কৃষ্ণের কৃপা হবে মা!'

মহিমময়ের মহিমার স্পর্শে মেয়েটির প্রাণ তখন গলে গেছে। প্রাণের অর্ঘ্য ঝরে পড়ছে অশ্রুরূপে দুটি চোখ দিয়ে। প্রভু কিন্তু তখন আবার আত্মহারা হয়ে গেছেন জগন্নাথের ধ্যানে!

৭৫

অনেক দিন পরে প্রভু নিত্যানন্দ এসেছেন এবার নীলাচলে। অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তগণও এসেছেন অনেকে। মহাপ্রভুকে প্রণাম করে নিত্যানন্দ তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। নিতাইকে পেয়ে প্রভুর কি আনন্দ!...প্রগাঢ় প্রেমে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে,—নিজের সংবাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর সর্বাঙ্গীন সংবাদ।...ইতিমধ্যে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচুর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তিনি মহাপ্রভুকে সে পরিচয় দিয়ে বললেন মৃদু হেসে,—প্রভু, ভাল মন্দ বুঝি না, তুমি যা করাচ্ছ,—তাই করছি।...আমার কর্তব্য তোমার আদেশ-পালন,—আমার ধর্ম তোমারই প্রীতি-সম্পাদন।

'শ্রীপাদ, শ্রীপাদ,'—প্রীতির আবেশে মহাপ্রভুর চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো,—কণ্ঠে প্রকাশ পেলো বিপুল উচ্ছ্বাস,—তোমার সংবাদ পেয়ে কি-যে সুখী হলাম,—তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। তুমি আমার একটা মহা-ভাবনার অবসান করেছ শ্রীপাদ! জীবের সম্মুখে তুলে ধরেছ তুমি বৈষ্ণবধর্মের এক সর্বানুসরণীয় মহান আদর্শ। এ-না হলে রসাতলে যেতো আমার, তোমার, শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীবাসের এবং বহু মদ্গতপ্রাণ-ভক্তের প্রগাঢ় অনুরাগ।...শ্রীঅদ্বৈত গভীর ধীর প্রবীণ,—তুমি সদানন্দময়—মুক্ত—অবাধ,—গৌড়ে তোমাদের দুজনেরই একান্ত দরকার ছিল। অন্যান্য প্রদেশেও আমার বাণী বহন করে—বহু আচার্য ব্রতী হয়েছেন নাম-প্রচারে। এখন আমি নিশ্চিন্ত।...আশীর্বাদ করি,—তোমার আদর্শ, তোমার মহান ঐতিহ্য দিনে দিনে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

কৃতার্থ হলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আশীর্বাদ পেয়ে। আজ তাঁর মনে সত্যই আর কোন গ্লানি ছিল না। বিরুদ্ধবাদীর দল আজ তাঁর স্বরূপ জেনেছে—জেনেছে তাঁর মহিমা।...গৌড়ের দিকে দিকে উঠছে প্রভু নিত্যানন্দের জয়গান,—ছুটে আসছে অসংখ্য জন তাঁর শরণ-লাভের আশায়! কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, মহাপ্রভুর অপার মাহাত্ম্য তাঁর প্রতিটি কার্যে।......

* * *

'প্রভু, এই আপনার বরপুত্র, একে আশীর্বাদ করুন।'—বললেন শ্রীশিবানন্দ সেন মহাপ্রভুকে প্রণাম করে। সাত বৎসরের শিশুপুত্র পরমানন্দকে নিয়ে এসেছেন তিনি সঙ্গে। পুত্রের দিকে চেয়ে বললেন সস্নেহ কণ্ঠে,—'বৎস, এই মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ,—প্রণাম কর।'

এবার, বিশেষ করে পুত্রের জন্য প্রভুর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতেই শিবানন্দ এসেছেন নীলাচলে। তাঁর পত্নীও এসেছেন।...মহাপ্রভু কন্যার মতই দেখতেন শিবানন্দের স্ত্রীকে,—সাত বৎসর পূর্বে তাঁকে পুত্রবর দিয়েছিলেন প্রভু।...... বালক পরমানন্দ পিতার আদেশ-মত মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করলেন শ্রীগৌরাঙ্গকে।

'বেশ ছেলেটি হয়েছে তোমার।'—মহাপ্রভু ডান পা তুলে বালকের মাথায় ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করতে গেলেন তাকে। কিন্তু অজ্ঞান বালক পরমানন্দ কি বুঝলো,—ব্যগ্রভাবে প্রভুর পা'টি ধরে বুড়ো আঙ্গুলটি মুখের ভেতর পুরে চুষতে লাগলো।

মৃদু হেসে প্রভু পা সরিয়ে নিলেন।..."বৎস, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বল"—বললেন পরমানন্দের দিকে স্নেহনেত্রে চেয়ে। কিন্তু পরমানন্দ যেন বিভ্রান্তের মত চাইতে লাগলো এ-দিকে সে-দিকে। কিছুতেই আর কৃষ্ণনাম বলে না।...শিবানন্দ সেন নিজেও অনেক চেষ্টা করলেন পুত্রকে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলাতে; কিন্তু পরমানন্দ সেই একই ভাবে ভ্যাবাচ্যাকার মত চাইতে লাগলো। তখন প্রভু একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বলে উঠলেন,—হায়, আমি জগৎ-সংসারকে কৃষ্ণনাম বলালাম,—কিন্তু এই বালকের কাছে আমাকে হার মানতে হলো।

'প্রভু, তা নয়।'—স্বরূপ দামোদর দাঁড়িয়ে ছিলেন পাশে। মৃদু হেসে তিনি বললেন,—'আপনি বালককে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র দিয়েছেন,—সে কেমন করে তা প্রকাশ করবে,—তা যেন ভেবে পাচ্ছে না।'

'তাই কি ?'—প্রভু চাইলেন বালকের দিকে,—'তবে বৎস, তুমি যা-হোক কিছু বল।'..তখন সেই সাত বছরের বালক,—যার যুক্তাক্ষর-জ্ঞানও ভাল হয়নি,—সে উঠে দাঁড়িয়ে মনে মনে একটি শ্লোক রচনা করে আবৃত্তি করলে,—

> শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
> বৃন্দাবনতরুণীনাং মণ্ডলমখিলং হরির্জয়তি॥

যিনি ব্রজ-যুবতীগণের কর্ণে কর্ণ-পদ্ম, নেত্রে সুরস অঞ্জন, বক্ষে নীলকান্তমণি-হার অথবা তাদের সর্বাঙ্গের ও অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভূষণ,—সেই শ্রীহরির জয় হোক।

পরম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সকলে চাইলেন বালকের দিকে।—কি আশ্চর্য,

—এ অসম্ভব সম্ভব হলো কার মহিমায়?—প্রভু কিন্তু কোনরকম বিস্ময় প্রকাশ না করে বললেন,—বৎস, তুমি ভবিষ্যতে সুকবি হবে। এই শ্লোকে তুমি প্রথমেই ব্রজাঙ্গনাদের কর্ণভূষণের বর্ণনা করেছ,—তাই আজ আমি তোমার নামকরণ করছি,—'কবিকর্ণপুর।'

সকলে সানন্দে প্রভুর জয়ধ্বনি করে উঠলেন! বর্ণে বর্ণে সফল হয়েছিল প্রভুর আশীর্বাদ। এই বালক উত্তরকালে কবিকর্ণপুর নামে বিপুল কবি-প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক বৈষ্ণব-জগতের পরম আদরের বস্তু।......

তখনকার দিনে প্রথা ছিল, কেউ কোন কাব্যাদি রচনা করলে দেশের রাজার সভায় এসে পাঠ করতেন। রাজার স্বীকৃতি পেলে—সে-কাব্যের আদর হতো জনসাধারণে। কিন্তু রসবোধ ও পাণ্ডিত্যের জন্য প্রভুর নাম এমন সুবিস্তৃত হয়েছিল যে,—অতঃপর কবিরা কোন কাব্য লিখলে নীলাচলে এসেই পাঠ করতেন মহাপ্রভুর সভায়। মহাপ্রভুর আশীর্বাদ কবির ললাটে জয়ের টীকা অঙ্কিত করতো।

* * *

কিন্তু জগতে এমন একদল লোক আছে,—যারা শুভ্র-নির্মল কিছু দেখলে বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে।...সেই শুভ্র বস্তুতে কোনরকমে কালিমা লেপন করতে পারলেই তাদের আনন্দ!...সন্ন্যাসী হলেও শ্রীপাদ রামচন্দ্রপুরীর স্বভাবটা ছিল কতকটা এই রকম।...একদিন তিনি নীলাচলে আসেন প্রভুকে দর্শন করতে।... বয়সে তিনি ছিলেন প্রভুর চেয়ে অনেক বড়। মহাপ্রভু তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে—পরম সমাদরে ভিক্ষা করালেন নিজে কাছে বসে।......কয়েকদিন সেখানে থাকবার জন্যও অনুরোধ করলেন পুরীকে।

কিন্তু থাকতে থাকতে প্রভুর লোকপূজ্যতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে প্রবল ঈর্ষা জেগে উঠলো পুরীর মনে। তিনি অবিরত শুধু প্রভুর ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টায় ফিরতে লাগলেন।...কিন্তু অনেক করেও কিছু না পেয়ে অবশেষে এক-দিন প্রভুর ঘরে পিঁপড়ে দেখে বলে উঠলেন,—'সন্ন্যাসীর মিষ্টান্ন খাওয়া বিধি-বিরুদ্ধ। কিন্তু শ্রীচৈতন্য যে মিষ্টান্ন খান,—তা তাঁর ঘরে পিঁপড়ে দেখেই বুঝতে পারছি।...আমাকে যেভাবে 'ভিক্ষা' করান,—তাতেও বুঝি, তিনি নিজে কিরূপ কি আহার করেন।...এত খাওয়া সন্ন্যাসীর ভাল নয়। একে শ্রীচৈতন্যের বয়স কম,—তার ওপর আহার-সংযম না করলে ইন্দ্রিয়-দমন হবে কেমন করে?

কথাটা মহাপ্রভুর অন্তরে করলো প্রচণ্ড আঘাত। সন্ন্যাসের ধর্ম কি কঠোর-ভাবেই না তিনি পালন করে আসছেন—গোড়া থেকে! বাহ্য-বেশের সঙ্গে অন্তরের সূচী-প্রমাণ-পার্থক্যহীন সামঞ্জস্য রাখবার তাঁর কি অপূর্ব প্রয়াস—

কি দারুণ কৃচ্ছ্রসাধন !...তবু তার ত্রুটি আছে ? প্রভু পরদিনই আদেশ করলেন ভক্তদের,—আমার আহার্যের পরিমাণ আজ থেকে যথাসম্ভব কম করে দেবে। আর কোন উপাদেয় দ্রব্য আমায় দেবে না। শুধু শাক আর ভাত। আর নফরা।

'প্রভু, প্রভু'—ভক্তেরা কেঁদে পড়লেন,—পুরী গোঁসাইয়ের কথায় আপনি আত্মপীড়ন করবেন না। তিনি আপনার প্রতি মনে মনে বিদ্বিষ্ট। আপনার অনিষ্ট-সাধনই তাঁর উদ্দেশ্য। আপনার আহারে কোন বাহুল্যই নেই।...এর চেয়ে কম করতে গেলে—আপনার দেহরক্ষা করা কঠিন হবে। দেহরক্ষা না হলে কি ধর্ম-সাধন হবে প্রভু ?

'স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু পুরীর দোষ কি ?'—প্রভু দৃঢ় কণ্ঠেই বললেন,—'তিনি ঠিকই বলেছেন। তিনি প্রবীণ,—তাঁর কাছে আমি বালক। কথার ছলে তিনি আমাকে উপদেশই দিয়েছেন—আমারই কল্যাণের জন্যে। সন্ন্যাসীর আহারের জন্যে এত চিন্তা কেন তোমাদের ? সন্ন্যাসীর আহারের পরিমাণ যত কম আর বাহুল্যবর্জিত হয়,—ততই ভাল।

কারো কোন কথাই আর শুনলেন না প্রভু। লাভ এই হলো যে,—কিছু-দিন পরে প্রভুর বিশাল দেহ উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে খুবই দুর্বল হয়ে পড়লো। রামচন্দ্রপুরীর যে এতে কি মহান উদ্দেশ্য-সাধন হলো,—তা অবশ্য তিনিই জানেন। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো না। নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমা নিষ্কলঙ্কই রয়ে গেলেন।...ভক্তদের কিন্তু প্রভুর জন্যে উদ্বেগের যেন সীমা থাকলো না।...

গৃহী-ভক্তদের প্রভু মাঝে মাঝে বলতেন,—'সর্পবৈদ্য কি করে জান ?—সাপটিকে না মেরে তার বিষদাঁত তুলে দিয়ে তাকে নাচায়,—সাপটি আর কোন অনিষ্ট করতে পারে না তার।...তেমনি ইন্দ্রিয়গুলিকে ধ্বংস করার দরকার নেই,—কিন্তু তার বিষদাঁতগুলি ভেঙ্গে দিতে হবে।...তাহলেই আর তারা তোমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।'—

নিজের বেলায় কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলিকে যেন ধ্বংসই করেছিলেন মহাপ্রভু।......

৭৬

'প্রভু, প্রভু, ফিরে আসুন, ফিরে আসুন।'—মহাপ্রভুর পিছু পিছু ছুটছে গোবিন্দ,—'ও-গান গাইছে মন্দিরের এক দেবদাসী।'—কিন্তু গোবিন্দর কথা কি কানে ঢুকছে প্রভুর?— তিনি আপন ভাবেই ছুটছেন, গোবিন্দও ছুটছে!

অদূরে এক দেবদাসী গান ধরেছিল সুমিষ্ট তানে!—রাধিকার প্রতি কৃষ্ণের আকুল আহ্বানে ফুটে উঠছিল সে-গানের ছত্রে ছত্রে,—প্রাণের সমস্ত আবেগ যেন ঝরে পড়ছিল গায়িকার গানের সুরে! রাধার আবেশে বিবশ হয়ে উন্মাদের মত প্রভু ছুটে ছিলেন সেই গানের সুর লক্ষ্য করে—কৃষ্ণভ্রমে দেবদাসীর উদ্দেশে!

গোবিন্দ ভাবলো,—প্রভুর তো বাহ্যজ্ঞানও নেই,—বহির্চৈতনাও লুপ্ত,—এক্ষুনি হয়ত তাঁর কৃষ্ণকে মনে করে ধরে ফেলবেন ওই গায়িকাকে।—আর তার পরেই হবে বিপদ,—'প্রকৃতিস্পর্শ-পাপে' প্রভু হয়ত প্রাণ বিসর্জন দিতেই চাই-বেন। কারো নিষেধ শুনবেন না।......

যা হোক—গোবিন্দর ঘন ঘন উচ্চ চীৎকারে অবশেষে প্রভুর আবেশ কেটে গেল। তিনি থমকে দাঁড়ালেন,—অন্তরের কৃষ্ণ-বিরহের তাপ ফুটে উঠেছে তখন তাঁর চোখে মুখে।...গোবিন্দ তাঁর ভুল ভাঙতেই প্রভু সানন্দে কৃতজ্ঞচিত্তে আলিঙ্গন করলেন তাকে,—'গোবিন্দ, গোবিন্দ, আজ তুমি আমাকে কিনে রাখলে!'

* * *

বাস্তবিক, আজকাল প্রভুকে নিয়ে বড়ই বিব্রত হতে হয়েছে গোবিন্দকে,—এবং ভক্তদেরও। একটি মুহূর্তও যদি তাঁরা অসতর্ক হয়েছেন,—অমনি বাধবে কোন বিপদ! প্রভুর যেন আর বাহ্য-চৈতন্য একেবারেই নেই। রাধার আবেশে আকুল হয়ে প্রতিক্ষণই তিনি খুঁজে ফিরছেন তাঁর প্রাণধন কৃষ্ণকে।

গয়াধামে বিষ্ণুর চরণ-চিহ্ন দেখে অবধি প্রভুর প্রাণে জেগে উঠেছে কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদনা,—মূলতঃ সেই প্রেমাবেশে আত্মহারা হয়েই তিনি যথাসর্বস্ব ছেড়ে হয়েছেন সন্ন্যাসী।—এক-একটি করে সন্ন্যাস-জীবনেরও দীর্ঘ বারোটি বৎসরই

তাঁর কেটেছে একরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই অন্বেষণে। এতদিন তবু অনেকটা থাকতেন তিনি সহজ অবস্থায়—সহজজ্ঞানে!...কিন্তু আজ কিছুদিন হলো,—রাধার আবেশে সম্পূর্ণই আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে তাঁর। নবদ্বীপে এই দিব্যোন্মাদনার সূচনা হয়েছিল বটে,—তবে তা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।......

এখন কিন্তু নিজেকে যেন আর স্মরণ করতেও পারেন না প্রভু। ভাবেন,—তিনিই বিরহিনী রাধা, কৃষ্ণ চলে গেছেন তাঁকে ছেড়ে,—অমনি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে উন্মাদ হয়ে ওঠেন!...আপন কস্তুরী-গন্ধে পাগল কস্তুরী-মৃগ-সম ঘুরে বেড়ান তিনি—তাঁর কৃষ্ণের অন্বেষণে চতুর্দিকে।...কি অপূর্ব সে দিব্যোন্মাদ, কত রস-মধুর সে-নিগূঢ় লীলা! বর্ণনার তো নয়ই,—আবার ওই ভাবের ভাবুক না হলে তা উপলব্ধিই বা করবে কে?

প্রথম প্রথম প্রভু দিনের বেলায় কতকটা সহজ জ্ঞানে থাকতেন,—সন্ধ্যা হলে কিন্তু আর বহির্জগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকতো না;—সমস্ত রাত্রি কাটতো তাঁর বিনিদ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের আকুল প্রতীক্ষায়। কিন্তু ক্রমশঃ এমন হলো যে,—দিনরাত সমান হয়ে গেল তাঁর কাছে।...অন্যের তো কথাই নেই—অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গেও যেন আর কোন সম্পর্ক থাকলো না। এক তিনি—রাধিকা,—আর তাঁর কৃষ্ণছাড়া যে—বিশ্ব-সংসারে আর কোথাও কিছু আছে,—কেউ আছে,—এমন সম্বিৎও থাকলো না তাঁর।—বহির্জগৎ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেল তাঁর মন থেকে!

কখনো কখনো শোনেন যেন উৎকর্ণ হয়ে শ্যামের বাঁশরীর তান,—চোখেও বুঝি ফুটে ওঠে সুস্পষ্টভাবে—যমুনা-পুলিনে কদম্ব-হেলানে দাঁড়িয়ে আছেন—বংশীধারী,—অমনি ছোটেন সেই দিকে প্রাণাকুল আবেগে,—ফলে কোথাও হয়ত অচৈতন্য হয়েই পড়ে থাকেন,—হয় মন্দিরের কাছে,—নয়ত যেখানে-সেখানে। ভক্তেরা উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে খুঁজে বেড়ান তাঁকে চারিদিকে।...

*　　*　　*

দেখে শুনে রামানন্দ একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠের মধ্যে থাকবার ব্যবস্থা করলেন প্রভুর। চারিদিকে দিলেন সতর্কতার বেড়া। নিজেও স্বরূপকে নিয়ে সব-সময় প্রভুর কাছে থেকে তাঁকে কৃষ্ণ-কথায় ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেন।...ভাবলেন,—কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে পাগল হয়ে একটা বিপদ ডেকে আনার চেয়ে,—কৃষ্ণ-কথা শুনে প্রভু যদি আনন্দ পান তো সে অনেক ভাল! এমনকি, প্রভু যাতে কৃষ্ণকে ভুলতে পারেন,—স্বরূপ একবার সে-চেষ্টা করেও দেখলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বিফল হতে হলো তাঁকে।

এই অন্তঃ-প্রকোষ্ঠে প্রভু যে নিগূঢ় লীলারস উপভোগ করতে লাগলেন, তাকে বলা হয়েছে গম্ভীরা লীলা। প্রভুর এই লীলা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য

হয়েছিল একমাত্র স্বরূপ এবং রাম রায়ের। তাঁরা এই লীলারস আস্বাদনও করেছিলেন প্রভুর সঙ্গে! ক্বচিৎ শিখি মাহাতি ও মাধবী দাসীর এ-সৌভাগ্য ঘটতো। সাধারণ বুদ্ধির অগম্য এ-এক অপূর্ব ভাব-জগতের বস্তু!...সুযোগ্য অধিকারী ছাড়া—এ রসানন্দ-পানের শক্তি আর কার?—এই গম্ভীরা লীলায় প্রভু ছিলেন স্বয়ং রাধিকা—এবং স্বরূপ ও রামানন্দ তাঁর দুই সখী। সখিগণ-সঙ্গে শ্রীমতী প্রতিমুহূর্ত কৃষ্ণ-কথায় বিভোর!...তখনই কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে প্রভু মূর্চ্ছা যাচ্ছেন,—স্বরূপ আর রামানন্দ তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করছেন;—তখনই নিষ্ঠুর কালার প্রতি অভিমান জাগছে রাধা-ভাব-বিভাবিত প্রভুর মনে,—স্বরূপ ও রামানন্দও ভাবিত তখন সখি-ভাবে,—তাঁরা সান্ত্বনা দিচ্ছেন 'শ্রীমতীকে'। তখনই কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে নিশিযাপন করেছেন বলে,—শ্রীমতীর দুটি আঁখিতে অভিমানের বন্যা ছুটছে,—'সখিরাও' কপট শ্যামের এই চাতুরিতে ব্যথিত হয়ে কত মনস্তাপ করেছেন!...এ-লীলার প্রতিটি মুহূর্ত এক অফুরন্ত রসে ভরপুর!

দিনের তো কথাই নেই,—রাত্রিতেও ঘুম ছিল না কারো চক্ষে।—দিনের পর দিন—মাসের পর মাস, এবং বছরের পর বছরও কেটে যেতে লাগলো এইভাবে। অন্যান্য ভক্তদের গম্ভীরালীলা-প্রকোষ্ঠে প্রবেশের অধিকার ছিল না। তবে বাইরে থেকে প্রভুর জন্য সব সময় সতর্ক থাকতেন তাঁরা। যেহেতু এই লীলা-রস-মগ্নতার মধ্যেও প্রভু যে কেমন করে কখন—এমনকি রাত্রির মধ্যেও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেন তাঁর কৃষ্ণ-অন্বেষণে,—তা কেউ টেরই পেতেন না। অনেক সময় দেখা যেতো, ঘর ঠিক বন্ধই আছে,—কিন্তু প্রভু ঘরে নেই,—প্রভু তখন পড়ে আছেন মূর্চ্ছিত হয়ে—মন্দির-প্রাঙ্গণে।

কয়েক বছরই চলে গেল দেখতে দেখতে ঠিক একইভাবে। ইতিমধ্যে শচীদেবী অন্তর্ধান করেছেন,—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হয়েছেন প্রভুর উত্তরাধিকারিণী,—তিনি প্রভুর খড়ম দুটি বহুমূল্য আসনে স্থাপিত করে—প্রতিটি মুহূর্ত যাপন করছেন তাঁর প্রাণের দেবতার ধ্যানে।—কি মহিমময়ী পতিপ্রেমে তপস্বিনী সাধ্বীর সে দিব্যভাব-বিভাসিত শীর্ণ-প্রশান্ত মূর্তি!—সর্বশুচি-শুভ্রা দেবী সরস্বতীই যেন নেমে এসেছেন সংসারে!...ভক্তদের সেবায় প্রভুর বাড়ীতে কোনদিন কোন অভাব নেই—বরাবরই সেই একভাবে চলছে দেব-সেবা,—এবং অতিথি-অভ্যাগতের সৎকার,—আজিও চলছে! প্রভুর স্মৃতি থেকে অবশ্য আজ মুছে গেছে যাবতীয় সাংসারিক স্মৃতি। মুছে গেছে নবদ্বীপ, মুছে গেছেন বিষ্ণুপ্রিয়াদি সকলেই।......এখন তাঁর মনোমন্দিরে জেগে আছেন শুধু, কৃষ্ণ—

ব্রহ্মাণ্ডময় শুধু কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ। ক্বচিৎ স্বপ্নের মত মায়ের স্মৃতি পলকমাত্র ভেসে ওঠে তাঁর মনে,—কিন্তু তখনই মিলিয়ে যায়!

ক্রমে ক্রমে প্রভুর আকুলতা এমনই বেড়ে গেল যে,—আর ঘরের মধ্যেও তিনি থাকতে পারতেন না।...কি জানি সে-কোন শক্তিবলে—যখন তখন সকলের অলক্ষ্যেই বেরিয়ে পড়তেন কক্ষ থেকে।—কখনো গিয়ে উঠতেন গোবর্ধন-ভ্রমে—নিকটবর্তী চটক পর্বতে। খুঁজতে খুঁজতে ভক্তেরা গিয়ে দেখতেন—বিগত-আত্মা-দেহীর মত পড়ে আছেন,—কোন চিহ্ন নেই জীবনের, শিথিল হয়ে গেছে যেন সর্ব-অঙ্গ।—ভক্তেরা অনেক করে নির্বিকল্প ভাব-সমাধি থেকে আবার জাগিয়ে তুলতেন তাঁকে।...স্বরূপ এবং রামানন্দও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবার,—চারদিক থেকে ভক্তেরাও সজাগ-সতর্ক হয়ে উঠলেন প্রভুর জন্যে।......

ক্রমে ক্রমে এই গম্ভীরা-লীলায় একে একে দীর্ঘ বারোটি বছরই কেটে গেল মহাপ্রভুর।...এই বারো বছর—একাদিক্রমে প্রভু প্রতিটি রজনী যাপন করেছিলেন জাগরণে,—তাঁর কৃষ্ণের আগমন-প্রতীক্ষায়। কি অচিন্ত্য সে কৃষ্ণ-বিরহ,—আবার বিরহের মধ্য দিয়েই কি অপূর্ব সে মিলনের রস-মাধুর্য!—এ যেন পুষ্প-বাস খুঁজে ফিরছে—সেই পুষ্পটিকে,—যার কক্ষচ্যুত হয়েছে সে বায়ুর স্পর্শে! এ যেন সঙ্গীত ছুটেছে তার মর্মগত সুরটির সন্ধানে,—ধ্বনি খুঁজছে তার শব্দটিকে।

প্রভু সন্ন্যাস নিয়েছিলেন চব্বিশ বৎসর বয়সে।—চব্বিশ বৎসর কাটলো তাঁর নীলাচলে—বারো বৎসর সহজ-লীলায়; বারো বৎসর গম্ভীরা-লীলায়।—প্রভু পদার্পণ করলেন এবার আটচল্লিশে।

* * *

জ্যোৎস্না-পুলকিত শরৎ-সন্ধ্যা। রজত-শুভ্র চন্দ্র-কিরণে চারিদিক নির্মল স্নিগ্ধ আলোকে পরিপ্লাবিত।...বিশ্বপ্রকৃতি যেন জ্যোৎস্না-বন্যায় স্নাত হয়ে হাসছেন মধুর হাসি বিপুল পুলকে।...সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে যেন তার রূপোর ঝালর।...মাথার ওপর কৌমুদী-বিধৌত অসীম নীলাকাশ! অনন্ত ব্যোম নীরব ভাষায় প্রচার করছে যেন শাশ্বতকালের এক মহাবাণী,—'অসতো মা সদ্-গময়।' নিম্নে প্রশান্ত-গম্ভীর অতলস্পর্শ অগাধ মহাসমুদ্র! নীল জল-রাশির ওপর চন্দ্র-কিরণ-সম্পাতে বক্ষে তার সৃষ্টি হয়েছে এক অপূর্ব মায়া-মরীচিকা!

বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চেয়ে চেয়ে সহসা মহাপ্রভুর অন্তর উথলে উঠলো ভাব-তরঙ্গে। প্রতি অঙ্গ জর্জরিত হয়ে উঠলো বিরহ-তাপে! ভাবের আবেগে তিনি ভাগবতোক্ত রাস-লীলার শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন। কিন্তু তাতে মনের আগুন শান্ত না হয়ে জ্বলে উঠলো দ্বিগুণভাবে।...মনে পড়লো বৃন্দা-

বন,—মনে পড়লো ব্রজধামের অনন্তলীলা-রস-মাধুর্য ! রাস-রসময় শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধার অদম্য আকুলতা জেগে উঠলো তাঁর বুকে।... তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। দিব্যোন্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে—জানি না কেমন করে সকলের অগোচরেই বেরিয়ে পড়লেন পথে।...অভিসারিকার মত বিহ্বল চিত্তে—স্খলিত চরণে দ্রুত এসে পড়লেন আই-টোটায়। চতুর্দিকে প্রেমার্ত চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘুরতে লাগলেন সেখানে পাগলের মত,—কই, কৃষ্ণ—কোথায় আমার কৃষ্ণ ?

অদূরে মহাসমুদ্র !...অশ্রান্ত গর্জনে কাকে আহ্বান করছে, কে জানে !... মহাব্যোম—আর মহান্ জলধি—বর্ণে সুষমায় অসীমতায় যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।...কৌমুদী-খচিত নীল সিন্ধু-বক্ষ হেসে উঠছে যেন স্নিগ্ধোজ্বল শ্যামকান্তি শ্যামসুন্দরের উদার বক্ষের মত। মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-প্রতীক্ষাকুল সতৃষ্ণ দৃষ্টি সহসা আকৃষ্ট হলো সে-দিকে। অমনি বহির্চেতনা আর কিছুমাত্রও থাকলো না তাঁর। অন্তরের অধীর আবেগ ফুটে উঠলো তাঁর চোখে-মুখে,—ফুটে উঠলো তাঁর কণ্ঠে,—ওই, ওই তো আমার কৃষ্ণ,—ওই—ওই তো আমার শ্যামসুন্দর—

উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে প্রভু ঝাঁপিয়ে পড়লেন অগাধ সমুদ্রের জলে।—শ্যামাংগ কৃষ্ণের শ্যাম-সুষমায় মিশে গেল যেন স্বর্ণকান্তি রাধার বর্ণ-সুষমা !...সংগে সংগে নীলাম্বুরাশির বক্ষে জেগে উঠলো একটি আবর্ত,—একটি অস্ফুট কলধ্বনি,—আমার কৃষ্ণ—আমার কৃষ্ণ—

এ-দিকে অন্বেষণ-রত ব্যাকুল ভক্তগণের বেদনাকুল কণ্ঠ তখন কেঁপে কেঁপে বাতাসে ভেসে আসছে,—প্রভু,—প্রভু,—

এই পুস্তক-রচনায় সাধারণতঃ যে সকল গ্রন্থের অল্প-বিস্তর সাহায্য নিয়েছি:

(১) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

(২) শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত—বৃন্দাবন দাস ঠাকুর

(৩) শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল—লোচন দাস

(৪) মুরারি গুপ্তের কড়চা

(৫) গোবিন্দ দাসের কড়চা

(৬) অমিয় নিমাই-চরিত (১-৬ খণ্ড)—মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

(৭) শ্রীগৌরাঙ্গ-তথ্য-সম্বলিত অন্যান্য পুস্তক।